ইদ সংখ্যা

করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সহযোগিতার জন্য সমন্বিত প্রয়াস

যাঁদের কারণে ‘অত্রিক’ আলোর মুখে...

উদ্যোক্তা

সোহাইল রহমান

হাফিজুর রহমান রিক

সম্পাদনা টিম

জাকির হোসেন

তাহমিদ রহমান

সোহাইল রহমান

হাফিজুর রহমান রিক

প্রাথমিক বানান সংশোধন

সিরাজুল আরিফিন

নুর ইসলাম টিপু

খাদিমুল মুরসালিন রিয়াদ

আসিফ জামান

ফাহাদ হৃদয়

ফাতিহা সুমাইয়া মিরিম

দেবলীনা চৌধুরী

এইচ আল হাদী

ইমরান হোসাইন

মুর্তজা সাদ

চূড়ান্ত বানান সংশোধন

জাকির হোসেন

তাহমিদ রহমান

অঙ্গসজ্জা ও গ্রাফিক্স

সতীর্থ প্রকাশনা,

রাজশাহী

প্রচ্ছদ

সজল চৌধুরী

বিপনন

Lighter Youth Foundation (lighterbd.org)

সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফিচার ফটো গুগল থেকে নেওয়া।

স্বত্তাধিকার লঙ্ঘিত হলে আমাদের যাথে যোগাযোগের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উ।ৎ।স।র্গ

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা সকল ব্যক্তিকে

এবং

করোনাযুদ্ধের সকল ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের

সম্পাদকীয়

আমার কাছে পৃথিবীর যেকোনো সংগ্রাম বা লড়াইয়ের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হলো, “যার যা আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া।”

এই মূল্যবান কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে। লড়াইটা যে কারও বিরুদ্ধেই হোক না কেন, জিততে হলে সবাইকে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। লড়াইয়ে জেতার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রটি সবার কাছে থাকে না। এজন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, যার কাছে যা আছে তাই নিয়েই।

এই যে এখন পুরো পৃথিবী কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। জিততে হলে সবাইকে একসাথে লড়তে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে যা আছে তাই নিয়েই। ডাক্তার চিকিৎসা দেবেন, বিজ্ঞানী গবেষণা করবেন, পুলিশ দেবেন জনসুরক্ষা, সাংবাদিকরা সঠিক তথ্য দিয়ে পাশে থাকবে। আর আমরা যারা লেখক-কবি-কথাসাহিত্যিক-প্রকাশক, তারা কী নিয়ে এই লড়াইয়ে নামতে পারি? হ্যাঁ, লেখার ক্ষমতা আছে আমাদের। আছে মানুষকে মুগ্ধ করার মতো লেখনীশক্তি। আমরা লড়াইটা লড়তে পারি নিজেদের এই লেখা দিয়েই। সেই লক্ষ্যেই ‘অত্রিক’ নামের এই ম্যাগাজিন শুরু করার ভাবনা।

ভাবনাটা ছিলো এরকম যে, বাংলাদেশের সকল জনপ্রিয় লেখক, কবি ও কথাসাহিত্যিকগণের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে আমরা একটা ডিজিটাল ম্যাগাজিন প্রকাশ করব পিডিএফ ভার্সনে। যেটা পাঠক সর্বনিম্ন পঞ্চাশ টাকা দামে ক্রয় করবে এবং সেই টাকাটা সরাসরি চলে যাবে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায়তায়।

রাতে এরকমটা ভেবে-চিন্তে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিলাম। সকালে উঠে বুঝতে পারলাম, “ভাবনা যতটা সহজ, ব্যাপারটা বাস্তবায়ন করা ঠিক ততটাই কঠিন।”

একা আমার পক্ষে এমন কিছু করে ফেলা মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার।

অত্রিকের আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা যখন ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে, তখন এগিয়ে এলেন ‘কফিশপ’ নামের জনপ্রিয় যৌথ উপন্যাসের একজন লেখক হাফিজুর রহমান রিক। ফ্রান্স প্রবাসী গোল চশমা পরা গোলগাল এই মানুষটা আমাকে বললেন, “চলো, ম্যাগাজিন বের করেই ফেলি। যেভাবেই হোক না কেন, বের করি।”

তার কথার মধ্যে কিছু একটা ছিল। আমি ভরসা পেলাম। প্রথমবারের মত মনে হলো, কিছু একটা করা সত্যিই সম্ভব।

রিক ভাইয়ের হাত ধরে এগিয়ে এলেন সতীর্থ প্রকাশনার প্রকাশক তাহমিদ রহমান। যার পরিশ্রম এই ম্যাগাজিনের পেছনে সবচেয়ে বেশি। হয়তো আমি যখন এই সম্পাদকীয় লিখছি সে তখনও কম্পিউটারের সামনে বসে ম্যাগাজিনের চেহারা আরও কীভাবে উন্নতি করা যায় সেইটা নিয়ে ভাবছে। কাজের একটা পর্যায়ে সতীর্থ প্রকাশনার পুরো টিম তাদের নিজেদের কাজ ফেলে এই ম্যাগাজিনের পেছনে সময় দিয়েছে; একদম নিঃস্বার্থভাবে। ম্যাগাজিন তৈরির টেকনিক্যাল কাজের পুরোটাই করেছে তাহমিদ ভাই ও তার 'টিম সতীর্থ'।

মজার বিষয় হলো তাহমিদ ভাইও দেখতে গোলগাল। পরেন গোল চশমা।

আমি যখন মোটামুটি শিওর যে ম্যাগাজিনের জন্য শুধু গোল চশমা পরা গোলগাল গড়নের মানুষরাই কাজ করবে, তখন আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত করে এগিয়ে আসলেন ভূমিপ্রকাশের প্রকাশক জাকির হোসেন ভাই। চারকোণা চশমা পরা চিকণচাকণ এই লোকটা অবতীর্ণ হলেন সম্পাদকের ভূমিকায়। কার কার লেখা কোথায় কীভাবে সাজানো হবে, প্রুফ দেখা হবে কীভাবে, কী ডিজাইন হলে ভালো হয়, প্রচ্ছদ কাকে দিয়ে করা হবে থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ খুব সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটিভাবে করে দিলেন রাত জেগে।

কাজের মাঝ পর্যায়ে ম্যাগাজিনের নাম ঠিক হলো 'অত্রিক'। এরপরে এখন একটাই চিন্তা, কীভাবে বিক্রি করা হবে? মানুষের থেকে টাকাটাই বা কীভাবে নেওয়া হবে? সেই সমাধানে মুক্তার ইবনে রফিক ভাই এগিয়ে এলেন লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনকে সাথে নিয়ে। যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটা 'অত্রিক' পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবে এবং ম্যাগাজিন থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করবে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য।

এসবের বাইরেও আরো কয়েকজনের কথা না বললেই নয়। একজন শরীফ মজুমদার; রস+আলোতে লিখতেন নিয়মিত। অসাধারণ লেখেন। উনাকে আমি শুরুর দিকে বলি ম্যাগাজিনের কথা। পরে নিজেই হতাশ হয়ে বাদ দিতে গেলে উনিই আমাকে বারবার মোটিভেট করে ম্যাগাজিন বের করার ইচ্ছাটা আমার মধ্যে তাজা করে রেখেছিলেন। আরেকজন হলো দুই বাংলার জনপ্রিয় ইউটিউবার "দ্য বং গাই" খ্যাত কিরণ দত্ত। সবার আগে আমি এই ছেলেটার কাছে ভয়ে ভয়ে একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ চাই ম্যাগাজিনের জন্য। কিন্তু সে আমাকে আস্ত একটা গল্প দিয়ে দিয়েছে।

মাঝে কাজের প্রেশার দেখে অনেকবারই আমার মনে হয়েছে ম্যাগাজিনের প্ল্যান বাদ দেবো। শুধুমাত্র এই ছেলেটা নিজে থেকে একটা গল্প দিয়েছে, ভেবেই আমি আবার কাজ চালিয়ে গেছি। এত বিখ্যাত কারো লেখা নষ্ট হতে দেওয়া যেত না।

বলার সাথেই গল্প পাঠিয়ে দিয়েছেন সাদাত হোসাইন ভাই, ওবায়েদ হক, শরিফুল হাসান, ইশতিয়াক আহমেদ, কাসাফাদ্দৌজা নোমান ভাই, ওপার বাংলার দেবতোষ

দাশসহ আরও অনেকে। সম্পূর্ণ ফ্রিতে ম্যাগাজিনের দুর্দান্ত প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন সজল চৌধুরী। কমপক্ষে দশজন ছেলে-মেয়ে বিনামূল্যে করেছে প্রাথমিক প্রুফ দেখার কাজ। কৃতজ্ঞতা তাদের সবার প্রতিও। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা ‘গুগল’ মামার প্রতি। তার মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া বেশ কিছু ছবি ম্যাগাজিনে ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু কথা হলো, নামেমাত্র সম্পাদক হিসাবে আমি এই সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া আর কী করেছি? সত্যি বলতে তেমন কিছুই না। দুইবার নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটির মাধ্যমে ঝগড়া সৃষ্টি করে ম্যাগাজিনের প্ল্যান বাদ দেওয়ার সূক্ষ্ম একটা চেষ্টা অবশ্য চালিয়েছিলাম, কিন্তু বাকি সবার জন্য সেই চেষ্টা সফলতার মুখ দেখেনি। আমার ষড়যন্ত্র মাঠে মারা গেছে।

একদিন এই করোনার কাল শেষ হবে। সবাই আবার নিশ্চিন্তে বাইরে বের হবো। হাসবো, আড্ডা দেবো, রেস্টুরেন্টে যাবো, চায়ের দোকানে ভীড় করবো। সেই দিনটা আসার আগে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুন। এই শুভকামনা জানিয়ে নিজের লেখা জীবনের প্রথম সম্পাদকীয়টা শেষ করছি। করোনার এই ছুটিতে সবাই ‘অত্রিক’ কিনুন, ‘অত্রিক’ পড়ুন এবং নিজ নিজ ঘরে থেকে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

ধন্যবাদ।

ম্যাগাজিন প্রকাশনা টিমের পক্ষে,

সোহাইল রহমান

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

সূচিপত্র

ক্যাটাগরি: কবিতা/ছড়া

ব্রত রায় ৭৬
মাহী ফ্লোরা ১০১
সৈয়দা সুরভি রহমান ২৬৫
প্রসেনজিৎ রায় ৮০
তাহমিদ রহমান ১৪৩
শ্রাবণী জুঁই ১৩৭
মোবারক খান হৃদয় ১৫৪
আয়শা আহমেদ ২৩৩
জাকিয়া ফেরদৌস ১৮২
লুনা লাবিব ১৯৭
খাদিমুল মুরছালীন রিয়াদ ২১৭
সানোয়ার রাসেল ২২৬
মাঈশা মারিয়াম ২৫১
জাকিয়া আফজাল ২৯৪

ক্যাটাগরি: ফিচার/স্মৃতিকথা

শেখ রানা ১৯৮
অসীম পিয়াস ২৭৯
সৈয়দ নাজমুস সাকিব ৩০৪
রিফাত এমিল ৭৭
শেখ মিনহাজ হোসাইন ২৩৬

জনরা : আধিভৌতিক/হরর

রুমানা বৈশাখী ২৬৮
সজল চৌধুরী ৯৮
রাজীব চৌধুরী ১৬৬
লুৎফুল কায়সার ১০২
অপু তানভীর ১২৯

ক্যাটাগরি : গল্প

জনরা : রম্য

ইশতিয়াক আহমেদ ৪৮
কাসাফোদ্দৌজা নোমান ৫১
শাহিন মহিউদ্দিন ১৭৯
শরীফ মজুমদার ২২২
রিফাত আহমেদ ১৩৪
মোস্তোফা মনোয়ার আকিব ১৫২
ফজলে খোদা রায়হান ২২৭
স্বর্ণাভ দে ২২৯
শাদমান জাহিন ২৩০
জান্নাতুল ফেরদৌস লাবণ্য ২৪৮
সাখাওয়াত হোসাইন ২৭৬
হাফিজুর রহমান রিক ৩১৭
সোহাইল রহমান ৩২৪

জনরা : থ্রিলার/এসপিওনাজ

শরীফুল হাসান ১৫
নাজিম উদ দৌলা ৬২
মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা ১৪৪
সালমা সিদ্দিকা ১৫৮
সুরাইয়া জামান ২৪৭

জনরা : ফ্যান্টাসি/সাইফাই

কিরণ দত্ত ২৬
মোহাইমিনুল ইসলাম বাপ্পী ১৮৪
জামসেদুর রহমান সজীব ১০৪
মেহেদী হাসান মুন ১০৯
কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত ২৫৯
মনিরা প্রীতু ২৮৯

জনরা : রোমান্টিক/মুক্তিযুদ্ধ

জয়নাল আবেদীন ৭০
মুশফিকুর রহমান আশিক ২৬৬
রুদ্র কায়সার ১৩৮
মুর্তজা সাদ ১৯৫
অভিষেক দেবনাথ অভ্র ২১৪
আলিম আল রাজি ২২০

জনরা : সাসপেন্স/সাইকোলজিকাল

ওবায়েদ হক ২০
কিশোর পাশা ইমন ৮৯
আবুল ফাতাহ ৩০৮
মাহবুব ময়ূখ রিশাদ ৯৬
আসিফ রুডলফায ১২২
মুহাম্মদ মারুফ আল-আমিন ১৯০
সঞ্জয় সরকার ২১১

জনরা : জীবনধর্মী

সাদাত হোসাইন ০৯
দেবতোষ দাশ ৩১
মাহরীন ফেরদৌস ৪০
নিয়াজ মেহেদী ৫৪
রাসয়াত রহমান জিকো ৫৯
মো. আসিফুর রহমান ২৬২
মো. ফরহাদ চৌধুরী শিহাব ৮২
নীলা হারুন ১০৬
শিহানুল ইসলাম ১১৬
শ্রাবণ সাহা ১৮৩
সকাল রয় ২৫২
সার্জিল খান ২৪২
নির্মাল্য সেনগুপ্ত ২০৩
আতিক খান ২০৭
শাহ বখতিয়ার ২১৮
আমেনা বেগম ছোটন ২৩৪
আহাদ আদনান ২৩৯
আহমেদ খান হীরক ২৯০
সুলতানা জহুরা আফরিন কুমু ২৫৫
ওমর ফারুক শ্রাবণ ২৯৫
তানভীর মেহেদী ১৫৫
জাহিদুল ইসলাম সবুজ ২০০

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

সোবহান সাহেব মারা গেলেন

সাদাত হোসাইন

সোবহান সাহেব মারা গেলেন ভোর বেলা।

ঠিক ভোর বেলা না। ফজরের খানিক আগে। তিনি ওজু করে জায়নামাজেই বসে ছিলেন। আজান হলেই নামাজ পড়বেন। বেশ কিছুদিন ধরেই শেষরাতে তার ঘুম হতো না। তিনি মটকা মেরে বিছানায় পড়ে থাকতেন। কিন্তু শেষরাতে ঘুমের আশায় বিছানায় মটকা মেরে পড়ে থাকার মতোন যন্ত্রণার কিছু হয় না। এ সময় কান থাকে প্রবল সজাগ। আর বাকী পৃথিবী শুনশান। খুট করে শব্দ হলেও কানের ভেতর গিয়ে লাগে। সোবহান সাহেবের খাটের তলায় একটা ধেড়ে ইঁদুর দিব্যি সংসার সাজিয়ে বসেছে। সোনার সংসার। সেই ইঁদুর শেষ রাতের দিকে নাতিপুতি নিয়ে ঠাকুরমার ঝুলি খুলে বসে। কুটকুট করে গল্প করে, নাকি গুড়-মুড়ি খায় কে জানে। কিন্তু সেই খুটখাট শব্দে সোবহান সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি প্রবল বিরক্তিতে উঠে হুশহাশ করেন। সুইচ টিপে বাতি জ্বালান। ধেড়ে ইঁদুরটা দলবল নিয়ে তার সামনে দিয়ে দুলকি চালে হেঁটে যায়। ফিরেও তাকায় না। যেন সেও জানে, এই বয়সে সোবহান সাহেবকে পাত্তা দেওয়ার কিছু নাই।

তিনি জায়নামাজেই বসেছিলেন। মারা যাওয়ার সময় সেই জায়নামাজেই শুয়ে পড়েছিলেন। বুকের বা দিকে একটা চিনচিনে ব্যথা। ব্যস, আর কিছু না। তখনো বোঝেননি যে তিনি মারা যাচ্ছেন। বরং দিব্যি একটা আরাম আরাম ভাব লাগছিল শরীর জুড়ে। এপ্রিলের কড়া গরমে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। আরামে তার চোখ বুঁজে আসছিল। অথচ এখন কিনা দেখছেন তিনি মারা গেছেন। কী আশ্চর্য!

সোবাহান সাহেব সত্যি সত্যি আশ্চর্য হয়েছেন। আশ্চর্য হবার অবশ্য কারণও আছে। অতি যৌক্তিক কারণ। তিনি মারা গেছেন অথচ সব শুনতে পাচ্ছেন। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন সবকিছু। গুমগুম করে মেঘ ডাকছে আকাশে। দোতলায় কেউ চিৎকার করে কথা বলছে। যে খাটিয়াতে তিনি শুয়ে আছেন, সেই খাটিয়াকে ঘিরে দুটো বাচ্চা ছেলে দৌঁড়াচ্ছে আর "কু ঝিক ঝিক, কু ঝিক ঝিক" শব্দ করছে। এমন কি পাশের বাড়ির দোতলা বা তিনতলা থেকে তীব্র শব্দে হিন্দি গান ভেসে আসছে, মুন্নি বদনাম হোয়ে, ডারলিং তেরে লিয়ে...।

এই হলো ঢাকা শহরের অবস্থা! পাশের বাসায় একটা মানুষ মারা গেছে অথচ এই নিয়ে কারো একটু সহানুভূতি পর্যন্ত নেই। থাকবে কি করে! প্রতিবেশীকে মানুষ চেনে না পর্যন্ত। মানুষের সম্পর্কগুলো দিন দিন কেমন ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। জীবিত থাকতে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতেন সোবহান সাহেব। শুধু ভাবতেনই না, এই নিয়ে তিনি পত্রিকাতে লিখেছেনও। লেখার শিরোনাম ছিল, "সম্পর্কের সেকাল-একাল।"

আহা! সে কি সময়টাই না ছিল। মানুষের জন্য মানুষের কি টান! সোবহান সাহেবের বাবা মারা গেলেন মাঘ মাসের এক রাতে। হাড় কাঁপানো শীত। সেই শীতে বাঘ-মহিষ পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপে। সোবহান সাহেবের বাবাই বলতেন,

পৌষের শীত মইষের গায়,
মাঘের শীত বাঘের গায়।

সেই "বাঘ কাঁপা শীতে" মারা গেলেন তারা বাবা। তাও মাঝরাতে। মানুষ তখন লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুম। সোবহান সাহেব শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মেজো চাচার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর এক চিৎকারে তার "দাঁত কবাটি"। দাঁত কবাটি মানে দাঁতে কবাট লেগে এখন-তখন অবস্থা। কবাট হলো গিয়ে দরজা। অর্থাৎ সোবহান সাহেব পিতৃশোকে নিজেই দাঁতে দাঁত খিল লেগে যাই যাই অবস্থা। সেই রাতে আশেপাশের মানুষ লেপ-কাঁথা রেখে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এলো। মৃতের দাফনের যোগাড়-যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। গাঁয়ের বৌ-ঝিয়েরা সুর করে ঘরের ভেতর মিহি স্বরে কোরআন শরিফ পড়ছে। শোকার্ত বাড়ির মানুষের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী? এই বাড়িতে তো আর দিন তিনেক চুলায় আগুন জ্বালানো যাবে না।

কীসের রান্না কীসের কি! গামলার পর গামলা ভাত আসতে শুরু করলো সব বাড়ি থেকে। হোগলা পেতে লম্বা বারান্দার এক কোণায় ঢালা হতে থাকলো সেই ভাত। নানান রঙের ভাতের ছোটোখাটো একটা স্তুপ হয়ে গেল সেখানে। গামলার পর গামলা শালুন। মাছ, মুরগীর শালুন। সাথে চালতা দেওয়া ডাল। বাড়ি ভর্তি শত শত লোক। তারা সুর করে কাঁদছে। দোয়া করছে। মৃতের জীবতাবস্থার ভালো ভালো গুণের কথা বলছে। সেই ভাত-শালুনের স্তুপের পাশে লম্বা লাইনে বসে ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। এই খাওয়া বেড়ে দেওয়ার জন্য দু-চার জন নিজ দায়িত্বে কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাড়ির উঠানে বিশাল নামাজের জামাত হচ্ছে। সেই জামাতের নামাজ শেষে লম্বা মোনাজাত। মোনাজাতে কান্নার ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে অন্দরমহলেও। নারী-পুরুষের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। হয়তো পৌছে যায় সাত আসমানেও।

আহা! কি মরণটাই না ছিল।

মরে গিয়েও সোবহান সাহেবের বুকের ভেতরটা আনচান করতে থাকে। বেঁচে থাকলে খুব দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে হয়তো লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাসও দিয়ে ফেলা যেত।

সোবহান সাহেব শুয়ে আছেন সবুজ রঙের লোহার খাটিয়ায়। খাটিয়া আনা হয়েছে মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ থেকে। সেই খাটিয়া রাখা হয়েছে বাসার সামনে যে ছোট্ট উঠান আছে সেখানে। পুরোনো আমলের এই বাড়িটা সোবহান সাহেব বহু কষ্টে কিনেছিলেন। দোতলা বাড়ি। সামনে এক চিলতে উঠানও আছে। সেই উঠানের একপাশে দুটি আমগাছ, দুটি কামিনী ফুলের গাছ। এই গাছে ধবধবে সাদ ফুল ফোটে। পূর্ণিমার রাতে সেই ফুল জোছনার ফুল হয়ে ফোটে। সোবহান সাহেব চন্দ্রাহতের মতো তাকিয়ে থাকতেন। তার চোখভর্তি ঘোর। একটা পেয়ারা গাছও আছে। পেয়ারা গাছটার ডালপালা বাড়ির দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। কি নরম ছায়া এই গাছের। ছোটো ছোটো পেয়ারা ধরে গাছে, সেই পেয়ারা চিনির মতো মিষ্টি।

সোবহান সাহেব বেশ কয়েকবার লেবু চা-তে চিনির বদলে একটুকরো পেয়ারা ফেলে খেয়ে দেখেছেন। স্বাদ ভালো। তিনি এই চা মুগ্ধ হয়ে খেতেন। সমস্যা হচ্ছে, তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর

থেকে এই চা তাকে খেতে হতো লুকিয়ে লুকিয়ে। ছেলে, ছেলের বৌরা দেখলে ঝামেলা আছে। তাদের ধারণা সোবহান সাহেবের মাথায় সমস্যা আছে। বয়স হলে এরকম সমস্যা অবশ্য সবারই একটু-আধটু থাকে।

সোবহান সাহেব সেই পেয়ারা গাছের তলায় খাটিয়াতে শুয়ে আছেন। খাটিয়া থেকে খানিকটা দূরেই রাবেয়া খাতুনের কবর। রাবেয়া খাতুন তার স্ত্রী। বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। সোবহান সাহেবের ছেলেরা চেয়েছিল মায়ের কবর গ্রামে হোক। সোবহান সাহেবের জন্য পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর পরেও ছেলে মেয়ের কাছাকাছি থাকতে। ব্যস্ত ছেলে-মেয়েরা কবর দেখতে যে গ্রামের বাড়ি যাবে, সোবহান সাহেব তা বিশ্বাস করেন না। তিনি একপ্রকার জোর করেই এই উঠানের একপাশে রাবেয়া খাতুনকে কবর দিয়েছেন। এবং ছেলে-মেয়েদের বলে দিয়েছিলেন, নিজের কবরও যাতে এখানে হয়। রাবেয়া খাতুনের পাশে।

শুয়ে থাকতে থাকতেই তার মনে হলো, বাড়িতে একটা বড়ই গাছ লাগানো খুবই দরকার ছিল। এই যে তিনি মারা গেলেন। এখন বড়ই পাতা দরকার হবে।

বড়ই পাতা গরম জলে,
শোয়াইয়া মশারীর তলে...

নাহ! কাজটা তিনি মোটেই ঠিক করেননি। দুই দিনের দুনিয়ার চিন্তায় তিনি আসল চিন্তাই বাদ দিয়েছেন। এখন বড়ই পাতা এরা কই পাবে? ঢাকা শহরে এই জিনিস পেতে ভালো ঝামেলা হওয়ার কথা। এরা তার জন্য কোনো ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত বড়ই পাতা ছাড়াই গোসল?

সোবহান সাহেবের বুক চিরে আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোতে চাইলো। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস কোত্থেকে বেরোবে? তার তো শ্বাসই নেই। মরা মানুষের আবার শ্বাস-দীর্ঘশ্বাস কি!

এই সময় গুমগুম করে আবার মেঘ ডেকে উঠলো। সোবহান সাহেব কিছুটা চিন্তিত বোধ করছেন। তিনি সব কিছু শুনতে পেলেও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তার অনুমানশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। শব্দ শুনেই অনুমান করতে পারছেন অনেক কিছু। যেমন, তার খাটের চারপাশে "কু ঝিক ঝিক, কু ঝিক ঝিক" শব্দে দুটি বাচ্চা ছেলে দৌঁড়াচ্ছে। কিন্তু এরা যে ছেলে, সেটা সোবহান সাহেবের জানার কথা না। বাচ্চা ছেলে-মেয়ের কণ্ঠ না দেখে আলাদা করা কঠিন। কিন্তু তিনি শুধু আলাদা করতেই পারছেন না। বরং বাচ্চা ছেলে দুটোর বয়সও অনুমান করতে পারছেন। এমনকি বাচ্চা দুটোর গায়ের পোশাক পর্যন্ত। কমলা রঙের হাফপ্যান্ট পরা ছোটো ছেলেটা বেশি ত্যাদর। সে দৌড়ানোর সময় আবার হাত বাড়িয়ে সোবহান সাহেবের পায়ের পাতা ছুঁয়ে দিচ্ছে। সোবহান সাহেব অবশ্য সেই ছোঁয়া টের পাচ্ছেন না। পাবার কথাও না।

সোবহান সাহেব আকাশের মেঘ নিয়ে চিন্তিত। গুমগুম শব্দে মেঘ ডেকেই চলছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। এরা দেরি করছে কেন? করছে কী এরা? শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি নেমে গেলে কবরের ভেতর পানি ঢুকে যাবে। সেই কাদা পানিতে মাখামাখি হয়ে শুয়ে থাকতে কেমন লাগবে কে জানে! অনেককেই হয়তো এরকম কাদা বৃষ্টিতে কবরে যেতে হয়েছে। তাদের কেমন লেগেছিল সেটা জানার উপায় অবশ্য নেই। আচ্ছা তারাও কি মরে যাবার পরে সোবহান সাহেবের মতো এমন করে সবকিছু শুনতে পেয়েছিলেন? চিন্তা করতে পেরেছিলেন?

সোবহান সাহেব আবার চিন্তায় পড়ে গেলেন। গভীর চিন্তায়। মরে যাবার পরে কি হয়, তা জানার কোনো উপায় নেই। উপায় থাকলে ভালো হতো। অনেক রহস্যই জানা যেত। সব লাশেরাই তার মতো করে ভাবতে পারে কিনা জানা যেত। চূড়ান্ত রহস্য ভেদ হতো। অবশ্য চূড়ান্ত রহস্য ভেদ না হয়ে ভালোই হয়েছে। রহস্য ছাড়া জগৎ-সংসার জমে না। জগৎ-সংসার জমতে হলে রহস্য লাগে। রহস্য ছাড়া জগৎ-সংসার হয়ে যেত নুন ছাড়া পান্তাভাতের মতো। শুধু নুন না, সেই পান্তা ভাতে পেঁয়াজ মরিচও নাই।

সোবহান সাহেবের লাশ মাটি দেওয়া নিয়ে ঝামেলা হওয়ার কথা না। এই জন্য আজিমপুর গোরস্থানে যেতে হবে না। গ্রামেও না। তার কবরের জায়গা ঠিক করাই আছে। উঠানের এই পেয়ারা গাছের গোড়ায়ই তার কবর হবে। এটা সোবহান সাহেবের ইচ্ছা। ঘুমের মতোন শান্ত এই উঠান দেখেই বাড়ি কিনেছিলেন সোবহান সাহেব। অবশ্য এই উঠানওয়ালা বাড়ি নিয়ে ঝক্কিও তাকে কম পোহাতে হয়নি। সবারই শকুনের চোখ এই বাড়ির ওপর। পাড়ার ছিঁচকে মাস্তান, রাজনৈতিক নেতা, ডেভেলপার, এমনকি নিজের ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত। পড়বেই বা না কেন?

এই শহরে এক আঙুল জমির দামও লাখ টাকা। এই উঠানওয়ালা বাড়ি তো সেখানে আলাদীনের প্রদ্বীপ। সোবহান সাহেব বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন এই বাড়ি। বড়ো ছেলে আশফাক প্রোমোটারদের দিয়ে বাড়ি অ্যাপার্টমেন্ট করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। সামনের উঠানজুড়ে মোটামুটি একটা মার্কেটও করে ফেলা যায়। প্রোমোটারদের দিলে তারা সব করে দিবে। সোবহান সাহেব শুধু বসে বসে টাকা গুনবেন। আশফাকের এই প্রস্তাবে বাকি তিন ছেলেরও সায় ছিল। সোবহান সাহেব সব শুনতেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বলতেন, "হুম।"

ওই "হুম" এর বেশি কিছু সোবহান সাহেব আর বলতেন না। ছেলেরাও কিছু বলতে পারতো না। খেয়ে-না খেয়ে এই বাড়ি কিনেছে বাপ। তাদের আর কী বলার আছে? তারপরও ভেতরে ভেতরে তাদের প্ল্যান-পরিকল্পনা যে চলতো না, তা তো না। সোবহান সাহেব সবই টের পেতেন। আর টের পেতেন বলেই কিনা কে জানে, টুপ করে রাবেয়া খাতুনকে কবর দিয়ে দিলেন পেয়ারা গাছের তলায়। সাথে বাড়িটারও যেন একটা বন্দোবস্ত করে ফেললেন।

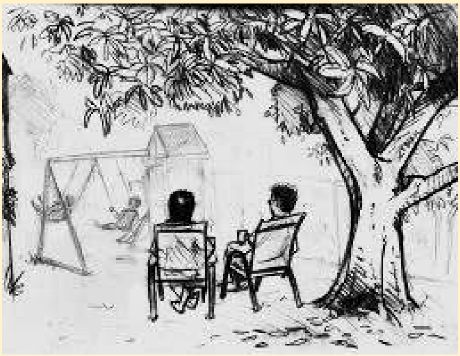

যে মাটিতে মায়ের কবর, সে মাটি আর যাই হোক, কোদাল চালিয়ে উপড়ে ফেলা তো আর যায় না। দু'দিন বাদে সোবহান সাহেবও যখন শুয়ে পড়বেন নিজের স্ত্রীর পাশের কবরে, তখন আর কি! বাধ্য হয়ে অন্তত এই উঠানটুকু রাখতেই হবে ছেলেদের। দোতলা বাড়িটা ভেঙে তারা যা ইচ্ছা করুক। উঠানটা শেষমেশ টিকেই গেলো।

নিজের বুদ্ধির গর্বে আরেকটু হলেই সোবহান সাহেবের বুকটা ফুলে উঠতো। ভাগ্যিস তিনি বেঁচে নেই। শুয়ে আছেন খাটিয়ার ভেতর লাশ হয়ে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখনো ছেলেদের কারো খোঁজখবর পর্যন্ত নেই। দোতলা থেকে অনেকগুলো এলোমেলো কণ্ঠের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন সোবহান সাহেব। এবং তার বেশ

ফুরফুরে লাগছিল। তিনি মারা যাওয়ায় তার ছেলেরা তাহলে বেশ কান্নাকাটিও করছে! বাহ, এই না হলে মৃত্যু। নিজের ছেলে-মেয়েরা গলা ফাঁটিয়ে কাঁদবে। আশেপাশের লোকজন এসে স্বান্তনা দেবে। ছেলে-মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে বাবার গুণকীর্তন করবে, দু-চার বেলা না খেয়ে থাকবে। এসব দেখে মানুষজন আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলবে, “আহারে, আহারে।”

কিন্তু সোবহান সাহেব কিঞ্চিত হতভম্ব হয়ে গেলেন। যাকে তিনি এতক্ষণ কান্না ভাবছিলেন, আসলে তা কান্না না। চেঁচামেচি। মরে গিয়ে এই হয়েছে তার সমস্যা। আগে কানে যা শুনতেন, এখন শুনছেন তার দশগুণ বেশি। শুনতে না চাইলেও শুনছেন। শরীর মরে গিয়ে সম্ভবত ইন্দ্রিয় সব জেগে উঠেছে। কিন্তু ছেলেরা চেঁচামেচি করছে কেন? অ্যাম্বুলেন্স আনার কথা হচ্ছে কেন? তিনি কি তাহলে এখনো বেঁচে আছেন? সোবহান সাহেব বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি কি তাহলে এ যাত্রা বেঁচে গেলেন? কিন্তু মরে তো খারাপ লাগছিল না তার। বেশ একটা উপভোগ্য ব্যাপার-স্যাপার। কষ্ট-টষ্টও তেমন নেই। আসলেই তো, মৃত্যু তো এমন সহজ হওয়ার কথা না। তাহলে কি তিনি বেঁচে আছেন? সোবহান সাহেব মোটামুটি ভালোরকমের বিপদে পড়েছেন। তিনি বুঝতেই পারছেন না, তিনি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন।

সোবহান সাহেব কিছুটা ঝিম মেরে গেছেন। বৃষ্টিটা মনে হয় শুরুই হয়ে গেল। কিন্তু কেউ তো তার দিকে খেয়ালই করছে না। এই মাত্র টুপ করে দু’ফোটা বৃষ্টি পড়লো তার বুকের বা দিকটায়। ওরা তাকে বৃষ্টির মধ্যেও বাইরে শুইয়ে রাখবে নাকি! তিনি যদি মরে গিয়ে না থাকেন, তাহলে ওরা তাকে বাইরে এনে শুইয়ে রেখেছে কেন? এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, ওরা কি দেখছে না? এই প্রথম তার যেন খানিকটা দুঃখ দুঃখ লাগতে লাগলো। অ্যাম্বুলেন্সে কি তাকে হাসপাতালে নেওয়া হবে? কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আনা নিয়ে এতো দেরি হচ্ছে কেন? সেই তখন থেকে সবাই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন? সোবহান সাহেব আর কিছু ভাবতে চাইলেন না। তিনি ঝিম মেরে গেছেন।

ওপরের চেঁচামেচির শব্দগুলো ক্রমশই নিচে নেমে আসছে। তার চার ছেলেই আছে। তাদের কথা শুনে বোঝা গেল অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স চলে আসবে। সোবহান সাহেব খুশি হবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। তবে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ছেলেদের ছোটাছুটি দেখে তার খারাপ লাগছে না। বরং ভালোই লাগছে। ছেলেরা তাহলে চাচ্ছে তাদের বাবা বেঁচে থাকুক।

“কী হলো বাবারা, লাশ আর কতক্ষণ এমনে ফালায় রাখবা? বিষ্টি-বাদলা শুরু হয়া গেল তো।” মসজিদের ইমাম সাহেবের গলা।

কিন্তু ইমাম সাহেব তাকে লাশ বলছেন কেন? সোবহান সাহেব আবারও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি কি তাহলে সত্যি সত্যিই মারা গেছেন? ইমাম সাহেব তাকে যেহেতু লাশ বলে সম্বোধন করেছেন, তার মানে তিনি মারা গেছেন। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স কেন তাহলে?

“সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেরি হয়ে গেল ইমাম চাচা।” সোবহান সাহেবের বড়ো ছেলে আশফাকের গলা শোনা গেল।

“কী সিদ্ধান্ত বড়ো বেটা?” ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

“আব্বার লাশ গ্রামে দাফন হবে।” এই সিদ্ধান্তর জন্যই দেরি হয়ে গেল চাচা। অ্যাম্বুলেন্সে লাশ নিয়া যাবো। অ্যাম্বুলেন্স আসতেছে।”

সোবহান সাহেব দিব্যি বুঝতে পারছেন, আশফাকের পাশেই দাঁড়ানো তার বাকি তিন ছেলে। ছোটো ছেলেটা অফহোয়াইট একটা পাঞ্জাবি পড়েছে। সেই পাঞ্জাবিতে কেউ পানের পিক ফেলেছে। দাগটা কটকট করছে। আশফাকের কথা শেষ হবার আগেই অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শুনতে পেলেন সোবহান সাহেব। অ্যাম্বুলেন্স এসেছে। গেট খোলারও শব্দ হলো।

"কিন্তু সোবহান সাব তো বলছিল এইখানেই তার কবর হইবো?" ইমামের বিস্মিত কণ্ঠ টের পান সোবহান সাহেব।

"হ চাচা, আব্বা তো বলছিল। কিন্তু এইটুক উঠানে দুই দুইটা কবর হলে আর তো জায়গাই থাকে না। কি করবো বলেন চাচা! আমরা চার চারটা ভাই। বাচ্চা-কাচ্চা বড়ো হচ্ছে। অনেক কিছুই বিবেচনা করতে হয়।

আশফাক থামে। কেউ কোনো কথা বলে না। ইমাম সাহেবও না। মেঝো ছেলে মুশফিকের গলা খাকড়ির আওয়াজ শোনা যায়। আশফাকই আবার শুরু করে, "আমরা চার ভাই-ই আলাপ আলোচনা করছি। গ্রামে তো কোনো অসুবিধা নাই। অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। পাড়া-প্রতিবেশী আছে। আর আমরা তো বছর বছর যাবোই...।" কথাটা শেষ করে না আশফাক। বুঝতে পারে না কথাটা বলা ঠিক হলো কিনা। আশফাকের কথার রেশ যেন থেকে যায়। এক ধরনের প্রতিধ্বনি হয় নিঃশব্দতায়।

নীরবতা ভাঙেন ইমাম সাহেব, "হ, সেইটাই মিয়ারা। মরা লাশের আবার শহর গ্রাম কী? সাড়ে তিন হাত মাটি পাইলেই হইলো। বেশি মাটি দরকার আমাগো, আমরা যারা বাইচা আছি। ড্রইংরুম, বেডরুম, ডাইনিংরুম, রিডিংরুম আরো কত রুম দরকার।" একটু থামেন ইমাম সাহেব, তারপর বলেন, "যাও তাইলে বাবারা, বেলা থাকতে থাকতে রওনা দেও।" ইমাম সাহেব দ্রুত পায়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তার স্যান্ডেলের শব্দ পর্যন্ত টের পান সোবহান সাহেব।

সোবহান সাহেবের কেমন একটা ঘোর ঘোর লাগে। তিনি ধীরে ধীরে যেন সকল শব্দ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। চারপাশের শব্দগুলো যেন ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে। এই সময় খাটিয়াটা নড়ে ওঠে। খুব ধীরে। সোবহান সাহেব স্পষ্ট টের পান, তার খাটিয়াটা নড়ছে। খাটিয়াটা উঠছে। চার ছেলের শক্ত চওড়া কাঁধে সোবহান সাহেবের পলকা শরীরটা সহজেই উঠে যায়। অ্যাম্বুলেন্সের গেট খোলার শব্দ হয়। সোবহান সাহেব চার ছেলের শক্ত কাঁধে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। উঠান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ওরা কি তাহলে এই উঠানটা আর রাখবে না? দুটো আম গাছ, দুটো কামিনী গাছ এবং একটি পেয়ারা গাছ পেছনে পড়ে থাকে। সোবহান সাহেব চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন। তিনি টের পাচ্ছেন তিনি দূরে কোথাও চলে যাচ্ছেন, দূরে। বহুদূরে। তিনি আর কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না।

সব কিছু কেমন নিস্তব্ধ, শব্দহীন। হঠাৎ কেমন তীব্র একটা ইচ্ছে হলো সোবহান সাহেবের। রাবেয়ার কী হবে? রাবেয়া খাতুনের? তার প্রবল ইচ্ছে হতে থাকলো খাটিয়ার ফাঁক দিয়ে রাবেয়া খাতুনের কবরটা একবার দেখার। একবার। পেয়ারা গাছটার গোড়ায়। একবার। কিন্তু কী করে দেখবেন?

সোবহান সাহেব তো মারা গেছেন।

সে ও পদ্মাবতী

শরীফুল হাসান

> **“আমি যাবো আর আসবো,” বললাম আমি, “আমি একা আপনাকে বাঁচাতে পারবো না।”**

বৃদ্ধের আশপাশে কেউ নেই। মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মানুষটি কাউকে না কাউকে আশা করছেন নিশ্চয়ই। স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত কোনো মুখ। কিন্তু সেই সৌভাগ্য তার হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি সদ্য পাশ করা ডাক্তার হিসেবে জীবনের প্রথম মৃত্যুপথযাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। বৃদ্ধের ফর্সা সাদা হাতটা ধরে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করছি। বৃদ্ধের মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে ব্যথায়। ঘোলাটে চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে, হয়তো পরিচিত কোনো মুখের ছায়া দেখতে পাচ্ছে আমার মাঝে। কিংবা অন্য কিছু। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের মাথার ভেতর কী চলে, সে কী ভাবে, তা হয়তো কোনোদিনও জানা হবে না।

আমার ডিউটি রাতে। সবগুলো কেবিন ঘুরে ঘুরে দেখেছি। থেমেছি এই বৃদ্ধের কেবিনে। আমি যে ক্লিনিকে কাজ করি, সেটা অভিজাতদের ক্লিনিক। কেবিনগুলো দামী, সাধারণত বড়োলোকরা এই কেবিনগুলো ভাড়া করেন। আজ এই গভীর রাতে, পুরো ক্লিনিকজুড়ে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। তবে তিনতলার এইপাশটা ফাঁকা।

কেবিনে ঢুকেই বুঝেছি, বৃদ্ধের শেষসময় কাছে চলে এসেছে। যেকোনো সময় কিছু একটা ঘটতে পারে। নার্সকে ডাকতে যাবো, বুঝলাম বৃদ্ধ শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছে আমার হাত। যেতে দিতে চাচ্ছে না। কিন্তু এসময় আমার সাহায্য লাগবে। অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি তখন যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু অনুমতি তিনি দিলেন না। বরং হাতে ধরে আরো কাছে টেনে নিলেন। বুঝলাম কিছু বলতে চাচ্ছেন।

“কিছু বলবেন?” কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর দিতে চাইলেও পারলেন না। বরং কিছু থুতুর ছিটে এসে লাগল আমার গালে। বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে তো আর কিছু বলা যায় না। একপাশে টিস্যু পেপার ছিল। ছিঁড়ে নিয়ে মুখ মুছে নিলাম।

হাতটা এখনও ছাড়েননি। বরং আরো শক্ত করে চেপে ধরেছেন।

“কিছু বলবেন?” আবার জিজ্ঞেস করলাম, খুব কাছাকাছি গিয়ে। টিস্যু হাতে রেখেছি, সাবধানতা হিসেবে। তবে এবার সেরকম কিছু হলো না।

ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, “আমাকে বাঁচাও!”

এরকম আকুতিভরা কথা শুনে বুকটা কেমন করে উঠল। ডিউটিতে যে নার্স আছে, ওকে ডাকা দরকার। কেবিনে একটা ফোন লাইন আছে, কিন্তু নামটাও ভুলে গেছি, খুঁজে পাবো কী করে?

“আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন, চিন্তা করবেন না।” ভদ্রলোককে আশা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। যদিও জানি বৃথা চেষ্টা।

বৃদ্ধ চারপাশে তাকালেন। আমিও তাকালাম। সুসজ্জিত একটা কেবিন। আমি আর বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন।

“আমি কিছু বুঝতে পারছি না,” বললাম। টের পাচ্ছি বৃদ্ধের হৃদস্পন্দন বেড়েছে।

“এই পৃথিবীতে আমি বড়ো একা,” বৃদ্ধ বললেন, “আমি মরে গেলে সব শেষ।”

“সবাই কমবেশি একা আমরা,” বললাম আমি, বুঝতে পারছি, আত্মীয়-স্বজন বা ছেলে-মেয়েরা বৃদ্ধের খবর নেয় না ঠিকমতো।

“আমি কাউকে খবর দেবো?”

“কাকে খবর দেবে?”

“আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা ছেলে-মেয়েকে?”

“আমার কেউ নেই।”

“আপনি একাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন?”

“হ্যাঁ। একাই। তোমাকে একটা কথা বলি, শুনবে?”

“বলুন।”

অনেকগুলো কথা বলে বৃদ্ধকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বালিশের নিচ থেকে কিছু একটা বের করে আনলেন। দু’হাতে মুঠো করে আছেন। জিনিসটা কী বুঝতে পারছি না।

“এটা হাতে নাও,” বললেন বৃদ্ধ। আমার হাতে একটা কাঠের পুতুল ধরিয়ে দিলেন।

পুতুলটা হাতে নিলাম। একটা নারীমূর্তি। শক্ত কাঠে খোদাই করা, ফুটখানেক লম্বা। শাড়ি পরা নারীমূর্তিটার চোখ, মুখ, নাক, শরীরের খাঁজগুলো নিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

“কী এটা?”

“তোমার কাছে রাখো,” বৃদ্ধ বললেন।

“কী করবো এটা নিয়ে?”

“ওর নাম পদ্মাবতী। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী। আমি মারা গেলে তুমি ওর দেখাশোনা করো।”

একটা কাঠের মূর্তির দেখাশোনা কীভাবে করবো, প্রশ্নটা করার আগেই বুঝলাম বৃদ্ধের শেষ সময় উপস্থিত। তিনি চোখ উল্টালেন না, শরীরে কোনো খিঁচুনি হলো না। কাঠের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে অল্প করে হেসে চোখ বুজলেন। তার হাত মুঠো করে ধরা ছিল। খুলে গেল। সেখান থেকে একগাঁদা ট্যাবলেট এক এক করে মেঝেতে পড়তে লাগল। ট্যাবলেটগুলো চিনতে পারলাম। বৃদ্ধের এই শারীরিক অবস্থায় এই ট্যাবলেট একটাই যথেষ্ট।

আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম পদ্মাবতীকে নিয়ে। মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। একটা কথাই মাথায় ঘুরছে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী এখন আমার হাতের মুঠোয়!

মাসখানেকের মধ্যেই ক্লিনিক থেকে আমাকে ছাঁটাই করা হলো। বলা হলো, তরুণ ডাক্তারদের মধ্যে আমার মতো আলসে, অকর্মণ্য ডাক্তার এই ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ আগে কখনো দেখেননি এবং দেখতেও চান না।

আমি প্রতিবাদ করিনি। প্রতিবাদ করবো কীভাবে। সত্যি সত্যি আমি অকর্মণ্য, আলসে হয়ে গেছি। সকালে সহজে ঘুম ভাঙতে চায় না। ঘুম ভাঙলেও ক্লিনিকে আসি দেরি করে। নিজের রুমে বসে চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে ভোস ভোস করে সিগারেট টানি। এরকম বেয়াদব তরুণ ডাক্তারকে কতদিন চাকরিতে রাখবে! কাজেই আমাকে ছাঁটাই করা হলো। ছাঁটাই হয়ে আমার চেয়ে খুশি সম্ভবত আর কেউ হয়নি। তবে একটা সমস্যা ছিল। আমি থাকি মোহাম্মদপুরে, মা আর ছোটো ভাইকে নিয়ে। বড়ো ভাই বিয়ে করে আলাদা থাকেন। কাজেই মা আর ছোটো ভাইয়ের দায়-দায়িত্ব আমার কাঁধে। এই দায়-দায়িত্বও ভালো লাগছিল না। অথচ টাকা রোজগার না করলেও চলছে না। কাজেই দায়-দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে, মা আর ছোটো ভাইকে ঢাকায় রেখে আমি দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এক গ্রামে চলে এসেছি। এখানে একটা বেসরকারি হাসপাতাল হয়েছে। শহর থেকে এত দূরে কোনো ডাক্তার আসতে চায় না বলে আমি যে বেতন চাইলাম তাতেই রাজি হয়ে গেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আমিও মহাখুশি। হাসপাতালের পাশে ছোটো একটা একতলা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো।

হাসপাতালটা ছোটো। ডায়রিয়া, জ্বর এ ধরনের রোগী ছাড়া তেমন কেউ আসে না। আমি দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে হেলেদুলে হাসপাতালে যাই, সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের রুমে বসে থাকি। রাত আটটা বাজতে না বাজতে বাসায় চলে আসি। কেউ আমাকে ঘাটাতে সাহস করে না, আমিও কাউকে ঘাটাই না।

বেশ আনন্দেই কাটছিল দিন আমার। শুধু আমার নয়, পদ্মাবতীরও!

এরপর প্রায় কুড়ি বছর পার হয়েছে। পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি বয়স আমার। দিনাজপুরের ঐ হাসপাতাল থেকেও বিতাড়িত করা হয়েছিল আমাকে। সেটা আমার জীবনের এক লজ্জাজনক অধ্যায়। কিন্তু তারপরও চাকরি পেতে অসুবিধা হলো না। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সব উপজেলা, থানা আর গ্রামে চাকরি করে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। কোনো জায়গায় এক-দুই বছরের বেশি স্থায়ী হলাম না। বিয়ে-শাদী করা হলো না। বন্ধু-বান্ধব সব অচেনা হয়ে গেল। মা মারা গেছেন এরমধ্যে। ছোটোভাই বিদেশে চলে গেছে। বড়ো ভাইয়ের সাথে কোনো যোগাযোগই নেই। আমি আছি আমার মতো। আলসেমিতে আর আনন্দে। পদ্মাবতীকে নিয়ে খুব সুখে দিন কাটছিল আমার।

কিন্তু সুখে দিন কাটলেও মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন নয় কেন আমার? উত্তরটাও পেয়ে যাই সাথে সাথে। বাকি কারো কাছে পদ্মাবতী নেই। আমার কাছে আছে। কাজেই আমার জীবনটা এভাবে হেসে-খেলে আনন্দে কাটানো উচিত।

আমি দিন কাটাতে লাগলাম আনন্দে। কিন্তু লোকজন এরমধ্যেই আমার নামের আগে "পাগলা" শব্দটা বসিয়ে দিতে শুরু করেছে। ওরা যে নিতান্ত ভালোবাসা আর স্নেহেই শব্দটা ব্যবহার করে সেটা শুরুতে বুঝতে পারিনি। পদ্মাবতী আমাকে বুঝিয়েছে। এরপর থেকে কেউ "পাগলা" শব্দটা ব্যবহার করলে তেড়ে যাই না, বরং হাসি। ভালোবেসেই তো মানুষ মানুষকে "পাগলা" বলে, তাই না?

দুই হাজার পাঁচ সালে আমি পঁয়ষট্টিতে পা দিলাম।

চাকরি-বাকরি অনেকদিন আগেই ছেড়েছি। তবে ঢাকায় ফেরা হচ্ছিল না। এই শহর গত চল্লিশ বছরে অনেক বদলে গেছে। রাস্তাঘাট, গাড়ি, মানুষজন কিছুই আর আগের মতো নেই। এই শহরে এখন আমার পরিচিত কোনো মানুষ নেই। ছোটো ভাই বিদেশে চলে গেছে আগেই বলেছি। বড়ো ভাই মারা যাওয়ার পর, ভাবিও সন্তান-সন্ততি নিয়ে বিদেশ চলে গেছেন। যাওয়ার আগে একবার আমার সাথে দেখা করতে ঝিনাইদহে এসেছিলেন। এই ভাবি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। বয়স হয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখে খুব কেঁদেছিলেন। আমারও চোখ ভারি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওটুকুই। ভাবি চলে যাওয়ার পর আমি আবার হেসেছিলাম। যার কাছে পদ্মাবতী আছে সে কেন কাঁদবে!

**দুই হাজার আঠারো সালের এক সন্ধ্যা।
আমি এখন আটাত্তরে বৃদ্ধ। চুল-দাড়ি সব পেকে গেছে। তবে শারীরিকভাবে এখনো বেশ শক্ত। হাঁটাচলা করতে পারি, ডায়াবেটিস নেই, রক্তচাপ স্বাভাবিক। এই মুহূর্তে কমলাপুর রেলস্টেশনে বসে আছি। রাতের ট্রেনে চিটাগাং যাবো। বঙ্গোপসাগর আমাকে আর পদ্মাবতীকে ডাকছে। অনেককাল যাওয়া হয় না।**

এক তরুণ এসে আমার পাশে বসল। ছেলেটাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। বারবার প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে সময় দেখছে। মাঝে মাঝে ডায়াল করছে কাউকে। ওপাশ থেকে সাড়া না পেয়ে তাকে রীতিমতো বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

"কী হয়েছে বাবা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কিছু না," ছেলেটা বিরক্ত মুখে বলল। বয়স পচিশ-ছাব্বিশ হবে। একসময় আমিও এই বয়সী ছিলাম। কত প্রাণচাঞ্চল্য ছিল!

"কেউ আসবে বলেও আসেনি, তাই তো?"

"বুড়া মানুষ চুপ থাকেন, এত বুঝেন ক্যান!"

বয়স বেড়েছে বলে নিজেকে সামলাতে জানি। আর এই বয়েসে কারো কথা শুনে উত্তেজিত হওয়াও ঠিক নয়। তাতে নিজেরই ক্ষতি। অনেকদিন ধরে কাউকে খুঁজছিলাম। আজ পেয়েছি।

"বুড়ো মানুষ, কী বলতে কী বললাম, কিছু মনে করো না," বললাম আমি।

ট্রেন লাইনে একটা ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। তূর্ণা নিশিথা। মাইকে ঘোষণা করা শুরু করেছে, কখন ছাড়বে কী বৃত্তান্ত এইসব।

"আমি চিটাগাং যাচ্ছি, তুমিও সম্ভবত চিটাগাং যাচ্ছো, তাই না?"

"হ্যাঁ," এবার ছেলেটা একটু নরম গলায় বলল। তাকে কিছুটা অনুতপ্ত মনে হচ্ছে। "বুঝলেন তো, মেয়েরা আসলে এমনি!"

"কথা দিয়েও আসেনি, তাই তো?"

"হ্যাঁ। আজ আমার সাথে বেরিয়ে পড়ার কথা। কথা ছিল এই ট্রেনে করে আমরা চিটাগাং যাবো। কিন্তু এখন ওর ফোন বন্ধ।"

"হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছে।"

"আরে কীসের সমস্যা। শেষ মুহূর্তে বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ছে। ও আর আসবে না।"

"তুমি তাহলে কী করবে?"

"আমি চিটাগাং যাবো। এই শহরে আর কোনোদিন ফিরবো না। কোনোদিন না।"

"আমার সাথে চলো। আমরা একসাথে গল্প করতে করতে যাই।"

ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার আগপর্যন্ত ছেলেটা অপেক্ষা করল। তারপর ট্রেন যখন ছেড়ে দিল, তখন প্রায় লাফিয়ে বগিতে উঠল। ওর টিকেট কোথায় কে জানে, ও এসে আমার পাশের ফাঁকা সিটে বসল।

ওকে দেখে খুব খারাপ লাগছিল। হতাশ চেহারা, জীবনের শুরুতেই দারুণ একটা ধাক্কা খেয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। আমি চোখ বুজলাম। ভাবছিলাম আমার নিজের কাটানো জীবনটা নিয়ে। কোনো অপূর্ণতা নেই। কোনো আক্ষেপ নেই। একটা পরিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছি। সেই রাতের বৃদ্ধের কাছে আমার আজীবন কৃতজ্ঞতা।

টঙ্গী স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল অল্প সময়ের জন্য।

এরপর একেবারে ভৈরবে গিয়ে থামবে। পুরো ট্রেনের যাত্রীরা সব ঘুম। শুধু আমি জেগে আছি আর ছেলেটা। ওকে জানালার পাশের সিট দিয়েছি বসতে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্ধকার দেখছিল। ওর অসহায়ত্ব, উদাস দৃষ্টি সব আমার বুকে আঘাত করছিল।

ট্রেনের গতি বাড়ছে।

"তোমার নাম কী?" ওর কাঁধে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি শফিকুল ইসলাম লিটন।"

"সিগারেট খাও?"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"চলো, দরজার সামনে যাই। ওখানে বেশ টানা যাবে।"

"এই বয়সেও আপনি সিগারেট খান!" ওর চোখেমুখে বিস্ময়।

"হ্যাঁ। ছাড়তে পারিনি। চলো।"

আমরা দুজন কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনের দরজার কাছে চলে এলাম। দরজাটা লাগানো ছিল। খুলে ফেললাম। একরাশ দমকা হাওয়ায় আমার সাদা চুল উড়তে লাগল। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। লিটনের হাতে দিলাম একটা।

সিগারেটে টান দিতে দিতে এই প্রথম লিটনের মুখে হাসি দেখলাম।

"আপনি বুড়া হলেও বেশ শক্ত, এখনো সিগারেট খান, বয়স কত হইছে আপনের?"

"আটাত্তর।"

"আমার তো পঁচিশে পড়ল মাত্র।"

"কিছু মনে করো না, লিটন। তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছে," বললাম আমি, "একটা মেয়ের জন্য এত দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।"

"কিন্তু ওকে তো আমি ভুলতে পারুম না!" ওর কণ্ঠে হাহাকার ফুটে উঠল। ওর এই হাহাকার দেখে আবার আমার মনের মধ্যে কষ্ট জেগে উঠল। ভেতর থেকে বারবার কে যেন তাগাদা দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম এটাই সেই মুহূর্ত। যার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি অনেকদিন। ট্রেনটা একটা ব্রিজে উঠেছে। আকাশে চকচকে চাঁদ, কী সুন্দর একটা মুহূর্ত!

আমার হাতের ছোটো ব্যাগটা থেকে চকচকে মসৃণ পদ্মাবতীকে বের করলাম। অন্ধকারের মাঝেও কেমন ঝকঝক করে উঠল। মূর্তিটা ওর হাতে দিলাম।

"ওর নাম পদ্মাবতী। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী। আমি মারা গেলে তুমি ওর দেখাশোনা করো।"

লিটন কিছু বলার সুযোগ পেল না।

তার আগেই আমি ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিলাম। ওপর থেকে নিচের হিমশীতল পানিতে পড়তে পড়তে দেখলাম লিটন হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে। পদ্মাবতীকে ঠিক হাতে ছেড়ে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। দারুণ আনন্দিত!

অধর্ম

ওবায়েদ হক

মোতালেব মিয়া চা মুখে দিয়েই দোকানদারের দিকে কাপটা এগিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললো, "কি চা বানাইসস, দুধ চিনি বাড়াইয়া দে।"

দোকানদার অভ্যস্ত হাতে দুধ আর চিনির চামচটা একটু করে নাড়িয়ে দিলো। তাতে চায়ের স্বাদে খুব একটা হেরফের হলো না। কিন্তু মোতালেব মিয়া চায়ে চুমুক দিয়েই এমনভাবে তাকালো যেন চামচের নাড়ানিতে তার চা অমৃত হয়ে গেছে। তার তৃপ্তির কারণ চায়ের স্বাদ নয়, অতিরিক্ত প্রাপ্তি।

বাজারে সবচেয়ে সস্তায় যেদিন ইলিশ বিক্রি হয়, যেদিন অর্ধেক দিনের আয় দিয়ে কানা ফকির দরদাম না করেই এক জোড়া ইলিশ কিনে নিয়ে যায় সেদিনও মোতালেব মিয়া আধা ঘণ্টা দরদাম করে পাঁচ টাকা কম দিয়ে ইলিশ কিনে। তখনও তার মুখে এই তৃপ্তির হাসি দেখা যায়।

প্রায়ই মামলার কাজে কোর্টে যেতে হয় তাকে সাক্ষী দিতে, লোকে বলে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে সে নিজের ঘর পাকা করেছে। কোর্ট থেকে কোঁড়েরপার বাজার পর্যন্ত রিকশা ভাড়া কমপক্ষে পনেরো টাকা। কিন্তু মোতালেব মিয়া সবসময় ভাড়া ঠিক না করে আসে এবং এখানে এসে অনেক বাকবিতন্ডার পর আট টাকায় রফা করে।

চা শেষ করে চায়ের দোকানের টিভির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে। সাদা কালো টিভিতে বাংলা সিনেমার গান চলছে। বাংলা সিনেমার নায়িকা হিসেবে স্বাস্থ্য একটু খারাপই বলা যায়, নায়ক অবলীলায় বারবার কোলে তুলে নিচ্ছে। স্থুলতার অভাবে বৃষ্টিস্নাত নায়িকার কুর্দন মোতালেব মিয়ার বেশি ভালো লাগছে না, কিন্তু নায়িকা যথাসাধ্য করছে, স্বউদ্যোগে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। গান শেষ হওয়ার পরই খলনায়ক ধর্ষণ পর্ব শুরু করলো, পার্শ্ব নায়িকা ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিৎকার করতে করতে নিজের পরিধেয় খুলতে ভিলেনকে সাহায্য করছে। মোতালেব মিয়া খুবই আগ্রহ নিয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলো, মনে হলো পার্শ্ব নায়িকার অভিনয়ে কিংবা স্থুলতায় সে বেশ মুগ্ধ। এমন সময় এক অল্প বয়সের যুবক ছেলে দোকানে এসে হাক ছাড়লো, “এক কাপ চা।”

মোতালেব মিয়া একটু বিষণ্ণ হলো, দোকানদারের দিকে তাকিয়ে গলায় জোরপূর্বক বিরক্তি এনে বললো, “কি লাগাইয়া রাখছস এইসব, খবর দে খবর।”

দোকানদারও নিতান্ত অনিচ্ছায় চ্যানেল পাল্টে দিলো। আজকে খবর ভালো লাগছে না মোতালেব মিয়ার। বড়ো কোনো খবর নেই, বোমা ফাটলো না কোথাও, রাজনৈতিক মারামারি নেই, ধর্ষণ হয়নি কোথাও, দুর্ঘটনায় মানুষ মারা গেল না, লঞ্চ ডুবা দূরে থাক কোনো ডিঙ্গি নৌকাও ডুবেনি কোথাও, কেমন যেন সব নেতিয়ে গেছে। এমন কোনো খবর নেই যা দেখে ‘আহা উহু’ করে আফসোস করা যাবে। মোতালেব মিয়া খুব হতাশ হলো, এভাবে দেশ চলতে থাকলে তার মতো মুরুব্বীদের কী হবে? ভাবনাটা হতাশার গভীরে প্রবেশ করার আগেই পাশের ছেলেটি সিগারেট ঠোঁটে রেখে তার দিকে তাকিয়ে বললো, “ভাই ম্যাচ আছে?”

মোতালেব মিয়ার চোখে যেন ম্যাচ ছাড়াই আগুন জ্বলে উঠলো, সে গলা চড়িয়ে বললো, “ঐ পোলা তোমার বয়স কতো?”

ছেলেটি ঠোঁটে সিগারেট রেখেই বললো, “চ্যাতেন ক্যারে? ম্যাচ চাইছি বয়স জিগান ক্যান, বয়স কত হইলে ম্যাচ দেবেন?”

চোখের আগুন যেন এখন গায়ে ছড়িয়ে পড়লো মোতালেব মিয়ার, বলতে লাগলো, “আমি তোমার বাপের বয়সী আর তুমি আমার থেইকা ম্যাচ চাও, আমরা মুরুব্বীগো কত সম্মান করতাম, দেখলেই খারায়া সালাম দিতাম, অহনকার পোলাপাইন সব বেদ্দপ।”

ছেলেটি সাথে সাথেই ওঠে ব্যঙ্গ করে বললো, “আসসালামুলাইকুম।”

বলেই চলে গেল, তাতেও মোতালেব মিয়ার মনে প্রশান্তি এলো না বরং জ্বালাটা বেড়ে আরো বহুগুনে জ্বলতে থাকলো।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষ সম্মানের কাঙ্গাল হয়ে ওঠে। কারো কারো সে সম্মান চাইতে হয় না, আর বাকিরা চাইলেও পায় না। মোতালেব মিয়া দ্বিতীয় ধরনের লোক। এলাকার কোনো ছেলে তাকে সালাম না দিলে, কিছু কল্পিত বেয়াদবী যোগ করে বাসায় গিয়ে নালিশ করে আসে।

দাড়ির সাথে সম্মানের একটা যোগ আছে, মোতালেব মিয়া তাই তাঁর কম ঘনত্বের গুটি কয়েক দাড়িও বড়ো করেছে, সেগুলোকে দেখতে পাটের আঁশের মতো লাগে। কিন্তু তবুও বেয়াদপ ছেলেরা সালাম দেয় না।

মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য পান মুখে দিল সে। মুখে জমতে থাকা লালচে তরলের মতো তার রাগটাও তরল হয়ে যাবে। সেই তরল জমিয়ে সে জমাদ্দার বাড়ির দেওয়ালে বিসর্জন দেবে। হাজী আসকত জমাদ্দারকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তাঁর মুখে সাদা শুভ্র ঘন লম্বা দাড়ি দেখেই মোতালেব মিয়ার মনে খুব হিংসা হয়। জমাদ্দার বাড়ির দেওয়ালে নতুন করে সাদা রঙ করা হয়েছে, একেবারে বকের ডানার মতো সাদা ঝকঝক করছে। সে পিচিক করে তার রাগ এবং মুখের তরল দিয়ে সাদা দেওয়ালকে রাঙ্গিয়ে দিল। এখন বেশ ভালো লাগছে দেওয়ালে চায়নার ম্যাপের মতো একটা আকৃতি হয়েছে। নিজের শিল্পকর্ম দেখে সে খুব আপ্লুত হলো। আপ্লুত ভাবটা মুহূর্তেই উবে গেল যখন দেখলো, তার পেছনে হাজী আসকত জমাদ্দার দাঁড়িয়ে আছে। মোতালেব মিয়া মনে মনে কৈফিয়ত প্রস্তুত করছে। আসকত জমাদ্দার মোতালেবের শিল্পকর্মে খুব বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে বললো, "কী মোতালেব কেমন আছো?"

ঠিক এই ব্যাপারটাই মোতালেবের ভালো লাগে না, সে একজন বয়স্ক মানুষ, বয়সে ছোটো হলেও হতে পারে কিন্তু তাই বলে তাকে তুমি করে বলবে এটা কেমন কথা! হজ্ব করলেই কি উনি সবাইকে তুমি করে বলার লাইসেন্স পেয়ে গেলেন নাকি? কিন্তু মুখে তার বিরক্তি গোপন করে বললো, "আছি আপনাদের দোয়ায়।"

"শুনলাম তোমার ছেলের বিয়ে দিচ্ছো।"

মোতালেব মিয়া খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কই থেইকা শুনলেন?"

"আরে এসব কথা কি আর গোপন থাকে? তা মেয়ের পরিবার কেমন?"

"এতিম মেয়ে, বাপ মা নাই, আমার খুব মায়া হইলো। কাইল দেখতে যামু। বিয়া অহনও ঠিক হয় নাই।"

"আইচ্ছা ঠিক আছে, চলো নামাজটা পইড়া আসি।"

মোতালেব মিয়া একটু আমতা আমতা করে কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গি করে বললো, "অহন একটু কাম আছে, বুঝেনই তো। বাইত গিয়া পড়মু।"

প্রায় সারাদিনই মোতালেব মিয়া অবসর কাটায়, শুধু নামাজের সময়ই কীভাবে যেন তার খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে যায়। মোতালেব মিয়া নিয়ত করেছে, সে আগামী বছর হজ্ব করতে যাবে, তারপর থেকে নিয়মিত নামাজ পড়বে। রাস্তাঘাটে সবাই 'হাজী সাব' ডাকবে আর সালাম দেবে ভাবতেই মনটা ভালো হয়ে যায় তার।

মোতালেব মিয়ার বর্তমান পেশা হচ্ছে জর্জ কোর্টের সাক্ষী, তার আগে সে আদমজী জুট মিলে চাকরি করতো। নিজের কিছু বদ অভ্যাসের কারণে টাকা জমাতে পারেনি কোনোদিন। দুই মেয়ের

বিয়ে দেওয়ার পর আর হজ্বে যাওয়ার মতো যথেষ্ট অর্থ ছিল না তার কাছে। তাই এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে কিছু অর্থযোগ ঘটাতে চাচ্ছে। হজ্বে তাকে যেতেই হবে, অনেক পাপ জমে গেছে।

বিয়ের বাজারে তার ছেলে একেবারে নিম্নমানের পণ্য নয়, এরকম ছেলের জন্য এতিম পাত্রী মোতালেব কখনোই বিবেচনা করেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে পাত্রী তার অর্থ সম্পতির জন্য উতরে গেছে। মেয়ের বাবা মেয়ের জন্মের আগেই মারা গেছে, মা আরো বছর দশেক পর। মামার কাছে থেকে পড়াশোনা করেছে মেয়ে। অভিভাবক পদ এখন সেই মামার দখলে যা পরে মোতালেবের দখলে যাবে, সেই সাথে দুটো বাড়ি এবং কয়েক একর জমি।

ছেলের মতকে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি মোতালেব, তাই ছেলের রাজি হওয়া না হওয়া নিয়ে চিন্তা ছিল না। কিন্তু মেয়ে দেখার পর ছেলের মুখে লাজুক হাসি দেখে মোতালেব মিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। মেয়ের বাড়ি দেখার জন্য কাল আবার যাবে সবাই, সেখানেই বিয়ের কাজটা সেরে ফেলবে ভাবছে, কারণ হজ্বের আর বেশিদিন বাকি নেই।

মোতালেব মিয়া বাড়িতে ঢুকতেই দেখলো উঠানে তার মেয়েরা মেহেদী বাটছে, তার ছেলেটা হাসি হাসি মুখ করে হাত পেতে রেখেছে। তার ছোটো মেয়ে হাতে মেহেদী দিয়ে নকশা করছে। মোতালেব মিয়ার বোনেরা এসেছে, তারা গুনগুন করে গান গাইছে, পাশের বাড়ির শামসুদ্দিনের বউও এসেছে, গলা চড়িয়ে সেও গাইছে,

পোলার বাপে কে?
সাহেব মেজবান সে
সামনে দাঁড়াইছে।
আইচ্ছা আইচ্ছা
লাল বাগিচায়
ফুল ফুইটাছে।'

একেবারে বিয়ের আসর। এই মফস্বল এলাকায় এভাবেই কাউকে না জানিয়ে বিয়ে হয়। মোতালেব মিয়া আড়চোখে তার বড়ো মেয়েকে ইশারায় ডাকলো, দাঁত দাঁত ঘষে বললো, "কী হইতাছে এইসব?"

"মেন্দী বাটি আব্বা।"

মোতালেব মিয়া রেগে বললো, "হ, এইবার মাইক লাগাও।"

বড়ো মেয়ে তার রাগটা বুঝলো, জিহ্বায় কামড় দিয়ে বললো, "আয় হায় বুল হইয়া গেছে, খারান আপনার জামাইরে কইতাছি সে আধা ঘণ্টার ভিতরে ব্যবস্থা করবো।"

বলেই সে চলে গেল নিজের বরকে খুঁজতে।

মোতালেব মিয়া স্থির দৃষ্টিতে মেয়ের চলে যাওয়া দেখলো। এই সংসারে তার মতো আর কেউ নেই। পাড়া প্রতিবেশীর কারণে কত বিয়ে ভেঙে যায়, পাত্রীর মামা খোঁজখবর নিলে বিপদেই পড়তে হবে। তার যে খুব একটা সুনাম আছে তা বলা যাবে না।

মোতালেবের সব রাগ গিয়ে পড়লো তার বউ মোমেনার ওপর এবং এইসব আয়োজন যে মোমেনার মস্তিষ্ক প্রসব করেছে তা নিয়ে তার কোনো সন্দেহ রইলো না। মোমেনাই তাকে একমাত্র যমের মতো ভয় পায়, তাই তার ওপর রাগ ঝেড়ে শান্তি পাওয়া যায়।

নিজের ঘরে ঢুকতেই মেজাজটা আরেক দফা বিগড়ে গেল মোতালেব মিয়ার। সারা ঘর ভর্তি পাতা ছিটিয়ে চড়ুইভাতি খেলছে তার নাতি-নাতনীরা। একেবারে ছোটোটা নিজের করা প্রাকৃতিক উচ্ছিষ্ট নিয়ে খেলছে। সবার হাতে গোল করে মেহেদী দেওয়া হয়েছিল, তারা সেগুলোর কিছু অংশ নিজেদের জামায়, মুখে আর বাকি অংশ বিছানার চাদর আর মোতালেব মিয়ার পাঞ্জাবিতে লেপ্টে দিয়েছে।

মোমেনা হঠাৎ করে আগত অতিরিক্ত মেহমানদের জন্য রান্না বান্না করছিল, স্বামীর হুংকার শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। মোতালেব মিয়া বললো, “কই গিয়া বইয়া রইছস?”

মোমেনা কাচুমাচু করে জবাব দিলো, “আমি পাকের ঘরে আছিলাম।”

“এই আন্ডাবাচ্চাগুলানরে বাইর কর এইখান থেইকা।”

মোমেনা হাস মুরগী তাড়ানোর মতো করে হুস হুস করে বাচ্চাগুলোকে বাইরে দিয়ে এলো।

মোতালেব মিয়া বললো, “পোলার বিয়া এতো রাষ্ট্র করার কী হইলো? কালকে মাইয়ার ঘর বাড়ি দেখতে যামু তাই কইছিলাম মাইয়াগো আর তাগো জামাইগো খবর দেও, তুমি দেখি চৌদ্দ গুষ্টিরে জানাইয়া ফেলছো। মাথার ভিত্রে কি সব গু?”

মোমেনা মাথা নিচু করে বললো, “আমি তো খালি মাইয়া গো কইসি। তারাই তো ফুফুগো আর খালাগো খবর দিছে।”

মোতালেব মিয়া মোমেনাকে থামিয়ে বললো, “হইছে বেশি কথা কইবা না। তোমার মাইয়া জামাইরে দিয়া মাইক আনতে পাঠাইছে, তারে মানা করো গিয়া, নাইলে লাত্থি দিয়া বাইর কইরা দিমু কইতাছি। আর ছোটো জামাইরে কও কাজীর লগে যোগাযোগ রাখতে, কাজীও যাইবো সাথে, ট্যাকা পয়সার কথা বলতে মানা করবা, সেইটা আমি কমু।”

মোমেনা ঘাড় কাত করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু কি মনে করে থেমে গেল তারপর নীচু গলায় বললো, “আমিও কি যামু কালকে?”

মোতালেব মিয়া খুব বিরক্ত হয়ে বললো, “বেক্কলের মতো কথা কও ক্যান, তুমি যাইবা কি করতে?”

মোমেনা বললো, “পোলাটার বিয়ার আগে মাইয়াটারে একটু দেখুম না?”

মোতালেব বললো, “মাইয়া আমি দেখছি, তোমার পোলায় দেখছে, তোমার দেখনের কাম নাই। বেশি দেখতে ইচ্ছা হইলে তোমার পোলার বালিশের নিচে মাইয়ার ফটু পাইবা, দেইখা লও। আর মাঁচায় নতুন লাউ ধরছে, সব চইলা গেলে আইসা দেখবা লাউসহ মাঁচা গায়েব হইয়া গেছে।”

লাউ পাহারা দেওয়ার যুক্তিটা মোমেনা কোনোমতেই অগ্রাহ্য করতে পারলো না। তাই আর কিছু না বলে চলে গেল তার নিজের জায়গায়, রান্নাঘরে।

মোতালেব মিয়া তার বউয়ের নির্বুদ্ধিতায় বরাবরই ক্ষুব্ধ হয়। এই বউটাকে তার ঠিক বউ মনে হয় না, মাঁচায় গজানো লাউ গাছটার মতোই মনে হয়। মোতালেবের কালেভদ্রে পাঠানো সামান্য টাকা দিয়ে কোনো জাদু ছাড়াই কীভাবে যে সে সংসার চালিয়েছে তা মোতালেব কখনোই ভাবেনি। সংসারের হিসাব কিতাব মোমেনার আহ্লাদ সব শুষে নিয়েছে। এই সংসারে মোতালেব মিয়ার অযাচিত কর্তৃত্ব মোমেনার ভার হালকা না করে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। পান বানিয়ে পাশে বসে আহ্লাদী করা বউ নয় মোমেনা। মোতালেবের খুব ইচ্ছা করে কম বয়সী একটা মেয়ে তার সাথে ঠাট্টা মশকরা করবে, পা টিপে দিতে বললে মোমেনার মতো মাথা নিচু করে পা টিপবে না, নিজের পা ছড়িয়ে দিয়ে বলবে, “আমার পাও টিপ্পা দেন।”

মোতালেব মিয়া টিপে দিতে গেলে আবার পা সরিয়ে নেবে, গায়ে গা ঠেসে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠবে।

এখন আর বিয়ে করার বয়স নাই মোতালেব মিয়ার, এই বয়সে মেয়ে পাবে কই, কিন্তু টাকা থাকলে কী না হয়। মোতালেব মিয়া সুখস্বপ্নে ভাসতে ভাসতে ঘুমের পাঁকে ডুবে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ কর্কশ শব্দে মাইক বেজে উঠল। তার বড়ো জামাই খুবই তরিৎকর্মা।

মোতালেব মিয়ার মেয়েরা পাত্রীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে পর্যুদস্ত করতে চাইছে, তার ছেলে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। বড়ো মেয়ের ছেলেমেয়ে দুটি দরজার পর্দায় ঝুলছে, তাদের কেউ বারণ করছে না। মোতালেব মিয়া বারকয়েক চোখ রাঙালো তাদের দিকে চেয়ে কিন্তু তারা মোতালেব মিয়ার চোখের ভাষা না বুঝার ভান করে ঝুলাঝুলি অব্যাহত রাখলো। পাত্রীর মামা খুব ব্যস্ত মেহমানদের আপ্যায়ন নিয়ে, তাকে থামিয়ে মোতালেব মিয়া বললেন, “আপনে আর ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই, বসেন। শোনেন বেয়াই সাব, জন্ম মৃত্যু বিয়া আল্লার হাতে, আল্লাই ঠিক কইরা দিছেন এই বিয়া। নাইলে কতো বিয়া আইছে পোলার লাইগা কিন্তু আমার যুত লাগে নাই। আল্লার ইচ্ছা আছে তাই আমিও দেরি করতে চাই না, আইজকাই বিয়া পড়াইতে চাই।”

মেয়ের মামা যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলো, তিনিও দায়িত্ব থেকে মুক্তি চান। তিনি গদগদ হয়ে বললেন, “ঠিক বলেছেন, আমরা তো উছিলা মাত্র, তাঁর ইচ্ছাই সব, ওপরওয়ালার মর্জি থাকলে আজকেই বিয়া হইবো।”

মুহূর্তেই পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে গেল, মেয়ের মাথার ঘোমটার দৈর্ঘ্য বেড়ে গেল, ছেলে কেমন অস্বস্তিতে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলো, মনে হয় রুমালের অভাব বোধ করছে। কাজীও নড়েচড়ে বসলো। মোতালেব মিয়া তার হতে যাওয়া সম্পদের দিকে আরেকবার চোখ বোলাতে লাগলো। হঠাৎ দেওয়ালে টাঙ্গানো দুটি ছবিতে তার চোখ আটকে গেল। দুজনকেই চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মোতালেবের চোখ অনুসরণ করে মেয়ের মামা বললেন, “আমাগো মা মনির বাপ মা। আল্লা তাগো বেহেশত নসীব করুক।”

বলেই তিনি কাজী সাহেবকে তাড়া দিতে লাগলেন।

মোতালেব মিয়া মনোযোগ ফেরাতে পারছে না, সেলিনা আর তার স্বামী হান্নানের ছবির দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেলিনা ছবিটাতে স্মিত হাসি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন তার দিকে তাকিয়েই হাসছে। শেষবার যখন মোতালেবের সাথে সেলিনার দেখা হয়েছিল, তখন তার চোখে ছিল কাকুতি, কণ্ঠে অসহায়ত্ব। কেঁদে কেঁদে মোতালেবকে বলেছিল, “আমি অহন কী করুম?”

মোতালেব তাচ্ছিল্য সহকারে বলেছিল, “আমি কেমনে কমু? যাও স্বামীর কাছে ফিরা যাও।”

“তুমি আমারে বিয়া করো।”

“আরে কয় কি! আমার বউ পোলাপান আছে, আমি তোমারে বিয়া করুম ক্যান?”

“আমার পেটে তোমার বাচ্চা আসছে, আমি এইটারে নিয়া কই যামু।”

“কিচ্ছু হইবো না, হান্নান মিয়া বুঝবো না।”

“বুঝবো, ডাক্তার কইছে হের সন্তান হইবো না।”

সেলিনা তার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, “আমারে তুমি বিয়া কইরা লইয়া যাও।”

মোতালেব পায়ে ঝাড়া দিয়ে বললো, “যাঃ মাগী, আমার লগে সিনেমা করবি না। শোয়নের সময় মনে আছিল না। প্যান প্যান করবি না, যা যেদিকে ইচ্ছা।”

সেলিনাকে কিছুই বলতে হয়নি, তাকে সব অপচিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে হান্নান মারা গিয়েছিল দুর্ঘটনায়।

মোতালেব মিয়ার চারপাশটা কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, ঘোমটা মাথায় দেওয়া মেয়েটির দিকে তাকাতেই তার বুক কেঁপে উঠলো। মাথার ভেতর সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম-অধর্মের মাঝে নিজের কর্মের বেড়াজালে জড়িয়ে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মতো বসে রইলো। হৃদপিণ্ডটা যেন বুকের ভেতর কোলাব্যাঙের মতো লাফাচ্ছে আর ছলাৎ ছলাৎ রক্ত ছিটিয়ে দিচ্ছে। মোতালেব মিয়ার চারপাশটা ঝাপসা হয়ে আসছে, সেলিনার ছবির হাসিটা এখন কেমন যেন বিদ্রুপের মতো দেখাচ্ছে।

লেখকের সন্ধানে

কিরণ দত্ত

গল্পটা শুরু হয় একটা অদ্ভুত জায়গা থেকে, হয়তো বা মাঝখান থেকে, আসলে শুরুটা জানা নেই, কিংবা শুরুটা খোঁজারই গল্প এটা। গল্পের প্রধান চরিত্র আঠারো বছরের একটা ছেলে।

ওর চোখ থেকেই শুরু করা যাক...

চোখ খুলতেই ছেলেটা দেখলো রাস্তার একটা ধারে এতক্ষণ ধরে সে শুয়ে ছিল। উঠে চোখ ডলতে ডলতে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো কী করেই বা ও এখানে এলো! আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ছেলেটা বুঝতে পারলো, আসলে ও কোথা থেকে এসেছে, আর ওর নামই বা কী- এসব কিছুই তার মনে পড়ছে না। আশেপাশে ভালোভাবে খেয়াল করতেই ছেলেটা দেখলো চারপাশটা কেমন যেন অদ্ভুত। কিছু অংশ হয়তো ১৯২০-২১ সালের কলকাতা আর কিছুটা ২০২০ সালেরই। ছেলেটা সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো। রাস্তার উল্টোপাশ থেকে একজন বয়স্ক লোক তখন ঠিক এদিকেই আসছিল।

“স্যার, একটু শুনবেন!”

“আমায়?”

"হ্যাঁ, আপনাকেই। এটা কোন জায়গা একটু বলবেন?"

"এটা? এটা সত্যজিৎ নগর। তুমি কোথায় যাবে বলো।"

"আমি আসলে হারিয়ে গেছি, আর এই জায়গায় আমি আগে এসেছি বলে মনে পড়ে না।"

"ও, তা অন্য শহর থেকে চলে আসোনি তো এখানে? সুকুমার নগর, বিভূতিভূষণ নগর, ওদিককার বাসিন্দা নাকি? নাকি ওই দিকে যে নতুন শহরগুলো হয়েছে, ধুর ছাতা– কি যেন নামগুলো, ও হ্যাঁ, স্মরণজিত নগর, ওদিক থেকে এসেছো? পোশাকের রঙঢং দেখে তো তাই মনে হচ্ছে বাপু।"

"আপনি ঠিক কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এই জায়গাগুলোর নামও কোনোদিন শুনিনি।"

"উফ, মহা সমস্যায় ফেললে তো। এখন আমার অত সময়ও নেই। বাচ্চাগুলো অপেক্ষা করছে গল্প শুনবে বলে। তুমি এক কাজ করো। এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও, গিয়ে ফেলু মিত্তিরের বাড়িটা খুঁজে বের করে ওদেরকে এসব বলো। লোকের গল্প শোনার কাজ ওই টিকটিকিদেরই, আমার কাজ হলো গল্প বলা। ফেলুকে গিয়ে বলবে তারিণী খুড়ো পাঠিয়েছে। এখন তবে আসি বাপু।"

"কী নাম! ফেলু মিত্তির?"

লোকটা জোরে একবার হ্যাঁ বলে আবার হাঁটা শুরু করল। ছেলেটা আবারো রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। এবার তার চোখে কিছু বাড়ি পড়ল। প্রতিটা বাড়ির সামনেই মালিকের নাম লেখা। যেমন তারিণী খুড়ো, প্রফেসর শঙ্কু, এরকম আরও অনেক বাড়ি। শেষে দেখা মিললো ফেলু মিত্তিরের বাড়ির। গিয়ে কলিং বেল বাজাতে আর কতক্ষণ! মধ্যবয়স্ক টাক মাথার এক ভদ্রলোক মাথা চুলকাতে চুলকাতে এসে দরজা খুলল।

"কাকে চাই?"

"ফেলু মিত্তির বাড়িতে আছেন?"

"হ্যাঁ আছেন বৈকি, আসুন ভেতরে আসুন।"

ভেতরে সোফায় আরও দুজন বসা। একজন বেশ অল্পবয়সী, গল্পের বই পড়ছে। আরেকজন কোনো এক ভাষার বই মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর আড়চোখে ছেলেটার দিকে চেয়ে বললেন, "হঠাৎ, আমার খোঁজ কেন?"

"আসলে আমি হারিয়ে গেছি। আমার কিছু মনে পড়ছে না!"

"নাম, বাড়ি, কিছুই না?"

"নাহ, কিচ্ছু না। শুধু এটুকুই মনে পড়ে যে, আমি আমার লাল শার্ট আর জিন্সের প্যান্টটা পরে সাইকেলে চেপে একটা মেয়ের বাড়ির সামনে যাই আর ওকে দেখতেই সাইকেল থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাই।"

পাশে বসা অল্পবয়সী ছেলেটা যার নাম পরে জানতে পারি তোপসে; সে মুচকি হেসে উঠল। আর টাক মাথার লোকটি মানে লালমোহন বাবু "সাস্পিসিয়াস! ভেরি সাস্পিসিয়াস!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"এলে কোত্থেকে?"

"আসলে আমার জ্ঞান যখন ফেরে তখন এই সামনের রাস্তাতেই পড়ে ছিলাম।"

"ওটা কিন্তু সত্যজিৎ নগরের মধ্যে পড়ে না।"

"সে আমি জানিনে, আপনি আমার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করুন ফেলুবাবু। আমার কিছুই মনে পড়ছে না।"

"হুম, দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা। হ্যাঁরে তোপসে, আজ শঙ্কুবাবু বিকেলে একবার ডেকেছিলেন না? নতুন ডিভাইসটা দেখানোর জন্য?"

তোপসে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

বিকেল হতেই চারজন প্রফেসর শঙ্কুর বাড়িতে পৌঁছালো।

"তারমানে প্রফেসর আপনি বলছেন এই মেশিনটার মাধ্যমে আমরা আসল দুনিয়ায় দুই ঘণ্টার জন্য ঘুরে আসতে পারি?"

"একদম ফেলুবাবু। আমার বিশ্বাস তো তাই বলে।"

কথাটা শুনে লালমোহন বাবু বিশাল আকারের একটা হা করে চোখে মুখে এক অদ্ভুত হাসি নিয়ে বললো, "বলো কী? আমাদের নিয়ে যে শুনেছি চলচ্চিত্র হয়, সেই অভিনেতাদের সামনাসামনি দেখতে পাবো! ওএমজি...!"

ছেলেটি কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ফেলুদা অবশ্য ব্যাপারটা টের পেয়ে সব খুলে বললেন,"তুমি এখন আছো আসলে গল্পের জগতে। আই মিন কলমের দুনিয়ায়। এখানে নতুন থেকে পুরোনো সমস্ত লেখকের নাম অনুসারেই জায়গা আছে, আর সেখানে থাকে তার তৈরি চরিত্রগুলো। যেমন, সুকুমার নগরে থাকে কাতুকুতু বুড়ো, শঙ্কর থাকে বিভূতিভূষণ নগরে, তেমনি ব্যোমকেশ বক্সীও নিজের শহরে। প্রত্যেক নির্দিষ্ট গল্পের চরিত্রগুলোই একটা পরিবার। যেমন আমি, তোপসে ও লালমোহন বাবু একসাথে থাকি। কোনো লেখকের কলমে আমাদের জন্ম হলেই আমাদের এই দুনিয়ায় আবির্ভাব ঘটে, হয়তো সেটা শৈশব থেকেই কিংবা মাঝ বয়স থেকেই। বাইরের জগতে যেসব চরিত্রের কথা মানুষ দিন দিন ভুলে যাচ্ছে, এই জগতে তারা ক্রমশ চলে যাচ্ছে মৃত্যুর মুখে আর যারা রয়েছে চর্চায় তারা আমাদের মতন সুস্থ। আর আমাদের জামাকাপড়, খাওয়া-দাওয়া সব কিছু নির্ভর করে লেখকের কল্পনার ওপর।"

"তাহলে আমি?"

"তুমিও কোনো এক অলস লেখকের তৈরি একজন চরিত্র।"

লালমোহন বাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "অলস কী করে বুঝলে?"

ফেলু মিত্তির মুচকি হাসলো, "সেটা ওকে আজ প্রথম দেখেই বুঝেছি। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো, একটা পায়ে মোজা আছে আর একটাতে নেই। হাতে পরা ঘড়ির টাইমটাও ঠিক নেই। অতএব বোঝা যায় কল্পনার ব্যাপারে লেখক খুবই অলস। আর তারই ফল ওর নিজের সম্পর্কে কিছু না জানা।"

তোপসে এবার কিছুটা অনুমান করতে করতে বলল, "বলতে চাইছ, লেখক ছেলেটার সম্পর্কে ওইটুকু ছাড়া কিছুই লেখেনি?"

একদম ঠিক তোপসে, লেখক তার সম্পর্কে লেখা শুরু করেছিল ঠিকই, তবে দু'লাইন লিখে আর লেখেনি। তাই হলুদ জামা, জিন্স প্যান্ট, সাইকেল আর মেয়েটি ছাড়া তার আর কিছু জানার কথাও না, কারণ তার তা ছাড়া আর অস্তিত্বই নেই। লালমোহন বাবু 'আহারে বেচারা' বলে

ছেলেটার কাঁধে হাত দিলেন।

“আমার লেখককে তবে আমায় জবাব দিতে হবে, তার যদি আমার কোনো চিন্তাই নেই তবে লিখেছিল কেন?”

প্রফেসর শঙ্কু এবার মুখ খুললেন, “ভালোই তো, তোমার জবাবও চাওয়া হবে আর আমার নতুন মেশিনটার ট্রায়ালও। ফেলুবাবু একবার ঘুরে এলে হয় না কলকাতা?”

লালমোহন বাবু জোরে চিৎকার করে বললেন, “কলকাতায় কৌতূহল মশাই!”

ব্যাস! ফেলুদা, তোপসে, লালমোহনবাবু আর ছেলেটা এসে হাজির হলো কলকাতায়। কিন্তু এত বড়ো শহরে লেখককে খুঁজে বের করা বড়ো মুশকিল। কিন্তু সে যে কলকাতার সেটা ফেলুদা বিশ্বাস এর সাথেই বলেছে কারণ ছেলেটার চশমার কাঁচটা বালিগঞ্জের একটা চশমার দোকানেরই। হয়তো লেখক মনের অজান্তেই সেটা কল্পনা করেছে। কিন্তু সে তো দিল্লিতে বসে আমেরিকার গল্পও লেখা যায়, তাই লেখক যে বালিগঞ্জ থাকে তা হতেই হবে এমনটা নয়, তবে কলকাতায় অবশ্যই থাকে কারণ তা না হলে চশমার দোকানটা খুঁজে পাওয়া যেত না। সেই চশমার দোকানে গিয়েও বা কী করা উচিৎ? তাই দোকানটার আশেপাশেই ঘোরা শুরু করলো সবাই। হঠাৎ ফেলুদা জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা তুমি সাইকেল থেকে পড়লে কীভাবে মনে করে দেখো তো!”

“উম! রাস্তার কাজ হচ্ছিল বোধহয়, আমার অত মনে নেই।”

“এখন বালিগঞ্জে তিনটে রাস্তায় কাজ হচ্ছে। আর গল্পটা কিছুদিনের মধ্যেই লেখা। জ্ঞান হারিয়ে আর কতদিনই বা তুমি শুয়ে ছিলে, দেখলে চিনতে পারবে?”

“সেরকম রাস্তা সত্যি নাও থাকতে পারে, হয়তো কল্পনা।”

“মেয়েকে নিয়ে লেখা প্রেমের গল্প, অনুপ্রেরণা তো সত্যি থেকেই আসবে।”

“হ্যাঁ, চিনতে পারব।”

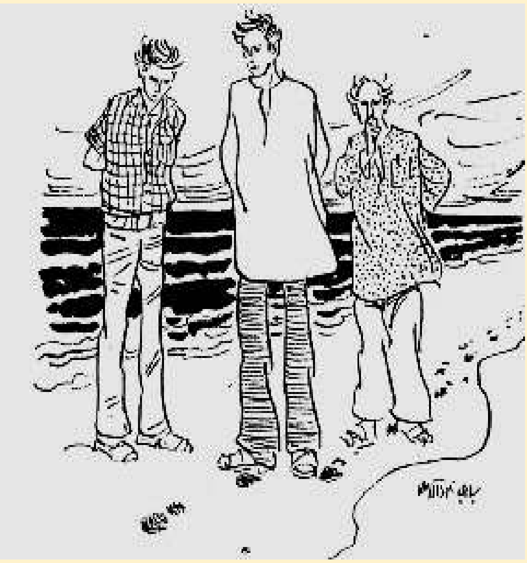

অবশেষে পাওয়া গেল সেই গলি আর সেই বাড়ি, মেয়েটাও হয়তো সত্যি... কিন্তু সেই লেখককে পাওয়া যাবে কোথায়? এখন কাজ ছিল শুধু সেখানে বসে এরপর কী করা উচিৎ সেটা ভাবা, এদিকে সময়ও এগিয়ে চলছে! প্রফেসর শঙ্কুর কথায় ২ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে হবে, যার মধ্যে চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। কিছুক্ষণ পর বেশ কিছু ছেলে সাইকেল নিয়ে রাস্তাটায় ঘুরতে লাগলো। বোঝাই গেল এদের মধ্যেই কোনো এক প্রেমিক আসলে আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিল। তবে এদের মধ্যে কে সেই লেখক তা দেখে বোঝা অসম্ভব, কারণ কে যে লেখক সেটা চেহারা দেখে বোঝা খুবই মুশকিল। ফেলুদা বেশ কিছুক্ষণ সবাইকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে

হঠাৎ একসময় বলল, “এবার সবাই উঠে হাঁটা শুরু করলে ভালো হয়।”

ফেলুদা তাদের মধ্যে একটা ছেলের পিছু করতে করতে তার বাড়ি অবধি সবাইকে নিয়ে পৌঁছে গেল। পা টিপে টিপে দোতালার ঘরটার দরজা খুলতেই দেখলো ছেলেটা শুয়ে আছে চিত হয়ে।

“একি আপনারা কারা?”

“ইনি লালমোহন বাবু, ও তোপসে আর আমি...”

“আপনি ফেলু মিত্তির? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাচ্ছেন না? কী চান? এরকম ফেলু মিত্তির সেজে এসেছেন কেন?”

এর মধ্যে তোপসে বলে উঠল, “আচ্ছা ফেলুদা, এই-ই যে সেই লেখক সেটা কী করে বুঝলে?”

“পায়ে কাটা জায়গাটা এখনো কাঁচা দেখছিস না, সাইকেল থেকে পড়ে ডান হাঁটুর এই অবস্থা করেছেন মশাই।”

“কারা আপনারা? আমার কী করে পা কাটল তা কীভাবে জানলেন?”

এরপর ছেলেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “এই তোমায় কেন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় দেখেছি বলতো?”

“নিজের তৈরি চরিত্র চিনতে পারছ না! তোমার গল্পের নায়কই তো এ, কিন্তু একটা নামও দাওনি এর?” ফেলুদা বললেন।

লালমোহন বাবু বলে উঠলেন, “এই যে লেখক বাপু নিজের গল্প নিয়ে তুমি এত আনরেসপন্সিবেল কী করে হও?”

ফেলুদা শুধরে দিল, “লালমোহন বাবু ওটা ইরেসপন্সিবেল।”

এবার লেখক রাগের সঙ্গে চেঁচিয়ে বললো, “বাবা আমায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি করিয়েছেন গত দু’বছর আগে, লেখক হবার ইচ্ছেটা আমার আর নেই। তাই সাহস নিয়ে লিখতে শুরু করলেও রাগে দুঃখে সেটা শেষ আর করতে পারি না, ইচ্ছে করে তো লিখিনি, মেয়েটাকে দেখে সেই রাতে একা একা কলম চলেছে, সকালে আবার মনে পড়েছে আমি তো ইঞ্জিনিয়ার, এসব গল্প লিখে আর লাভ নেই, লেখক আমি হতে পারব না।”

ছেলেটাও এবার রেগে বলল, “তাহলে আমি কী করব? আমায় তৈরি করে যে এভাবে ছেড়ে দিয়েছ, আমি কি এবার বসে বসে নিজের গল্প নিজে লিখে যাবো?”

“তোমরা কী বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!”

ফেলুদা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, “আর সেসব জেনে লাভ নেই, সময় প্রায় শেষ এটুকুই বলব, গল্পটা তাড়াতাড়িই শেষ করো নয়তো চল্লিশ সেকেন্ড পরে যেটা দেখবে সেটা ছাড়া আরও অনেক কিছু এরকম দেখতে হবে...”

চল্লিশ সেকেন্ড পর কী হলো, লেখক মশাইয়ের চোখের সামনে চারটে মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেল!

এরপর গল্পজগতে গিয়ে ছেলেটার আস্তে আস্তে অনেক কিছুই মনে পড়তে থাকল, ওর একটা নামও হলো, ঈশান, ঈশান দত্ত।

অভিজ্ঞানপত্র

দেবতোষ দাশ

এক.

“বড়োপিসির নাম নেই?”

“না।”

“ওরা তো ওখানকার পুরোনো বাসিন্দা, ওদের নাম উঠল না কেন?”

“বাকি সকলের নাম আছে।”

“মানে?”

“কেবল দিদিরই নাই।”

“পিসি কী বলছে?”

“কী আর বলবে, হাসছে।”

বড়োপিসি নিজেকে তালিকাহীন ভাবতেই পারছে না সম্ভবত। তাই হাসছে। অবিশ্বাসের হাসি। চুপ করে গেল অম্লানজ্যোতি। সুনীলও। অম্লানের মনে হলো ছোট্ট একটা টেনশন চারিয়ে গেছে বাবার মাথায়। বড়োপিসির ফোন ধরেছিলেন টিভি মিউট করে। হাতে রিমোট কন্ট্রোলারটা নিয়ে বসে রইলেন, আওয়াজ ফেরালেন না টিভির। কেবলই দৃশ্যের জন্ম হচ্ছে টিভিতে, বিনা শব্দে।

সুনীল তাকিয়ে আছেন পর্দার দিকে। কিন্তু দেখছেন না। আরও কিছু হয়ত বলবেন। কোনও প্রশ্ন না-করে, নীরবতা প্রশ্রয় দিয়ে অম্লানও বসে রইল বিছানায়। একেবারে শব্দহীন তো বলা যাবে না। রান্নার বৌয়ের খুন্তি নাড়ার আওয়াজ আর ছ্যাঁকছোঁক শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মণিমালার গলা। অম্লানের মা। কী বলছে বোঝা না-গেলেও কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

“এটাতো ড্রাফট। ফাইনাল লিস্টে ঠিক উঠে যাবে।”

সুনীল প্রত্যুত্তর দিলেন না ছেলের কথায়। অম্লানজ্যোতির অস্বস্তি প্রশমিত করতেই যেন মণিমালা ঘরে ঢুকলেন।

“আমায় ফোনটা দিলে না যে! দিদির শরীর ভালো? পুটু ওরা আছে কেমন?”

মণিমালার কথার জবাব না-দিয়ে অম্লানের দিকে ফিরলেন সুনীল।

“আমাদের এখানেও এই লিস্ট তৈয়ার হতে পারে কখনও?”

“না, না, এখানে কেন হবে! আসাম আর ওয়েস্ট বেঙ্গল এক নাকি! আর হলেই বা কী!

আমাদের তো সব আছে। দলিল আছে। পরচা আছে। রেশন কার্ড। ভোটার কার্ড। আধার। স-ব!"

"দিদিরও তো সব আছে!"

"ওটা মিসটেক বোঝাই যাচ্ছে!"

সুনীলের চোখ আবার শব্দহীন দৃশ্যময় টিভির দিকে। কিন্তু কথা বলে চলেছেন। নিজের সঙ্গেই কথোপকথন। বাবার বিড়বিড়ানিতে কান পাতে অম্লানজ্যোতি।

"এখন না-হয় গৌহাটি থাকে, আদতে তো ওরা বকসা জেলার শালবাড়ির লোক। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। এর আগে যখন এনআরসি হয়েছিল একান্ন সনে, সেখানে ওর শ্বশুরের নাম ছিল। ছেষট্টি সনের ভোটার তালিকায় জামাইবাবুর নাম ছিল। দিদিরও ছিল। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে জমির খাজনা দেয় ওরা, তার রসিদ আছে। হতে পারে দিদি ওই বাড়ির বউ, কিন্তু বহু পুরানো বাসিন্দা। নাম উঠবে না কেন?"

"আরে ভুল হয়েছে বলছি না, এই নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই!"

কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলে অম্লান।

সুনীল সটান তাকান পুত্রের চোখের দিকে।

"এটা অপমান! কলমের এক খোঁচায় আমাকে নো ম্যানস ল্যান্ডে ফেলে দেওয়া একটা অপমান! ক্ল্যারিকাল মিসটেক বলে একে লঘু করিও না!"

একটা ধাক্কা বুকে এসে লাগে অম্লানের। নিশ্চুপ বসে থাকে। মণিমালা একবার ছেলে আর আর একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে রান্নাঘরে ফেরত যান।

"দীর্ঘ নাগরিকত্বের সকল প্রমাণ আছে আমার কাছে। এতদসত্ত্বেও তুমি আমার নাম বাদ দিলে! কেন?"

চুপ থাকতে পারেন না সুনীল। খসড়া তালিকায় আইনী নাগরিক হিসেবে দিদির নাম না-থাকাটা তাঁকে পীড়া দেয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এপারে আসার পর, নাগরিকত্ব নিয়ে আর ভাবনার অবকাশ ছিল না। দেশত্যাগ করেছেন স্বেচ্ছায়। ঢাকার অফিস থেকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে আইনী পদ্ধতিতেই হিন্দুস্তানে এসেছিলেন তিনি। সে তো আজকের কথা নয়, সেই ১৯৫৫ সালের জুলাইয়ের কথা। শেষ-আষাঢ়। আজ এত দিন পর, এ কী আপদ এলো দুশ্চিন্তা হয়ে।

মণিমালা রান্নার বৌকে বিদেয় দিয়ে আবার ঘরে ঢোকেন। সুনীলের দিকে তাকান। সামান্য অবাক সে দৃষ্টি। রিমোট কন্ট্রোলারটা তুলে টিভি সরব করে বসে পড়েন মণি। সুনীল টিভির পর্দা জুড়ে দেখতে পান পেট্রোম্যাক্সের আলোয় উজ্জ্বল দিদির কনে-মুখ। লাল বেনারসি, চন্দন-শোভিত সালঙ্কারা দিদির দিকে তাকিয়েই থাকেন সুনীল।

দিদির বিয়ে হলো তাঁর চলে আসার আগের বছর। চুয়ান্নয়। বিয়ের পরদিন চলে গেল দিদি। হারিয়ে গেল দিদি। নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া তো একপ্রকার হারিয়েই যাওয়া। মেয়েরা তো হারিয়েই যায়। মেয়েদের কি নিজের কোনোও দেশ আছে?

দেশ কি সুনীলেরও আছে? দিদির মতো তিনি-ও তো হারিয়ে গেছেন সে-ই কবেই! নিজের দেশ ছেড়ে, জন্মভিটা ছেড়ে হারিয়ে গেছেন। কোনোওদিন কি আর নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন? নিজেই নিজের কাছে ফেরারি।

উঠে পড়েন সুনীল। খাওয়ার টেবিলে রাখা জলের বোতল থেকে জল ঢালেন কাঁচের গ্লাসে।

চুমুক দেন। বুক ঠেলে কাশি আসে। দু'বার কেশে আবার চুমুক দেন গ্লাসে।

দিদির বিয়ের দিনই প্রথম সিগারেট খাওয়া। কিংস্টক সিগারেট। প্যাকেটের ওপর বকের ছবি। বরযাত্রীদের জন্য আনা হয়েছিল। সিগারেট দিয়ে তাঁদের আপ্যায়ন করার দায়িত্ব সুনীলের। বরযাত্রীদের বিলিয়েও একটি প্যাকেট উদ্বৃত্ত হয়।

জল খেয়ে হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁট মোছেন। কিংস্টকের প্যাকেটের বুকে বকের ছবির ওপর হাত বোলান। ভিতর থেকে বার করেন একটা সিগারেট। ম্যাচ বাক্স থেকে মাচিস বার করে ফস করে জ্বালিয়ে ঠোঁটে-চেপে-ধরা সিগারেট ধরান। একটু টেনেই খকখক করে কাশেন, কিন্তু কাশতে কাশতেই আরও দুইবার টানেন।

সিরজু দেখে ফেলেছিল। ভালো নাম ছিল বোধহয় সিরাজ। মনেও পড়ে না। বেদম কাশি দেখে কী হাসি সিরজুর। বাবার প্রজা কাদেরের পোলা। সুনীলের খেলার সঙ্গী।

আশপাশের গ্রাম থেকে মুসলমান প্রজারা এসেছে দল বেঁধে। তাদের জন্য খাওয়ার কোনোও ব্যবস্থা নাই। কেবল পান-সুপারি দেওয়া হল তাদের হাতে। কত্তার মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ থেকে তারা আবার চলে যায়। সুনীল চিৎকার করেন, সিগ্রেট খাবি সিরজু?

মুসলমানরা নিমন্ত্রণ পেলেও নমশুদ্ররা তাও পায়নি। গগন চাঁড়াল ও তার দল সকালে পুকুর থেকে মাছ ধরে দিয়ে গেলেও বাবুর বিয়েতে তাদের নিমন্ত্রণ নাই। সুনীল কাশতে কাশতে হাসিমুখ সিরজুর চলে যাওয়া দেখেন। ও কি বর্ডার পেরিয়ে চলে যাচ্ছে কোনোও নো ম্যানস ল্যাণ্ডে। আবার চিৎকার করেন সুনীল, একখান টান দি যা সিরজু?

"বিয়ের পরপরই বড়োপিসিরা আসাম চলে গেল?"

পেছনে কখন ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেননি।

"না, কিছুদিন ফেনীতেই ছিল। জামাইবাবু কুমিল্লা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে চলে গেল বিলোনিয়া। ত্রিপুরা। আমাদের ফেনীর পাশেই বিলোনিয়া। পরশুরাম হয়ে ট্রেন যেত।"

"তারপর গৌহাটি?"

"বিলোনিয়ায় ছিল বোধহয় বছর দুয়েক। তারপর বাড়ি ফিরে যায়।"

"শালবাড়ি।"

"জামাইবাবু পেয়ে গেল সরকারি চাকরি। প্রায় সকলেই গৌহাটিতে চলে এসেছে তখন। শালবাড়িতেও যাতায়াত ছিল। দিদিও গেছে বহুবার।"

কথা বলতে বলতেই আবার নিজের ঘরে ঢোকেন সুনীল। টিভির মাথা থেকে চশমাটা নেন। আলমারি খোলেন। লকার থেকে বার করেন পলিথিনের একটা প্যাকেট। বিছানায় রাখেন সেই মোড়ক। ঘরের দ্বিতীয় টিউবটি জ্বালান। তারপর এক এক করে কাগজপত্র বার করে উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করেন।

বাবা-মায়ের ঘরে আর ঢোকে না অম্লানজ্যোতি। খবরের কাগজদুটো হাতে নিয়ে নীচে নামে। মেয়ের টিউটর এসেছেন। সঞ্চারি স্কুলের খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। অম্লান বৈঠকখানায় এসে সোফায় বসে। পাতা ওল্টায় খবরের কাগজের।

দুই.

চারের পাতার উত্তর-সম্পাদকীয় রচনার মাঝামাঝি এসেছে, মণিমালা এসে হাজির।

"কী ব্যাপাররে বাবু, তোর বাবা পাগলের মতো কী খোঁজে? আলমারি তোলপাড়।"

মায়ের দিকে অবাক তাকায় অম্লান।

"যতই জিগাই, কিছুই কয় না! চোখেমুখে একটা টেনশন!" মণিমালা বসেন সোফায়। "দিদির কাগজ-পত্র এখানে থাকব ক্যামনে? দিদি তো ওয়েস্ট ব্যাঙ্গলে আসেই নাই কখনও।"

কাগজ রেখে ওঠে অম্লান। মণিমালা ছেলেকে নিয়ে স্বামীর কাছে যান।

"কী খুঁজছো বাবা? কোনো কাগজ?"

নিরুত্তর সুনীল খাটের তলা থেকে সুটকেস বার করতে চেষ্টা করেন। বাবাকে সরিয়ে অম্লান সুটকেস বার করে আনে। এইখানেও সুনীল রাখেন প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র। মেঝেতে বসে সুটকেস খোলেন। খাপ থেকে চওড়া কাগজের খামটি বার করলেন। একে একে বার করেন টুকরো টুকরো কাগজ। কিন্তু না, অন্যান্য কাগজের মাঝে ঈপ্সিত নথিটি পেলেন না সুনীল। সুটকেসটি বন্ধ করলেন সশব্দ।

"কী খুঁজ কইবা ত?" মণিমালার স্বরে উৎকণ্ঠা।

"সবথেকে পুরান ডকুমেন্ট।" অবসন্ন সুনীল মণির দিকে তাকিয়ে বলেন।

"মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট?" অম্লানজ্যোতি যেন ধরতে পেরেছে কোনো অন্বিষ্ট নথির জন্য বাবার এই চঞ্চলতা।

"ওটা আমার কাছে থাকার কথা নয়!"

"তা'লে?" মণিমালা অশীতিপর স্বামীর পাশে বসেন।

"সার্টিফিকেট জমা নিয়েছে বানপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট। জমা নিয়ে একটা টোকেন দিয়েছিল। ওটাই ওয়েস্ট ব্যাঙ্গলে থাকার আসল কাগজ। আমি ত হিন্দুস্তানে বেআইনীভাবে আসি নাই। সরকারি কাগজপত্র লই আইসি!"

"ঠিক আছে, এখন খেতে চলো। পরে দেখুম আমি। বাবুরে লই খুঁজুম। যাইব কোথায়? চলো, এখন চলো!"

স্বামীকে হাত ধরে মেঝে থেকে তোলেন মণিমালা। ধরে ধরে বাথরুমের কাছে নিয়ে যান। হাতে ধরিয়ে দেন গামছা। ফতুয়া খুলে কেবল লুঙ্গি পরে বাথরুমে ঢোকেন সুনীল।

নাতনির মাস্টার চলে গেছেন। সে-ও এসে বসেছে খাওয়ার টেবিলে। দশটা নাগাদ রাতের খাবার নাতনির সঙ্গে খান সুনীল। সঙ্গে অন্য কেউ থাকতেও পারে, কিন্তু নাতনির থাকা আবশ্যিক। চেয়ারে দাদু এসে বসতেই এগারো ক্লাসে-পড়া নাতনি বলে, হোয়াটস রং উইদ ইউ দাদাই? কী হয়েছে?

"না, তেমন কিছু না, একটা কাগজ মিসিং।" নাতনির দিকে তাকিয়ে হাসেন সুনীল।

"আরে, ইলিশ নাকি! আচ্ছা দাদাই, এখন ট্যাংরা মাছ পাওয়া যায় না?"

অম্লানও এসে খেতে বসে। কাজ সেরে এসে সঞ্চারী খাবার গরম করতে শুরু করেছে। মণিমালা কাঁসার থালায় ভাত বেড়ে দেন সুনীলকে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি। বৃষ্টির তেমন দেখাসাক্ষাৎ নেই, বাজারে ইলিশও কম। ফলে বেজায় দাম। ভাত ভেঙে কালো-জিরে-কাঁচালঙ্কার ঝোল ঢালেন।

"গাঁটি কচুর তরকারিটা খাইব্যা না?"

"কত করে নিল রে?" মণিমালার কথার জবাব না-দিয়ে ছেলের দিকে তাকান সুনীল।

"তুমি খাও। দাম জানি কী কইরব্যা!" মণিমালা জবাব দেন।

ইলিশের টুকরোটা কিছুটা খুঁটে রেখে, বেশিটা নাতনির পাতে দিলেন সুনীল। ইদানিং রাতে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

"বড়োপিসিঠাম্মাকে তুমি দেখেছ?" প্রশ্ন নাতনিকে।

"ওরা গৌহাটি গেল তো একবার, পাঁচ-ছয় বছর আগে! বাবাই তখন ছোটো।" আবার মণিমালা।

"হ্যাঁ, শিলং গেলাম ওখান থেকে। বড়োপিসিঠাম্মার বাড়িতে ছিলাম তো দু"দিন। মনে আছে আমার। টিভিতে ক্রিকেট দেখে আর খুব পান খায়।"

নাতনির কথায় হাসেন মণিমালা। সুনীলও।

"দিদি খুব ডানপিটে ছিল। আমাদের দেশে বৃষ্টির খুব জোর। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য বৃষ্টি। আর তেমন ঠাডা!"

"ঠাডা মানে?" মুখে ভাত নিয়েই নাতনির প্রশ্ন।

"মেঘগর্জন। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ। থান্ডার। আমি খুব ভয় পেতাম। শ্রাবণ মাসে যখন দিনভ"র বৃষ্টি, হয়তো ইশকুলে যেতে পারিনি, দিদি নেমে যেত পুকুরে!"

"ওই ঠাডার মধ্যে!" নাতনি অবাক।

"পুবদিকের ঢালে কইমাছের ঝাঁক কান বেয়ে উঠত। পুবপাড়ে গিয়ে দিদি কইগুলিরে ধরত আর সাঁইসাঁই করে পাড়ে ছুঁড়ে ফেলত।"

"আমিও বহুবার শুইন্‌ছি ওই গল্প। দিদির হাত কইয়ের কাঁটায় রক্তারক্তি।" ইলিশের ঝোল দিয়ে নাতনির ভাত মাখতে মাখতে বলেন মণিমালা।

"এমা, পিসিঠাম্মার ব্যথা করত না!"

"কচুপাতার রস লাগিয়ে নিত। পাত্তাই দিত না।"

"আর তোমার দাদাই তখন ঠাডার ভয়ে চকির তলায়!"

মণিমালা নাতনির দিকে তাকিয়ে চোখ টেপেন। নাতনি হাসে।

"কাল রমজান আইবনি?"

মণিমালা বোঝেন সুনীলের প্রশ্ন তারই উদ্দেশে।

"আওনের ত কথা। কেন?"

"ট্যাংরা কি কাইল আইন্‌বো হেতে?"

"গত রোববারই তো ট্যাংরা দিয়ে গেল রমজান! খেল তো!" সঞ্চারী বিরক্তি নিয়ে মেয়ের দিকে তাকায়।

"বড়োপিসি-ঠাম্মা ট্যাংরা মাছ ধরতে পারত?"

"দিদি বলে, রেজিস্টারে আমার নাম নাই মানে আমি আর হিন্দুস্তানের না, সুনু চল চলি যাই ফেনী। আমগো ফেনী। মধুপুর! নিব না আমগোরে? নিব না?"

ভেতরবাড়ি কেঁপে ওঠে অম্লানের। দৃষ্টি যায় বাবার দিকে। নির্বিকার সুনীল খাওয়া প্রায় শেষ করে ফেলেছেন।

তিন.

ঘুম ভেঙে যায় মণিমালার। একি, ঘরের লাইট জ্বলে কেন? সুনীল আবার খুলে বসেছেন পুরনো কাগজের বান্ডিল। একটা-একটা করে দেখছেন আর হতাশায় মাথা নাড়াচ্ছেন।

মশারি সরিয়ে নেমে আসেন মণিমালা।

"কইলাম না বাবুরে লই খুঁজুম! তোমার তর সয় না!"

"ওইটাই আসল কাগজ মণি, এখানে তালিকা তৈয়ার হইলে ওই কাগজই আমগো বাঁচাইবো!"

"আরে যাইব কোথায়? কাগজ তো তোমার কম না! ব্যাকই ঢুকাই রাখো! অহন চলো, কাইল অন্সরে খুঁজুম!"

ছেলেকে ডাকতে গিয়েও ডাকেন না মণি। সুনীল বাথরুমে ঢোকেন। ঘড়িতে দুটো চল্লিশ।

থম মেরে বিছানায় বসে থাকেন মণিমালা।

চার.

"মালিক যেখানে পাঠাবে সেখানেই চলে যাব মা, সব জাগাই তো মালিকের। নাম কেটে দিলে দেবে!"

"ভোটের কার্ড, আধার, পরচা, খাজনা দাখিলা সব আছে তোমার?"

"জি মা।"

কেজি দেড়েকের রুইমাছটা কাটতে কাটতে হাসিমুখে মাথা নাড়ে রমজান।

"মাথায় মাছ রাখব?"

"সামান্য।"

"পেটি করি মা?"

"কর। তোমার দাদার তো খুব ভয়!"

চুপচাপ বসে মাছ-কাটা দেখেন সুনীল। মণিমালার কথার প্রত্যুত্তর দেয় না রমজান। একমনে ফালি ফালি করে রুই।

"কাইল কিন্তু ট্যাংরা আনিও রমজান। আমার নাতনি ভালো খায়।"

"আনব মা।"

মাছভর্তি গামলা সাইকেলের পেছনে বসিয়ে চলে যায় রমজান। মণিমালা রান্নার বৌয়ের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

"রমজানের ভয় পাওয়ার কথা, ও ভয় পাচ্ছে না, তুমি পাচ্ছ কেন বাবা? তুমি মুসলমান?"

পুত্রবধু সঞ্চারীর প্রশ্নে সুনীল হাসেন। অস্ফুটে বলেন, "আমি রিফিউজি।"

"পুরো প্রসেসটা এইদেশে মুসলমানকে সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন বানাবার একটা মাস্টার প্ল্যান! হিন্দুদের ভয় কী?"

"বৌমা, আমি না-হিন্দু, না-মুসলমান! কোনোও এক ধর্মের আশ্রয় লওনের স্বাধীনতাও রিফিউজির নাই! তার একটাই পরিচয়, সে রিফিউজি! চিরজীবন তারে একখান কাগজ পকেটে নিয়ে ঘুরতে হবে। প্রমাণ। না-থাকলে সে অবৈধ। রমজানের ধর্ম আছে। আমার আছে কাগজ। ওইটা মিসিং, তাই ভয়।"

বাঁ পকেটে মানিব্যাগ আর ডানদিকে স্মার্টফোন ঢোকায় অম্লান। সঞ্চারী আর বাবার কথোপকথন কানে আসে। চুমুক দেয় জলের গ্লাসে। দু'ঢোক জল খায়। ভাবে কিছু বলবে, কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না। রুমালে ঠোঁট মুছে আবার পকেটে রাখে। দোতলায় যায়। প্রণাম করে মা-কে।

ছেলে-বৌ কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর নাতনির স্কুল যাওয়ার পালা। নাতনি স্কুলের কারপুলে ওঠা না-ইস্তক ফুরসত মেলে না মণিমালার। কিন্তু আজ যেন দ্রুত পৌঁছোতে চান অবসরে।

খেতে খেতে নাতনি বলে, "ঠাম্মা, আমরা কি রিফিউজি?"

মণিমালা মাছের কাঁটা বেছে দিতে দিতে বলেন, "কে বলে এইসব কথা?"

"এই যে বড়োপিসিঠাম্মা ক্রিকেট দেখতে ভালোোবাসে, বিরাটের ফ্যান, এখন থেকে আর ইণ্ডিয়াকে সাপোর্ট করতে পারবে না?"

"কেন পারবে না, নিজের দ্যাশরে সাপোর্ট করতে আবার কাগজপত্র লাগে নাকি!"

"রিফিউজিদের কোনোও দেশ নেই ঠাম্মা।"

অন্নগ্রহণরত নাতনির মুখের দিকে চেয়ে থাকেন মণিমালা।

পাঁচ.

ঠাম্মা-দাদুকে টা-টা করে নাতনি বেরিয়ে যেতেই মণিমালা ঈপ্সিত কাগজের খোঁজে স্বামীর সঙ্গে বসেন। সুনীলের উৎকণ্ঠা কিঞ্চিৎ তাঁকেও ঘিরে ফেলেছে। চশমাটা নাকের ডগায় রেখে একটা-একটা কাগজ খুঁটিয়ে দেখেন। কাগজটির প্রয়োজনীয়তা ছেলের কথাতেও পরিষ্কার। অফিসে বেরোবার আগে সে একান্তে মা-কে বলেছে, "বাবার সঙ্গে একটু হাত লাগিও। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে আমিও দেখব।"

খুব বেশি খুঁজতে হয় না মণিমালাকে। আলমারির কাগজের বাণ্ডিলের মধ্যে রাম ঠাকুরের একটা চটি জীবনী বই ছিল। তার মধ্যেই মেলে সেই টোকেন, সুনীলের পশ্চিমবঙ্গে থাকার ছাড়পত্র।

"কইলা যে মাইগ্রেশন লই স্বেচ্ছায় আইস এই দ্যাশে? অহন রিফিউজি কও কা নিজেরে?"

হাসেন সুনীল। মণিমালা খুঁটিয়ে দেখেন সেই কাগজ। কখনও দেখেননি যে কাগজ, সেই কাগজ হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কী করে! কাগজের লেখা জোরে পড়েন। টোকেন ফর ইমিগ্র্যান্টস। ডিপার্টমেন্ট অফ রিফিউজি রিলিফ অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন। পূর্ব পাকিস্তানের শেষ ঠিকানাঃ গ্রাম ও পোস্ট মধুপুর। সাবডিভিশন ফেনী। জিলা নোয়াখালি। ইণ্ডিয়ার কোথায় পাকাপাকি বাস করতে চানঃ যাদবপুর কলোনি। নীচে অফিসারের সই। চেকপোস্টের ছাপ। বানপুর পাসপোর্ট চেকিং পোস্ট। নদিয়া।

আবার সব কাগজ গুছিয়ে ফেলেন সুনীল। রামঠাকুরের বইয়ের মধ্যেই ঢুকিয়ে রাখেন টোকেন ফর ইমিগ্র্যান্টস যার মাথায় লেখা, অরিজিনাল।

"দর্শনাতে এইটা দেখালেই তুই হিন্দুস্তানের লোক!" বাবার কথা শুনে বুক কেঁপে উঠে। হিন্দুস্তানের লোক মানে? সে তো কখনও হিন্দুস্তানের লোক হওয়ার কথা ভাবে নাই। দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর সে তো পাকিস্তানেরই। পাকিস্তানই তার দেশ।

ঢাকার সেগুনবাগিচায় মাইগ্রেশন অফিস। এত বড়ো শহর এই প্রথম দেখল সুনীল। কলকাতা কি ঢাকার থেকেও বড়ো? অত বড়ো শহরে গিয়ে কী করবে সে? হারিয়ে যাবে না তো? একটা ফর্ম

পুরণ করে জমা দিতেই হাতে হাতে পেয়ে যায় মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট।

অফিসার হেসে বাবাকে বলেন, "পোলারে আগে পার কইর‌্যা পরে আম্নেরা যাইবেন, তাই তো? কিন্তু ক্যান যাইবেন? ধর্ম ছাড়া ত আর কিছুই মিল নাই!"

নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে চাঁদপুরে ফেরার পথেও বারবার অফিসারের কথা কানে বাজে সুনীলের।

"যেদিন আইলাম, কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! দর্শনা পেরোতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। কিন্তু, কিছুই তো পরিবর্তন হয় না! সেই একই ধানক্ষেত, মাঠ-ঘাট, তাল গাছের সারি, এমনকি ধোঁয়া ধোঁয়া বৃষ্টি পর্যন্ত এক।"

"পরিবর্তন আর কী হইব!" এ টি দেবের ডিক্সনারির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মণিমালা বলেন।

"তাইলে এই সীমানা পার হওনের জন্য ব্যাকে এত উতলা ক্যান?"

আই-এর পাতায় গিয়ে মণিমালা পেয়ে যান যা খুঁজছিলেন। এ পারসন হু কামস টু লিভ পার্মানেন্টলি ইন এ ফরেন কান্ট্রি। অভিবাসী।

ইমিগ্র্যান্টের এই অর্থই দিয়েছে ডিক্সনারি।

ছয়.

খাবার টেবিল গতরাতের মতো থম মেরে নেই, আজ ফুরফুরে। অভিজ্ঞান পত্রটি আবার দৃশ্যমান হতেই ভার নেমে গেছে সকলের। হারানো-নথি হাতে পেয়েই ছেলেকে ফোন করে দিয়েছিলেন মণিমালা। কোথা থেকে কীভাবে অকস্মাৎ বিপর্যয় নেমে আসবে কেউ জানে না। কাগজপত্র সব হাতের কাছে থাকাই মঙ্গল। অফিসে বসেই চাপমুক্ত হয় অম্লানজ্যোতি। স্কুল থেকে সন্ধেয় সঞ্চারী ফিরে খবর পায় শাশুড়ির থেকে। মুচকি হাসে সে।

"ফেনী থেকে তোমরা চলে এলে কেন দাদু? বিক'জ অব রায়ট?"

"না, না, রায়টের অনেক পরে আমরা এসেছি!"

"ওখানে থাকলে কী ভালো হতো! আমাদের বিরাট পুকুর থাকত। পিসিঠাম্মার মতো আমি ঠাডার মধ্যে কইমাছ ধরতাম!"

হা-হা করে হেসে ওঠে সকলে।

"আমাদের এবার বাংলাদেশ ট্যুর প্ল্যান কর তো অম্লান। বাবাকে নিয়ে ফেনী যাই।" সঞ্চারী বেশ উৎসাহী।

"পাসপোর্ট লাগবে।"

"আরে প্ল্যানটা তো কর! পাসপোর্ট করতে এখন বেশি সময় লাগে না!"

অম্লানকে উড়িয়ে দেয় সঞ্চারী। মেয়েও আনন্দে লাফায়। মৃদু হাসেন সুনীল।

"এই কাগজটা না-পেলে কি আমাদের সিটিজেনশিপ থাকত না, দাদাই?"

"ধুর, তোর দাদাইয়ের যত ফালতু ভয়!" হাসতে হাসতে বলে সঞ্চারী।

"ফালতু ক্যান, যা আরম্ভ হইসে কোথার থিকা কী হইব কেউ জানে!" মণিমালা দুশ্চিন্তা দূর করতে পারেন না।

"আচ্ছা দাদাই, একটা কথা বল, আমি মেসির ফ্যান– সো আর্জেন্টিনার সাপোর্টার– লাস্ট

ওয়ার্ল্ড কাপে ফ্রান্সের কাছে হারার পর কেঁদেছি– আমি কি আর্জেন্টাইন নই?”

“আর্জেন্টিনা হাইর্‌লে যারা কাঁদে, তারা অবশ্যই আর্জেন্টাইন!” সুনীল নাতনির তালে তাল মেলান।

“ফর্টি সেভেনের পর তুমি পাকিস্তানি ছিলে– ইস্ট পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়ায় এসেছো– আই ক্যান অলসো ক্লেইম দ্যাট লিনিয়েজ– সো অ্যাম অ্যা পাকিস্তানি– আবার ফেনী এখন বাংলাদেশে– সো অ্যাম অ্যা বাংলাদেশী অলসো! তাহলে কী দাঁড়ালো, আমি ইন্ডিয়ান, সাইমালটিনিয়াসলি আমি আর্জেন্টাইন, পাকিস্তানি অ্যান্ড বাংলাদেশী!”

আবার সকলের হাসি। অম্লান বলে, “পাগল একটা!”

সাত.

রাতে সুনীল স্বপ্ন দেখেন, বৃষ্টিতে শাদা হয়ে গেছে চরাচর। ঠাডার পর ঠাডায় কেঁপে ওঠে দালান। কইমাছগুলি কান বেয়ে উঠে আসছে পুকুরের পুবপাড়ে।

“দিদি অরা ক্যান ওইদিকে যায়?”

“আরে ভোদাই, ওইদিকে খাল না? পার হইলেই যাই পইড়্‌ব গিয়া খালে! পুকুরের মাছ খালের হইব!”

“দিদি অরা বুঝে ক্যামনে ওইদিকে খাল?”

“অরা জলের গন্ধ পায়!”

চরম ঠাডা আর বৃষ্টির মধ্যেই তার অকুতোভয় দিদি বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। দ্রুত পুবপাড়ে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য রেখে ছুঁড়তে থাকে একের পর এক কই। হাত লাল হয়ে যায় দিদির। কইয়ের কাঁটায় তালু রক্তাক্ত। কচুগাছের রস লাগিয়ে দেয় সুনীল দিদির হাতে পরম যত্নে। দিদি হাসে। দিদির মুখটা দিদিভাইয়ের মতো লাগে।

নাতনি বলে, “দাদাই আমি কইমাছ ধরতে শিখে গেছি!”

রাত কত জানা যায় না। ঘুম ভেঙে মণিমালা দেখেন পাশে সুনীল নেই। ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকটা। মণিমালা ওঠেন। মশারি সরিয়ে খাট থেকে নামেন। এক পা এগিয়েই দেখতে পান স্বামীকে।

সুনীল কুচি কুচি করে সেই টোকেন ফর ইমিগ্র্যান্টস ছিঁড়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন দক্ষিণের জানালা দিয়ে। তীব্র হুইশল কানে আসে তার। পাকিস্তানের দর্শনা আর হিন্দুস্তানের বানপুরের মাঝে দীর্ঘ নো ম্যানস ল্যান্ড অতিক্রম করতে প্রাণপণে গতি বাড়ায় ট্রেন। টুকরো টুকরো অভিজ্ঞান ভেসে যায় হাওয়ায়। ছড়িয়ে পড়ে সেই বেওয়ারিশ ভূমিখণ্ডে।

“দিদি, তর নাম নাই রেজিস্টারে আর আমিও ছিঁড়ি উড়াই দিসি কাগজ! আমরা আর হিন্দুস্তানের না, দিদি চল চলি যাই ফেনী। আমগো ফেনী। মধুপুর! নিব না আমগোরে? নিব না? নিব না?”

স্বামীর বিড়বিড়ানি শুনে এগিয়ে আসেন মণিমালা। হাত রাখেন পিঠে।

হালকা হয়ে যান সুনীল। মাধ্যাকর্ষণটুকু যেন এখন অগ্রাহ্য করতে পারছেন। সীমানাও তিনি পেরিয়ে যেতে পারছেন সহজেই।

গন্তব্য ফিফথ এ্যাভিনিউ

মাহরীন ফেরদৌস

প্রথম যে তাকে রবার্ট লি ফ্রস্ট এবং উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের কবিতা চিনিয়েছিল তার সাথে আর যোগাযোগ নেই। এক সহপাঠী শিখিয়েছিল এক্সেল শিটে কীভাবে হিসাব রাখতে হয়, তার নামটিও গেছে ভুলে। যে বন্ধুটি বলেছিল, সে যখন জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখবে তখন সেই বন্ধুটি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, টের পাবে আর আনন্দিত হয়ে হাসবে। যদিও বন্ধুটি পরের বছরই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল; তবুও সে যখন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়েছে ঠিকই তাকে মনে করেছে। বন্ধুটি কি অন্যজগত থেকে তা টের পেয়েছে? হেসেছে আনন্দিত হয়ে? এই মানুষগুলো আর জীবনে নেই, অথচ সে এখনও কবিতা পড়ে। একের পর হিসাব করে কিংবা লম্বা ছুটি পেলেই ছুটে যায় সমুদ্রের কাছে। মানুষ তার মানে চলে গিয়েও আসলে চলে যায় না! সে সবসময় কিছু না কিছু রেখে যায়, হয় স্মৃতি, নয়তো এমন কিছু যার সাথে তার উপস্থিতি জড়িত!

লুবনা আগে এসব নিয়ে প্রায় ভাবত তবে এখন আর উত্তর খোঁজে না। সে শুধু মাঝে মাঝে বর্তমানকে ধরতে চায়। এই যেমন সন্ধ্যা হবে হবে ভাব দেখে জ্বলে উঠছে ডাউনটাউনের সবগুলো বাতি, রেস্তোরাঁগুলো নানা আলোর চমকে কাঁপছে থেকে থেকে। বহুতল ভবনে শান-শওকতের সাথে লুকিয়ে থাকা অফিসগুলোর বেশির ভাগই ছুটি হয়ে গেছে আরও ঘণ্টাখানেক আগে। এই আঁধার নেমে আসা সময়ে আজকের দিনের শেষ বাসটার জন্য অপেক্ষা করছে সে। এদিকে দূরে কোথাও র‍্যাপ মিউজিকের বিট বেজে যাচ্ছে। ফল সিজনের হালকা শীতল বাতাসের ঝাপটায় উড়ে যাচ্ছে তার পাতলা চুল। শীত শীত লাগছে একটু। সে গায়ের হুডিটা আরেকটু টেনে নেয়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যাগপ্যাকটা ঠিক করে। ব্যাংক অব আমেরিকার মস্ত বড়ো ভবনের পেছনে সূর্যের শেষ আলোটুকু জ্বলে আছে রক্ত জবার মতো। ম্যাপল, পাইন আর চেরি গাছগুলো হালকা বাতাসে কাঁপছে মৃদু। সাঁই সাঁই করে করে চলে যাচ্ছে কিছু গাড়ি। আর নাটুকে শব্দ তুলে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে কিছু হালফ্যাশনের সাইকেল। শীতের হাওয়া, রক্তজবার মতো মোহময় সন্ধ্যা, অত্যাধুনিক সব ভবন ও রেস্তোরাঁয় ভরপুর যন্তর-মন্তর সময় পলকে পালটে যায়।

লুবনা দেখে সে ফার্মগেটের ফুটওভার ব্রিজ পার হচ্ছে খুব দ্রুত। হনহন করে হাঁটছে। ডান কাঁধে ভারি ব্যাগ, কানে ইয়ারফোন, সেখানে সঞ্জীব চৌধুরী ভরাট কণ্ঠে গেয়ে যাচ্ছে গান। সে ঘামছে খুব, বুকের ওড়নাটুকু দুই প্যাঁচ দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে মাঝে-মধ্যে। সিনেমার ফাস্ট ফরোয়ার্ড দৃশ্যের মতো দু'পাশে অজস্র মানুষের ট্রেন চলে যাচ্ছে। ওজন আর উচ্চতা মাপার মেশিন নিয়ে বসে আছে এক

কিশোর। তার ঠিক পাশেই গান ধরেছে এক অন্ধ ফকির, সঞ্জীবের কণ্ঠে ঢাকা পড়ে যায় সেই গান। লুবনা আকাশ দেখে। ডিজিটাল শহরের আলো ফুরাচ্ছে। শতশত গাড়ির পেছনে ইমার্জেন্সি বাতির মতো জ্বলে উঠেছে লাল টেল লাইট। যেন জরুরি আলো দেখিয়ে এরা সবাই পৃথিবীর জন্য মস্ত বড়ো কোনো উপকার করতে যাচ্ছে। কাছে ধারে কোথাও তেমন সবুজের সমারোহ নেই। ধূলায়, ধোঁয়ায় অদৃশ্য কোনো দানব যেন পাক খেয়ে যাচ্ছে বাতাসে। লুবনার গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে কিছু মানুষ। এত ভিড়। সামনের পথটুকুর দেড় হাতও দেখা যায় না। সব অফিস ফেরা মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, কেরানি, দোকানদার, ব্যবসায়ী, ফকির।

হঠাৎ বাতাসে বেলি ফুলের গন্ধ পেয়ে চমকে ওঠে।

"এই অবেলায়, অসময়ে বেলিফুলের ঘ্রাণ আসবে কীভাবে?"

ভুল ভাঙে নিমিষেই, সাদা আলখাল্লা পরা এক মুরুব্বি যাচ্ছেন পাশ দিয়ে, ফুলের তীব্র ঘ্রাণ তার কাছ থেকেই আসছে। আতরের গন্ধ। এত জীবন্ত! এত প্রবল। মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। ফুটওভার ব্রিজের সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে লুবনা। আর তখনই দীর্ঘদিন পর দেখা হয়ে যায় অর্ণবের সাথে। কাঁধে ল্যাপটপের ব্যাগ, সন্ধ্যার এই সময়েও চোখে রে-ব্যানের সানগ্লাস। মুখে আগের মতোই ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি। শুধু কাঁধটুকু আরেকটু প্রশস্ত হয়েছে। ঝট করে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় সে। নিশ্চয়ই অফিসের কোনো ডিল বা মিটিংয়ের জন্য কারওয়ানবাজার এসেছিল ও। এখন ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করছে। নাহ, দেখা হোক এমন চায় না সে। ডান-বামে দ্রুত নজর বুলিয়ে এমন একটা পথ খুঁজতে চায় যেখান দিয়ে না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। তবে দেখে ফেলে অর্ণব।

প্রচলিত কোনো কুশল বিনিময়ে না যেয়েই গমগমে স্বরে বলে ওঠে, "লুবনা, কোথায় যাচ্ছো? রাইড লাগবে?"

কণ্ঠ শুনে লুবনার ভেতরে যেন এক ঈগল পাখি ক্রুর ভঙ্গীতে ডানা ঝাপটায়। ভাবে, এই শহরটা এত ছোটো কেন? পৃথিবীটাই বা কেন গোল? ঘুরেফিরে বার বার সবার সাথে দেখা হয়ে যায়। কেন শিকড় উপড়ে ফেলা যায় না? কিংবা কেন নানা অনলাইন মাধ্যমের মতো মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ইগনোর, রিমুভ, ব্লক এইসব অপশনগুলো নেই? নিজেকে সামলে নিতে নিতে দ্রুত বলে, "রাইড লাগবে না। আমার একটা মিটিং আছে এখানে। সে জন্য এসেছি। তুমি ভালো?"

'তুমি ভালো'র সাথে 'আছো' শব্দটুকুও যুক্ত করতে ইচ্ছে করে না, বিরক্তি আর আলস্যের কারণে। অর্ণব হাত দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে কপালের চুলগুলো পেছনে ঠেলে দেয়। একটু ভ্রু কুঁচকায়, তারপর হালকা স্বরে বলে, "রাস্তায় যা জ্যাম। এখান থেকে উত্তরা যাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো ওয়ে কী হবে? হাতিরঝিল দিয়ে বনানীর অফিস হয়ে যাবো নাকি সরাসরি উত্তরা চলে যাবো?"

লুবনা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। অর্ণব এই প্রশ্ন তাকে কেন করছে? হালকা কাঁধ নেড়ে সে বলে, "আসলে... আমার মনে হয়...।" কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দেয় না অর্ণব।

পেলব অথচ কৃত্রিম হাসি দিয়ে বলে, "ওহ হো, তুমি তো সাজেশন দিতে পারবে না। তোমার তো আবার পথঘাট মনে থাকে না। এরচেয়ে গুগল কিংবা আমার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে ভালো। কী বলো?"

ঈষৎ লাল হয়ে আসে লুবনার মুখ। আবার? একই আচরণ। সময় বদলে যায়, সম্পর্কও, কিন্তু মানুষ সম্ভবত নিজের কুটিল দিকগুলো হাতিয়ার মনে করে যত্ন করে লুকিয়ে রাখে। আর দিন দিন

ধারালো করতে চায়। এই অবজ্ঞা, অন্য কারো সাথে নিচু করে তুলনা করা এসব অনেক পুরোনো ট্রিক অর্ণবের। যা কোনোদিন ঠিক হবে না। তবুও কেন সব জেনেশুনে সে ক্রোধকে দমিয়ে রাখতে পারে না? নির্লিপ্ত হওয়া কি এতই কঠিন? ভেতরের আগুনটুকু প্রশমিত করতে করতে একটা প্রসারিত হাসি দেয় সে অর্ণবের দিকে। তারপর বলে, “দেরি হয়ে যাচ্ছে। যাই। ইউ টেক কেয়ার।” শুনে একটা অদ্ভুত হাসি দেয় অর্ণব আর তাকে পেছনে ফেলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে প্রায় ছুটতে থাকে লুবনা। ঢাকার ভিড়, আত্মীয়বর্গের কলহ-কোলাহল আর মিথ্যা সংসার ছেড়ে দূরের নির্জনতায় মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ নিতে সে বহু আগেই যাত্রা শুরু করেছে। সেদিকে আর ফিরে তাকানো যাবে না। ডাঙায় তোলা মাছ আবার জলে পড়েছে, এখন আর তাকে খুঁজে পাওয়ার সাধ্য নেই কারও।

“ইউর নেক্সট বাস উইল বি এরাইভিং এ্যাট এইট পিএম” যান্ত্রিক কণ্ঠে কানে গুঁজে রাখা ইয়ারফোনে জানিয়ে দেয় সিরি। লুবনা বুঝতে পারে সিরির রিমাইন্ডার আবার একটিভ হয়েছে। আর মাত্র কিছু সময়। স্টেট বিল্ডিংয়ের পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া প্রসারিত পথের অন্যপাশে দেওয়ালে কিছু মিউল আর গ্রাফিতি আঁকা। এর পাশেই গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লাল-সাদা ইটের ওল্ড শিকাগো রেস্তোরাঁ। বাইরে ফেলে রাখা প্যাটিও ও বেঞ্চিগুলোতে অল্প-স্বল্প মানুষ বসে আছে। কারও হাতে কোল্ড ড্রিংকস, কারও হাতে বিয়ার। কেমন যেন ছবির মতো লাগে দেখতে সব। মনে মনে ওল্ড শিকাগোর বাইরের দৃশ্যপটকে একটা লাইক দিয়ে বসে লুবনা। তারপর লম্বা নিশ্বাস টেনে ফুসফুসের ভেতর বাতাস নেয়। তার পেছনে গল্প করতে করতে হেঁটে যায় কিছু পথচারী, তাদের বলা কথার টুকরো টুকরো শব্দ ভেসে আসে কানে, ডিনার, মাই প্লেস, পাই এইসব। এই ক্ষুদ্রযাত্রার মহাসমারোহ শেষ করে আজ শুক্রবার রাতে এই ভিনদেশে সবাই হয়ে উঠবে পার্টিপ্রেমী। হ্যাপি হাওয়ারে ভরে যাবে সময়। হাওয়ায় ভাসবে মিউজিক, ড্যান্স, বিয়ার- রেড ওয়াইন, পিৎজা আর তুমুল মিলনের শব্দ। আজ এই রাতে এত গল্প ছড়াবে শহর; যে বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনদাতারা পর্যন্ত লজ্জা পেয়ে যাবে। এমন রাতগুলোতে মার্কিন মুলুকের প্রতিটি শহরই যেন লাস ভেগাস কিংবা ইস্তানবুলের মতো গ্ল্যামারাস হয়ে উঠে। আর শনিবার সকাল থেকেই ঘটে অনেকের মোহভঙ্গ। ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচার মতো করেই সবাই আবার নিজ রুটিনে একটু একটু করে ফিরে আসে। ভাবে যতটা পারা যায় আরাম করে নেওয়া যাক, কারণ এরপরেই আসবে সানডে আর ব্লু মানডে। আবার সাইকেল শুরু হবে আগের জীবনের। অধৈর্য হয়ে আকাশের দিকে তাকায় লুবনা। কখন আসবে বাস? আর কতক্ষণ? বাসে চড়ে ডাউনটাউন পেরিয়ে প্রায় মিনিট বিশেকের যাত্রা তারপর ফিফথ এ্যাভিনিউয়ের টুয়েন্টি টু নাম্বার রাস্তায় তাকে নামতে হবে। হাঁটতে হবে মিনিট পাঁচেক। এরপর পৌঁছে যাবে হোম, সুইট হোম।

কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়।

লুবনা চমকে তাকিয়ে দেখে আফ্রিকান আমেরিকান হিপ্পিদের মতো একটা লোক এসেছে তার পাশে। দাঁড়িয়েছে বাসের জন্য। অন্যদিকে কাঁধে ভারী ব্যাগ নিয়ে স্ট্রলারে বাচ্চাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক হিস্পানিক মহিলা। বাচ্চাটার হাতে একটা খেলনা, সে বার বার সেটা ছুঁড়ে ফেলছে আর মহিলাটি কুড়িয়ে এনে আবার স্ট্রলারে রাখছে। কারো জন্য যা খেলা, অন্যজনের জন্য তাই হয়তো যন্ত্রণা।

হঠাৎ ধীর গতিতে একটা কালো টয়োটা এসে থামে তার সামনে। তারপর টার্ন নিয়ে পার্কিংয়ের দিকে আগাতে থাকে। লুবনা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে নেমে এসেছে জানালার কাঁচ। ড্রাইভিং

সিট থেকে কেউ হাত নাড়ছে তার দিকে। ভ্রু কুঁচকে আরেকটু মন দিয়ে দেখে। কে ওটা? তখনই চিনতে পারে, তার প্রতিবেশী ড. কুমার। ভারতীয় এই চিকিৎসক গত কিছুমাস হলো বদলি হয়ে এসেছে শহরে। অল্পস্বল্প কথা হয়েছে। ভদ্র মানুষ। মিশুক কিন্তু উচ্ছ্বল নন। একইসাথে ফ্রেন্ডলি আবার বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ড. কুমারের কাছ থেকে রাইড নেবে কি নেবে না ভাবে এক পলক। তারপর রাস্তার আরেকপাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়, চেপে ধরে ওয়াক বাটন। একটু পর সিগন্যাল পেলেই এগিয়ে যায় কালো টয়োটার মুখোমুখি।

"হ্যালো, মিস লুবনা, আমি বাড়ির দিকে যাচ্ছি। তুমিও বাড়ি গেলে উঠে পড়ো কিংবা অন্য কোথাও যাওয়ার থাকলে বলো। আমি নামিয়ে দিচ্ছি।"

"শিওর। বাড়ি ফিরব।" বলে ব্যাগপ্যাকটা পেছনের প্যাসেঞ্জার সিটে রেখে সামনে এসে বসে সে। সিট বেল্ট বেঁধে নেয় দ্রুত। গাড়ির ভেতর লিটল-ট্রি এর চাপা ঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে। ড্রাইভের তালে তালে দুলছে রিয়ারভিউ মিররে ঝুলে থাকা লিটল-ট্রি। কিছুদিন আগেই সে কোথায় যেন পড়েছিল আমেরিকার সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হওয়া কার ফ্রেশনার এটা। সেই ১৯৫২ সালে নিউয়র্কের ওয়াটারটাউন শহরে থাকা এক কেমিস্ট এটা আবিষ্কার করে বড়োলোক হয়ে গিয়েছিল; এখনও এটার চল রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এটার আগের নাম ছিল ম্যাজিক ট্রি। ওয়ালমার্টে যেয়ে দেখেছে আজও শত ফ্রেশনারের ভিড়ে লিটল ট্রি সবার আগে সোল্ড আউট হয়ে যায়।

"মিস লুবনা, তুমি কি খুব ক্লান্ত আজকে? হেকটিক দিন ছিল?" ড. কুমারের ভদ্রতাসুলভ কণ্ঠ শুনে এলোমেলো ভাবনা মুছে ফেলে লুবনা।

"কিছুটা।" ছোটো করে উত্তর দেয়। এদিকে প্রায় মুছে যেতে থাকা আলোতে একে একে পেছনে যেতে থাকে রককোল্ড ক্যাসল, ডগলাস স্ট্রিট, পাবলিক লাইব্রেরি, হাফ ডজন চার্চ আর অনেক অনেক গাছপালা।

"ওয়েল, আজ আমার মন খুব ভালো। কারণ, আমি আগামীকাল আমার মেয়ের সাথে দেখা করতে যাব।" হঠাৎ স্বগোতোক্তির মতো বলে বসে ড. কুমার।

লুবনা মনে মনে কিছুটা সতর্ক হয়। প্রশ্ন না করতেই এত কথা বলছে কেন ডক্টর? ড্রিংক করে হাই নাকি? ফ্রাইডে নাইট শুরু হবার আগেই? এই অবস্থায় তো ড্রাইভ করার অনুমতি নেই এই দেশে। ধরা পড়লে যা শাস্তি হবে না। সন্তর্পণে সে বলে, "দ্যাটস রিয়েলি নাইস, ড. কুমার।"

"আমাকে রাজেশ বলেই ডাকতে পারো তুমি। মানুষ নিজের পরিচয়ের সাথে আত্মবিশ্বাস আর অহংকার যুক্ত করতে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর এসব যুক্ত করে। এরপর যখন তারা আরও সফল হয়ে যায়, তখন আরও বেশি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কেউ তখন তাদেরকে আর ডাকনাম ধরে ডাকে না। তাদের ডাকতে হয় পুরো নামে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যেন প্রতিবার কোনো অফিশিয়াল ফর্ম ফিলআপ করা হচ্ছে। ফার্স্ট নেম অমুক আর লাস্ট নেম তমুক। তাই না?"

লুবনা মাথা নাড়ে। এভাবে সে আসলে আগে কোনোদিন ভেবে দেখেনি। এই ভারতীয় চিকিৎসককে এখন আর হাই বা মাতাল মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বরং সে কিছুটা ভাবুক ধরনের মানুষ। ভদ্রলোক সম্ভবত একাই থাকে তার মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাটে। স্ত্রী কী বেঁচে নেই নাকি অন্য কোথাও থাকে? মেয়ের সাথে দেখা হবে বলেই কি সে আজ এমন ভাবুক? ইজ হি অ্যা ফ্যামিলি পার্সন? তাহলে এখানে কেন একা? ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর বিরক্ত হয় লুবনা। এত চিন্তা করছে কেন? কাউকে নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে তার আজকাল আর ভালো লাগে না। মাথা ধরে যায়

খুব। একা তো সেও থাকে। পাশের রুমের টার্কিশ মেয়েটা যেন ফ্ল্যাটে থেকেও নেই। তার যা বয়স একই প্রশ্ন তাকে নিয়ে ড. কুমারেরও থাকতে পারে। কোথায় তার স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড? সে কেন একা? এইসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুধু মনেই আসে। এখানে কেউ খুব বেশি মাথা ঘামায় না। এটাই বিদেশের শান্তি।

"মিস লুবনা, কিউটিতে থেমে গাড়ির গ্যাস নেব আর কফি। তুমি কি কফি খাবে?"

"কফি ছাড়া আমার কোনো পানীয় নিয়ে কোনোই নেশা নেই।" ভদ্রতাসুলভ হাসি দিয়ে বলে লুবনা। ভাবে, কফি পেলে মন্দ হয় না। মাথা ধরে গেছে। বাসায় কফি মিক্স শেষ। গত বেশ কয়েকদিন ধরে কিনবে ভেবে কেনা হয়নি।

"কুল।" ছোট্ট করে এই উত্তর দিয়েই গাড়ি এইটথ এভিনিউ থেকে লেফট টার্ন নিয়ে কিউটির দিকে আগাতে থাকে ড. কুমার। মিনিটের মাঝেই পৌঁছে যায়। পাম্পের সামনে গাড়ি রেখে স্টার্ট বন্ধ করে দেয় তারপর সপ্রভিত একটা হাসি দিয়ে বলে, "ওকে, আমি দুটা কফি নিয়ে আসছি। তুমি কোনো ফ্লেভার পছন্দ করো?"

"ড. কুমার, মানে মি. রাজেশ আমি সাথে আসছি। আমার কফি আমিই বানাবো।"

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলে সে। তারপর হালকা পায়ে এগিয়ে যায় লাল রঙের বিশাল আলোকিত দোকানের দিকে। মনে মনে পরিকল্পনা করে, যেহেতু সে রাইড নিয়েছে বিনিময়ে ধন্যবাদ হিসেবে চিকিৎসকের কফির বিল দিয়ে দেবে। কারো সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা তার জন্য যন্ত্রণার। তা যত ছোটো সাহায্যই হোক না কেন। সুযোগ পেলে কিছু না কিছু ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ। এমনিতেও সবাই বলে আমেরিকায় কিছুই ফ্রি না। এমনকি ফ্রি শব্দটাও ফ্রি না। সবকিছুর কোনো না কোনো পে-ব্যাক আছেই।

কফি কর্নারে গিয়ে সে ফ্রেঞ্চ ভ্যানিলা বানিয়ে নিল নিজের জন্য। ইচ্ছে করে বেশি চিনি দিলো ক্রিমারের সাথে। মিষ্টি তার খুব প্রিয়। যেকোনো ধরনের মিষ্টি ভালো লাগে। এমনকি খালি খালি চিনি খেতেও যেন ভীষণ ফুরফুরে আনন্দ। এই সুইট টুথ, ক্রেভিং সেই শিশুকাল থেকে। অর্ণব আগে বলত, "এত মিষ্টি খেতে পারো, অথচ মুখের কথা এত কর্কশ কেন?"

না, এসব ভাবা যাবে না। লুবনা আপনমনে মাথা ঝাঁকায়; যেন ঝেড়ে ফেলতে চায় এসব কথা। যত পারে ভুলে যাবার চেষ্টা করে।

সাদা টপস আর চেক চেক মিনি স্কার্ট পরা, টকটকে লাল লিপস্টিক দেওয়া একটা মেয়ে ও তার প্রেমিক জড়াজড়ি করতে করতে বের হয়ে যায় কিউটি থেকে। হাসছে ওরা খলবল করে। হাসির দমকে হাতের পপকর্ন শিউলি ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। ড. কুমারের হাতে ব্ল্যাক কফি। তাতে নামমাত্র চিনি দিয়ে আর একটা টুইংকিসের প্যাকেট হাতে নিয়ে লুবনার মুখোমুখি পড়ে যায় সে। এরপর কিছুটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলে, "তোমার কাছে ফানি লাগতে পারে, কিন্তু কফির সাথে মিষ্টি কিছু খাওয়ার স্বাদ আলাদা। আমি টুইংকিস খুব পছন্দ করি। আমি আর আমার মেয়ে আগে একসাথে অনেক খেতাম।"

লুবনা সরলভাবে হাসে। তারপর দ্রুত কাউন্টারে গিয়ে চিকিৎসককে কিছু বলতে না দিয়ে বিল দিয়ে দেয়। ড. কুমার আপত্তি তোলে, সে পাত্তা দেয় না। বরং তার মনে হয় সেও কি খাবে টুইংকিস? তারও যে মিষ্টি খুব প্রিয়, কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া আসে না। এই আচরণগুলো সে মানুষের সামনে করা বাদ দিয়েছে বহু আগেই। যা মন চায়, তা করার জন্য এই পৃথিবী না।

কফিকাপ আর মানিব্যাগ হাতে বের হয়ে দেখে, প্রায় সমস্ত আকাশ নিবিড় করে বেশ জোর বৃষ্টি নেমেছে। কিউটির স্বচ্ছ শার্সিতে বিন্দু বিন্দু জলকণা আছড়ে পড়ছে; ক্যানভাসে যেভাবে তুলি আঁচড় কাটে তেমন করে। এমন আচমকা বৃষ্টির আবির্ভাবকে ঠিক স্বাগত জানাতে পারে না মন। ভাবে বৃষ্টির মাঝে গাড়িতে উঠবে নাকি? কফি কাপ হাতে ড. কুমার কেমন যেন সিরিয়াস ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকায়। যেন আকাশটা তার সাথে কোনো জরুরি অ্যাপয়েনমেন্ট ক্যান্সেল করে বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছে। এ দেশে তুষার পড়া দেখলে লুবনার কিছু মনে হয় না। প্রথম প্রথম উত্তেজিত হতো। ভাবত, এতবার সিনেমায় দেখা দৃশ্য চোখের সামনে দেখার আনন্দই আলাদা। তবে অল্প ক'দিনেই একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন তুষারের অপর নাম একঘেয়েমি। তবে বৃষ্টিও আর আগের মতো প্রিয় নেই। বরং মেঘদূতের জলভরা মেঘ আর বৃষ্টির ছাঁট শূন্যতার কথা মনে করায়, স্মৃতিকাতর করে। পিছু ডাকে।

"বৃষ্টি কি তোমাকে বিরক্ত করল মি. রাজেশ? আমরা কি গাড়িতে উঠব নাকি আরেকটু অপেক্ষা করব?"

"একটু অপেক্ষা করতে পারি। আমার কোল্ড এলার্জি আছে। আর সাইনোসাইটিস। আমি সচরাচর বৃষ্টি আর তুষার এড়িয়ে চলি।"

"আচ্ছা। বেশ। তোমার মেয়ের সাথে কতদিন পর দেখা হবে এবার?" লুবনা চুপচাপ না থেকে অস্বস্তিকর পরিবেশ দূর করতে কিছুটা আইস ব্রেকিংয়ের চেষ্টা করে।

"প্রায় ছয় মাস। আগামীকাল ওর মায়ের মানে আমার প্রাক্তন স্ত্রীর বিয়ে। সেখানেই দেখা হবে ওর সাথে।" ম্লান হেসে বলে চিকিৎসক। আর তারপরেই হঠাৎ কেমন যেন একটা চাপা নিস্তব্ধতা নেমে আসে চারপাশে।

ম্লান হাসিটুকুর রেশ চোখ থেকে মুছতে পারে না লুবনা। মনে হয় নিজের আরেক অবয়বের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্ণবের বিয়ের খবর যখন পেয়েছিল, ওর কি এমনই লেগেছিল? একদিকে নির্ভার হবার আনন্দ আর অন্যদিকে বুকের মাঝে শতবছরের দীর্ঘশ্বাসের মতো গুমোট ভাব। কী বলবে খুঁজে পায় না। পরিবেশ সহজ করতে কফিকাপে চুমুক দেয় বার দুয়েক। হঠাৎ অথযাই মনে পড়ে, এখন আর সে ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় না। দিলে এতক্ষণে হয়তো সিপ দেওয়ার জায়গাটুকু হালকা লাল বা গোলাপি আবরণে ছেয়ে থাকত। আরও কিছুক্ষণ পর নৈঃশব্দ্য ঝেড়ে ফেলে গলা খাঁকড়ে বলে, "যদিও আমি পুরো ঘটনা জানি না। তবে তোমার হয়তো খুশি হওয়া উচিৎ যে তোমার স্ত্রী নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে। কাল তার জন্য আনন্দের দিন।"

একটা বন্ধুসুলভ প্রশ্রয়ের হাসি দেয় যেন চিকিৎসক। তারপর বলে, "আমি আনন্দিত। অবশ্যই আনন্দিত। কারণ যে আমার স্ত্রী ছিল সে কাল নতুন জীবন শুরু করছে না। সে বর্তমানে আর নেই। আগেই মিলিয়ে গেছে। কাল যার জীবন শুরু সে আরেকজন। অন্য সত্ত্বা। আমি সেই সত্ত্বার জন্য শুভেচ্ছা জানাতে কার্পণ্য করব না। তবে আমি হয়তো অতীতে থাকা মানুষ। সেখানেই থাকব। দেখো, অতীত শুনলে আমাদের সবার আগে মনে হয় অতীত মানেই বুঝি স্মৃতি। কিন্তু মানুষের অতীত শুধু স্মৃতি দিয়ে নয় বরং সেখানে ইতিহাস বা তথ্যও থাকতে পারে। আর এমন না যে বেশিরভাগ স্মৃতি আবেগকে ধারণ করে। যেমন, আমি অতীতে কোনো এক সময়ে মেডিকেলের লাইব্রেরিতে বই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এটা শুধুই স্মৃতি। এখানে কোনো প্রবল বা মৃদু ইমোশন নেই, কিন্তু আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতিগুলো ভাবলে আমাদের মধ্যে যদি কোনো অনুভূতির প্রাবল্য কাজ

করে সেটা স্মৃতিকাতরতা। তবে স্মৃতি অতীতের হলেও এই কাতরতা হতে পারে শুধুই বর্তমানে। এটা অতীতের সাথে জড়িত কিন্তু কখনো অতীত নয়।”

“তোমার নিজের কোনো অতীতকে বা ভুলকে মনে করলে ভয় লাগে না, আফসোস হয় না?”

“না। হয় না। কারণ অতীত মানুষকে পরিণত করে। অনেক কিছু শেখায়। যার ভুলে ভরা কিংবা বৈচিত্রময় অতীত নেই সে মানুষ হিসেবে এখনও পরিণত হতে পারেনি।”

লুবনা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বহুদিন তার সাথে জীবন বা বোধ নিয়ে এমন করে কেউ কথা বলেনি। এই ভদ্রলোক চিকিৎসক নাকি কবি? নাকি দার্শনিক? এই চেনা শহরে, স্কাইলাইন আর রবার্টসন ভ্যালির সবুজ সমারোহে ডুবে থাকা লাল দোকানের বাইরে তারা দু'জন মানুষ যে বোধ নিয়ে কথা বলছে, কেন বলছে? কী অর্থ এর? একদিন এই পৃথিবীতে কেউ থাকবে না কিংবা এই রাইড নেওয়া শেষ হবার পর তারা দু'জন হাই-হ্যালো বাদে আর কোনোদিন কথা বলবে নাকি তার নিশ্চয়তা নেই। তবুও কেন মানুষ ক্ষণিকের ভাবে, যোগাযোগে তৎপর হয়ে যায়? এটা কি মানুষের বোকামি নাকি সাহসিকতা?

কেন যেন কিছুটা কৌতূহলী হয়ে ওঠে চিকিৎসককে নিয়ে। ইচ্ছে করেই এবার নিজেকে একটু প্রকাশ করে। বলে, “আমার মনে হয় আমি নিজে সব সময় একটু পিছিয়ে পড়া মানুষ। আমাকে বর্তমান শুধু ধাওয়া করছে, কিন্তু পাশে থাকছে না। ভবিষ্যৎ বলে হয়তো আমার কিছু আছে কিন্তু বর্তমান নেই। পৃথিবীতে সবার ঘড়িতে যখন সকাল নয়টা বাজে। আমার ঘড়িতে বাজে তখন আটটা পঞ্চান্ন। আমি যখন বাসস্টপেজে পৌঁছাই দেখি, মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য মিস করেছি কাঙ্ক্ষিত বাস। আমার কেবলই দেরি হয়ে যায়।”

“ইন্টেরেস্টিং! তুমি কি বুলগেরিয়ান একটা স্টোরি শুনেছ? অনেক অনেক বছর আগে একটা ছোট্ট গ্রামে ভায়সা নামের এক মেয়ে জন্ম নিয়েছিল। সে সাধারণ কোনো মেয়ে ছিল না। তার বৈশিষ্ট্য ছিল, সে এক চোখে দেখতে পেত আর অতীত এবং অন্যচোখে দেখত ভবিষ্যৎ। বর্তমান বলতে তার কিছু ছিল না।

“না, শুনিনি। তারপর?”

“একটু বড়ো হবার পর ভায়সা যখন বাড়ি থেকে বাইরে বের হতো সে দেখত একপাশে কোকুন পড়ে আছে আর অন্যপাশে পানির ওপর উড়ছে প্রজাপতি যাকে একটু পরেই একটা সবুজ ব্যাঙ খেয়ে ফেলছে। নিজের বাবা-মাকে বাঁ-চোখে সে দেখত বালক-বালিকার বেশে আর ডানপাশে তাকালে খুঁজে পেতো না। কারণ ততদিনে তারা মারা গিয়েছে। ও যখন ঘুমাতো তখন শুধুই দুঃস্বপ্ন দেখত। কারো সাথে মিশতে বা যোগাযোগ করতে পারত না, কারণ ও বুঝতেই পারত না কোনটা আসল? অনেকেই মনে করছিল কেউ ওকে কালোজাদু করেছে। তাই তারা দিনের পর দিন চিকিৎসার নামে জরিবুটিসহ নানা কিছু ওর দু'চোখে দিতে থাকল। কিন্তু তাতে কোনোই লাভ হলো না। সবাই তখন বলল ভায়সা অভিশপ্ত। এখন মেয়েটি কী করবে বলো তো? এক চোখ বন্ধ করে অতীতে থাকবে? যার কোনো অস্তিত্বই বর্তমানে নেই। নাকি অন্যচোখ বন্ধ করে ভবিষ্যৎ দেখবে যা এখনও ঘটেনি, এবং যেখানে ভালো বলতে হয়তো কিছু নেই।”

“আসলেই তো! বুঝতে পারছি না কী সমাধান দেব ভায়সাকে। গল্পে কী হয়েছিল তারপর? শেষ পর্যন্ত ভায়সা কী ঠিক করল?”

"গল্পটা এখানেই শেষ। আর কিছু আমার জানা নেই।" সোজাসাপটা উত্তর দিয়ে কাপের শেষ কফিটুকু একটানে শেষ করে বলল ড. কুমার। তারপর প্রায় নিপুণভাবে পাশের ট্র্যাশবাক্সে কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"আসলেই এর শেষ নেই? বইতে কিছুই ছিল না?" কিছুটা আশাহত স্বরে প্রশ্ন করে লুবনা।

"না নেই। এটা একটা হোপলেস স্টোরি। কারণ এই পৃথিবীতে অতীত আর ভবিষ্যতকে রিইউনাইটেড করে আমরা কোনোদিন বর্তমানকে ক্রিয়েট করতে পারব না। এটা একটা হোক্স, মানুষের জীবনের প্র্যাকটিক্যাল জোকস। মিস লুবনা চলো, গাড়িতে উঠে পড়া যাক। আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।"

নিঃশব্দে চিকিৎসকের পিছু নেয় লুবনা। আর তার দৈনন্দিন ও পৃথিবীর সব বড়ো বড়ো বিষয় বাদ দিয়ে ভায়সা নামের এক অদ্ভুত বালিকার কথা ভাবতে থাকে। গাড়িতে আবার সেই লিটল ট্রিয়ের চাপা ঘ্রাণ। ড. কুমার গ্যাস নিয়ে গাড়িতে এসে সিটবেল্ট বেঁধে নেয়। বাতি জ্বালিয়ে, ইঞ্জিন স্টার্ট করে। পার্কিং থেকে ড্রাইভ মোড়ে গিয়ে গাড়িটাকে অল্প অল্প করে ঘোরাতে থাকে। আর এই প্রথম... এই প্রথম, গ্যাস স্টেশনের মাঝারি আলোতে লুবনা বেশ মনোযোগ দিয়ে তার এই স্বল্পযাত্রার সঙ্গীর দিকে তাকায়। ভদ্রলোক সাদা রঙের শার্ট পরেছে, সাধারণ উচ্চতার মানুষ, গায়ের রঙ তামাটে, কিছুটা ভারী গড়ন, মাথার মাঝামাঝি টাক পড়েছে সম্ভবত, চোখেমুখে ক্লান্তি আর সৌম্যভাব। তবে বেশ বোঝা যায় সে চিকিৎসাবিদ্যা বাদেও বেশ অনেক কিছু জানে। তবে আলগাভাবে তা জাহির করতে যায় না। লুবনা এক পলকের জন্য কিছু একটা ভাবে তারপর গাড়ির রেডিওটা 'এক্সকিউজ মি' বলে অন করে দেয়।

সপ্তাহের সবচেয়ে রঙিন রাতের রহস্যময় আঁধারে একটা কালো টয়োটা স্ট্রিট লাইটের আলো ছুঁয়ে সাউথ সাইড, রক রোড, অলিভার নামের একের পর এক পথ পেরিয়ে ফিফথ এ্যাভিনিউয়ের টুয়েন্টি টু নাম্বার রাস্তার দিকে ছুটে যায়। এসির বাতাসে সন্ধ্যার সেই শীত শীত ভাবটুকু লুবনার মাঝে আবার ফিরে আসে। সে গায়ের হুডিটাকে ভালো করে টেনে নেয়। এই বাতাসে তার কপালের পাতলা চুলগুলোও যেন কিছুটা বিব্রত হয়ে নড়াচাড়া করে ওঠে। সে মনে মনে ভাবে বাড়ি ফিরেই মোবাইল আর হাত ঘড়িটাকে পাঁচ মিনিট এগিয়ে নেবে। যেন আর দেরি না হয়। এমন সময় রেডিওতে বেজে ওঠে অচেনা একটা কান্ট্রি সং। অথচ লুবনার মনে হয় খুব ভরাট স্বরে কেউ হয়তো কবিতা আবৃত্তি করছে। বলছে-

তারপরও কথা থাকে;
বৃষ্টি হয়ে গেলে পর ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটিমাখা গন্ধের মতন-
আবছায়া মেঘ মেঘ কথা;
কে জানে তা কথা কিংবা কেঁপে ওঠা রঙিন স্তব্ধতা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

মিলি ফারুক উপাখ্যান

ইশতিয়াক আহমেদ

অংক স্যারের মেয়ে মিলি ছিল।

খুবই সুন্দরী। তার সৌন্দর্যকে বোনের চোখে দেখতে শুরু করলাম যখন জানলাম, ফারুক ভাই তাকে পছন্দ করে।

ফারুক ভাইয়ের কাছে আমার এক আকাশ ঋণ। ফারুক ভাইয়ের কারণে প্রতিদিন আমার তিন টাকা করে বাঁচতো। সপ্তাহে আঠারো টাকা বাঁচতো। ফারুক ভাইয়ের কারণে আমার মাসে ৭৫-৭৮ টাকা করে বাঁচতো। ক্লাস সেভেন থেকে নাইন অবধি এই টাকা বাঁচানোর প্রকল্প আমাকে ঋণী করে ফেলে দারুণভাবে।

আমরা একই এলাকায় থাকার কারণে শেয়ারে রিকশা করে যেতাম। ছয় টাকার ভাড়া অর্ধেক করে। ব্যাচেও যেতাম একই স্যারের কাছে।

ফারুক ভাই আটটার ব্যাচ, সাতটায় চলে আসে স্যারের বাসায়। আমার ব্যাচ নয়টায়, আমাকেও নিয়ে আসে তার সাথে। সপ্তাহে তিনদিন আমি দুই ঘণ্টা করে ফারুক ভাইয়ের জন্য উৎসর্গ করতাম। ফারুক ভাই বলতো, “প্রেম করলে বুঝবা কেমন লাগে। দেখে শিখো।”

আমিও ঠিক করলাম, ঠিক। প্রেম করার আগে শিখতে কিছুটা সময় ব্যয় করা উচিত। তাই সপ্তাহে তিনদিন এক ঘণ্টা করে গণিত আর তার আগে দুই ঘণ্টা করে প্রেম শিখি।

ফারুক ভাই প্রেমে দারুণভাবে অসফল। তেমন কারিশমা দেখাতে পারেন না। স্যার না থাকলে মিলিকে বলেন, “মিলি একটু পানি আনবা?”

মিলি কঠিন স্বরে বলে দেয়, “পারবো না।”

ফারুক ভাই বলে, “আচ্ছা। ঠিক আছে। লাগবে না।”

আমি ফারুক ভাইয়ের দিকে তাকাই, তিনি আমার কানে কানে এসে বলেন, “একটু কণ্ঠ শুনলাম। আহা!”

আমি বলি, “মিলি তো জোরে জোরে পড়তেছে। সেটা শুনলেই তো হয়।”

ফারুক ভাই আবারও আমার কানে ফিসফিস করে বলেন, “আমার সাথে তো আর না সেসব কথা।”

আমি মাথা নাড়ি। যুক্তি আছে। ভালো একটা জিনিস শিখলাম। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

স্যার আমাদের সন্দেহ করেন।

আমরা বলি, অংক এত কঠিন এজন্য আগে এসে বসে থাকি।

স্যার মুগ্ধ হয়। আমি বিরক্ত। আর ফারুক ভাই মিলির দিকে তাকিয়ে থাকেন তৃষ্ণার্ত হয়ে।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা সমাগত। ফারুক ভাইয়ের মেট্রিক পরীক্ষা। আমার অংকের কিছু হলো না, তার হলো না মিলির।

ফারুক ভাই তখনও পানিতেই আছে; "মিলি একটু পানি খাওয়াবা?"

মিলি আগের মতোই, "না।"

ফারুক ভাই বিমর্ষ বদনে, "আচ্ছা থাক।"

আমার আর সহ্য হলো না।

এক ধর্মপ্রাণ বন্ধুর কাছে গেলাম। বললাম, পড়া পানির ব্যবস্থা কর। মিলির কাছে পানি চাইতে চাইতে ফারুক ভাই শেষ।

সে বলল, "এখানে পড়া পানি দিয়ে হবে না। একটা গোপন বিষয় আছে নেওয়ামূল কোরআনে। সেটা পড়ে কোনো মিষ্টি জিনিসের ওপর ফু দিয়ে কন্যাকে খাওয়ালে সুফল আসতে পারে।"

আমি বললাম, "তাই কর। ফারুক ভাইয়ের টেস্ট পরীক্ষা শেষ। আর যাইতে পারবে না ব্যাচে। পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করলেও প্রেমে তার একটা স্টারমার্ক দরকার।"

বন্ধু বড়ো কবিরাজের মতো চেহারা করে বলল, "কাল ব্যাচে যাওয়ার আগে আয়।"

ফারুক ভাইকে কিছু না বলে, সকালে গিয়ে আমি সেই প্রেমের বটিকা নিয়ে এলাম। চকলেটের ওপর সেই ফু দেওয়া আছে।

জানতে চাইলাম, "একটাই?"

বন্ধু বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, "বেশি দেওয়ার নিয়ম নাই।"

জানতে চাইলাম, "কাজ হবে?"

বন্ধু আরও বিরক্ত হলো, "কাজ হবে না মানে, কোলে এসে বসে থাকবে।"

বলে নিজেই খুব লজ্জা পেয়ে সামনে থেকে চলে গেল।

ব্যাচে যেতে যেতে ফারুক ভাইকে বললাম সব।

ফারুক ভাইয়ের চোখে পানি।

"কাজ হইবো তো?"

আমি বললাম, "আমারে বিশ্বাস না করেন, আমার বন্ধু খুব পরহেজগার জীবনে হাতে গুনে তিন-চারটা মিথ্যা কথা বলছে সম্ভবত।"

ফারুক ভাই বলল, "চলো হোটেলে।"

তারপর তিন পরোটা আর ডাল ভাজির স্তুপ এনে দিলো সামনে, "খাও। আর কাল থেকে তোমার রিকশা ভাড়া লাগবে না।"

এবার আমার চোখে জল চলে আসার অবস্থা।

আহারে প্রেম!

আমরা ব্যাচে গিয়ে কাঁপছি।

আমি মিলিকে দেখে হাসছি, আহারে বোকা মেয়ে তুমি তো জানো না তোমার জীবনসঙ্গী আজ কনফার্ম করে দিচ্ছি। সামান্য পানি দিতে চাও না, এখন তো কোলে এসে বসে থাকবা।

ফারুক ভাই কী ভাবছে কে জানে? সে হয়তো মিলিকে কখন চকোলেট দেবে তার সুযোগ খুঁজছে।

মিলিকে একা পেয়ে পকেট থেকে চকলেট বের করে দিলেন।

ভেবেছিলাম মিলি নেবে না। পানি না দিলেও চকোলেট নিল ঠিকই।

আমরা খুশিতে অস্থির। কিছুটা লজ্জায়ও আছি। মিলি কী এখনই এসে কোলে বসে পড়বে নাকি?

মিলি চকোলেট নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। আর আসার খোঁজ নেই, বিশ মিনিট পর এলো।

এসেই ফারুক ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। পাশে বসলো।

আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম, যাক, জীবনে একটা প্রেমের মিলন ঘটাতে পারলাম।

মিলি ফারুক ভাইয়ের পাশে বসে খুব কোমল গলায় বলল, "ফারুক ভাইয়া।"

ফারুক ভাই লজ্জায় মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "কী হয়েছে মিলি?"

মিলি নরম গলায় বলল, "চকলেট কী আরও আছে? ওটা না ইয়ামিন খেয়ে ফেলেছে।"

উল্লেখ্য, ইয়ামিন মিলির ছোটো ভাই। খুব দুষ্ট প্রকৃতির পিচ্চি। সকালে প্যান্ট না পরে এসে সবাইকে ভয় দেখাতো, হিসু করে দেবো কিন্তু।

আরও উল্লেখ্য, ইয়ামিন এর পর থেকে আর দুষ্টুমি করেনি। প্যান্ট পরে আসতো। আর স্যার পড়ানোর পুরোটা সময় ফারুক ভাইয়ের কোলে বসে থাকতো।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

বিবাহ করিলে প্রমাণ হইবে সে অবিবাহিত

কাসাফাদ্দৌজা নোমান

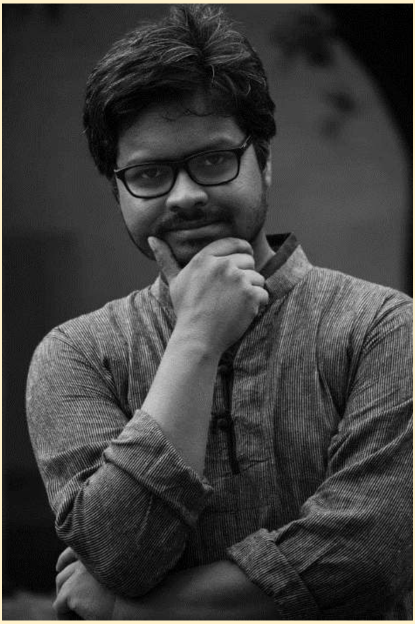

মুরাদ সম্পর্কে আমার ছোটোভাই।

ঢাকায় পড়ে থাকে সবসময়। বাড়িতে গেলে সবার সামনে এমন ভাব করে, যেন তার ঢাকায় অনেক কাজ। সে না থাকলে ঢাকা অচল। কিন্তু এবারের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইদে বাড়ি যাওয়ার পর সে আর ঢাকার পথ মাড়ায়নি। এ নিয়ে জনমনে নানারকম প্রশ্নের উদয় ঘটেছে। তার বন্ধুরা খুব চিন্তিত। একজন আমাকে ফেসবুকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া, মুরাদের কী হয়েছে? সে বাড়িতে এত দিন কেন?"

আমি জবাবে লিখলাম, "নতুন বিয়ে করলে তো একটু বেশিদিন বাড়িতে থাকবেই।"

"মুরাদ ভাই বিয়ে করছে কবে?"

"এই তো ইদের তিনদিন পর।"

মুরাদের বন্ধু অভিমান করে বসল। ফেসবুকেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "একবার জানালোও না!" এই পর্যায়ে তার অভিমান ভাঙার কঠিন দায়িত্ব নিয়ে বললাম, "খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে হয়েছে। তাই কাউকে বলতে পারেনি। একদম ঘরোয়াভাবে আয়োজন।"

"তারপরও ভাই, একবার জানাতে তো পারত! যা হোক, ভাবি কে?"

"যার সঙ্গে প্রেম করত, সে না। ওর আম্মার পছন্দ করা ছিল। ফুপাতো না খালাতো বোন—কেউ একজন হবে।"

"আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে।"

বুঝলাম, ছেলেটা একবুক অভিমান করেছে। তার অভিমান তো আর মুরাদ বুঝবে না। একসময় অভিমানী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকল। শেষে আমি নিজেই মুরাদকে ফেসবুকে নক করলাম। অভিমানী মানুষদের জন্য কিছু করা দরকার।

"কী অবস্থা, কেমন আছো?"

"জি ভাই, ভালো।"

"বউ কেমন আছে?"

“বউ?”

“বিশ তারিখে যে বিয়ে করছো, এইটা শুনছি। সমস্যা ছিল বলে দাওয়াত দাও নাই। অস্বীকার করার কী আছে!”

“কী বলেন ভাই, আজব আজব কথা! বিয়ের বয়স হইছে নাকি?”

“সঠিক সময়ে বিয়ে করলে তোমার একটা মেয়ে এবার মেডিকেলে চান্স পাইত। এখন করছো, একদম খারাপ করো নাই। আমি তো তা-ও করতে পারলাম না!”

“আরে ভাই, আমি বিয়া করি নাই তো! বাদ দেন। আপনি কেমন আছেন, বলেন।”

“কেমন আর থাকব। একা একা। যাকগে, ঢাকায় আসবা কবে?”

“দেরি হবে মনে হয়।”

“দেরি হওয়া স্বাভাবিক। নতুন বিয়ে করছ...”

“ভাই, আমি বিয়া করি নাই!”

“অনেকেই বিয়ে করার পর বুঝতে পারে তারা একটা ভুল করেছে। সেই ভুল নিয়ে চিন্তা করতে করতে হতাশ হয়ে পড়ে। হতাশার একপর্যায়ে ভাবে, সে আসলে বিয়ে করে নাই। তখন অবচেতন মনে সেটা মাঝে মাঝে দাবীও করে বসে। যা হোক, ব্যাপার না।”

মুরাদ রিপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝলাম, আমাকে নিয়ে পুরোপুরি হতাশ। তার বিবাহজীবন সম্পর্কে কথা বলি, এটা সে চায় না। কিন্তু বড়ো ভাইকে তো আর এভাবে অবহেলা করতে পারে না। আমি নিশ্চিত, বিবেকের দহনে সে আবার নক করবে। কিছুক্ষণ পর করলও।

“ভাই, কিছু টাকা দেন না। ব্যাপক অর্থ কষ্টে আছি।”

“স্বাভাবিক। একজনের জায়গায় দু’জন হয়েছ, খরচ বেড়েছে। অর্থকষ্ট তো হবে। কিন্তু আমার কাছে তো তোমাকে দেওয়ার মতো টাকা নাই।”

সে এবার বোধহয় চেঁচিয়ে উঠল। ফেসবুকে দেখা না গেলেও মেসেজের ধরনে বোঝা গেল। বলল, “কইলামই তো ভাই, বিয়া করি নাই। হুদাই প্যাঁচান।”

“মুরাদ, বিয়ে করে ক’দিনের মধ্যেই তুমি ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার শুরু করে দিয়েছ?”

“ভাই, বাদ দেন। থাকুম না আর বাড়িতে। ঢাকায় চলে আসব।”

“কবে?”

“দু-এক দিনের মধ্যেই।-

“একা আসবা?”

মুরাদ আবার রিপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দিল। তবে পরদিন সে আবার ফেসবুকে নক করল।

“ভাই, সিরিয়াস কথা আছে। তবে আপনি প্লিজ লাগে বিয়ের কথা বলবেন না।”

“আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যে বিয়ে করেছ, সে কথা কাউকে বলব না।”

“ভাই, আবার! আমি বিয়া করি নাই বললাম তো!”

“আচ্ছা, তুমি বিয়ে করো নাই। সব বিবাহিত পুরুষই নিজেকে অবিবাহিত ভাবতে পছন্দ করে। এটা বড়ো কোনো ঘটনা না। বলো, কী বলতে চাও।”

“ভাই, কী করলে আপনি বিশ্বাস করবেন যে আমি বিয়ে করি নাই?”

“তুমি একটা কাজ করো, একটা বিয়ে করে ফেলো।”

“বিয়ে করলে কী হবে?”

“প্রমাণ হয়ে যাবে যে তুমি বিয়ে করো নাই।”

“কীভাবে?”

“রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছো? নাকি বিয়ে করে সেটাও ভুলে গেছো? রবীন্দ্রনাথ একটা গল্প লিখেছিলেন। সেখানে কাদম্বিনী নামের এক নারী ‘মরিয়া’ প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি মরেন নাই। তোমার মতোই অবস্থা। সবাই জানত, তিনি মরে গেছেন। কেউ বিশ্বাস করত না। তারপর কাদম্বিনী ‘মরিয়া’ প্রমাণ করিলেন যে তিনি মরেন নাই। তুমিও বিবাহ করিয়া প্রমাণ করো যে তুমি অবিবাহিত।”

“আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এই জীবন আর ভালো লাগে না। সবাই ফোন দিয়ে ওয়াইফের কথা জিজ্ঞেস করে, বাচ্চা কবে নিচ্ছি জিজ্ঞেস করে, বাচ্চার নাম কী রাখব, সেটাও জিজ্ঞেস করে! প্রেমিকা ব্রেকআপ করে ফেলবে ফেলবে অবস্থা। সে নাকি পরকীয়া করতে চায় না!”

মুরাদের শেষ অবস্থা খুব করুণ। যেকোনো কথার একটাই উত্তর দেয়, “আমি বিয়ে করি নাই। আমি বিয়ে করব।” তার এই খবর শুনে সমবেদনা জানানোর জন্য ফোন করলাম—

“মুরাদ, কেমন আছ?”

“ভাই, আমি বিয়ে করি নাই। বিয়ে করব। আপনার হাতে কোনো পাত্রী আছে?”

“তোমাদের বয়সী ছেলেপেলেরা এমন কেন? বিয়ের বয়স হয়েছে? নাক টিপলে পানি বের হয় আর বিয়ে করতে চাও? যাও পড়তে বসো। যত্ত সব!”

মুরাদ চুপ।

এবারের আঘাত বোধহয় সে মেনে নিতে পারেনি। বাংলা সিনেমার থিওরিতে প্রথম আঘাতে যদি স্মৃতিশক্তি যায়, দ্বিতীয় আঘাতে ফিরে আসে। পুরো জাতি অপেক্ষায় আছে, মুরাদ স্মৃতি ফিরে পাবে। আমিও আশাবাদী!

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

ম্যান উইথ মিস্টিরিয়াস বিয়ার্ড

নিয়াজ মেহেদী

স্টেটে চইলা যাচ্ছি। কাইন্ড অব এনিগমার মিউজিকের মতো। ব্যাপারটা আনবিলিভেবল লাগতে পারে। বাট ট্রাস্ট মি ইটস নট। আমার ঘুমের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির হচ্ছে। ডু আই সাউন্ড সিলি? ইটস ড্যাম টেগোর, দি ওল্ডম্যান হিম সেলফ।

মাম্মি আমাকে ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়াইতো। আমার হালকা হালকা মনে আছে। শী ওয়াজ আ গ্রেট টেগোর এনথিউজিয়াস্ট। আমাকে কোলে নিয়া মাঝে মাঝে মাম্মি রবীন্দ্রনাথের গান গুণ গুণ করে গেয়ে উঠতো। ইটস ফানি বাট ট্রু, তার থেকে শুনে শুনে আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে শিখছিলাম। মাম্মির খুব পছন্দের গান আছে একটা। মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে। আমি মাম্মির কাছ থেকে শুনে শুনে গানটা পুরা মেমোরাইজ করে ফেলছিলাম। এখন ভুলে গেছি। বাট এইজন্য চেইতা গিয়া রবীন্দ্রনাথ আর তো আমার স্বপ্নে আসবে না, তাই না? হা হা হাহা।

মাম্মির একটা বইয়ের কাভারে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখছিলাম। সেটা একেবারে বুড়া বয়সের ছবি। জাস্ট স্কিন অ্যান্ড বোনস। দেইখা মনে হইলো বদ কিসিমের বুড়া। তো একদিন ড্রয়িংয়ের প্যাস্টাল স্টিক দিয়া দিলাম বুড়ার মুখ কালা কইরা। আমি জানতাম মাম্মি এইটা ভালোভাবে নিবে না। সারাক্ষণ ওর বই নিয়ে বসে থাকবে। আমি তো পিচ্চি ছিলাম, হয়তো জেলাসি ছিল। অ্যাজ আ কিড ইউ ওয়ান্ট ফুল অ্যাটেনশন অব ইয়োর মম, রাইট?

তো মাম্মি আমার কাণ্ড দেখে খুব রেগে গেল। শী নেভার হিট মি বিফোর। বাট দ্যাট ডে শী বিকেম সো ফিউরিয়াস দ্যাট আই হ্যাড টু হাইড ইন দ্য ক্লজেট। সেই দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার শত্রুতা।

মাম্মি মাঝে মাঝে টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতো। কী বিচ্ছিরি প্যান প্যান। ইন দ্যাট টাইম আই ডিডন্ট হ্যাড আ পিসি অব মাই ওউন। মাম্মির পাশে বইসা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনা লাগতো, কী যে পেইন কী বলবো!

টেলিভিশনে এই প্রোগ্রামটা শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাম্মিকে অন্যরকম লাগতো। শী ওয়াজ সো অনটু ইট। প্রতিটা গানের লিরিকস তার মুখস্ত। শুনতে শুনতে মাম্মি নিজেই গাইতে শুরু করতো গুণ গুণ করে। আমি অবাক হয়ে দেখতাম মাম্মি ধীরে ধীরে গানের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। ইট ওয়াজ লাইক এন্টারিং অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড। আমি তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকায়া থাকতাম।

আমি জানি মাম্মির মিউজিকের খুব শখ ছিল। আমার ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ড পা খুব ওপেন মাইন্ডেড মানুষ ছিলেন। আমার দাদুর মতো নয়। শুনেছি তিনি স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানি রেজিমকে অপোজ

করে কালচারাল অ্যাকটিভিটি কনডাক্ট করতেন। তিনিই মাম্মিকে গান শিখিয়েছিলেন। অনেক বই পড়ার অভ্যাস করিয়েছিলেন। মাম্মি-ড্যাডি কখনো বলেনি কিন্তু আমি জানি ড্যাডি গান শুনেই মাম্মিকে বিয়ে করেছিল।

কিন্তু সেই ড্যাডি কেমন যেন হয়ে গেল। মিউজিক সহ্য করতে পারে না। একদিন বাসায় রাগারাগি করে রবীন্দ্রনাথের সবগুলা বই শেলফ থেকে মেঝেতে ফেলে দিল। হি সেইড তার বাসায় এইসব রবীন্দ্রনাথ-টবিন্দ্রনাথ থাকতে পারবে না। শুধু রবীন্দ্রনাথ না, মাম্মির পছন্দের লিটারেচারের কোন বই-ই বাসায় রাখা যাবে না। নজরুল-জীবনানন্দের বইয়ে মেঝেতে ফেলে ড্যাডি লাথি মারতে লাগলেন। মাম্মি ওয়াজ ক্রাইয়িং অ্যান্ড আই ফেল্ট স্যাড ফর হার। তাদের মধ্যে আরো কী যেন ঝগড়া হচ্ছিল। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি দেখতে পেয়ে ড্যাডি আমাকে আমার রুমে যেতে বললেন। আমি আমার রুমে গিয়ে প্লে স্টেশনে বসে পড়লাম। মন খারাপ হলে আমি কল অব ডিউটি খেলি। মেশিনগানের নয়েজ আমার মন ভালো করে দেয়। দ্যাট নাইট আই কুড স্টিল হিয়ার দেম ফাইট। আমি ভলিউম বাড়ায়া দিলাম কিন্তু তারপরও মাম্মির কান্নার শব্দ পাচ্ছিলাম। ইট ওয়াজ আনবিয়ারেবল।

এরপর থেকে মাম্মি আর ড্যাডি কেমন যেন হয়ে গেল। ড্যাডি খুব একটা রেলিজিয়াস পারসন ছিল না। খুব ড্রিংক করতেন আর বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করতেন। বিদেশে পড়াশোনা করেছিলেন তো, ওয়েস্টার্ন ভ্যালুজ বিয়ার করতেন। বেঁচে থাকতে আমার গ্রান্ড মা প্রায়ই বলতেন, "আমার পোলা বিলেত থেইকা ডিগ্রি লইয়া আইছে।" দ্যাট টাইম আই হ্যাড নো আইডিয়া হোয়ার দিস "বিলেত" প্লেস ইজ! লেটার আই কেম টু নো দ্যাট বিলেত ইজ অ্যাকচুয়ালি ইংল্যান্ড। ইজন্ট ইট ফানি? হা হা।

তো আমার সেই বিলেত ফেরত ড্যাডিই হঠাৎ করে খুব রেলিজিয়াস হয়ে গেলেন। দাড়ি রাখতে শুরু করলেন। শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে পাঞ্জাবি-পায়জামা ধরলেন। কথা-বার্তা একেবারে কমিয়ে দিলেন। যে বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করতে পছন্দ করতেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দিলেন। ব্যবসার কাজেও কেমন যেন মনোযোগ হারিয়ে ফেললেন। খালি বলতেন, "কি হবে এসব করে? কী হবে?" ড্যাডির এই পরিবর্তন নিয়ে আমি খুব ভেবেছি। কিন্তু এক্সাক্ট রিজন কী বের করতে পারিনি। আই কুড গেস সামথিং। ইটস ভেরি পারসোনাল। ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই ডু নট শেয়ার ইট উইথ ইউ? আমি এটা বলতে চাচ্ছি না।

এটা-ওটা নিয়ে মাম্মি-ড্যাডির মধ্যে রেগুলার ঝগড়া চলতে লাগলো। আমি আমার রুম থেকে সবকিছু শুনতে পেতাম। সামটাইমস আই ফেল্ট লাইক গোয়িং আউট অ্যান্ড ইন্টারভেন, কিন্তু আমি করিনি। আই কুড হিয়ার মাম্মি ক্রাই অ্যান্ড ড্যাডি শাউট ইন অ্যাগোনি।

মাম্মি শাড়ি পরতে পছন্দ করতো। কত্তো সুন্দর সুন্দর শাড়ি ছিল তার। শী লুকড লাইক অ্যান এঞ্জেল ইন শাড়ি। ড্যাডি চাচ্ছিলেন না মাম্মি শাড়ি পরুক। হি ওয়ান্টেড হার টু কাভার হারসেলফ প্রোপারলি। এই নিয়ে একদিন ঝগড়া চলছিল। তো ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমি শুনতে পেলাম হুড়মুড় করে কী যেন ভেঙে পড়ছে। তারপর মাম্মি চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। এতই ভয়াবহ সে চিৎকার যে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তাদের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দেখি ভয়াবহ অবস্থা।

ড্যাডির হাতে আমার বেসবল ব্যাট। তিনি রাগে কাঁপতেছেন আর মাম্মি ঘরের এক কোণায় দাঁড়ায়া কাঁদতেছে। ড্যাডি আমাকে দেখে থেমে গেলেন। আমার দিকে একটা ব্ল্যাংক লুক দিলেন। তারপর ব্যাট দিয়ে বিছানায় একটা জোরে বাড়ি দিলেন। আমি আর মাম্মি ভয়ে চমকে উঠলাম।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম লোকটা আর আমার ড্যাডি নেই। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ভীষণ মনস্টার। যে ছিড়েখুঁড়ে খাবে আমার মাম্মিকে। সেই মাম্মিকে যে আমাকে কোলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার গল্প শোনাত। যার আনন্দ রবীন্দ্রনাথের গানে। মুগ্ধতা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। ড্যাডিও কি বুড়োটাকে নিয়ে জেলাস?

লাঠিটা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করতে করতে ড্যাডি মাম্মির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হি ওয়াজ অন দ্যা ভার্জ অব হিটিং হার। আমি জানতাম ড্যাডি চেইঞ্জ হয়ে গেছেন। কিন্তু এতটা নিচে নেমেছেন আইডিয়া ছিল না। সো হোয়েন হি লিফটেড দ্যাট ব্যাট আই কুডনট স্টে কোয়েয়েট। আমি বেডসাইড টেবিলে প্রচণ্ড একটা লাথি মারলাম। চিৎকার করে বললাম, “লিভ মাই মম অ্যালোন।”

ড্যাডি মুহূর্তের মধ্যে থমকে গেলেন। তাকে কখনো এতটা সারপ্রাইজড হতে দেখিনি। চেহারা একেবারে ব্লাডলেস হোয়াইট হয়ে গেছে। ব্যাটটা টুক করে পড়ে গেল হাত থেকে। তাতে যে ঠকাস করে শব্দ হলো, তাতে মাম্মি চমকে গেল। তার কান্না এখনো থামেনি।

আমি ড্যাডির চোখের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, “ইফ ইউ এভার ডেয়ার টু হিট মাই মাদার এগেইন, আই উইল কিল ইউ।”

ড্যাডি আমার ফিউরিয়াসনেস দেখে থমকে গেল। তারপর ঝড়ের মতো রুম থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও আমার রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। প্লে স্টেশনে বসে কল অব ডিউটি খেলতে শুরু করলাম। হোয়েন আই অ্যাম অ্যাংগ্রি, আই লাইক টু প্লে দিস ব্লাডি গেম। আমি ও ঘর থেকে কোন শব্দ পাচ্ছিলাম না। কিন্তু জানতাম মাম্মি ওয়াজ ক্রাইয়িং।

মাম্মি আর ড্যাডি এরপর থেকে কথা বলা বন্ধ করে দিল। একই ছাদের নিচে বাস করেও তারা একে-অপর থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছিলো। ড্যাডি মাঝে মাঝে আমার রুমে আসতো। পড়াশোনার খোঁজ নিত। নিজের লাইফের গল্প বলতো। হি এনকারেজড মি টু প্রে অ্যান্ড সারেন্ডার টু দ্যা অলমাইটি। বোঝাত আমাদের এই জীবন টেমপোরারি। আমি তার ওপর রেগে ছিলাম। বাট কথা-বার্তায় বুঝতে দেইনি। আফটার অল হি ইজ মাই ফাদার। আমরা কেউই কখনো সেই রাতের কথা তুলিনি। ওই রাতটা আমাদের জীবনে যেন কখনো আসেনি। আমাদের মধ্যে কোনো দাগ ফেলে যায়নি।

সে রাতের পর আমি একেবারে বদলে গেলাম। আই স্টার্টেড টু হ্যাং আউট আ লট। সিগারেট আগেই ধরেছিলাম। এবার উইড খাওয়া শুরু করলাম। আমার সার্কেল বাড়তেছিল। নতুন নতুন পোলাপাইনের সাথে পরিচয় হচ্ছিলো। একদিন সামান্থাদের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ইয়াবা ট্রাই করলাম। ইট ওয়াজ সো সুথিং। ইউ ওন্ট বিলিভ ঢাকা শহরের কত পার্সেন্ট মানুষ এই জিনিস খায়। ইয়াবাকে পোলাপাইন ইন আ ফানি ওয়ে “ড্যাডি” বলে ডাকে। আমার জীবনে ব্যাপারটা হলো আয়রনির মতো। এক ড্যাডির সঙ্গে দুরত্ব যত বাড়ছিল, আশ্রয় নিচ্ছিলাম অন্য ড্যাডির কোলে।

ইন দ্যা মিন টাইম মাম্মি একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। খাবার টেবিল ছাড়া আমাদের খুব একটা দেখা হতো না। শী ওয়াজ সাফারিং অ্যান্ড আই কুড ফিল ইট। সারাক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতো। বাসায় কেউ আসলে সামনে যেত না। আগের মতো সাজতো না। শাড়ি পড়তো না। খোঁপায় ফুল দিতো না। শুকিয়ে কেমন যেন কাঠির মতো হয়ে গেছিলো।

একদিন দুপুরে ঘুম থেকে জেগে দেখি মাম্মি আমার মাথার কাছে বসে কী যেন পড়ছে। গতকাল একটা লেট নাইট পার্টি ছিল। অনেক ড্রিংক করেছিলাম। এজন্য মাথাটা একেবারে ভারি হয়ে ছিল।

আমার ঘুম ভেঙেছে দেখে মাম্মি মিষ্টি করে হাসলো। শী আস্কড মি টু কাম ক্লোজার। আমি তার পাশে গিয়ে বসতেই মাম্মি বইটা বন্ধ করে ফেললো। রবীন্দ্রনাথের কোনো বই। প্রচ্ছদে তার ছবি।

“বকু, একটা কবিতা পড়ছি। শুনবি?”

আমার ভালো নাম বখতিয়ার। বাট মন ভালো থাকলে মাম্মি লাইকস টু কল মি বকু।

“বলো।”

চশমাটা একবার এডজাস্ট করে নিয়ে মাম্মি পড়তে শুরু করলো,

তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি।
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

পড়া শেষ করে মাম্মি বইটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালো। কাঁদছে। কী অপরূপ লাগছে তাকে! শী লুকড লাইক এন এঞ্জেল ইন ডিজগাইস। আমি মাম্মিকে হাগ করলাম। শী ওয়াজ ক্রাইয়িং লাইক আ লিটল গার্ল। কান্নার দমকে তার ছোট্ট শরীরটা বারবার কেঁপে উঠছিল। আমি বললাম, “মাম্মি কেঁদো না। তুমি কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয়। ডোন্ট ওয়ারি। এভরিথিং উইল বি অলরাইট।”

মাম্মিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম সত্যি কী সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে?

এর কদিন পরই মাম্মি আমাদের ছেড়ে চলে গেল। না, শী ডিডনট ডাই। মামারা তাকে লানডানে নিয়ে গেল। বাসায় একা রয়ে গেলাম আমি আর ড্যাডি। কিছুদিন পর মাম্মির ল ইয়ার ড্যাডিকে ডিভোর্সের নোটিশ পাঠালো। আমার ও লেভেল পরীক্ষা ছিল সামনে, আমি রয়ে গেলাম দেশে।

মাই হোল ওয়ার্ল্ড ফেল অ্যাপার্ট। ড্যাডির সঙ্গে আমার অলরেডি একটা দুরত্ব ছিল। এবার সেটা তৈরি হলো মাম্মির সঙ্গেও। শী ইউজড টু কল মি আ লট। বাট আমি তার কল রিসিভ করতাম না। তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করতো না। আমাকে এই দোজখে রেখে সে একা কীভাবে চলে যেতে পারলো? শী কুড টেল মি শী ওয়াজ লিভিং। ক্যান ইউ বিলিভ দ্যাট আই হ্যাড টু লার্ন ইট ফ্রম আ লেটার? ইট ওয়াজ সো ডিসেপয়েন্টিং।

পড়াশোনা লাটে উঠলো। আমি সব রকমের ড্রাগস নিতে শুরু করলাম। স্কুল-কোচিংয়ের নাম করে বাইরে সময় দিতে শুরু করলাম। বাসায় যে কয়টা টিউটরের কাছে পড়তাম, সবাইকে একে একে বিদায় করে দিলাম। ঘরের দরজা বন্ধ করে খুলে দিলাম বাইরের দরজা। এখন ডিনার টেবিলেও ড্যাডির সঙ্গে দেখা হতো না। অবশ্য ড্যাডিও বাসায় থাকতো না। ব্যবসা থেকে সব মনোযোগ হারিয়ে তাবলীগের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যেতে শুরু করলো।

আই স্টার্টেড টু ইনভাইট জাংকিজ অ্যাট হোম। বাসায় প্যারেন্টজ থাকে না দেখে নানারকমের পোলাপাইন আসতে শুরু করলো। তারা তাদের ফ্রেন্ডদেরও আনতে শুরু করলো অ্যান্ড দ্যাটস হোয়েন আই মেট সানজানা। শী ওয়াজ ওল্ডার দ্যান মি। ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। ওর মধ্যে কী একটা ছিল যে প্রথম দেখাতেই আমি ওর জন্য পাগল হয়ে গেলাম। উই হ্যাড সিমিলার টেস্ট ইন মিউজিক, মুভিজ অ্যান্ড ড্রাগস। আমি ওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চ্যাট করতে শুরু করলাম। শী ওয়াজ সো কুল। ওকে পেয়ে আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। আই ওয়াজ সো ইন লাভ উইথ হার। আমার ধারণা ছিল সেও আমাকে লাভ করে।

ওয়ান ফাইন ডে আই থট অব প্রোপোজিং হার। আমরা বনানীর একটা রেস্টুরেন্টে দেখা করলাম। সানজানাকে সেদিন কেমন যেন স্ট্রেঞ্জ লাগছিল। আমি ওকে ভালোবাসার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন একটা শুকনা হাসি দিল। বললো, "আমি ভয় পাচ্ছিলাম এমন কিছু ঘটবে। বাট আই ক্যান্ট ডু দিস বিকি। আই অ্যাম সরি। আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবেই দেখি।"

এরপর আর কী বাকি থাকে জীবনে?

এই অবস্থায় যে চিন্তাটা আসা স্বাভাবিক প্রথমে সেটাই আসলো। আই থট অব এন্ডিং দিস মিজারেবল লাইফ। আমি জানতাম আমাকে এটা করতেই হবে। এমন কিছু করার কথা ভাবছিলাম যেন মাম্মি-ড্যাডির একটা উচিত শিক্ষা হয়। কীভাবে কী করবো ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শেষরাতে একটা তন্দ্রামতো এসেছিল। সেখানেই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখি। দ্যাট স্কিনি ওল্ডম্যান উইথ মিস্টিরিয়াস বিয়ার্ড।

আমার স্বপ্নের কথা একেবারেই মনে থাকে না। মনে থাকে কিছু ডিসটোর্টেড ইমেজ। সে দিন রাতে নিশ্চয়ই ভয়াবহ কিছু দেখেছিলাম। হোয়েন আই ওক আপ আই ফেল্ট সামথিং আন্ডার মাই বেড। বিছানা তুলে দেখি ওটা একটা বই। রবীন্দ্রনাথের একটা বই- ক্ষণিকা।

বইটার একটা জায়গায় পেইজ মার্ক দেয়া। সেখানে যে কবিতাটা আছে তার টাইটেল বোঝাপড়া।

আই স্টার্টেড টু রিড-

"মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

বাহ! সুন্দর তো। তারপর বাকিটা পড়তে শুরু করলাম। অনেক বড় কবিতা কিন্তু একদম বোরিং মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কী অদ্ভুত টেগোর যে আমার জন্যই কবিতাটা লিখেছেন! আমি বাকি কবিতাগুলোও পড়তে শুরু করলাম। কেমন যেন কঠিন, একেবারে দাঁতভাঙা বাংলা। বাট আমার পড়তে মজা লাগছিল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বইটা নিয়ে বসলাম। একটু পর ড্যাডি এসে বসলো টেবিলে। অনেকদিন পর ড্যাডিকে দেখে অবাক হলাম। উনি বাসায় আছেন জানতাম না। বাইরে থেকে থেকে অনেকটা ট্যানড হয়ে গেছে।

"তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে বখতিয়ার?"

"ভালো।"

"মাম্মির কথা ভেবে মন খারাপ হয়?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না।"

ড্যাডি একটা শুকনা হাসি দিলেন। "ও লেভেলের পর কী পড়বে কিছু ভেবেছ?"

"বাংলা।"

"বাংলা?" মনে হলো ড্যাডিকে কেউ চেয়ার থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

"হ্যাঁ," ছোট্ট করে জবাব দিয়ে আমি বইটা বন্ধ করলাম। রাখলাম একেবারে টেবিলের মাঝখানে। বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে রবীন্দ্রনাথ একমনে চেয়ে রইলেন ড্যাডির দিকে।

ডানা ক্ষয়ে যাওয়া প্রজাপতির গল্প

রাসয়াত রহমান জিকো

আমার জন্ম হয়েছিল ঢাকার বেইলিরোডে। শৈশবকালও কাটিয়েছি সেখানে। আমাদের মধ্যে সেখানে একটা মজার ঘটনা ঘটত। আমরা ফড়িং ধরতাম। নানা রকম নানা রঙের ফড়িং -এর দেখা পাওয়া যেত। রাজা ফড়িং, প্রজা ফড়িং, রানী ফড়িং, রাজপুত্র ফড়িং আরো নানা রকম ফড়িং। আমরা সেই ফড়িং গুলাকে ধরতাম, একজনের হাতের ফড়িং অন্য আরেক জনের হাতের ফড়িং এর নিকটে এনে তাদের মধ্যে যুদ্ধ করাতাম। বিষয়টা ঠিক না বেঠিক সেই বোধ তখন ছিল না।

মাসুদও আমাদের সাথে ফড়িং ধরত। মাসুদ ফড়িং আর প্রজাপতি এর পার্থক্য বুঝত না। আসলে, তার নিজের মধ্যেই একটা প্রজাপতির ব্যাপার ছিল, তাই প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে প্রজাপতি ধরত। সে ডানা ধরে প্রজাপতি ধরত আর মাঝে মাঝেই ডানা গুলো ক্ষয়ে যেত।সেই ডানা ক্ষয়ে যাওয়া প্রজাপতির গল্পই লিখছি।

আমার জন্মের সময় আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই আমি সব থেকে বেশি যার কোলে পিঠে থাকতাম সে হল মমতাজ বুয়া। মমতাজ বুয়া ঘর ঝাড়ুও নাকি দিত আমাকে কোলে নিয়ে। পুরানো অ্যালবাম ঘাটলে সেরকম ছবিও পাওয়া যায়।

আমাদের বাসায় কর্মরত অবস্থাতেই অল্প বয়সেই মমতাজ বুয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের পর সাময়িকভাবে আমাদের বাসায় কাজ করা বন্ধ করে দেন। তার জামাই বাসায় কাজ করা মনে হয় পছন্দ করতেন না। তখন তিনি গার্মেন্টসে কাজ নেন। মারধর করা এক জামাই তার কপালে জুটেছিল। সেই জামাইয়ের ঘরে মমতাজ বুয়ার ছেলে মাসুদের জন্ম হয়। মাসুদের জন্মের ২ বছর পর মমতাজ বুয়া আবার আমাদের বাসায় এসে হাজির হন। গার্মেন্টস ছেড়ে বাসাতেই কাজ করবে। আমাদের ধারণা হল হয়ত সেখানে নিরাপত্তা ঘাটতি আছে। পরে আমরা নিশ্চিত হই যখন জানতে পারি সেই জামাইয়ের সাথে ডিভোর্স হয়ে যায়।

আম্মাও হাফ ছেড়ে বাঁচল। মমতাজ বুয়াকে তিনি পছন্দ করেন। হাসিমুখে দ্রুত তাল লয়ে সব কাজকর্ম করে ফেলত সে। এর মধ্যে মাসুদের নাম যে মাসুদ রাখা হয়েছে এটা শুনে আম্মা বেশ চমকে উঠলেন। “করেছিস কী! পাশের বাসার সাহেবের নাম ও যে মাসুদ”। এটা ছিল আম্মার সরল মনের মজার উক্তি।

মমতাজ বুয়াও বললেন,” আমার ছেলে একদিন ঠিক-ই সাহেব হবে। আমি কাজের বুয়া দেখে কী আমার ছেলে সাহেব হবে না!”

আম্মাও বলতেন, “হবে, ইন শা আল্লাহ হবে। ঠিক-ই সাহেব হবে। ও দেখতেও হইছে সাহেবের মত। দেখি ওকে কোলে নেই”। মাসুদ তখন কার্পেটের উপর বসে নিজের মনে কিছু একটা খেলছিল।

পরবর্তীতে আমাদের বাসা বেইলিরোড থেকে ইস্কাটনে স্থানান্তরিত হয়। আব্বা তখন সরকারি বড় কর্মকর্তা। সরকারী নতুন কোয়ার্টারে উঠলাম। মাসুদের বয়স তখন ৬ পেরিয়ে ৭ হল। ঠিক করা হল মাসুদকে স্কুলে ভর্তি করানো হবে।

বাসার পাশেই ইস্কাটন গার্ডেন স্কুল। মাসুদকে সেখানে ভর্তি করানো হল। মমতাজ বুয়ার অদম্য ইচ্ছা মাসুদ লেখাপড়া শিখবে। আমরা তখন সরকারি নতুন গাড়ি পেলাম। সরকারি গাড়ি বলতে এর আগে বুঝতাম যেরকম সাদা মরা গাড়ি সেরকম না। ল্যান্সার মিতসুবিশি। নিউ মডেল গাড়ি। ভাগ্য ভাল ছিল। মোটামুটি এলাহি কারবার। আমাদের ড্রাইভারও খানদানি।তিনি এর আগে কোন এক মিনিস্টারের দায়িত্বে ছিলেন। সারাদিন তিনি তাদের গল্পই করেন। ট্রাফিক পুলিশও দেখা যায় সব তার চেনা। এইখানেও এলাহি কারবার।

বাসায় নিয়ম ছিল সন্ধ্যা হলেই পড়তে বসতে হবে।সেটা আমাকে, আমার বড় বোনকে এবং মাসুদকেও। মাসুদকে আম্মা নিজেই পড়াতো। বাচ্চাদের পড়ানোতে আম্মার সাফল্য খারাপ না। আমার বোনকে ভিকারুননিসাতে ভর্তি করিয়েছিলেন। আমাকে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। সম্পাদ্যতে কোণ আঁকতে হলে চাঁদা ব্যবহার করা যাবেনা ,কম্পাস ব্যাবহার করতে হবে-এটা না করায় তখন বাঘা বাঘা স্টুডেন্টরা অঙ্কে কম পেল। মাঝখান দিয়ে সর্বোচ্চ পেয়েও মোহাম্মদ আলী স্যার আমাকে থাপ্পড় মারলেন (যার নাম মোহাম্মাদ আলী তিনি যে ঘুষি না মেরে থাপ্পড় মারসেন সেটাই তো আমার ভাগ্য!))। কারন বর্গমূল এর অঙ্ক ভুল হয়ে গেছে। সেই থাপ্পড় খেয়ে বাসায় এসে অদ্ভুত একটা ব্যাপার শুনলাম। তবে ভাল লাগার মত ব্যাপার।

মমতাজ বুয়া আমার জন্য ২৫ টাকা দিয়ে মেগা আইস্ক্রিম কিনে রেখেছেন। একটা কাজের বুয়া হটাৎ করেই ২৫ টাকা খরচ করবেন না। জানতে পারলাম মাসুদ তার স্কুলে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। মাসুদের স্কুল বাংলাদেশের সেরা স্কুল হয়ত না, কিন্তু অনেক ভাল ভাল ঘরের ভদ্রলোকের ছেলেপেলে ঐ স্কুলে পড়ে। স্কুলের টিফিনে তারা বার্গার নিয়ে যায়, পিজা নিয়ে যায় এগুলো মাসুদের কাছ থেকেই শোনা।

মমতাজ বুয়ার উচ্ছ্বাস দেখে ভাল লাগল। মাসুদও বলল , “মামা, আমি ফার্স্ট হইছি”। মমতাজ বুয়া ভাইয়া ডাকত, কাজেই মাসুদ মামা। বাসার আব্বা আম্মা অবাক হওয়ার পাশপাশি খুশিও হল। মমতাজ বুয়া মাসুদের স্কুলের বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্য চকলেট কিনে মাসুদকে দিল।

গল্পটা এই পর্যন্ত হলে ভালো হত। কিন্তু এটা যে বাস্তবের গল্প। মাসুদকে স্কুলে নামিয়ে দেওয়া হত আমাদের গাড়িতে। আব্বা অফিসে যাওয়ার সময় মাসুদকে নামিয়ে দিত। সেই গাড়ি দেখেই মাসুদের স্কুল এর কয়েকজন ছেলে বলত, “বাহ, তোদের গাড়ি তো সুন্দর!”

মাসুদ সেটা আমাকে এসে বলেছিল একবার। তারপর মাসুদ তার দুই একজন বন্ধুকে আমাদের বাসার ফোন নম্বর দিয়ে এসেছিল। সেখান থেকেই প্রথম সমস্যাটা হল। ফোন আসায় আমি ফোন ধরলাম। ঐপাশ থেকে মাসুদ কে চাইল। একটু দূরে মমতাজ বুয়া দাঁড়ানো। আমি বুয়াকে বললাম, “বুয়া, মাসুদের ফোন।” বুয়া মাসুদ কে ডাক দিল, “মাসুদ তোর ফোন।”

মাসুদও বলল, “আম্মা, আসতেছি।”

৭ বছরের ছেলে মাসুদের বন্ধু। সে এত কিছু বুঝার কথা না কিন্তু বুঝল। পরের দিন মাসুদকে প্রথম তার এক বন্ধু বলল, "তোর আম্মা কি ঐ গাড়িওয়ালাদের বাসায় কাজ করে?"

মাসুদ সেদিন দিন বাসায় আসল। মন বেশ খারাপ ছিল তার। হাজার হোক ৭ বছরের একটা বাচ্চা। এরপর আরেকদিন আরেকটা ঘটনা ঘটল। ঐদিন কি কারণে আব্বা গাড়ি নিয়ে আগেই অফিসে চলে গেছে। মমতাজ বুয়া নিজেই মাসুদকে দিয়ে আসতে গেল। স্কুল এর দারোয়ান নাকি সরাসরি মাসুদকে জিজ্ঞেস কর, "ও কি তোমার আম্মা?"

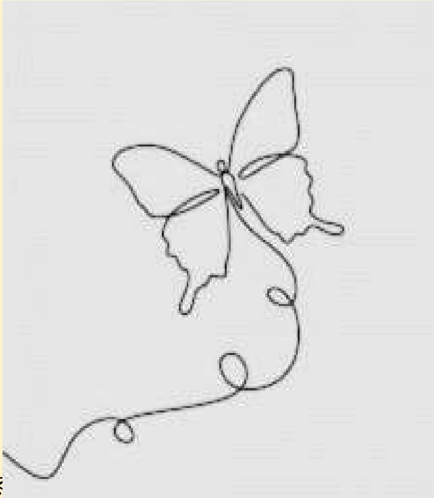

মাসুদ কোন জবাবই দিল না। মায়ের দিকে একবার

বাসায় আসার পর মমতাজ বুয়া সারাদিন কান্নাকাটি করল। তারপর রাতে ঠিক করল সে আর বাসায় কাজ করবে না। কোনোদিন ও না। আমার আম্মা অনেক বুঝাল।

"তুই আমার ছেলেমেয়েকে দেখেছিস সব সময় । তুই ওদের বোনের মতো। এত মন খারাপ করিস না।"

বুয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "আমার ছেলেকে পড়ালেখা করালে সে বড় হয়ে সাহেব ঠিকি হবে কিন্তু আমাকে চিনবে না।"

মাসুদ নির্বিকার। সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি বাইরের কিছু খুঁজছে। বাইরে তখন প্রজাপতি উড়ছে মনে হয়।

মমতাজ বুয়া সেদিন বাসার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে মাসুদ কে নিয়ে চলে গেল। এমনিতে বুয়ার আরেকটা বিয়ে হয়েছিল। বেইলিরোডেরই এক বাসার এক ড্রাইভারের সাথে। বুয়ার সেই নতুন জামাই এসে মাসুদ আর মমতাজ বুয়াকে নিয়ে গেল।

প্রজাপতির মত উড়তে থাকা মাসুদের ডানার কী অবস্থা হল জানি না।তার সাথে আর দেখা হয় নাই কখনও।

পৃথিবীর সব বুয়াদের মধ্যে একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার খুঁজে পাই। সব সময় তাদের জামাইরা তাদের মারে। আমাদের কয়েক বছর পরের বুয়ারও একই অবস্থা। তার জামাইয়ের নাম কামালের বাপ। আমার ধারনা কামাল জন্মের আগে বুয়ার জামাইয়ের কখনই কোন নাম ছিল না। বুয়া সব সময় খালি কামালের বাপ কামালের বাপ করতে থাকে। "ভাইয়া, আপনার পুরান পাঞ্জাবী-গেঞ্জি যা আছে কামালের বাপকে দিয়েন।" অথচ সেই কামালের বাপ বুয়াকে মাঝে মাঝেই বেদম প্রহার করে।

একদিন রাত করে বাসায় ফিরে খেতে বসব। হঠাৎ করে দেখি টেবিলে পোলাও আর কোরমা। কী ব্যাপার! পোলাও ক্যান? এই খাবার তো হঠাৎ করে আসার কথা না।

জানতে পারলাম নতুন বুয়া তার বাসার লোকজন এর জন্য নাকি পোলাও রান্না করেছে। আমাকে একটু ইজ্জত করতে চায়, তাই আমার জন্য রেখে দিছে। বুয়ার ইজ্জত এর নমুনা দেখে অবাক হলাম। উপলক্ষটা দারুণ। সে বছর ক্লাস ফাইভে যে পিইসি এর নতুন নিয়ম চালু হয়েছে সেখানে কামাল তাদের গ্রামের বাড়িতে ফার্স্ট হয়েছে। খাইলাম পোলাও। বুয়াকে বললাম খুশি হইছি, খুব খুশি হইছি।

সে বছর ঈদের দিন নামাজ পড়ে বাসায় ফিরলাম। শ্যামলা বর্ণের ছোট একটা ছেলে এসে পায়ে হাত দিল। সালাম করার ভঙ্গি। এত ইজ্জতে বিব্রত অনুভব করলাম! কেউ আমার পায়ে হাত দিবে এটা আমার একদম পছন্দ না। আর সিজদা এর ভঙ্গিতে পায়ে হাত দেওয়ার জন্য মানুষ মোটেও উপযুক্ত কেউ না। সিজদা খালি আল্লাহ এর জন্যই করা যায়। মানিব্যাগ বের করে কামালকে কে ১০০ টাকা দিলাম।

হঠাৎ মনে হল কাজটা কি ঠিক হল? কামালকে ডাক দিলাম। টাকাটা নিয়ে বুয়ার হাতে দিলাম। "বুয়া, এটা কামালের জন্য।"

আর কোন প্রজাপতি এর ডানা যাতে ক্ষয়ে না পড়ে। কামাল তুমি বড় হও। ডানা ক্ষয়ে যাওয়া প্রজাপতি দেখতে খুব খারাপ লাগে।

মাসুদের কোন খোঁজ আর কখনো পাইনি। মাঝে মাঝে খুব জানতে ইচ্ছে করে মমতাজ বুয়ার স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল কি না! ভাবতে ভাল লাগে মাসুদ অনেক বড় কিছু হয়েছে আর তার মাকে নিয়ে খুব ভাল আছে। অনেক বড় অবস্থানে থাকা কোন বড় কোন অফিসার হয়ত কোনদিন সামনে এসে বলবে আমার মা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত আর অনেক কষ্ট করত দেখেই আজ আমি এই অবস্থায় আছি। আপনাদের গাড়িতে চড়তে দিয়েছিলেন দেখে ধন্যবাদ। আজ আমি সেরকম একটা গাড়ির মালিক। আমার মা সেই গাড়িতে হাত পা এলিয়ে এখন বসে আছে।

চম্পা হাউজ

নাজিম উদ দৌলা

"নতুন বাড়িতে উঠেছি দুই মাসও হয়নি। এরই মধ্যে নানান ভুতুড়ে কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। সারাটা রাত আতংকে থাকি। আর দিনের বেলা যতটা সম্ভব বাড়ির বাইরে থাকার চেষ্টা করি। খুব কষ্টে আছি ভাই।"

আমজাদ আলীর মতো একজন শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত লোকের মুখে এই ধরনের কথা শুনতে হাস্যকর লাগছে। আমি অতি কষ্টে হাসি গোপন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম।

"এই যে আপনি হাসছেন!" আমজাদ আলী রেগে গেলেন। "আমি আগেই বলেছিলাম কথাগুলো আপনি বিশ্বাস করবেন না!"

"আরে না না! হাসছি কোথায়?" আমি হাসি আটকে বললাম, "পুরো বিষয়টা কি একটু খুলে বলতে পারবেন?"

আমজাদ আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর কিছু বলার লক্ষণ দেখছি না।

লোকটার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে খানিকক্ষণ আগে। দুজনে বসে আছি সুপ্রভাত বাসে। আটকে আছি গুলিস্তানের অভিশপ্ত জ্যামে। বাসে চেপে পুরান ঢাকা যাওয়া মানেই বিরাট ফ্যাসাদে পড়া। গুলিস্তানে আসার পর গাড়িগুলো যেন আর আগাতেই চায় না! অন্য কোনো বাহনে যাবেন? সে তো আরেক ঝামেলা! রিক্সা কিংবা সিএনজিওয়ালা পুরান ঢাকার নাম শুনলেই সাত বার করে পানি খায়!

এমনিতেই প্রচন্ড গরমে ঘামছি দরদর করে, তার উপর গাড়ির হর্নের কর্কশ আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার দশা। তখনই আমার চোখ পড়লো আমজাদ আলীর উপরে। লোকটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো ঝগড়াটে বউয়ের হাতে মার খেয়েছে! কেমন মুখ-চোখ কালো করে রেখেছে বেচারা! মধ্যবয়সী, মাথায় আধপাকা চুল, দেখে শুনে ভদ্রলোক বলে মনে হলো। লোকটার পাশের সিট ফাঁকা। তাই দেখে আমি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তার পাশে এসে বসলাম। সময় কাটানোর জন্য আমি তার সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম।

"এক্সকিউজ মি, একটু কথা বলতে পারি?"

লোকটা আমার দিকে বিরক্ত ভঙ্গিতে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

আজব লোক তো! সালামের জবাব পর্যন্ত দিলো না! আমি আবার ডাক দিলাম।

"এই যে ভাই।"

"আমাকে বলছেন?"

"জি... আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

"আপনাকে তো ঠিক পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না।" সন্দেহের সুরে বললো লোকটা।

"না, আপনি আমাকে ঠিক চিনবেন না।" আমি খানিক ইততস্ত করে বললাম, "আমরা সমবয়সী মানুষ... জ্যামের মধ্যে সময় কাটছে না। ভাবলাম আপনার সাথে একটু কথা বলি।"

"জি বলুন।" লোকটা অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে বললো।

আমি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম, "আমি আসিফ রহমান। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।"

লোকটা আমার হাত ধরলো, "আমি আমজাদ আলী।"

এরপর দুই এক কথায় জানতে পারলাম আমজাদ আলী পেশায় একজন উচ্চপদস্থ ব্যাংকার। গাড়িটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে বলে বাধ্য হয়ে পাবলিক বাসে উঠেছেন। পাবলিক প্লেসে এভাবে যাতায়াত করার অভ্যাস নেই বলে অস্বস্তিতে ভুগছিলেন।

আমি সহানুভূতির সুরে বললাম, "আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি গাড়ির জন্য মনটা খারাপ হয়ে আছে।"

“আসলে...” আমজাদ আলী এক মুহূর্ত থেমে থেকে বললো, “সেজন্য মন খারাপ নয়! গাড়ি তো নষ্ট হতেই পারে। অন্য একটা ঝামেলায় আছি...”

“ওহ! কি ধরনের ঝামেলা?”

“ব্যাপারটা একটু জটিল...” লোকটা ইতস্তত করছে। সম্ভবত বলবে কি বলবে না, ভাবছে।

আমি হাসি মুখে বললাম, “বলার মতো বিষয় না হলে বলার দরকার নেই।”

“না মানে... আসলে তা না...” আমজাদ আলীর দ্বিধা যাচ্ছে না। “বিষয়টা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনার কাছে হাস্যকর লাগতে পারে।”

আমি জোরাজুরি করায় আমজাদ আলী বোমাটা ফাটালেন! তার বাড়িটা নাকি ভুতের বাড়িতে পরিণত হয়েছে! আমি চেষ্টা করেও হাসি আটকাতে পারলাম না। তাই মনে হচ্ছে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি। আর বলতে চাইছেন না কিছু।

তাকে পুরোটা খুলে বলার জন্য অনুরোধ করলাম আমি, “আমজাদ ভাই, আমি মানুষের বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সমাধান দিয়ে বেড়াই। এমন অনেক কিছুই আমাকে বিশ্বাস করতে হয়, যা অন্যদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। নির্ভয়ে বলতে পারেন আপনার সমস্যা! চিন্তা করবেন না, ভিজিট চাইবো না!”

আমজাদ আলী হাসলেন। এবার আর সন্দেহ ভরা হাসি নয়, একদম প্রাণ খোলা হাসি যাকে বলে। বলতে শুরু করলেন-

“আমি আমার পরিবার নিয়ে উত্তরায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকতাম। বছর খানেক আগে প্রমোশন পেয়ে ব্যাংকের বাংলাবাজার শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়েছি। কিন্তু উত্তরা থেকে পুরান ঢাকায় যাতায়াত করতে কি পরিমাণ কষ্ট হয়, তা তো বুঝতেই পারছেন। শেষে বাধ্য হয়ে পুরান ঢাকায় বাসা দেখতে শুরু করলাম। ইসলামপুরের দিকে একটা ডুপ্লেক্স সিস্টেমের বাড়ি পেয়ে গেলাম, বিক্রি হবে। বাড়ির নামঃ চম্পা হাউজ। মালিক থাকে দেশের বাইরে, দেশে আর ফেরার ইচ্ছে নেই। তাই বাড়িটা বাজার মূল্যের অর্ধেক দামেই বিক্রি করে দেবে। দেখলাম দামটা আমার সাধ্যের মধ্যেই আছে। খুব বেশি চিন্তা না করেই কিনে ফেললাম। এবং কেনার পর জানতে পারলাম আসল কাহিনী।

ঐ বাড়ির মালিকের বড় বোন ছিল চম্পা, তার নামেই বাড়িটি নামকরণ করেছিলেন তাদের পিতা। মেয়েটি অল্প বয়সে গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। তারপর থেকেই বাড়িটি হন্টেড বাড়ি হিসেবে পরিচিত। সেখানে নাকি অনেক ভুতুড়ে কর্মকাণ্ড ঘটে। অনেককাল যাবৎ খালি পড়ে আছে বাড়ি, কেউ কিনতে আগ্রহী হয় না। ভুতুড়ে বাড়ি কে কিনবে বলুন? শেষে বাধ্য হয়ে মালিক অর্ধেক দামেই ছেড়ে দিয়েছে। আমার কাছে ব্যাপারগুলো খুবই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছিল। এই টুইন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে এসে ভুতের ভয়? এগুলো নিছক গুঁজব ছাড়া কিছুই নয়। আমি বাড়িটা একটু রিনোভেশন করালাম। উত্তরার ফ্ল্যাট টা ভাড়া দিয়ে দিলাম। পরিবার-পরিজন নিয়ে চম্পা হাউজে এসে উঠলাম। কিসের ভুত? সবই স্বাভাবিক। বিশাল বাড়িতে দারুণ সময় কাটছিল আমার পরিবারের সবার। কিন্তু মাসখানেক পর অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে শুরু করলো বাড়িতে। বাড়ির সব দরজা জানালা হুট হাট খুলে যাচ্ছে, আবার আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান না হতেই দেখা দিল নতুন সমস্যা। বিভিন্ন কক্ষের লাইট ফ্যান সব আপনা থেকেই জ্বলছে, নিভছে! প্রথমে মনে হল বৈদ্যুতিক গোলযোগ। কিন্তু ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী এনে সারা বাড়ি পরীক্ষা করিয়েও কোনো সমস্যা পেলাম না। মনে হচ্ছে কেউ যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে করছে কাজটা!

এদিকে পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে বাড়িটির ভুতুড়ে কর্মকাণ্ডের কথা শুনে আমার স্ত্রী সন্তানদের ভয় বাড়তে থাকলো। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করলো এগুলো আসলেই ভুতের কাজ! আমি তখনও বিশ্বাস করি নি। কিন্তু এরপর এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে বিশ্বাস না করে পারলাম না। এক সন্ধ্যায় বাড়ির ছাঁদে উঠেছিলাম হাওয়া খেতে। হঠাৎ কেউ একজন আমার পেছন থেকে পিঠে হাত রাখলো। ঘুরে দেখলাম একটা সাদা কাপড় পড়া মেয়ে আলুথালু বেশে দাঁড়িয়ে আছে। বললো, "প্রিয়তম! আমি তোমার চম্পা!" আমি আতংকে চিৎকার করে জ্ঞান হারালাম। এই ঘটনার পর আমরা বিকেলের পর ছাদে ওঠাও বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু চম্পার আত্মা আমাদের ছাড়লো না। হঠাৎ ড্রয়িং রুমের সোফায় কিংবা বেডরুমের বিছানায় চম্পার আত্মা দেখা যায়! তাকে দেখে পরিবারের সদস্যরা ভয়ে আর্ত-চিৎকার শুরু করে। ফকির কবিরাজ এনে অনেক ঝাড়ফুঁকও করা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। একটা মাস যাবৎ আতংকের মধ্যে বসবাস করছি!

আমজাদ আলী একটানা কথাগুলো বলার পর থামলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন কি করবেন ভাবছেন?"

"চিন্তা করছি বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আবার উত্তরার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবো। এভাবে আতংকের মধ্যে তো বসবাস করা যায় না! কি সুন্দর একটা বাড়ি ভাইজান! এটা ছেড়ে চলে যাব ভাবতেও খারাপ লাগছে।"

"তাহলে বাড়ির কি হবে?"

"বাড়ি ভেঙে নতুন করে বড় এপার্টমেন্ট বিল্ডিং বানাবো। কোন ডেভেলপার কোম্পানিকে দেব না। নিজের খরচে বানাবো। সেজন্য অবশ্য অনেক টাকার প্রয়োজন। অন্তত ৫ বছর টাকা জমাতে হবে।"

"৫ বছর! ততদিন কি বাড়িটা খালি ফেলে রাখবেন?"

"এ ছাড়া আর উপায় কি বলুন?" কথাটা শুনে আমি ঠোঁট টিপে হাসলাম।

"আমার কাছে কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই আপনাদের মনের ভুল।"

"হোয়াট?" লোকটা রেগে গেল এবার। "কে বলেছে সব মনের ভুল?"

"বুঝিয়ে বলছি ভাই।" আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। "আপনারা বাড়িতে উঠেছেন মাস দুয়েক হয়েছে তাই না? প্রথম একমাস ভালোই ছিলেন, তারপর থেকে শুরু হলো এইসব..."

আমজাদ আলী হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়লেন।

"নির্জন বাড়ি, পুরনো দেয়াল-দরজা-জানালা, এমনিতেই একটা ভুতুড়ে ভাব আছে বাড়িতে। তার উপর একটা মাস আপনারা প্রতিবেশীদের মুখে বিভিন্ন ভুতুড়ে ঘটনার কথা শুনেছেন। ফলে ভেতরে ভেতরে একটা ভয়ের অনুভূতি বেঁধেছে আপনাদের মনে। একা থাকা অবস্থায় সেই ভয় আতংকে রুপ নেয়। আর ঠিক তখনই আপনারা হ্যালুসিনেসন দেখছেন। আসলে ভুতুড়ে ব্যাপার কিছুই নেই এখানে।"

"কিন্তু... আমি যে চোখের সামনে মৃত চম্পার আত্মাকে দেখলাম! সেটাও মনের ভুল?"

"জি।" আমি হ্যা-বোধক মাথা নাড়লাম। "লোকের মুখে শুনে আপনার কল্পনা জগতে চম্পার একটা অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। আর হ্যালুসিনেশন এর সময় সেই অবয়বই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। পরিবারের বাকি সদস্যদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে"।

“ফাজলামি করেন আমার সাথে?” লোকটা রাগে চোয়াল শক্ত করে রেখেছে। “একটা জলজ্যান্ত নারীমুর্তি আমরা কল্পনায় দেখি? যে সমস্যায় আমরা বাড়ি ছাড়তে চলেছি, সেই সমস্যা এতো সহজে মুখেমুখে সমাধান করে দিলেন? নিজেকে কি ভাবেন আপনি? মিসির আলী?”

আমি মিস্টি করে হেসে বললাম, “আসলে আপনাকে আমার পরিচয় পুরোটা দেইনি। আমি পেশায় মনোরোগ চিকিৎসক হলেও, প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেটর হিসেবেও কাজ করি। এ পর্যন্ত ১০০ এর অধিক প্যারানরমাল ইন্সিডেন্ট তদন্ত করেছি আমি। প্রতিবারই দেখা যায়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মনের ভুল।”

“আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন চম্পার বিষয়টা আমাদের মনের ভুল?

“জি পারবো,” আমি সম্মতি জানালাম।

“যদি পারেন তাহলে যত টাকা চান, আমি দেব। চলুন আমার সাথে।”

“কোথায়?” আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম।

“আমার বাসায়। সেখানে ২৪ ঘণ্টা থাকবেন আপনি এবং প্রমান করবেন যা ঘটে সব মনের ভুল।”

“কিন্তু আমি তো বাড়ি যাচ্ছি...” আমি হতবাক কণ্ঠে বললাম, “সদরঘাট যেতে হবে আমাকে। লঞ্চের টিকিট কাটা হয়ে গেছে...”

“আরে রাখেন তো বাড়ি,” লোকটা নাছোড়বান্দার মতো মাঝা ঝাঁকাল। “একদিন পরে যাবেন না হয়। লঞ্চের টিকিট আমি কেটে দেব আবার।”

*

নাছোড়বান্দা আমজাদ আলীর জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি পরিবারের সবার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে। ভদ্রলোকের স্ত্রী মানুষ হিসেবে খুব ভালো, অমায়িক। দুই ছেলে, এক মেয়ে- তারাও খুব ভদ্র।

আমি দুপুরের খাবার খেয়েই কাজে লেগে পড়লাম। বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাই গন্ধের উৎস খুঁজতে শুরু করলাম। বাড়ির ছাদ থেকে শুরু করলাম পরীক্ষা। একদম প্রত্যেকটা ইঞ্চি পর্যবেক্ষণ করলাম। তারপর একে একে প্রত্যেকটা রুমে ঘুরলাম। বলা বাহুল্য কোথাও কোন অসামঞ্জস্য চোখে পড়লো না। সব কিছুই একদম স্বাভাবিক। এমনকি দরজা জানালা আপনা থেকে খোলা কিংবা লাইট নিজ থেকে জ্বলা নেভার ঘটনাও ঘটলো না। বিকেল নাগাদ কিচেন ঘরটা পরিস্কার করতে গিয়ে আমি তাদের এই হ্যালুসিনেশন এর কারণ খুঁজে পেলাম। পুরনো আমলের বাড়ি, কিচেনের ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ফার্নেস বানানো হয়েছে। সেই ফার্নেসে বড় একটা ফাটল ধরেছে। ফলে ধোঁয়াগুলো বাড়ির বাইরে না গিয়ে, ফাটল দিয়ে বের হয়ে সিলিং এ বাড়ি খেয়ে কুন্ডুলি পাকাচ্ছে। তারপর ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা ঘরময়। এই জন্যই কেমন যেন একটা ভ্যাপসা টাইপের গন্ধ বাড়ির ভেতরে।

“আমজাদ সাহেব, আপনাদের ভুত দেখার কারণ তো পেয়ে গেছি।”

“কই?”

আমি তাকে কিচেনে নিয়ে গিয়ে দেখালাম, “ঐ যে দেখেন ফার্নেসে ফাটল। কিচেনের ধোঁয়া বাইরে যাচ্ছে না, ছড়িয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভেতর চারিদিকে।”

“তার সাথে ভুত দেখার কি সম্পর্ক?” আমজাদ আলী হতবাক।

আমি বুঝিয়ে দিলাম বিষয়টা, “শুনুন, কিচেনের ধোঁয়ায় আছে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। এই গ্যাস মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত। এই গ্যাসের ভেতর খুব বেশিক্ষণ থাকলে মানুষ এক প্রকার বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। কার্বন মনোক্সাইড ব্রেইনে গিয়ে ইফেক্ট করে এবং ব্রেইনের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই হারিয়ে ফেলে মানুষ। ফলে তারা হ্যালুসিনেশনের বশে এমন কিছু দেখে যা তার চোখের সামনে নেই। আপনারা সবাই এই কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদিকে পাড়া প্রতিবেশীদের মুখে এই বাড়ির ভুতুড়ে কর্মকাণ্ডের কথা শুনে শুনে একটা ভয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে আপনাদের মধ্যে। তাই হ্যালুসিনেশনের বশে আপনারা চম্পাকে দেখছেন বাসার মধ্যে। এটা আসলে আপনাদের মনের ভুল। ঐ ফার্নেস ঠিক করার পর দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।”

“স্ট্রেঞ্জ!” আমজাদ আলীর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

তার বড় ছেলে মোবাইল হাতে গুতাগুতি করছিল। সে হঠাৎ বলে উঠলো, “আব্বু! এই আঙ্কেল আসলেই ঠিক বলেছেন। ইন্টারনেট ঘেটে আমিও একই তথ্য পেলাম। ডঃ উইলিয়াম ভিলমার আমেরিকান জার্নাল অব অফথালমোলজিতে আমাদের পরিবারের মতো একটা পরিবারে ঘটে যাওয়া ভুতুড়ে ঘটনার কথা বলেছেন। তারা আমেরিকার কোন এক রাজ্যের একটি নির্জন এলাকায় একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে বসবাস করতো। সেখানে নানার ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটতো। সেই পরিবারের দিন কাটছিলো ভয় ও আতংকে। ঠিক এমন সময় পরিবারের একজন দেখলো তাদের বাড়ির ফার্নেসটাতে মারাত্মক ত্রুটি আছে। ফলে পুরো পরিবার কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়ার শিকার! এই ফার্নেসটি মেরামত করে দেওয়ার পর থেকে ভুতের উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেলো। এরপর থেকে আর কখনও বাড়ির লোকেরা ভুত দেখেনি।”

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রীকে খবর দিল এসে ফার্নেস ঠিক করার জন্য। ফার্নেস মেরামত হয়ে গেল। তারপর ঘন্টা দুয়েক কেটে গেল এবং বলা বাহুল্য যে, কোন প্রকার অস্বাভাবিক কিছুই ঘটলো না।

আমজাদ সাহেব বুঝতে পরলেন যে আমার কথা ভিত্তিহীন নয়। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “আপনি ঠিক বলেছেন, বিষয়টা আসলেই আমাদের মনের ভুল ছিল। মাফ করবেন ভাই। রেগে গিয়ে আপনাকে কয়েকটা কথা শুনিয়ে ফেলেছি”।

“আরে না না কি যে বলেন,” আমিও ভদ্রতার হাসি হাসলাম।

“আপনাকে বলেছিলাম যত টাকা চান দেব। কত দিব বলেন?”

“আমার কিছুই লাগবে না ভাই,” আমি প্রবল বেগে মাথা নাড়লাম। “আপনারা নতুন বাড়ি কিনেছেন। এখানে একটু শান্তিতে থাকেন, এই কামনাই শুধু করি।”

ভদ্রলোক জোর জবরদস্তি করে আমাকে একটা ২০ হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন। আমি চলে যেতে চাইলেও তিনি দিলেন না। “রাত হয়ে গেছে ভাই। এত রাতে আর লঞ্চে উঠবেন না। আমি কাল সকালে আপনাকে টিকিট কেটে লঞ্চে উঠিয়ে দিব।”

অগত্যা কি আর করা? রাতটা থেকে গেলাম তার বাসায়। আমার থাকার জন্য গেস্ট রুমটা রেডি করে দেওয়া হল। রাতে ভরপেট খাওয়া দাওয়া করে ঘুমুতে গেলাম। আরামদায়ক বিছনায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম চলে আসলো। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি কি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য!

মাঝ রাত। আমি গভীর ঘুমে মগ্ন। মনে হলো কেউ একজন আমার গা থেকে চাদর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ঘুমের ঘোরে হাতরে হাতরে আবার গায়ের উপর চাদর টেনে নিলাম। আবার যেন কেউ টান দিয়ে নিয়ে গেলো। আবার চাদর টেনে নিলাম। একই ঘটনা তিনবার ঘটার পর আমার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসলাম। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না। বারকয়েক চোখ পিট পিট করতেই অন্ধকার একটু সয়ে এলো। আধো অন্ধকার-আধো আলোতে বিছানার পাশে একটা মানুষের অবয়ব দেখতে পেলাম। সাদা শাড়ি পড়া একজন নারী। দেখার সাথে সাথে আতংকের একটা স্রোত উঠল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

"কে... কে আপনি?"

নারী মুর্তি অসম্ভব চিকন কণ্ঠ বলে উঠলো, "প্রিয়তম, আমি তোমার চম্পা!"

আমার দুই হাত-পা প্রচণ্ড আতংকে ঠক ঠক করে কাপতে শুরু করলো। "আ... আমার কাছে কি চাও?"

"তুমি আমাকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও কেন?"

ভয়ে আমার গলা দিয়ে আওয়াজ আসছে না। কাঁপছি মৃগী রোগীদের মতো। চম্পা আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি প্রচন্ড আতংকে জমে গেছি। নড়তে পারছি না একচুলও। চম্পা এক হাত বাড়িয়ে আমার গলা ধরলও। শীতল হাতের ছয়া পেয়ে আমার সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো। প্রচন্ড শব্দে চিৎকার করে উঠলাম, "কে আছো? বাঁচাও...!!"

চম্পা আমাকে এক হাতে তুলে আছড়ে ফেললো মাটিতে। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম, "ওরে বাবারে... গেছিরে..."

বাড়ির লোকজন সব দৌড়ে এলো চিৎকার শুনে। ঘরের লাইট জ্বালাতেই দেখি- চম্পা নেই! আমি আছাড় খেয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি করছি। সবাই আমাকে তুলে ধরে বিছানায় নিয়ে শোয়ালো। প্রচন্ড আতংকে থরথর করে কাঁপছি। তারা আমার গায়ে চাদর মুড়িয়ে দিলো।

আমজাদ আলী উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে আসিফ সাহেব?"

"চ... চম্পা! চম্পা এসেছিল..." কাঁপুনির চোটে ঠিক মতো কথা বলতে পারছি না আমি। "আ... আমাকে মেরে ফেলতে চায়!"

আমজাদ আলীর হতাশ কণ্ঠে বললেন, "আমি আগেই বলেছিলাম ভাই। এটা হ্যালুসিনেশন নয়!"

আমজাদ আলীর মেয়েটা টিটকারির সুরে বলে উঠলো, "চম্পাকে তো আমরাও দেখেছি। আপনি এতো বেশি ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"চুপ বজ্জাত মাইয়া!" আমি রেগে গেলাম। "তোরা খালি দেখছোস! আর আমারে তুইল্লা আছার দিছে! মাজার হাড্ডি মনে হয় গুড়া হইয়া গেছে! ওরে মাগো..."

*

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই আমজাদ সাহেব তাদের উত্তরার ফ্ল্যাটটি খালি করালেন। তারপর চম্পা হাউজের দরজা-জানালা সব তালা দিয়ে, পরিবার পরিজন নিয়ে উত্তরায় চলে গেলেন। বাড়ি ভেঙে নতুন করে বানানোর আগে আর চম্পা হাউজে পা দেবেন না! সেই টাকা যোগাড় হতেও লাগবে অন্তত ৫ বছর!

আমজাদ সাহেব তো পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গেলেন। কিন্তু আমি এত সহজে বিষয়টা মেনে নিতে পারলাম না!

আমার মতো একজন প্যারানরমাল বিশেষজ্ঞকে একটা পেত্নী তুলে আছাড় দিয়েছে! এটা আমি মেনে নেই কি করে? সাহস সঞ্চয় করলাম।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম যে আরও আরও একবার যাব সেই বাড়িতে। ঐ পেত্নীর সাথে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে!

নির্দিষ্ট দিনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটা ব্যাগে ভরে রেডি হয়ে চম্পা হাউজে গেলাম। পাচিল টপকে বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করলাম। দরজাগুলো সব তালা দেওয়া। কিন্তু সেদিন পরীক্ষা নিরিক্ষা করতে গিয়ে বাড়ির কয়েকটা গোপন প্রবেশ পথ চোখে পড়েছিলো আমার। সেগুলোর একটা ব্যবহার করে ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে।

মাঝখানের বড় রুমটাতে এসে দাঁড়ালাম। এই রুম থেকে প্রায় সবগুলো রুমের দরজা দেখা যায়। আমি ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলাম। দুই হাতে হাত তালি দিয়ে বললাম, "কই রে চম্পা? কই তুই? সাহস থাকলে সামনে আয়!"

নূপুরের শব্দ শোনা গেল। সাথে কাঁচের চুরির টুং টাং আওয়াজ। এলো চুলে সাদা শাড়ি পড়া নারীমুর্তি বেরিয়ে এলো একটা ঘর থেকে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "প্রিয়তম, তুমি এসেছ?"

আমি হাসি মুখে দুই হাত বাড়িয়ে ধরে বললাম, "হ্যাঁ, আমি এসেছি!"

নারীমূর্তিটি দৌড়ে ছুটে এলো। ঝাপিয়ে পড়লো আমার বুকে। আমি আমার মাথার পরচুলা আর আলগা গোঁফ খুলে ফেললাম। তারপর নিজের স্ত্রীকে বুকের মধ্যে পরম যত্নে জড়িয়ে ধরলাম। হাসি মুখে বললাম, "অভিনয়টা কেমন করলাম বলো তো?"

"তুমি তো অভিনয় করেছ কেবল একদিন," নিপুণ চোখ মুখ পাকিয়ে বললো, "আমি যে এক মাস ধরে অভিনয় করছি?"

প্ল্যান সাকসেসফুল! নিপুণ আর আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করার পর থাকার যায়গা নিয়ে খুব সমস্যায় ছিলাম। আজ থেকে আর সেই টেনশন নেই। অন্তত ৫ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত!

সুইসাইড নোট

জয়নাল আবেদীন

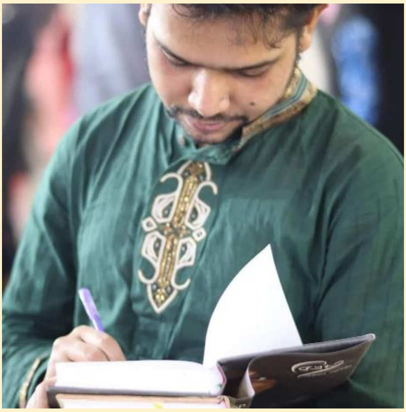

আমার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমার ঝুলে থাকার রায় হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমার দণ্ড কার্যকর করা হবে।

আমার এই বিচার কাজে বিচারক ছিলাম আমি, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীও হয়েছি আমি নিজেই। দণ্ড কার্যকর করার দায়িত্বও আমার উপর। আমার মৃত্যুকে আমি আত্মহত্যা বলতে রাজি না। আমি খুব ঠাণ্ডা মাথায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টানা দুই দিন চিন্তা করে আমি আমার নিজের বাঁচার কোন কারণ খুঁজে বের করতে পারিনি।

কেউ যদি একটা কাজের জন্য যোগ্য না হয় তবে সেখানে রিজাইন দেয়াটাই নিয়ম। অনেক হিসেব করে দেখলাম আমি পৃথিবীর জন্য যোগ্য না। এ জন্য আজ নিজে নিজেই আদালত বসিয়ে রায় শুনিয়ে দিলাম। আমি পৃথিবী থেকে রিজাইন করছি। এতে খারাপের কিছু নেই। রিজাইন না করলেও এক সময় রিটায়ার্ড করতে হয়। দুইটাই একই ব্যাপার।

আমার স্ত্রী নীলা সব কিছুতে যুক্তি খুঁজতে ভালোবাসে। তার কথা মতে যুক্তি বলছে এখনই রিজাইন করার সময়।

এখন আমি কেবল দণ্ড কার্যকর করার অপেক্ষা করছি।

একটা লেখাতে পড়েছি ফাঁসির মৃত্যুতেই নাকি কষ্ট সব চেয়ে বেশি হয়। এ সব রিসার্চকে আমার কাছে গাজাখোরী জিনিস ছাড়া কিছু মনে হয় না। কেউ কি দশ ভাবে মরার পর এসে বলেছে, ভাইরে... বিশ্বাস কর সব ভাবে ট্রাই মেরে দেখলাম ফাঁসিতেই কষ্ট বেশি। তোরা যেমনেই মর, ফাঁসিতে ঝুলিস না।

যত সব ফালতু রিসার্চ।

আমার চাকরি চলে গিয়েছে। চাকরির সাথে সাথে স্ত্রীও হাওয়া।

সাত বছর প্রেম করার পর তিন বছর এক সাথে সংসার করা স্ত্রীর সম্পর্ক আমার চেয়ে বোধহয় আমার চাকরির সাথেই বেশি ছিল। এই ঘটনাকে কি বলে যায় 'চাকরির হাত ধরে স্ত্রীর পলায়ন' নাকি 'স্ত্রীর হাত ধরে চাকরির পলায়ন?'

আমার হাতে সময় বেশি নেই। মনে মনে রসিকতা করার সময় এখন না। কেবল আমার স্ত্রী চলে গেলেও সমস্যা হত না, বাড়ি থেকে বাবা আমাকে ত্যাজ্য করেছেন।

কোন কিছুই কারণ ছাড়া হয় না। আমাকে ত্যাজ্য করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি বাবার কাছে থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা চুরি করে পালিয়েছিলাম। বাবার কাছে থেকে কৌশলে টাকা হাত করি।

আমার উদ্দেশ্য মোটেই খারাপ ছিল না, পার্টনার খারাপ ছিল। ব্যবসা ঠিক মতো চললে দুই বছরেই বাবার টাকা ফেরত দিতে পারতাম। পার্টনার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। বাবা তাঁর সারা জীবনে সঞ্চয় করা টাকা হারিয়ে মাইল্ড স্ট্রোক করে ফেললেন। তারপর হাসপাতাল থেকে ফিরে প্রথম কাজ হিসেবে আমাকে ত্যাজ্য করেছেন।

এক সপ্তাহ আগে আমার চাকরি চলে গেছে। অফিসের এমডির বিরুদ্ধে মুভমেন্ট হচ্ছে। সবাই মিলে আমাকে লিডার বানিয়ে দিল। আমি গরম গরম বক্তব্য দিলাম, সবাই তুমুল হাত তালি দিল। মুভমেন্ট যে মুখে হয় না, মাথায় হয় এটা যখন বুঝলাম তখন আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। এমডি মুহূর্তের মধ্যে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেললেন। লিড দেয়ার অপরাধে আমাকে বরখাস্ত করা হল। যে লোক আমাকে সব চেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিল সেই তিন ধাপ প্রমোশন পেয়ে পরের দিন হাসি মুখে আমার চেয়ারে গিয়ে বসল।

কান পর্যন্ত হাসি দিয়ে বলল, "শুভ সাহেব, মন খারাপ কইরেন না ভাই। রিজিকের মালিক আল্লাহ পাক। আপনি এর চেয়ে ভালো চাকরি ডিজার্ভ করেন। রাতে আমার বাসায় দাওয়াত রইল। ভাবীরে নিয়া আইনেস কিন্তু। আমার বউ নতুন এক রান্না আবিষ্কার করেছে। কচুর লতি ভর্তার সাথে মুরগী ফ্রাই। একেবারে অমৃত।"

আমার স্ত্রীকেও দোষ দেয়া যায় না। এই মুহূর্তে আমি সাড়ে সাত লাখ টাকা দেনার উপর আছি। সামনের মাসে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। চাকরি নেই, কোথায়ও যাওয়ায় কোন উপায় নেই।

আমাকে গত পরশু ডেকে নীলা বলল, "শুভ তোমার তো সব শেষ। এখন কি করবে?"

আমি বললাম, "আত্মহত্যা করব।"

নীলা সহজ গলায় বলল, "তোমার মরে যাওয়াই উচিত। তবে সেটাকে আত্মহত্যা না বলে বলো রিজাইন, জীবন থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় অপসারন।"

"হু জীবন থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াব।"

"তুমি তো মরে যাচ্ছ, আমার কি করা উচিত বল তো? তোমার সাথে সহমরণ?"

"না।"

"তোমার সামনে কোন রাস্তা খোলা নেই। মানুষ হিসেবে তুমি চূড়ান্ত বোকা, জীবনে টাকার পেছনে গিয়ে বার বার ধরা খেয়েছো। আমাকে কখনো সময় দেয়ার কথা চিন্তা করনি। আমার কোন পরামর্শ নেয়ার কোন দরকার মনে করনি। আমি কি ঠিক বলছি?"

"হ্যাঁ।"

"এখন আমার করণীয় কি?"

"আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দাও।"

নীলা বলল, "দুঃখিত। তোমাকে ডিভোর্স দেয়ার আমার কোন ইচ্ছে নেই। আমি তোমার সাথে আজকেই শেষ বারের মতো আছি। কালকে থেকেই আমি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। আমার বাবার বাড়িতে গিয়ে লাভ হবে না। আমি সেখানে থাকব না। আমার নাম্বারও বন্ধ থাকবে। আমি একটা খবর শুনতে চাই, তুমি সফল ভাবে জীবনে একটা হলেও কাজ করেছো... মরে গিয়ে। তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?"

আমি বললাম, "না।"

নীলার এত কঠিন কথা আমাকে কেন জানি স্পর্শ করল না।

আমি নীলার একটা ওড়না ফ্যানের সাথে আটকিয়ে দিলাম। টান দিয়ে পরীক্ষা করে মনে হল আমার ভর নেয়ার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। ওড়নার সাথে ঝুলে পড়া মাত্র কয়েকটা ঘটনা ঘটবে। আমার ক্যারোটিড আর্টারি ছিঁড়ে যাবে। তারপর মস্তিস্ক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। আমার কাঁধের দিকের একটা হাড়ের অংশ বিশেষ ভাঙবে। এর ফলে মাথার সাথে নার্ভ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তার কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি হাত উপরে তুলতে পারব না। বাঁচার জন্য হাঁসফাঁস করতে করতে আমি মারা যাব।

আশ্চর্য ব্যাপার আমার কোন ভয় লাগছে না। ফাঁসি দেয়া মানুষ কিভাবে মারা যায় সেটা আমি গত কালকে পড়েছি। আমার মৃত্যু প্রক্রিয়া আমার জানার দরকার আছে। ভাঙতে যাওয়া ঐ হাড়ের নাম মনে করতে পারছি না বলে কিছুটা খারাপ লাগছে।

আমি ফ্যানের নিচে থেকে সরে এলাম। মরার আগে আমার খুব দরকারি কাজ বাকি আছে। একটা সুইসাইড নোট লিখতে হবে। নীলা বার বার বলে দিয়েছে মরে যাওয়ার আগে যাতে এই কাজটা করতে ভুল না করি। ফাঁসিতে ঝুলার ঠিক আগেই এই কাজ করতে হবে। স্পষ্ট করে লিখতে হবে ‘আমি আমার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে মরতে যাচ্ছি। আমার মরার জন্য কেউ দায়ী না।’

নোট না লিখলে নীলা ঝামেলায় পড়বে। জীবিত অবস্থায় তাকে কম যন্ত্রণা দিইনি, মরার পর যন্ত্রণা দেয়ার কোন মানে নেই।

আমার মৃত্যু আত্মহত্যা না, নীলা বলে দিয়েছে। যেহেতু আমার মৃত্যু বিচারের মাধ্যমে হয়েছে তাই আমার শেষ ইচ্ছা বলে একটা জিনিস আছে।

আমি আমার ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, “জনাব শুভ, আপনার শেষ ইচ্ছে কি?”

আমি নিজেই জবাব দিলাম, “আমি একটা সিগারেট খেতে চাই। দশ মিনিট সময় লাগবে।”

“মঞ্জুর।”

আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

মা মারা গেছেন ১১ বছর হয়। মায়ের মুখ চোখের সামনে থেকে চলে গেছে। বাবার সাথেও কথা হয় না অনেক দিন। মরার আগে কি তাদের কথা চিন্তা করা উচিত?

আমি তাদের চিন্তা বাদ দিলাম। মৃত্যুর আগে আবেগ নিয়ে আসতে চাই না।

হিসেব মতে আমি জাহান্নামে যাবো। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে মরলেও জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ আমার খুব ই কম। কোন দিন বড় কোন ভালো কাজ করিনি। ধর্ম কর্ম কখনোই ভালো মতো পালন করতে পারিনি। আমি ধর্মের চিন্তাও মাথা থেকে বের করে ফেললাম।

আমি সৃষ্টিকর্তার জন্য কোন দিন কিছু করিনি, সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি কি চাইতে পারি?

যুক্তি সেটা বলে না। জীবন যুক্তিতে চলবে - এটা নীলার কথা।

শেষ সময়ে কি আমি কোন গান শুনতে পারি? গান শোনতে শোনতে আমার মৃত্যু হবে, অসাধারণ একটা ব্যাপার।

কোন বিরহ ধর্মী গান শোনা যেতে পারে। যেমন, ‘যখন আমি থাকব না কো, আমায় রেখো মনে’ কিংবা ‘চলে যায় যদি কেউ বাঁধন ছিঁড়ে কাদিস কেন মন’।

বাংলা গানের জগত এই একটা দিক থেকে অনন্য, বিরহের গানের কোন অভাব নেই।

গান শোনার ছেলে মানুষী চিন্তা আমি বাতিল করলাম।

দশ মিনিট শেষ হয়ে গেল। আমার হাতে এখন একটা মাত্র কাজ বাকি। সুইসাইড নোট লিখতে হবে...সরি রিজাইন লেটার। জীবন থেকে পদত্যাগ পত্র।

আমি ড্রয়ার থেকে ডায়েরি বের করলাম। মাঝখানের একটা পাতা বের করেই চমকে উঠলাম। নীলার হাতের লেখা,

> বাহ সাহস তো কম না, সুইসাইড করতেই যাচ্ছ? নোট একটু পরে লিখবে, যাও ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পেছনে গিয়ে দেখো...

আমার মাথা কাজ করছে না। নীলার লেখা আমার ডায়েরিতে কেন? আমি মনমুগ্ধের মতো করে আয়নার পেছনে হাত দিলাম। একটা ফুলের তোড়া বেরিয়ে এল। ফুল কিছুটা চুপসে যাওয়া অবস্থা। ফুল সম্ভবত দুই তিন দিন আগের। এখান থেকে একটা কাগজ বের হল। কাগজে একটা ফোন নাম্বার। নীলা লিখেছে,

> বে আক্কেল পরে মরবা। আগে এই নাম্বারে কল করো।

আমি ফোন হাতে নিয়ে কল করলাম।

ওপাশ থেকে রিসিভ করা মাত্র কিছুই বলতে পারলাম না। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল।

*

রাত সাড়ে এগারোটা। আমি আর নীলা একটা ফুচকা ভ্যানের পেছনে বসে ফুচকা খাচ্ছি। আমার দণ্ড কার্যকর করতে পারিনি। নীলাকে ফোন করা মাত্র এখানে আসতে বলেছে। আমি কিভাবে চলে এসেছি নিজেই জানি না। নীলা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "তার মানে সত্যি সত্যি মৃত্যু চেষ্টা করা হয়েছে?"

"হু।"

"আচ্ছা বেকুব তো, আমি জীবনে যত গুলো ভালো কাজের পরামর্শ দিয়েছি একটাও শুনোনি, শেষ পর্যন্ত মরার বুদ্ধিটাই শুনলে?"

আমি বললাম, "নীলা আমার যাওয়ার কোন রাস্তা নেই, এই একটাই রাস্তা। এই রাস্তাতেই তো আমার যাওয়া উচিত, যুক্তি তাই বলে।"

নীলা বলল, "না যুক্তি তাই বলে না। রিজাইন করা আর পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। তুমি জীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছ। রিজাইন করাকে সমর্থন করা যায়, পালিয়ে যাওয়াকে না। কাপুরুষরা সমস্যা থেকে পালিয়ে যায়। প্রকৃত মানুষ সমস্যার মধ্যে গিয়ে সমাধান খুঁজে বের করে। জীবনে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে যাত্রা শেষ না, সাময়িক সময়ের জন্য কেবল যাত্রা বিরতি। জীবনে যখন একটা রাস্তা বন্ধ হয় ঠিক তখনই আরেকটা রাস্তা খুলে যায়। তখন কেবল অপেক্ষা করতে হয় নতুন রাস্তা খুঁজে পাওয়ার।"

আমি বললাম, "কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে কেউ যদি কোন কাজের যোগ্য না হয় তবে সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত।"

নীলা বলল, "আমি বলেছিলাম, ইচ্ছে করেই ভুল বলেছি। চাকরি আর জীবন এক না। চাকরীতে নিজের ইচ্ছেয় জয়েন করা যায়, নিজের ইচ্ছেয় রিজাইন ও আছে। জীবনে নিজের ইচ্ছেই জয়েন বলে কিছু নাই। তুমি যার ইচ্ছেই এসেছো তার ইচ্ছেতেই তোমাকে যেতে হবে। যুক্তি তাই বলে।"

"হু।"

"তারপর চিন্তা করো। তুমি কার জন্য মরতে গিয়েছিলে? চাকরির জন্য, টাকার জন্য আর আমার জন্য... এই তো? তুমি কি মনে করো তুমি মরে গেলে তোমার অফিস তোমার শোকে বন্ধ হয়ে যেত? তুমি মরে গেলে আমি কাঁদতাম, বিশ্বাস করো। কিন্তু সেটা কত দিন? এক মাস, এক বছর। তারপরই আমার পথ আমি খুঁজে নিতাম। দুই বছর এখানে অন্য কারো হাত ধরে বসে ফুচকা খেতাম। যুক্তি কি তাই বলে?"

"হ্যাঁ;" আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, "কিন্তু নীলা আমি তোমার লেখাটা যদি কাকতালীয় ভাবে না পেতাম তবে এতক্ষণে মারাই যেতাম। কি আশ্চর্য যে ডায়েরির যে পাতাটা বের করলাম ঠিক সে পাতাতেই তোমার লেখা। এই পাতা মিস করলে এতক্ষণে আমি ঝুলে থাকতাম। কাল চলে যেতাম পোস্টমর্টেমে।"

নীলা হাসতে হাসতে বলল, "মিস হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তোমার ঘরে দুইটা ডায়েরি ছাড়া আর কোন কাগজ নেই। এই দুই ডায়েরির প্রতিটা পাতায় আমি এই একই কথা লিখে রেখেছি।"

আমি অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নীলা বলল, "সুইসাইড করা প্রায় প্রতিটা মানুষ নোট লিখে। আমার পুরো বিশ্বাস ছিল তুমি নোট লিখতে গেলেই আমার লেখা পড়বেই। আর মস্তিস্কের ঐ বিশেষ অবস্থায় সুইসাইড কারী প্রতিটা মানুষ অবচেতন ভাবে হলেও বাঁচার ভরসা খুঁজে। এ রকম একটা ভরসা পেলে কেউই মিস করবে না। যুক্তি তাই বলে।"

আমি বললাম, "কিন্তু তারপরও একটু বেশি রিস্ক হয়ে গেল না? আমি যদি নোট না লিখতাম, কিংবা নোট লেখার জন্য অন্য কোন কাগজ খুঁজতাম?"

নীলা মিষ্টি করে হেসে বলল, "তোমাকে লাইনে আনার জন্য কিছুটা রিস্ক নিতেই হল।"

*

এই মুহূর্তে আমার মাথায় একটা গোল টুপি। নীলা এই মাত্র আমাকে কিনে দিয়েছে।

নীলার কথা মতে আমি প্রচণ্ড হতাশ একজন মানুষ, আমার লাইনে আসার প্রথম কাজ হচ্ছে ধর্ম কর্ম করা। এ ছাড়া আমার জীবনে শান্তি আসার সম্ভবনা নেই।

নীলার পরিকল্পনা মতে আমরা আগামী সপ্তাহে গ্রামে গিয়ে বাবার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ব। নীলা বলেছে সে যে ভাবেই হোক বাবাকে মেনেজ করবে। কাজটা অনেক কঠিন কিন্তু তারপরও তাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। যে এত কিছু করে ফেলেছে তাকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আমার হাতে কোন টাকা পয়সা নেই, সাড়ে সাত লাখ টাকা ঋণ। নীলা বলেছে এই ব্যাপারে চিন্তা না করার জন্য। আমরা রাতের বেলা ফুটপাত ধরে হাঁটছি। কেন জানি সব কিছুকেই অসম্ভব সুন্দর মনে হচ্ছে।

নীলা বলল, "তুমি কোনো দিন জীবনকে ভালবাসোনি। একবার মৃত্যুর কাছে থেকে ফিরে এসেছো। এখন কি আশা করতে পারি যে জীবনকে নতুন করে ভালোবাসবে? টাকার পেছনে দৌড়ানো বাদ দেবে?"

আমি বললাম, "অবশ্যই আশা করতে পারো।"

নীলা বলল, "তোমার জীবন নিয়ে এত বড় রিস্ক নেয়ার জন্য আমি দুঃখিত। তবে তোমার জন্য বড় কোন রিস্ক না নিয়েও কিছু করার ছিল না।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "অবশ্যই, যুক্তি তাই বলে।"

নীলা বলল, "কোন যুক্তি ছাড়াই আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি। তুমি সেটা জানো না।"

একটা ট্রাক আমাদের পেছনে এসে বিকট শব্দে হর্ণ দিল।

আমি বললাম, "দেখেছো নীলা আজকে ট্রাকের হাইড্রলিক হর্ণকেও কত মধুর মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে রবি শংকর বাবুর বাঁশির মতো মিষ্টি সুর।"

নীল মুখ লাল করে বলল, "রবি শংকর বাঁশি বাজাতেন না বেকুব, সেতার বাজাতেন। না জেনে মিথ্যা বলার আর জায়গা পাওনি?"

আমি বললাম, "নীলা, একটা জিনিস খেয়াল করেছো? জগতের খারাপ মানুষদের প্রতি সৃষ্টিকর্তা একেবারে নির্দয় হন না। কিছু একটা চমৎকার জিনিস দান করেন।"

নীলা বলল, "তারপর..."

আমি মুখ কাচুমাচু করে বললাম, "আমার মতো মানুষের জীবনে তোমার মতো কাউকে পাওয়া কত বড় দান ভাবতে পারো?"

নীলা হাসল, আমিও হাসলাম।

আমাদের জীবনের এই চরম সুখের সময়ে কোন সাক্ষী নেই।

আফসোস।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

অফিস খোলার পর

ব্রত রায়

খুলছে অফিস আজকে অবশেষে
রজব আলী আগেই গেছে এসে।
কিন্তু দেখে চমকে গেল খারাপ হলো মনও
লাগছে পুরাকীর্তি যেন অফিসটাকে কোনো!
তার নিজেরও মাথায় এখন টাক
বাবরি কোথায়? গোঁফেও দেখি পাক।

মিস শিউলি এমডি স্যারের পিএস
স্যারের সকল কথায় 'ইয়েস ইয়েস' –
করাই ছিল তার ডিউটি। আজ?
তার মুখেও একশোখানা ভাঁজ!
এমডি সাবের সেক্রেটারি হয় কি বুড়ি এমন
মিস শিউলির মনের ভেতর করছে কেমন কেমন!

নুরুন্নাহার এই অফিসের হিসাব শাখায় আছে
পূর্বপাশের জানলাটা ক্যান পড়ল ঢাকা গাছে?
অবাক দেখে নুরুন্নাহার – গাছ এলে কোত্থেকে?
একটু পরেই ব্যাপার মনে পড়ল একে একে!
নাহার তখন গর্ভবতী ছিল
আগ্রহ তার টকের প্রতি ছিল –
আচার খেয়ে সেদিন নিচে ফেলছিল সে বিচি
তাই থেকে গাছ? জিভটা কেটে নাহার বলে, ছি ছি!

একটু পরে এলো হাশেম গার্ড
তার হাতে কী? মেয়ের বিয়ের কার্ড!
ছুটির আগে চান্স পেল না মেয়ে হলিক্রসে?
সময় কত দ্রুতই না যায়! থাকবে না তো বসে!

সুবল বাবুর সুরত দেখে ভাবছে সবাই কী কী
নাস্তিকতার ভক্ত ছিলেন এখন মাথায় টিকি!

একটু পরে পিওন এসে বলে
সবাই যেন মিটিংরুমে চলে।
রুশো স্যারের আজকে বিদায় ছুটির আগের দিনই
জিএম পদে কোম্পানিতে ঢুকেছিলেন তিনি।

হায় করোনার গ্রাসে
কত্তকিছু বদলে গেল সবার আশেপাশে!

আপনার ভাবনা এবং অ্যাশ, ম্যাশ ও সাকিব

রিফাত এমিল

কিছু গল্প বা গল্পের কয়েকটি চরিত্র আপনার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। আপনি ছোটবেলায় অসংখ্যবার রূপকথার গল্পের শেষে 'অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল' পড়লেও; আপনি ভেবে নিয়েছিলেন আপনার গল্পের নায়কদের রূপকথা কখনোই ফুরাবে না। আপনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাদের দেখতে দেখতে। শেষমেশ বুঝলেন, একদিন না একদিন সবাইকেই থামতে হয়। ‘ইতি’ নামক অপ্রিয় শব্দ সবাইকেই বলতে হয়।

উইলোর টুকরো, কোকাবুরা বল, তিন জোড়া দণ্ড, প্রতি দলে এগারো করে বাইশজন খেলোয়াড় যার কেতাবী নাম ‘ক্রিকেট’! আপনি খেলাটাকে মনের অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেন। যে ভালোবাসায় কোন স্বার্থ নেই, আপনার মনে পড়ে যেতে পারে এদেশীয় কোন পরিচালকের বানানো 'নিঃস্বার্থ ভালোবাসা' সিনেমার কথা। যেন আপনার আর ক্রিকেটের প্রেম দেখেই যে সিনেমার নামকরণ। আপনি ততদিনে জেনে যান ক্রিকেট শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ঝিঁঝিঁপোকা! মনে প্রশ্ন জাগে, এতো শব্দ থাকতে একটা পোকার নামের সাথে কেন মিলে যায় আপনার প্রিয় খেলার নাম?

আপনি ঝিঁঝিঁপোকার ইংরেজি প্রতিশব্দের ক্রিকেটে অসংখ্য রথীমহারথীদের দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি আক্ষেপের অনলে পুড়তেন, আপনার দেশের জার্সিতে এমন রথী কেউ নেই বলে। আপনি অন্য অনেকের ব্যাটে-বলে মুগ্ধ হতে হতে ভাবেন আপনার প্রিয় দলে এমন কেউ নেই কেন?

আপনার ভাবনার আকাশে একজন তারা হাজির হয়। ততদিনে আপনি কার্ডিফ রূপকথা জেনে যান, আপনার নায়কের উপাখ্যান শুনেন, নিজেও কিছু জানেন। আপনি দেশের শীর্ষস্থানীয় কোন পত্রিকার শিরোনামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাকে ‘আশার ফুল’ ডাকেন।

কখনো সে আপনার আশার ফুল ফুটিয়ে চারপাশ সুবাসিত করে, কখনো আশার বেলুন চুপসে যায় কলিতেই। তবুও তাকে আপনি ভালোবাসেন; ঐ যে সেই উপরোক্ত এদেশীয় পরিচালকের সেই সিনেমার নামের মতো! কখনো সে মায়াবী বিভ্রম হয়ে ধরা দিতো যেদিন ছন্দে থাকতো; তার ব্যাট থেকে ছোটা

প্রতিটি শট জন্ম দিতো সুন্দর ইনিংসের। যে ইনিংসে চড়ে আপনার প্রিয় দল জিতে যেতো। এমন অনেক প্রথম জয়ের সাক্ষী তার ব্যাট।

চলছিল বেশ! কখনো হাসি, কখনো চাপা অভিমানে। কিন্তু আপনার তারকার গল্পেও ধরা দেয় ট্রাজেডি। ম্যাচ গড়াপেটায় নিষিদ্ধ হয় নায়ক। তিনি সবার সামনে কেঁদে ক্ষমা চান। আপনি কোলকাতা নিয়ে 'ডিসেম্বরের শহর' নামের এক গান শুনেন। সে গানের একটি লাইন আপনার নায়কের জীবনের সাথে মিলে যায়! যে লাইন 'সব শীতের শেষে হয়তো বসন্ত আসেনা' আপনার ক্রিকেট আকাশে উদিত প্রথম তারকার জীবনেও ম্যাচ গড়াপেটায় নিষিদ্ধ হওয়ার পর এখনো বসন্ত আসেনি। বসন্ত, তুমি কবে আসবে আশার ফুলের জীবনে?

সময় বড্ড অস্থির, থমকে থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার ক্রিকেট আকাশে উদিত হয় আরো অনেক তারাই। তবে একটা তারা কখনো জ্বলে, কখনো নিভে। তার নিভে যাওয়ার কারণ ছিল ইনজুরি। তবে সব বাধা জয় করে জিতে যান তিনি। এতো নিভু নিভু করার পরেও এদেশের ক্রিকেট আকাশে সবচেয়ে জ্বলজ্বল তারার একটি হয়ে যান তিনি। নেতৃত্বগুণে দেশের সেরা অধিনায়ক, সাড়ে পাঁচ আউন্সের বল হাতে দেশের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। অবশ্য সে তকমা আঁটান শুধু রঙ্গিন পোশাকের ক্রিকেটেই। ইনজুরির থাবায় লম্বা হয়নি ক্রিকেটের সবচেয়ে বনেদী ফরম্যাটের টেস্ট ক্যারিয়ার।

আপনার গল্পের প্রথম নায়ক কাঁদেন, দ্বিতীয় নায়ককেও আপনি কাঁদতে দেখেন। ইনজুরির জন্য বিশ্বকাপ মিস করায় তিনি কাঁদেন। তিনি আবার ফিরে আসেন, মহাকাব্য লেখেন। যে মহাকাব্যের কিছু পাতা সাদাকালো হয়ে ধরা মেলে ইনজুরির জন্য এক পেসারের না খেলতে পারা। অন্য পাতায় দেখা যায় তার দোর্দণ্ডপ্রতাপে ফিরে এসে বাইশ গজ শাসন করা।

আপনার নায়ক শেষের গান গাওয়ার পথে আছেন। গানটা থামবে খুব দ্রুতই। তবে সময় যখন আসবে, নায়ক নিজেই থেমে যাবেন। হয়তো মিরপুরের কোন অলস দুপুরে, হয়তো কোন বিকেলের মন খারাপে। থামার প্রশ্নের জবাব তার কাছেই। তিনি কীভাবে বাইশ গজের পরীক্ষায় থামায় কতো নম্বর প্রশ্নের জবাব দেবেন, তিনিই জানেন। একদিন না একদিন তো সবাইকেই থামতে হয়।

সময়ের চাকা ঘুরে বয়স বেড়ে আপনার জীবনে ক্রিকেট ছাড়াও অন্য এক প্রেয়সী আসে। প্রেয়সীর সাথে মুঠোফোনে আলাপকালে আপনি তাকে জানান, আপনার জীবনে সে ছাড়াও অন্য একজন আছে। আপনি বুঝতে পারেন অপর প্রান্তের নীরবতা। সময়ক্ষেপণ না করে আপনি বলে দেন, আরে সেটা হচ্ছে ক্রিকেট। অপরপ্রান্ত থেকে জবাবে, আপনার সুস্মিতা হাসে। আপনি বোঝেন না সে হাসি আনন্দের নাকি ক্রিকেটকে তাচ্ছিল্যের! অতো বুঝে আপনার কাজও নেই। আপনি মিড

অন আর মিড অফের পার্থক্য বোঝেন, জানেন গালি ফিল্ডার কোথায় দাঁড়ায়। নারী হাসির মতো কঠিন সত্য আপনার না বুঝলেও হবে।

সন্ধ্যায় উত্তরে জ্বলজ্বল করা ধ্রুবতারা দেখেছেন? দেখে থাকলে আপনার ক্রিকেট আকাশেও আসে এক ধ্রুবতারা। অন্য সব তারার আলো ম্লান যার আলোর কাছে। আপনি বছরের পর বছর আক্ষেপ করেছেন, আপনার তারাদের কেউ সবচেয়ে বেশি আলো দেয়না কেন? সে তারা আপনার আক্ষেপ ঘোচায়। যে বছরের পর বছর ক্রিকেটের নির্দিষ্ট স্থানে এক নম্বর হয়ে থাকে, তার পাশে আপনার দেশের নাম থাকে। সে বিভিন্ন দেশে গিয়ে পারফর্ম করে আসে, আপনার দেশের নাম অনেক জায়গায় ছড়ায়। আপনি আনন্দে ভাসেন।

আপনার দলে ব্যাটিং বিপর্যয়, আপনার তার কথা মনে পড়ে। সে দলকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তোলে। আপনার দলের বোলাররা উইকেট নিতে পারছেনা, বড় জুটি হয়ে গেছে কিংবা ম্যাচের শুরুতেই ব্রেক থ্রু দরকার, আপনার তাকে মনে পড়ে। সে এসে দলের চাহিদা পূরণ করে। বাউন্ডারি লাইনের তাকে দেখা যায় দুর্দান্ত কোন ক্যাচ নিতে কিংবা চার বাঁচাতে। এই ক্রিকেট নায়ককে দেখে আপনার ছোটবেলায় কুসুমকুমারী দাশের লেখা আদর্শ ছেলে কবিতার কথা মনে পড়ে। যে কবিতার প্রথম দুই লাইন ছিল এমন, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?'

আপনার নায়ক কাজে প্রমাণ করেন তিনি কেনো তার সময়ের সেরা। সর্বশেষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ কিংবা এর আগেপাছেও এমন অসংখ্য প্রমাণ তিনি করেছেন।

আপনার ক্রিকেট গল্পের আগের দুই নায়কের মতো তিনিও কাঁদেন। আগের দুজনের মতো তার কাঁদার পরিস্থিতি ভিন্ন। তিনি কাঁদেন দুই রানের আক্ষেপ মেটাতে না পেরে। আপনি তাকে বেশ শক্ত মানসিকতার মানুষ হিসেবে চিনতেন। আপনার ধারণা ভুল প্রমাণিত করে তিনিও শিশুর মতো কাঁদেন।

কাঁদতেন না, অন্য সতীর্থরা তার কাছে এসে কাঁদায় তিনি সম্ভবত নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। নায়কদের কান্না আপনাকে স্পর্শ করে, আপনি উত্তর পেয়ে যান ক্রিকেট শুধুই খেলা না তারচেয়েও বেশি কিছু। কখনো কখনো তা আবেগেরও, তাই নয় কী?

সেই কান্নার পরের সকালে আপনি দেশের শীর্ষস্থানীয় কোন পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় শিরোনামে লেখা দেখেন; 'এত কাছে তবু এত দূর!' এরপর থেকেই আপনি বিশ্বাস করেন, আপনার নায়কের হাতে একদিন উঠবে বড় কোন ট্রফি, সেটি সম্ভবত বিশ্বকাপ। আপনি জানেন, 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর!' আপনি তাই পাওয়া না পাওয়ার জীবনে এই প্রশ্নের জবাবটা ছেড়ে দেন মহাকালের কাছেই।

ক্রিকেট শুধু নায়কোচিত কিছু ঘটনায় আপনাকে নায়ক চিনিয়েছে তাই নয়। এই ক্রিকেট আপনাকে জীবনের পথে চলতে শিখিয়ে গেছে বিনয়ী হতে, অন্যকে সম্মান করতে। ছোট্ট ঘটনায় শেষ করা যাক, আপনি কোন এক ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময় নিজেদের জাতীয় সঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে বসে যায় অন্যদলের জাতীয় সঙ্গীত এলে। আপনার পাশে খেলা দেখা বন্ধু, আপনাকে আবার দাঁড়াতে বললে আপনি জবাব দেন, আরে অন্য দল। আপনার বন্ধুর জবাব, আরে একটা দেশের জাতীয় সঙ্গীত তো; উঠে দাঁড়া। আপনি অন্যকেও সম্মান দেওয়ার গুণ শিখেন আপনার বন্ধু কিংবা সেই ক্রিকেট ম্যাচ থেকে। বিনয়ী হওয়া কিংবা অন্যকে সম্মান করার শিক্ষা আপনাকে শিখিয়ে যায় ক্রিকেট। যে শিক্ষা আপনাকে কাজে দেয় জীবনের পথেও চলার...

কবিতা

ফেরেশতা

প্রসেনজিৎ রায়

আমার দুই কাঁধে দুইজন ফেরেশতা লিখে যাচ্ছেন অনর্গল হিসেব;
মা-বাবার কবরের মতোই বয়ে বেড়াচ্ছি তাদের, অথচ কাউকেই ছুঁতে পারি না।
প্রথমবার নামাজে দাঁড়াবার আগে কাঁধের উপর হাত রেখে বাবা আমাকে
চিনিয়েছেন পৃথিবীতে পথ চলার প্রথম কোনো ধারাপাত।
নামাজটা কী!
ফেরেশতা কারা।
কোন কাঁধে কেরামন, কাতেবিনই বা কে!
ফেরেশতাদের ডানা থাকে শুনে ফেরেশতা দেখবো বলে বহুদিন চোখ
রেখেছিলাম পাখির পালকে।
একদিন শুনলাম, ফেরেশতারা পাখি নয়।
ভীষণ কান্না পেলো,
আমার কান্নায় ফুলে উঠেছিলো চোখ।
বাবা বললেন, “কাঁদতে হলে আল্লাহর দরবারে কাঁদো।
নামাজে দাঁড়ালেই খুলে যাবে জান্নাতের কপাট;
ফেরেশতারা জান্নাতেও থাকেন।”

আমি কান্না থামিয়ে দিয়ে বাবার কোলের কাছে চুপ হয়ে শুয়ে ছিলাম সুদীর্ঘ দুপুর।
সুযোগের শেকল পেয়ে পৌষের তাপমাত্রার মত নেমে গেলো ঘড়ি।
আসরের আজান হলো,
বাবা উঠে শেষ করলেন ওযু;
জায়নামাজ হাতে নিয়ে এগিয়ে আসলেন মা।
ফেরেশতা না দেখার সম্পূর্ণ আক্ষেপ নিয়ে প্রথমবার পিছু পিছু খুদে পায়ে হেঁটে এলাম নামাজের ঘরে।
আমি নামাজে দাঁড়ালাম; নামাজে দাঁড়ালেই খুলে যায় জান্নাতের কপাট।
সেজদায় খুলে রাখলাম ভেতরের শোক।
সালাম ফেরাতেই ঘাড় সোজা চেয়ে দেখি নামাজে ডুবে আছেন বাবা; তার পাশে মা'ও।
সেই প্রথম কাছ থেকে আমার 'ফেরেশতা' দেখে চোখ ভরে গেলো!
সত্যিই তো, নামাজে দাঁড়ালেই খুলে যায় জান্নাতের কপাট!
বাবা মিথ্যে বলেনি; ফেরেশতারা জান্নাতেও থাকেন।
নাহলে বাবা'ও বা অমন করে চলে যাবেন কেন?
কিছু দিন বাদেই কেন চলে গেলেন মা'ও?
আমি নামাজে দাঁড়াই,
কান্নায় কাঁপিয়ে দেই আরশ;
সেজদা দেই, রুকু করি; সালাম ফেরাই;
অথচ আমার পাশ ঘেঁষে আমার ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকে না আর।
পৃথিবীর ধারাপাতে আমার দুই কাঁধে দু'জন ফেরেশতা লিখে যাচ্ছেন অনর্গল হিসেব;
মা-বাবার কবরের মতই বয়ে বেড়াচ্ছি তাদের।
জানি এখানেই তারা আছেন, অন্তরে টের ও পাই;
অথচ,
ফেরেশতাদের আমি ছুঁতে পারি না আর!

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

অজগর

মোঃ ফরহাদ চৌধুরী শিহাব

“দাদী? অ দাদী? ভাত হইছে?”
রিনরিনে গলায় রাণী ডাকে।

নূরজাহানের বাম চোখে ছানি পড়েছে মাস খানেক হচ্ছে। অন্য চোখটা দিয়ে চল্লিশ ওয়াটের টিমটিমে বাতিটার নিচে মাটির কাঁচা মেঝেতে পা ছড়িয়ে খালি গায়ে বসে থাকা চার বছরের রাণীর দিকে তাকায়। ঢোলা সুতি কাপড়ের বেগুনী হাফ প্যান্টটার কোমরের দিকে গোল করে পাকানো। রাবারের ভেতর কিছু গুটিয়ে রেখেছে বোঝা যাচ্ছে। হাড্ডিসার পাজরের হাড়গুলোর নিম্নদেশে সেই পাকানো জায়গাটা চোখে লাগছে খুব। শিল্পকলা চত্বর থেকে নাতনিকে নিয়ে আসার সময় আজকে প্যান্ট হাতিয়ে দেখা হয়নি। মাটির চুলায় হাড়িতে ভাত চাপিয়ে জির্ণ আঁচলে মুখের ঘাম মুছে হাত বাড়িয়ে রাণীকে ডাকলো নূরজাহান। রাণী সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। তারপর উঠে গিয়ে দাদীর কাছে যায়। নিজের অজান্তেই বাম হাতে প্যান্টের সেই পাকানো রাবারটা চেপে ধরে রেখেছে।

“হাত সরাইবি নাকি লাকরির ছ্যাঁক দিমু?” ঠাণ্ডা গলায় নূরজাহান বলে।

রাণী সঙ্গে সঙ্গে ভীতমুখে হাত সরিয়ে নেয়। বড় বোন আফিয়াকে তিন চারদিন আগেই হাটুর কাছে গরম লাকরির ছ্যাকা দিয়েছিল দাদী। তার কথা না শুনলে প্রায়শই এরকম করে। রাণী আগুন ভয় পায়।

নূরজাহান লোহার মতো শক্ত হাতে রাণীকে টেনে এনে প্যান্টের গোটানো রাবারের ভাঁজটা খুলতেই টুন টুন করে পাচ সাতটা এক টাকা আর পাঁচ টাকার পয়সা গড়িয়ে পড়ল চুলার লালচে আগুনের মাঝে রূপালি রঙ ছিটকে দিয়ে। একটা বরইয়ের বার্মিজ আচারও রয়েছে, আধ খাওয়া প্যাকেট।

শান্ত মুখে রাণীকে ঝটকা দিয়ে ছেড়ে মেঝেতে ছড়িয়ে যাওয়া পয়সাগুলো গুণে গুণে তুলে নিল নূরজাহান। চৌদ্দ টাকা মোটে। রাণীর দিকে পয়সাগুলো হাতের তালুতে তুলে নূরজাহান কঠিন গলায় বলল, “সারাদিনে এই কয়ডা পাইছোস? নাকি আফিয়ার মতো চুরি চামারি শিখছস? পয়সা আইনা বাহিরের লেট্রিনের বাঁশের ভিতর জমায়া রাইখা আমারে দশ বারো টাকা দিতাছস নাতো? হাচা কবি।”

রাণী ভয়ার্ত মুখে মাথা নাড়ায়। সে চুরি করে আর কিছু লুকিয়ে রাখেনি। মাস খানেক আগে বড় বোন আফিয়া বাহির থেকে ভিক্ষা করে টাকা এনে দাদীকে সব না দিয়ে বাহিরের লেট্রিনের একটা

বাঁশের খুঁটির মধ্যে জমিয়ে রাখার ব্যাপারটা ধরে পড়ে গিয়েছিল নূরজাহানের কাছে। নূরজাহানের এক চোখে ছানি পড়লেও অন্যচোখে শকুনের মতো দৃষ্টি। তার চোখ এড়িয়ে টাকা জমানোর ঘটনা ধরা পড়ে যাওয়ার পর আফিয়াকে চুল ধরে টানতে টানতে পলিথিনের ছাউনির ঘরটার ভেতর এনে ইচ্ছামত লাথি ঘুষি মেরেছে। এরপর রাগ সামলাতে না পেরে আফিয়ার হাটুতে জ্বলন্ত কাঠের ছ্যাকা দিয়েছে।

আফিয়া বাঁধা দেওয়ার সুযোগ পায়নি। তেরো বছর বয়স তার। দাদীর চল্লিশের ওপরে। সারাদিন কনট্রাক্টরের সাথে রোডের পিচ ঢালাইয়ের আগে সুরকি বেছানো আর ইট ভাঙ্গার কাজ করে নূরজাহান। দুবলা শরীরের মধ্যে জানোয়ারের মতো অসম্ভব শক্তি। রোদের নিচে সারাদিন আগুনে তেঁতে কাজ করে করে নূরজাহানের মাথা গরম থাকে সব সময়। আগুনের ছ্যাকা দেয়াটা নতুন বিষয় না। নাতনি তাকে না জানিয়ে টাকা চুরি করে রেখে জমাবে কেন?

অবশ্য শেষ রাতে নূরজাহানের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসে সব সময়। কারণ রাণী আর আফিয়া ঘুমিয়ে গেলে তাদের পলিথিনের ছাউনির বাহিরে কনট্রাক্টর সাদেক মিয়াঁ এসে দাঁড়ায়। মদের তীব্র ঘ্রাণ এখন ঘুমের মধ্যেও টের পায় রাণী আর আফিয়া। কিন্তু জেগে ওঠা বাড়ন এই সময়। নূরজাহান মিষ্টি জর্দা দেয়া পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে যায় ঘরটা থেকে। ফযরের আযানের ঠিক আগ মুহূর্ত করে আবার ফিরে আসে। বাহিরের কলতলায় টিউবয়েল চাপা আর পানি ঢালার শব্দ পাওয়া যায়। ভেজা কাপড়ে ঘরে ঢুকে আফিয়াকে ধরে শুয়ে পড়ে নূরজাহান। তার ভেজা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেলেই আফিয়া চমকে জেগে ওঠে প্রতিবার। সেরাতেও ফেরার পর নূরজাহানের ভেজা ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগতেই আফিয়া চমকে জেগে উঠেছিল। হাটুর কাছের দগ দগে ঘাঁ টা জ্বলছে তখনও। ভয়ার্ত মুখে অন্ধকারের দাদীকে দেখার চেষ্টা করে।

নূরজাহানের মুখ থেকে ভক ভক করে কড়া বাজে মদের গন্ধ আসছে। আফিয়াকে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করে, "টাকা চুরি করছিলি ক্যানরে খানকি?"

আফিয়া কাঁপা গলায় বলে, "জামা ছিঁড়ে গেছে দাদী। একটাই জামা আর কত সিলাই কইরা পরা যায়? বাইরে গেলেই বেটা ছেলেরা জামার ছিঁড়ার দিকে ক্যামুন ক্যামুন করে জানি চাইয়া থাকে......"

"অ! জামা কিনার লাইগা টাকা জমাইতেছিলি বান্দির বেডি?" দরদ ভরা গলায় বলে নূরজাহান। ঘুমের আভাস পাওয়া যায় গলায়। নেশাগ্রস্থের মতো ঘুমে টলছে।

ফুঁপিয়ে ওঠে আফিয়া, "কনট্রাক্টরের পোলা মিজাইন্না ঐদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি আসার সময় আমারে ইলেক্ট্রিক পিলারে চাইপা ধরছিল... বুকে হাত দিছে......"

নূরজাহান চাপা ক্ষোভ জমা গলায় বলল, "মাগির পোলার ** গরম হইছে মনে হয়? বেলেড লয়া ঘুরবি এখন থেইকা। গায়ে হাতাইলে একেবারে কাইটা হাতে ধরায়া দিবি। মনে রাখিস, মাইয়া হইয়া জন্মানোর এইটা হইলো সব চাইতে বড় সুবিধা। তোর আর কি ক্ষতিটা করবো? তুই ওর সবচাইতে বড় ক্ষতিডা করবার পারবি। পুরুষ মাইনসের চাইতে দূর্বল চিজ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টা নাই। তাবত বুদ্ধি রানের চিপায় নিয়া ঘুরে।"

আফিয়া নূরজাহানের মতো এত সাহসী নয়। এই একই লোকের অত্যাচারে থাকতে না পেরে তাদের মা জুবায়রা পালিয়ে গিয়েছিল। কনট্রাক্টরের ছেলে মিজানের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশ যে কোনোটাই হতে পারে। সাদেক মিয়াঁর রোড কন্সট্রাকশনের কর্মীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশি।

নূরজাহান, জুবায়রা কিংবা নূরজাহানের মৃত ছেলে সুলতান সবাই এখানেই কাজ করত। লোকমুখে শোনা কথা, জুবায়রার দিকে নজর পড়েছিল মিজানের। সুলতান মাঝখানে একদিন ঝামেলা করেছিল। গরম পিচের একটা বালতি ফিকে মেরেছিল মিজানের দিকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। এরপর প্রায় মাস খানেক মিজান চুপচাপ ছিল। জুবায়রাকে শান্ত চোখে দেখে গেছে কাজ করার সময়। সুলতানকেও দেখতো। কিছু বলেনি।

তারপর একদিন সুলতান গায়েব হয়ে গেল। অনেক খোঁজা খুঁজির পর এক সপ্তাহের মাথায় কন্সটেবল জসিম উদ্দিন সুলতানের লাশ পেল সিটি কর্পরেশনের একটা বিশাল ডাস্টবিনের ভেতর। চেনার উপায় নেই। গরম পিচ ঢেলে গোটা মানুষটাকেই পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। চুল, ভ্রু কিংবা আলাদা করে চেনার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য বাকি নেই। কেবল সুলতানের দুই পায়ের কনে আঙ্গুল দুইটা করে ছিল। সেটা দেখেই চেনা গেছে যে নূরজাহানের ছেলে এটা।

নূরজাহানের বেঁচে থাকা সন্তানদের মধ্যে সুলতানই কেবল সাথে ছিল এতদিন। বাকিরা কেউ জেলে আছে, কেউ বর্ডার পার হয়ে মিয়ানমার চলে গেছে। সুলতানের পর জুবায়রা আর নাতনি দুটো বাকি ছিল। কিন্তু এর মাঝে মিজানের ভয়াবহ রকমের হুমকি ধামকিতে এক রাতে কাউকে কিছু না বলে জুবায়রা পালিয়ে গেছে। আশেপাশের অনেকেই নাকি দেখেছিল মিজান এসিড ছুড়ে অন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে জুবায়রাকে। হয় রাত কাটাবে নয় এসিড মারবে।

জুবায়রা আফিয়াদের জন্য নিজেকে বেঁধে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। পালিয়ে গেছে। ক্ষুধা, মাতৃত্ব আর পঙ্গুত্বে শেষ পর্যন্ত পঙ্গুত্বের ভয় জিতেছে। সভ্য পৃথিবীর মানবিকতার চর্চা এখানে নেই। আফিয়া নূরজাহানের কাছ থেকে সরে এসে ঘুমন্ত রাণীকে জাপ্টে ধরে ঘুমিয়ে গিয়েছিল ফোঁপাতে ফোঁপাতে।

আজকে রাণী আর নূরজাহান আগে আগে ফিরেছে ঘরে। শহরের এই উচ্ছিষ্ট পলিথিনের ছাউনির বস্তির জমে থাকা ময়লা পানিতে পা ফেলে অলিগলি ঘুরে আফিয়ার ফিরতে রাত হয়ে গেল। নূরজাহান আফিয়াকে কিছু বলল না। কোথায় গিয়েছিল ভিক্ষা করতে সেটাও জিজ্ঞেস করেনি। তবে অন্যান্য দিনের মতো আজকে টাকা লুকিয়ে রাখেনি। পাজামার গোছ থেকে নব্বই টাকার মতো খুচরা টাকা পয়সা বের করে দিয়ে নীরবে শুয়ে পড়েছে। ভাত খায়নি। গোসলেও যায়নি।

“ভাত খাবি না?” নূরজাহান চিন্তিত গলায় ডাকে।

“ক্ষিদা নাই দাদী। পেট ব্যথা। শরীর ভালা না। জ্বর আসতেছে মনে হয়।” আফিয়া ক্লান্ত মুখে বলে।

রাণী বিশাল একটা টিনের থালা নিয়ে বসে আছে পাশেই। গরম মাড় মাড় ভাত দেয়া হয়েছে। লবণ আর পেঁয়াজ। তরকারি নেই। ময়লা হাতেই খাবলা খাবলা করে ভাত তুলে খাচ্ছে। নূরজাহান বিরক্ত মুখে বলল, “পেটে ব্যথা আইবে জানা কথা। ভাত না খাওয়ার সাথে কী সম্পর্ক? উইঠ্যা ভাত চাইট্টা খাইয়া ল। ভাত রান্ধে ফালাইছি না?”

আফিয়া কঁকিয়ে ওঠার মতো করে বলল, “খামু না কইলাম না? এত ত্যাজ দেখাও ক্যান বুড়ি? রাণীরে দেও খাইতে। রাক্ষস একটা সেয়।”

নূরজাহান দ্বিরুক্তি করলো না। আরেকটা থালা নিয়ে রাণী আর সে বাকি ভাতগুলো ভাগাভাগি করে খাওয়া শুরু করে দিল। চুলায় এক মগ পানি ঢেলে ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকা লাকড়িগুলো নিভিয়ে দিল। ছ্যাঁত করে শব্দ করে মরা ধোঁয়া ওঠা শুরু করল।

শব্দ করে পেঁয়াজ দিয়ে মাড়ওয়ালা ভাত খেতে খেতে আড় চোখে নীরবে আফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে নূরজাহান। ছানি পড়া চোখটায় অদ্ভুত লাগে সেই দৃষ্টি।

রাতে সবাই বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায় আফিয়া। কোনো রকম শব্দ না করে সোজা হয়ে উঠে বসে অন্ধকারের মাঝে। গায়ের সাথে লেপ্টে থাকা রাণীকে সাবধানে সরিয়ে নিয়ে পাজামার গিঁট থেকে দুটো কানের বল বের করে। খাঁটি সোনার জিনিস কিনা জানে না। কান ফুটিয়েছিল বহু আগে। শলা দেয়া থাকে কানের ফুটাতে। নাকের ফুটাতেও একই। নিঃশব্দে কানের লতির শলা টেনে বের করে একটা একটা করে বলগুলো পরে। ব্যথা করে অনভ্যস্ততায়। তবু অন্যরকম একটা সুখ সুখ লাগে। চুপ চাপ দুই কানে সোনালি বলদুটো পরে অন্ধকারে বসে থাকে আফিয়া। কোনো হাসি কিংবা আনন্দ কান্না থাকে না সেই বসে থাকার মাঝে। চুরি করা একটা চাপা উচ্ছ্বাস কেবল জ্বল জ্বল করতে থাকে চোখের তারায়। অন্ধকারে যা দেখা যায় না।

শেষ রাতের দিকে কনট্রাক্টর সাদেক মিয়াঁর তীব্র মদের ঘ্রাণ আর মাতাল গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র দ্রুত শুয়ে পড়ে আফিয়া। পাশ থেকে নূরজাহান ঘুম ঘুম মুখে উঠে বেরিয়ে যায় এক খিলি জর্দা পান হাতে নিয়ে। নূরজাহান বেরিয়ে যাওয়া মাত্র আফিয়া উঠে বসে রাণীকে ধাক্কাতে থাকে জাগার জন্য। অন্ধকারে রাণী বড় বোনের আচমকা ধাক্কা খেয়ে ভয় পেয়ে জেগে ওঠে। আফিয়া হাতড়ে সুইট দিয়ে বাতিটা জ্বালাতেই চোখ কচলে তাকায় রাণী, "কী হইছে বু? সকাল ত হয় নাই অহনো!"

"আমারে দ্যাখ?" আনন্দিত মুখে খোলা শন পাটের মতো চুল কানের পেছনে সরিয়ে দিয়ে দুই কানের বলগুলো দেখায়।

রাণী চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর অবাক হবার গলায় বলে, "এইগুলা কইত্থে পাইছো বু? চুরি করছো তুমি?"

"না! মিজান দিছে......"

রাণী কিছু বুঝতে পারে না। মিজানকে ঠিকমত নাম ধরেও চেনে না সে। তার বয়স মানুষ চেনার মতো হয়নি। বস্তু চেনার বয়স হয়েছে সবে। হাত বাড়িয়ে বোনের কানের বলদুটো ধরে দেখে অবাক হয়ে। "কী সোন্দর!"

আফিয়া কানের বলগুলো খুলে আবার পাজামার ভাঁজের ভেতর লুকিয়ে ফেলে, "দাদীরে কইস না। না কইলে তোরে শীগগির একটা নয়া জামা কিন্না দিমু।"

রাণী বোকার মতো খুশী হয়। "হাচা?"

"হ। এখন শুইয়া পড়। দাদী চইলা আইলে আর জ্যান্ত রাখবো না।" বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে দুই বোন।

অন্ধকারে নীরব কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়।

আফিয়ার ঘুম আসছে না। রাণী কি ঘুমিয়ে গেছে? "রাণী?"

"উঁ?"

"ঘুমাইছস?"

"ক্যান?"

"মিজান লোকটা খারাপ না আসলে। বুঝলি? রাতে কইছি না যে আমার পেটে ব্যথা? ভাত খামু না? আসলে আমি খাইয়া আসছি। নান্নার বিরিয়ানি। এই আমার নখে এখনো বিরিয়ানির ঘ্রাণ লাইগা আছে!"

রাণী অন্ধকারে বোনের হাতের ঘ্রাণ নেয়। আসলেই খুব দামী খাবারের ঘ্রাণ লেগে আছে। খিদায় পেট মোচর দেয় ছোট মানুষটার, “বু? আমারেও খাওয়াবা?”

“ক্যান! জামা দিমু তাতে হয় না? তোর বয়স হইলে তুই খাইস কাম কইরা। এখন আমি কাম কইরা খাইতেছি।”

“কি কাম? আমিও করমু।” রাণী বায়না করার মতো করে বলে। বোনের হাত ধরে টানে অবুঝের মতো।

অন্ধকারেই ঠাস করে চড় মারে আফিয়া। চড় খেয়ে হাত ছেড়ে দেয় রাণী। সাপের মতো হিসিয়ে উঠে আফিয়া, “বেশি কথা কবি না। যেমনে রাখছি তেমনে থাকিস। নাইলে চুলার মধ্যে লাকড়ি সুদ্ধা চাইপা দিমু। ধলা শরীল আর ধলা থাকবো না!”

“তুমি খালি আমারে রঙের খোটা দেও ক্যান বু?” রানী দুঃখ পাওয়া গলায় বলে। আফিয়া রাণী অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণের হওয়ার কারণে রাণীকে প্রায় সময়েই তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। নিজের গায়ের কালো রঙ নিয়ে আক্ষেপের শেষ নেই আফিয়ার। মিজান নিজেই একদিন পথ আগলে বলেছি, “তর চেহারার কাটিং দেইখা আসলে মাথা মুথা আউলায় যায়। রঙটা আরেকটা ধলা হইলে কি এমন মসিবত হইতো? বিয়া কইরা রাজরাণীর মতো রাখতে পারতাম।”

আফিয়া মড়িয়া হয়ে বলেছিল, “তাইলে আমারে না ছুঁইলেই হয়? রাস্তা থামাও কিয়ের লাইগ্যা?”

মিজানের দৃষ্টির চেনার বয়স আফিয়ার বহুকাল আগেই হয়েছে। শরীরের বয়স হতে কেবল সময় লেগেছিল। এখন যেটা একবেলা বিরিয়ানির সওদা করে সবার অজান্তে। নিজের পিতার খুনির সাথে এক বেঞ্চে বসে বিরিয়ানি খাওয়ার মতো দৈন্যতায় কবে তাকে পেয়েছে নিজেও জানে না।

উত্তরের গলির নান্নার বিরিয়ানির টিনের দোকানের বেঞ্চে বসে আজ সন্ধ্যায় যখন তৃপ্তি করে বিরিয়ানি খাচ্ছিল আফিয়া, পাশেই মোটর সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি ফুকাচ্ছিল মিজান। চোখে সানগ্লাস। সানগ্লাসের আড়ালের চোখ দুটো ময়লা কাপড়ে ঢাকা তেরো বছর বয়সী মেয়েটার সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল। আফিয়া সমস্ত কিছুই টের পায়। তার ইন্দ্রিয় প্রখর। ইচ্ছা করেই একপাশে ফেলে রাখা ওড়নাটা আর তুলে ঠিক করে না।

এই অসংজ্ঞায়িত ক্ষুধার ব্যবসায় ময়লা ওড়নার অন্তরাল বড় প্রকট অস্বীকৃতির প্রকাশ। আফিয়া সেই অস্বীকৃতি জানায়নি। সে জানতে শুরু করেছে ক্ষুধার ওপরে জাত সত্য বলে কিছু নাই। লোক লজ্জা কিংবা দ্বিধান্বিতের আড়ম্বর যেখানে কেবল অপ্রয়োজনীয় মানবিকতা। তবে সেই অলিখিত জাত সত্যের নিচে যাবতীয় লৌকিক ধর্ম, সংস্কার আর সমাজ বিদ্যমান। যেগুলোকে গোনার মতো সময় মিজান কিংবা আফিয়ার না করলেও চলে।

শেষ রাতে যথারীতি নূরজাহানের ফিরে আসার আওয়াজ পাওয়া যায়। কলতলায় পানি ঢালার চেনা পরিচিত শব্দ, এরপর ভেজা কাপড়ে আফিয়াকে ধরে ঘুমিয়ে যাওয়া।

ঘুমানোর আগে নিজে থেকেই ডেকেছিল নূরজাহান, “জাগে আছস? আফিয়া?”

আফিয়ার উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। ঘুমানোর মতো ভান করে কেবল বলে, “উঁ?”

“ভাবতেছি এরপর থেকে তোরে আমার সাথে কাজে নিমু। আমার চোখ তো একটা যাইতেছে গা। তোরে কাজ শিখায় দেওয়া লাগে। সাদেক মিয়াঁর দলে কাম করলে ফায়দা অনেক। ভিক্ষা করার বয়স গেছে গা তর।”

আফিয়া উত্তর দেয় না। দাদীর সঙ্গে রোদে পুড়ে পিচ গলিয়ে রাস্তায় ঢাকা, সুরকি বেছানোর কাজে টানে না তাকে। এর চেয়ে ভিক্ষা করা ঢের সহজ। কিন্তু উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। নূরজাহান জবাব না পেয়ে ঘুমিয়ে যায়।

কিন্তু আফিয়া ঘুমাতে পারে না। জেগে থাকে। নাকে ঘ্রাণ ভেসে আসতে থাকে নান্নার বিরিয়ানির। নতুন পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ আর মুরগীর বাড়ন্ত ঝোল দিয়ে রিবিয়ানী। অনেকগুলো কালো কালো গরুর মাংসের টুকরো, সাথে লেবু। আফিয়া চোখ মুদে সেই বিরিয়ানির প্লেটে আঙ্গুল ডুবিয়ে মজা পায়। নিজের অজান্তেই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়।

দিনের বেলা ঘর থেকে নূরজাহান, আফিয়া আর রাণী তিনজনে এক সাথেই বেরিয়ে যায়। আফিয়া শহরের লোকাল বাসে চলে অন্য দিকে চলে যায় ভিক্ষা করতে। নূরজাহান রাণীকে রেখে আসে শিল্পকলার দিকে। ভার্সিটির উঠতি ছেলে মেয়েরা ঐদিকে চা সিগারেট খেতে যায়। রোগা পটকা রাণীকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখলে মায়া করে টাকা পয়সা দেয়। কিংবা ওরা যখন কিছু খেতে যায়, রাণীকে শিখিয়ে দিয়েছে নূরজাহান, সামনে গিয়ে হাত পেতে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে একসময় বিরক্ত হয়েও খাবার দিয়ে দেবে। এর বাহিরে পয়সা কড়ি কিছু হাতে এলে মন্দ না। দিন শেষে নূরজাহান রাণীকে গিয়ে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে রাণীর হাতে ভাল মন্দ খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশও পাওয়া যায়। দাদীকে ভাগ দেয়া নিয়ে আপত্তি নেই রাণীর। নিজের উপার্জনের প্রতি তেমন একটা মমতা নেই। তবে আচার আর আইসক্রিম জাতীয় জিনিস পেলে নিজে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করে। এ নিয়ে নূরজাহানের অভিযোগ নেই। চার বছরের উপার্জনক্ষম নাতনিকে এটুকু ছাড় দেয়াই যায়।

তবে সেদিন জ্বর এসে যাওয়াতে রাণীকে আর শিল্পকলায় দিয়ে আসেনি নূরজাহান। ঘরেই শুইয়ে রেখে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল সে আর আফিয়া। আফিয়াকে বলে দিয়েছিল দুপুরের আগেই যেন ফিরে আসে। সারাদিন রাণী একা থাকতে পারবে না। পাশের ঝুপড়ীর বুড়িটাকে বলে গিয়েছিল মাঝে মধ্যে এসে দেখে যেতে।

সূর্য যখন মধ্যাহ্নের দিকে গড়াচ্ছে আফিয়া সেই সময় ফিরে এসেছিল। ওদের পলিথিনের ঝুপড়ির সামনের গলিতে চেনা পরিচিত একটা মোটর সাইকেল দেখতে পেয়ে খানিকটা সন্দিহান মুখে ঘরের দিকে এগোয়।

পলিথিন আর বাঁশের বেড়ার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ধাক্কার মতো খায়। বাহিরের উজ্জ্বল আলো থেকে ভেতরে এসে আবছা অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগে। পরিচিত একটা মিষ্টি ঘ্রাণ নাকে এসে বাড়ি খায়।

ঘরের মেঝের মধ্যে আধ খাওয়া নান্না বিরিয়ানির একটা প্যাকেট পড়ে আছে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পোলাউয়ের চাল, মাংসের টুকরা, কাঁচা পেঁয়াজ মরিচ। আফিয়ার বুকের ভেতর ভারি কিছু একটা চেপে বসে আতঙ্কের মতো। মেঝের বালু মাটির ওপর রাণীর শুকনো শরীরটা মাটি মেখে পড়ে আছে। গায়ে লেগে আছে বিরিয়ানির ভাত। খুব ক্ষীণ ভাবে উঠছে নামছে রুগ্ন বুকটা। আধখোলা চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পরনে কিছু নেই। উরুর দিকটায় ছোপ ছোপ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

চুলার কাছটায় দেয়ালে হেলান দিয়ে অচেতনের মতো আধ বোজা চোখে শুয়ে আছে মিজান। হাতে একটা ঘোলাটে পানির বোতল। পরনের কাপড় অবিন্যাস্ত। আফিয়ার শব্দ পেতেই চোখ খুলে

ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকালো মিজান। তারপর নড়লো সামান্য। আফিয়ার দিকে একবার, আরেকবার রাণীর দিকে তাকিয়ে অপরাধীর গলায় বলল, "শ্‌শ্‌ শ্‌! কাউরে কইস না। তোর লাইগা নান্নার বিরিয়ানি নিয়া আইছিলাম। তুই যে বাড়িত নাই জানা আছিল না। রাণীরে দ্যাখলাম আছে কেবল। বাবা খাইয়া মাথায় একটু সমস্যা হইয়া গেছে রে। কড়া জিনিস! খাইবি?"

আফিয়া হাঁটু গেড়ে রাণীর পাশে বসে পড়ে। হাত দিয়ে মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে স্থাণুর মতো। মিজান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। প্যান্টের বেল্ট লাগাতে লাগাতে বলল, "তর লাইগা এরপর আবার বিরিয়ানি আনুম। এখন কাউরে কিছু কইস না।" বেল্টের পেছন দিকে একটা পুরনো ধাঁচের জং ধরা পিস্তল গুজে নেয়। এই জিনিস আফিয়া আগেও দেখেছে। মিজান পিস্তল ছাড়া চলা ফেরা করে না।

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় মিজান। আফিয়া মূর্তির মতো বসে থাকে রাণীর শরীরটার পাশে। দম যাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে ছোট শরীরটা। আফিয়া নির্জীব।

তিন মাস পরের এক বর্ষণ মুখর রাতের কথা।

ঝুপড়ির ভেতরেও পানি এসে যাচ্ছে। ঘুমানোর উপায় নেই। কাঁথা বিছালেই পানি ধরে ফেলবে। বালিশও ভিজিয়ে দেবে। নূরজাহান এই বৃষ্টির মাঝেও সাদেক মিয়াঁর সাথে বেরিয়ে গেছে পলিথিনের ব্যাগ মাথায় দিয়ে। আফিয়া ঘুমিয়ে আছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে বজ্রপাতের তীব্র আওয়াজে। জ্বর আসছে কিনা বুঝতে পারছে না।

নাকে মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আসছে। বিরিয়ানির ঘ্রাণ। ঘুম ফিকে হয়ে আসছে। কেউ গায়ে হাত রেখেছে, বরফ ঠাণ্ডা হাত। চমকে জেগে উঠল আফিয়া।

আবছা অন্ধকারে দেখা গেল মিজানের মুখ। এক হাতে আফিয়ার কাঁধে চেপে ধরেছে। অন্য হাতে এক প্যাকেট বিরিয়ানি। "কিরে? খিদা লাগে নাই তর?" কড়া মদের গন্ধ ভক ভক করে বেরিয়ে আসে মুখ থেকে তার।

আফিয়া সঙ্গে সঙ্গে খপ করে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে গোগ্রসে খাওয়া শুরু করে দেয়। শুকনো জিনিস খেতে গিয়ে বেদম কাশি ওঠে, তাও পানি খায় না। মিজান লেলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়েটার শরীরের দিকে। অন্ধকারের মাঝে আফিয়া খেয়ে যেতে থাকে নিবিড় ভঙ্গিতে। মিজানের

হাত কোথায় যাচ্ছে, কি করছে কোনোদিকে খেয়াল থাকে না তার। কোনোরূপ বাঁধা না দিয়ে নিজের মতো খেতে থাকে। বুভুক্ষের মতো খেতে থাকে।

খাওয়া শেষ হতেই মিজান ঝাঁপিয়ে পড়ে আফিয়ার শরীরের ওপর...

দশ মিনিট পর চাপা পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া যায় বজ্রপাত ছাপিয়ে...

নূরজাহান ফিরে এসেছিল তখন। কলতলায় গিয়ে টিউবওয়েল চাপছিল বৃষ্টির মাঝেই। নিজের গায়ে পানি ঢালতে গিয়ে আচমকা সেই শব্দে হাতের মগ ছিটকে পড়ে যায়। অদ্ভুত চোখে ফিরে তাকায় নিজেদের ঝুপড়ির দিকে। বজ্রপাতের আলোয় অস্পষ্ট দেখা যায় কামিজ পরা, পাজামাহীন একটা মেয়ে কলের মানুষের মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কাঁদা, ময়লার মাঝ দিয়ে...... হাতে মিজানের সেই পুরনো জং ধরা পিস্তল।

বৃষ্টির মাঝ দিয়ে হেঁটে আসে দাদীর কাছে আফিয়া। কলতলায় উবু হয়ে বসে মাথা ঝুকিয়ে দেয় টিউবওয়েলের নিচে। "দাদী? অ দাদী? আমার ডান হাতে বিরিয়ানির খুব সোন্দর ঘ্রাণ আছিল। রাণী প্রত্যেক দিন আইসা আমার হাতের আঙ্গুল কামড়ায় খায় ঘুমের মধ্যে... আজকে রক্ত মাইখা সেই ঘ্রাণ নষ্ট হইয়া গেল। রাণীটা আর বুঝি আইবো না আঙ্গুল কামড়াইতে।"

ধীরে ধীরে বাকি ঝুপড়িগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে থাকে একে একে... আফিয়াদের ঘরটার ভেতর মিজানের লাশটা লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। ঠিক রাণীর মত, বিবস্ত্র। রক্তে মাখা। ডান চোখের কোটর শূণ্য হয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে... একপাশে অবহেলায় পড়ে রয়েছে বিরিয়ানির প্যাকেটটা। দু-চারটে ভাত ছড়িয়ে আছে মাটির মেঝেতে...

জোঁক

কিশোর পাশা ইমন

"হাতে কী হয়েছে তোর?" মায়ের প্রশ্নের জবাবে গা না করে চোরের মতো ঢুকে পড়লাম বাড়িতে।

টিউবওয়েলের সামনে থেকে নড়ার উপায় মায়ের নেই, একগাদা কাপড় নিয়ে বসেছেন। ঘরে এসে হাতে পেঁচানো কাপড়টা খুললাম। জোঁকটা এখনও বসে আছে হাতের ওপর। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে পেট। ধৈর্য ধরে তার রক্ত খাওয়া দেখতে থাকলাম। শুনেছি, রক্ত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে এমনিতেই গা ছেড়ে দেয় তারা।

হলোও তাই। এক সময় মৃদু শব্দ করে খসে পড়লো জোঁকটা। ঝর ঝর করে রক্ত বের হয়ে এলো আমার হাত থেকে। তা বের হোক। জোঁকটিকে বিছানার নিচে বনসাইয়ের নতুন টবটায় লুকিয়ে রাখলাম। কাপড়টা দিয়ে হাতের রক্ত মুছে বের হলাম পুরানো টব খুঁজে আনতে। রক্ত অনেক টেনেছে। হাতের ভেতর অবশ অবশ অনুভূতি।

পচা আর পুরাতন এক টব নিয়ে ফিরে এলাম ঘরে। মা এখনও টিউবওয়েলে ব্যস্ত। আমার এই পচা টবের ভেতর অর্ধেকটা পানিতে ভর্তি। বনসাইয়ের টবে ঠিকমতো ফিরে পেলাম জোঁকটাকে। বসে বসে ঝিমাচ্ছে। অন্তত আমার তো তেমনই মনে হলো। একটা কাঠি দিয়ে যত্ন করে তুলে এনে ছেড়ে দিলাম পানির ভেতর।

"তোকে আর কেউ মারতে পারবে না। এটা এখন থেকে তোর নতুন বাসা। একদম নিরাপদ তুই এখানে।" বিড়বিড় করে বললাম।

"কী রে? অন্ধকারে খাটের নিচে কী খুঁজছিস?" পেছন থেকে ভাইয়ার কণ্ঠটা ভেসে আসতে চমকে উঠলাম। মাথা বের করতে গিয়ে বাড়ি খেলাম খাটে।

"উফ, অন্ধকারে ভূতের মতো এসে ষাঁড়ের মতো না চিল্লালে তোর হয় না, ভাইয়া?"

মাথা ডলতে ডলতে পাল্টা খেঁকিয়ে উঠলাম আমিও, "নতুন একটা টব আনলাম। বনসাইয়ের সার বানাবো।"

বিচ্ছিরি শব্দ করে হাসলো ভাইয়া, "তুই জীবনেও বনসাই বানাতে পারবি না।"

আরও কী কী বিদ্রুপ করতে করতে যেন বাইরের দিকে চলে গেলো সে। গোঁজ হয়ে থাকলাম। গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে ভাইয়া। ডাক্তারি পড়ছে তো। ময়মনসিংহে সরকারী মেডিকেল কলেজে পড়ে। তার এখন দামই আলাদা। এই গ্রাম থেকে আগে কেউ কখনও সরকারী মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে পারেনি। তার সাথে তর্ক করা বৃথা।

জোঁকটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বের হলাম। রাজন ভাইয়ের সাইবার ক্যাফেতে দশ মিনিট বসা দরকার।

*

জোঁকটাকে প্রথম দেখলো নজরুল। আমিই দেখালাম। স্কুলে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু সে। রুমের দরজা লাগিয়ে টবটা বের করে বললাম, "দ্যাখ।"

মুখে হাত চেপে আঁতকে উঠলো সে, "ও মা! এতো বড় জোঁক!"

জোঁকটা মোটেও বড় না। মাত্র আধ-ইঞ্চি সাইজ। নিরীহ দেখতে। দেখলেই যা মায়া লাগে বলার মতো না। কালো রঙ, একদিকে চ্যাপ্টা।

"আস্তে, চেঁচাস না।" নিচু গলায় সাবধান করলাম ওকে, "কী মায়াবি না দেখতে?"

চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালো নজরুল, "হ!"

"ওকে প্রতিদিন খাওয়াই আমি।"

"তর নিজের রক্ত পিয়াস এডিরে?" চোখ কপালে রেখেই বললো নজরুল।

"হ। কিন্তু বেশিদিন পারবো না মনে হইতেছে। আমার হাত দেখ।"

আমার হাত দেখলো নজরুল। ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই রক্ত খাওয়াচ্ছি আমি জোঁকটাকে। সব সময় সে রক্ত খেতে চায় না। মনে হয় পুরোটা হজম না হলে রক্ত খেতে ওদের ভালো লাগে না। আমি একরকম জোর করে খাওয়াই। না খেলে স্বাস্থ্য হবে কী করে ওর?

“তোর শইলে রক্ত নাই বেশি আর।”

“তা নাই।” সবগুলো দাঁত বের করে তাকে বললাম, “ইন্টারনেটে কী দেখেছি জানিস? জোঁকরা খারাপ রক্ত খায়। এভাবেই কবিরাজরা চিকিৎসা করাতো আগে। রোগ হলে জোঁক ধরে রোগির গায়ে লাগিয়ে দিতো। খারাপ আর দূষিত সব রক্ত টেনে নিতো জোঁক। কী ভাবছিস? আমার এখন নিজের একটা জোঁক আছে। পোষা।”

নজরুলের চোখ চক চক করে উঠলো। এমনিতেও সে আমাকে প্রায় সবদিক থেকে গুরু মানে। গ্রামের ছেলে হয়েও প্রমিত বাচনভঙ্গির কারণে অনেকটা সমীহ পাই আমি তাদের থেকে। তার ওপর বাবা ছিলেন এই স্কুলেরই হেডমাস্টার। এখন অবসরপ্রাপ্ত। বাবার জ্ঞানের ভাগীদার তারা আমাকেও করে ফেলে। নজরুলের উৎসাহ দেখে তাই অবাক হলাম না।

হাত বাড়িয়ে সে বললো, “দে, আমার হাতে দে। আইজকা আমি লোংরা রক্ত ফালাই?”

অনুনয় ভরা তার চোখের দৃষ্টি এড়ানোর মতো না। জোঁকটাকে বের করে নজরুলের হাতে বসিয়ে দিলাম আমি। চোখ বড় বড় করে জোঁকের রক্ত খাওয়া দেখতে থাকলো নজরুল।

*

সেদিন ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরছি। কামাল, আমাদের ওপেনিং বোলার, আমার পেছনে ঘুরঘুর শুরু করলো। রাজ্যের পিরিতের আলাপ করছে সে। যেনো এসব আলাপ আমরা রোজ দিন করি! বাবার স্বাস্থ্যের কথাও জানতে চাইলো একবার। অবাক না হয়ে আমি বিরক্ত হলাম। মনে হয় কালকে বলের টাকা আমার কাছেই চাইবে সে। কামাল হলো খুঁতখুঁতে, বল ফাটার আগেই নতুন বল কেনে। অন্য কারও পকেট কেটেই বলের টাকা আদায় করে। তার গায়ে পড়া আলাপে আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই।

“শুনলাম,” অবশেষে গলা নামিয়ে আসল কথা পাড়লো সে, “তুই নাকি একটা জোঁক পুষিস?”

এতো রাগ হলো নজরুলের ওপর, যে বলার মতো না। ঘাড় গোঁজ করে বললাম, “তোকে এটা কে বলেছে?”

হেহে করলো কামাল, “যে-ই বলে থাকুক না। পুষিস কি না বল্।”

আমি আর অস্বীকার করলাম না, “পুষি। ক্যান?”

“আমাকে দেখতে দিবি?”

হুটহাট উত্তর দিলাম না আমি। ভেবে দেখার ভান করছি। চটপট উত্তর দিলে দাম কমে যায়। আমার জোঁক তো আর সস্তা না।

“বল্ না, দিবি? একবার দেখতাম। কাওকে বলবো না।”

মাথা নাড়লাম, “মাগনা দেখানো যাবে না।”

চক চক করে উঠলো কামালের চোখ, “তা কোনো সমস্যা না। আমার কাছে দশ টাকা আছে। এই নে। ধর?” আমি ওর টাকা ধরলাম না। পিচিক করে থুতু ফেললাম ধানক্ষেতে।

“টাকার না বিষয়টা।”

কামালের চোখের আলো নিভে এলো অনেকটা, “তাহলে দেখাবি না? সরাসরি বললেই তো পারতি। যাত্রা করার দরকার ছিলো না।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম আমরা। বলাই বাহুল্য, কামালের মুখ এখন বাংলা পাঁচের মতো। তবে পাত্তা দিলাম না আমি।

নিস্তব্ধতা ভাঙতে সে-ই জানতে চাইলো, "দামটা তাহলে বলবি না?"

চারপাশে তাকালাম, কেউ আমাদের কথা শুনছে কি না দেখতে তো হবে। না, ধানক্ষেত নির্জন।

বললাম, "জোঁকটাকে যদি দেখতে চাস, সাতদিন ওটাকে রক্ত খাওয়াতে হবে।"

আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলো কামাল।

*

পাশের বাসায় থাকে জ্যোতি। ছোটোখাটো গড়ণের এক মেয়ে। আমাদের এক ক্লাস নিচে পড়ে, সেভেনে। সেদিন দেখলাম এলোমেলো চুলে আমার ঘরে ঢুকে গেছে। আমি একটা হাত তুলে দাঁত খিঁচিয়ে কুকুর তাড়ানোর মতো শব্দ করলাম, "হুঁশ! হুঁশশ!"

জ্যোতি গেলো না। বরং একদম এসে খাটে বসলো, "তাড়াচ্ছিস ক্যান?"

"ভাগ। ভাগ?" ভ্রু কুঁচকেই বললাম আমি। ছোটোবেলা থেকেই জ্যোতির সাথে আমার দা-কুমড়ো সম্পর্ক।

আমার আচরণে মনে হলো তার অভিমান হলো। উঠে দাঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত চলে গেলো সে, তারপর ঘুরে তাকালো, "যাইতাছি ঠিক আছে, কিন্তু খালাম্মারে গিয়া অহনই কইতাছি তুই খাটের তলে একডা জুঁক নিয়া থাকোস।"

এর পর আর কথা চলে না। রাজকীয় মর্যাদায় জ্যোতিকে বসালাম। জানতে চাইলাম তার আগমনের হেতু কি। লজ্জাবনত কিশোরীর কণ্ঠে সে বললো, "জুঁকটারে একবার দ্যাখতাম।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, জোঁক দেখার শর্ত একটাই। জ্যোতি আমাকে অবাক করে দিলো। বললো, জোঁক দেখার শর্ত সে জানে। কামাল বলেছে। জোঁককে সে রক্ত খাইয়েই দেখবে। এরপর আমার আপত্তি করার আর কিছু ছিলো না।

জোঁকটাকে টব থেকে বের করতেই অস্ফূট চিৎকার করে উঠলো জ্যোতি, "এত্তু বড়!"

ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলাম। মেয়ে মানুষ জোঁক দেখলে অজ্ঞান হবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু জ্যোতি ভুল বলেনি। জোঁকটা এখন আসলেই বড়। যখন এনেছিলাম তখনকার মতো আধ ইঞ্চির নেই সে আর।

ঝাড়া চার ইঞ্চি লম্বা আর মোটা এক জোঁক। এতোদিন পেলে পুষে বড় না করলে এটাকে দেখে আমিই চিৎকার করে উঠতে পারতাম!

জ্যোতিকে ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তাছাড়া বিস্মিত হলেই এই মেয়ে যেভাবে চিৎকার করে, তাতে করে বিপদ আরও বাড়ে। কাজেই আমি দরজার বাইরে বসে পাহারা দিতে থাকলাম। ভাইয়া মেডিকেলে চলে গেছে। তার ছুটি শেষ। আব্বা বাজারে। মা মনে হয় শাক তুলতে গেছে মসুরের ক্ষেতের দিকে। নিরাপদেই পাহারা দিতে পারলাম।

বিশ মিনিট পর হাত ভর্তি রক্ত নিয়ে ক্লান্ত শরীরে বের হলো জ্যোতি। মুখ সাদা হয়ে গেছে তার।

আমি শুধু একবার জানতে চাইলাম, "ঠিক মতো টবে রেখেছিস তো ওটাকে?"

দুর্বল ভঙ্গিতে একবার মাথা দোলালো মেয়েটা।

ধীরে ধীরে আমাদের বাড়িতে লোকের আনাগোনা বাড়তে থাকলো। সবাই আমার বন্ধু-বান্ধব। জোঁকটাকে একবার দেখতে চায় ওরা। আমিও অনেকদিন হয়ে গেলো জোঁকটাকে আর রক্ত দেই

না। ভিজিটররাই রক্ত খাইয়ে চলে যায়। বেশ মোটাতাজা হয়েছে আমার জোঁক। আসলে, পানিতে থাকলে তো এভাবে নিয়মিত খাবার পায় না। আরাম আয়েশের অভাবে ছোটো হয়ে যায়। পুষ্টিরও অভাব বলা যেতে পারে। আমার জোঁককে আমি দুধে-ভাতে রেখেছি। এখন পর্যন্ত বত্রিশজন ভিন্ন মানুষের রক্ত খেয়েছে সে।

আমি ইন্টারনেটে আরও পড়েছি জোঁক নিয়ে। তারা একবার পেট ভর্তি করে খেলে নাকি এক বছর না খেলেও চলে। ঐ রক্তেই এক বছর বাঁচতে পারে তারা। আমি অবশ্য এতো শাস্তি দেইনি। নিয়মিত রক্ত খাইয়েছি। খুব দ্রুত বেড়েছে আমার জোঁক।

ওকে বাড়িতে আনার প্রায় এক বছর হয়ে যাচ্ছে। ভাবতেই আমার বুক গর্বে ভরে যায়। যেদিন বছর পূর্ণ হবে, একটা জন্মদিনের পার্টি দেবো। প্রত্যেক রক্তদাতাকেই ডাকবো সেখানে। অবশ্য সংখ্যায় ইদানিং রক্তদাতা কমে আসছে।

নজরুলকে সেদিন নিয়ে এলাম। ওর টাইফয়েড হয়েছিলো কয়দিন আগে। মাত্রই সেরেছে। মারাত্মক দুর্বল। রক্ত যারা দিতো তাদের অনেকেই আর আসতে চায় না এদিকে। কাজেই ওকে পটাতে গেছিলাম। বললাম, টাইফয়েডের পরও অনেকদিন দুর্বলতা থাকে, শরীরে খারাপ রক্ত থাকে তো, তাই। একবার জোঁক-চিকিৎসা করবে কি না সে?

অনিচ্ছাসত্বেও রাজি হলো নজরুল। শেষ যে বার রক্ত খাইয়েছিলো ওটাকে, তখন আকারে তা ছিলো সাত ইঞ্চি। এরপর থেকেই কেন যেনো অনিচ্ছা দেখানো শুরু। আমি ওদের ব্যাপারটা বুঝি না। জোঁক বড় হয়েছে তো কি হয়েছে, আমাদের সেই জোঁক-ই তো সে।

ভয় পাওয়ার কি আছে?

গত দুই সপ্তাহে ওকে খাইয়েছি দুইবার। এই দুইবার আমাকেই দিতে হয়েছে রক্ত। উপায় ছিলো না। রক্ত দাতা পাওয়া যাচ্ছে না ইদানিং। জোঁকটাকে দেখলে আমার বুক গর্বে ভরে যায়। কি ভিষণ মোটা আর লম্বা। লম্বায় মনে হয় এক ফুট ছাড়িয়েছে। একবার রক্ত টানলেই মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে।

নজরুল আমার ঘরে ঢুকে বেঁকে বসলো।

তোতলাতে তোতলাতে বললো, “দোস্ত, লোংরা রক্ত পিয়ানির দরকার নাই। এইডারে তো লাগতাছে সাপের লাহান। উরি বাবা কি বিশাল!”

আমি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে রাখলাম। ছোট এক লোহার দণ্ড দিয়ে জোঁকটাকে তুলে আনলাম, কাঠিতে ইদানিং আর কুলায় না। ওজন তো আর কম হয়নি এর।

নজরুল গোঙ্গাতে থাকলো। ওকে চেপে ধরে জোঁকটাকে বসিয়ে দিলাম। রক্তের স্বাদ পেয়ে প্রবল আনন্দে দাঁত বসালো জোঁক। খুব বেশি রক্ত খেলো না, তবে অপচয় করলো অনেক। নজরুলের হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। টকটকে লাল রক্ত আমার লাল গামছায় মুছে দিলাম। কিছুক্ষণ চেপেও রাখলাম, এমন করলেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়। গামছাটা একসময় সাদাই ছিলো অবশ্য। নানান দাতাদের রক্ত মুছে মুছে হয়ে গেছে লাল।

নজরুল আমার বাড়ি থেকে যাওয়ার সময়ও গোঙ্গাচ্ছিলো। বার বার চোখ উল্টে ফেলছিলো হারামজাদা। ভীতুর ডিম না হলে কেউ এমন করে না। একটু কষ্ট হলেও বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলাম তাকে।

জ্যোতি ইদানিং আমাকে দেখলেই উল্টোদিকে চলে যায়। মোট ছয় বার রক্ত খাইয়েছিলো ও আমার জোঁককে। তারপর আট ইঞ্চির বিশাল জোঁক দেখে আর ভয়ে এদিকে ঘেঁষেনি। আমি লেখার

অযোগ্য দুটো অশ্লীল গালি ছুঁড়ে দিলাম তার উদ্দেশ্যে। দিন দিন আমার জোঁককে রক্ত খাওয়ানোর মতো মানুষ কমে যাচ্ছে। এই সমস্যার প্রতিকার কি? নিয়মিত রক্ত না পেলে আমার জোঁক তো আর লম্বা হবে না।

*

আমার জোঁকটার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেউ এলো না। এতো করে তাদের বললাম, তারপরও পাত্তাই দিলো না! অনেক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে এসেছি ওদের। এরপর আসুক আর জোঁক দেখতে। বন্ধু চেনা আসলেই বড় দায়। জোঁকটাকে আজ বিশ জনের হাতে পালাক্রমে লাগিয়ে রক্ত খাওয়াতাম।

আমার কাছে সেই লিস্টও রেডি করা ছিলো। অনেক মজা হতো। কিন্তু ওরা যে কিভাবে এমন একটা মজা মিস করলো তাই বুঝতে পারলাম না।

জোঁকটাকে আমার নিজের সন্তান বলেই মনে হয়। ওকে ছোট থেকে বড় করে তুলেছি আমি। টব দিয়েছি। বড় হলে বালতি দিয়েছি। রক্ত দিয়েছি। ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি যে কোনো মূল্যে। সেদিন ক্লাস আমাদের বাংলা স্যার জানতে চাইলেন, পরিবারের কাকে আমরা

সবচেয়ে ভালোবাসি? বাবাকে না মাকে?

আমি উত্তরটা নিয়ে একটু ভেবে বুঝেছিলাম, তাদের না, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা আমার জোঁকটার জন্য। পরিবার তো অবশ্যই, আমাদের সাথে এক বছর ধরে আছে। তাকে পরিবার বলবো না তো কী? অনেক বার ভেবেছিলাম ওর একটা নাম দেবো। দেওয়া হয়নি।

জন্মদিন উপলক্ষ্যে ছোট্ট একটা কেক কিনলাম, দশ টাকা দাম। সামর্থ্য থাকলে আরও বড় কিছু কিনতাম। কিন্তু টাকা ছিলো না। ওটা সমস্যা না। ঘরে মোমবাতি আছে। একা একাই আমি ওর জন্মদিন পালন করবো। ঠিক করে বললে প্রাপ্তিদিবস বলা উচিত। তবে নামে কী এসে যায়।

কামালের সাথে ফেরার পথে দেখা হয়ে গেলো। আমাকে দেখে আগ্রহের সাথে কাছে এলো সে, "কেক নাকি? দে খাই।"

মাথা নাড়লাম, "এমনি পাবি না। এই কেক বার্থডের। তুই আসবি? এলে কেক খেতে পারবি।"

সবগুলো দাঁত বের করে ফেললো সে, "যাবো না কেন? কার বার্থডে?"

"আমার জোঁকের।"

সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গেলো কামাল, "এখনও তুই ওকে ফেলে দিসনি? দ্যাখ, বাবু, সাক্ষাৎ পিশাচ হইতেছে ঐটা। সাক্ষাৎ পিশাচ! একবার চোখ খুলে দেখছিস? দেড় হাত লম্বা এক সাপের মতোন দেখতে, ঐটারে তুই এখনও এক ঘরে রাখোস কী মনে কইরা?"

আতঙ্কিত কামাল আমার সাথে আর কথা পর্যন্ত বললো না, উল্টো পথে হেঁটে চলে গেলো। লেখার অযোগ্য কয়েকটা গালি ওকে উদ্দেশ্য করেও ছাড়লাম। কানে গেলোও তার, তবে ঘুরে তাকালো না।

বাড়ির কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, ভাইয়া এসেছে। বাইরে নতুন বাইক থাকা মানেই ভাইয়ার আসা। বাইক চালানো আমি শিখতে চেয়েছিলাম, দেয় না। বলে, আরও বড় হ। আর কতো বড় হবো আমি? দিবে না বললেই পারে।

দরজা দিয়ে ঢোকার পরই আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। বাড়ির ভেতর অনেক মানুষ। সবাইকে ছাপিয়ে ভাইয়ার গলা শোনা যাচ্ছে। মজিদ চাচার কণ্ঠও কানে আসলো, "ভাগ্যিস বাবা তুমি বাড়ি ফিরলা।"

মা বললো, "ছেলেটাকে আর পাইতাম না রে আমি। আর পাইতাম না..."

এরকম কথা ওরা বলে যাচ্ছে। আমার মাথার দুলুনি বেড়ে গেলো। আমাকে দেখেই অনেকে ছুটে এলো। ভাইয়া আমার কাঁধ ধরে বললো, "বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস। তোর খাটের নিচে এতো বড় সাপ-"

"ঠাণ্ডা পেয়ে বালতিতে ঢুকেছিলো মনে হয়..."

"যদি কামড়ে দিতো..."

"আপনের বড় পোলার সাহসের কথা কইতেই হয়..."

আমার হাত থেকে কেক পড়ে গেছে। উঠানের মাঝখানে বড় একটা অংশ ভেসে আছে রক্তে। কয়েক খণ্ডে পড়ে আছে আমার জোঁক। যাকে গত একটা বছর ধরে রক্ত খাইয়ে বড় করেছিলাম আমি।

যাকে ওরা সাপ মনে করে মেরে ফেলেছে!

উঠানে উপস্থিত সবাই চোখ বড় বড় করে আমাকে রক্তের মধ্যে উপুর হয়ে শুয়ে পড়তে দেখলো। জোঁকটার শরীরের নানা অংশ জোড়া লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখলো। কিছু ওদের আমি আর জোড়া লাগাতে পারলাম না। মাথাটা যেভাবে থেঁতলে দিয়েছে, জোড়া লাগাতে পারলেও কি আর নড়তো ও?

শক্ত কি দিয়ে যেনো ওরা আমার জোঁকটাকে পিটিয়ে থেঁতলে ফেলেছে। টুকরোগুলো জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো কাঁদতে থাকলাম আমি।

"বিষ লাইগা যাইবো তো-"

"পোলায় পাগল হইয়া গেছে-"

মারতে মারতে আমাকে ওখান থেকে সরিয়েছিলো আব্বা।

পরে আমি ভেবে দেখেছিলাম, অসুন্দরের প্রতি ভালোবাসার মূল্য ওদের কাছে ছিলো না। আরও দেড়টা বছর কেটেছে এর পর। স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে আমি উঠে গেছি কলেজে। জোঁকটাকে হারানোর পর ছোট্ট এক গোখরা পুষতে শুরু করি। তবে বাড়ির মধ্যে রাখার সাহস তাকে করিনি। গোয়ালঘরের পাশে একটা বাক্স বানিয়েছি। জোঁকের মতো সাপটাও বড় হয়েছে বেশ। ইদানিং আমাকে দেখলেও মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে।

তাকে খাবার জোগানোর ক্ষমতা আমার অনেক আগেই শেষ। আজকাল তাকে রাতের শুরুতে ছেড়ে দেই। ভোরের আগেই ঠিক ঠিক বাক্সে ফিরে আসে সে। সেদিন মরলো মজিদ চাচাদের কালো গাইটা। সাপ অনেক খুঁজেছে তারা, পায়নি। ভাসা ভাসা শুনতে পাই পাশের গ্রামের সাত্তার ভাইও সাপের কামড়েই মারা গেছেন। গোখরাই নাকি।

এসব আমি কানে নেই না।

আমার সাপ তো আর মানুষ কাটবে না। অন্য কোনো সাপ কেটেছে হয়তো।

আমি দুধের গ্লাসটা নিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাই গোয়ালঘরের দিকে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

সেনোরিতা আইল্যান্ড

মাহবুব ময়ূখ রিশাদ

এক.

হরিণ নামের লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার বাম গালে একটা মস্ত বড়ো তিল। মাথায় চুলের স্বল্পতা। একবার তাকে দেখলে দ্বিতীয়বার তাকানোর তেমন কোনো কারণ নেই। বরং তাকাতে ভয় লাগে। তিলটার কারণেই হয়তো লোকটা মানে হরিণের চেহারায় খুনি ভাবটা প্রবল। আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম।

আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেনোরিতা আইল্যান্ডে। ওখানে প্রজেক্ট চলছিল একটা। আমরা দুজনেই সেখানে কবর বানানোর একটা প্রজেক্টে চাকরি করি সমপোস্টে। আমরা দুজনেই ছিলাম সুপারভাইজার। প্রায় সাড়ে নয় হাজার কবর বানানোর দায়িত্ব পেয়েছিল আমাদের সংস্থা। জনা পাঁচেক কর্মী, রান্না করার জন্য একজন লোক, আর সুপারভাইজার হিসেবে আমরা দুজন। সময় ছিল অফুরন্ত। অর্থাৎ আমাদেরকে কোনো টাইম লিমিট বেঁধে দেওয়া হয়নি।

পাঁচজন কর্মীর জন্য দুজন সুপারভাইজার কেন এই প্রশ্নটা আমি অথরিটিকে করতে পারিনি, কারণ আরেকজন সুপারভাইজার যে আছে সেটা আমি দ্বীপে আসার আগে নাকটেফ উপজেলার ঘাটে গিয়েই জানতে পারি।

এই খুনি দেখতে লোকটা আমাদের সঙ্গে কেন? এমন প্রশ্ন দিয়েই হরিণের সঙ্গে আমার মনের পরিচয়। সে খুব একটা কথা বলছিল না, আমিও না। অফিস থেকে আমাদের দুজনকে যখন পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, আমি শুনেছিলাম লোকটির নাম হরি।

দ্বীপে নামার পর জানতে পারি লোকটির নাম হরিণ।

দ্বীপে স্থানীয় কেউ থাকত না, কোনো ঘাটও নেই। তাই ট্রলার করে নামতে আমাদের বেশ কসরত করতে হতো। ছোটো থেকে আমার ভেতরে এক ধরনের পানি ভীতি আছে। ট্রলার থেকে নামতে গিয়ে আমি যখন সাগরে পড়ে গেলাম, সবাই হেসে উঠেছিল। তবে হরিণ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল হাত। আমরা ছিলাম তীরের কাছে, পানি বেশি ছিল না। সুতরাং ডুবে যাওয়ার ভয় ছিল না। লোকটি হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য হরিণ বিষয়ক ভয় কেটে গেলেও জল বিষয়ক ভয় এই দ্বীপে এতদিন ধরে আছে, কাটেনি।

আমরা প্রথমেই তাঁবু খাটালাম। ঝর্ণার কাছে। দ্বীপের একপাশে একটা পাহাড় ছিল, সেই পাহাড় যেন আচমকা সমুদ্র থেকে উঠে দাঁড়ানো, তার সঙ্গে ঝর্ণা। ওখানকার পানি খাওয়া যাবে। তাই সেখানে তাঁবু।

আমাদেরকে ডিকটেশন আর একটা ম্যাপ দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেই মোতাবেক কাজ করছিলাম। একমাসের বাজার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর বলা হয়েছিল প্রতি একমাস পর পর খাবার আসবে। সেই একমাস পার হয়েছে অনেক আগেই। তবে এভাবে আর কয়দিন?

হরিণের সঙ্গে ততদিনে আমার বেশ বন্ধুত্ব। কেবল বন্ধুত্ব নয়, সম্পর্কটা গভীরতার এমন জায়গায় চলে যাচ্ছিল, আমরা ভাবছিলাম শহরে ফিরে গেলে একসঙ্গেই থাকব।

প্রথম পরিচয়ের ঘটনা তো বলেছিই। এবার পরেরটুকু বলি।

"ঝর্ণার উৎপত্তি কি এভাবে হয়?" প্রশ্নটা আমি জোরেই করে ফেলেছিলাম।

হরিণ শুনে বলল, "আমার জানা নেই।"

আমি তার দিকে হাসলাম। ধন্যবাদ দিলাম, তখন হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

সে হাসল। হাসার পর মনে হলো মানুষটাকে যতটা ভীতিকর মনে হয় অতটা নয়।

হরিণ বলল, "আমার নাম হরিণ।"

আমি চমকে উঠলাম।

"হরিণ? আমি বোধহয় হরি শুনেছিলাম।"

"ওরকম ভুলভাল অনেকেই শোনে। আমার নাম হরিণ। আমার পিতা সুন্দরবনে হরিণ শিকার করতেন তো। সেজন্য রেখেছিলেন। আপনি জানতে চাইবেন, তাই আগে বলে দিলাম।"

আমি হাসলাম। দ্বীপে যাওয়ার পর প্রথম প্রাণখুলে হাসা। ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আরেকজন সুপারভাইজার পাঠিয়ে অথরিটি খুব একটা ভুল করেনি।

দুই.

শুরুর দিন খুব অস্বস্তিতে কেটেছিল। শুরুর দিন বলতে ততদিনে বিশ কি বাইশ দিন পার হয়ে গেছে। হরিণ আর আমি একই তাঁবুতে থাকি। আলাদা থাকার প্রয়োজন পড়ত না বরং একসঙ্গে থাকাটাই নিরাপদ মনে হতো। যদিও এই দ্বীপে তখন পর্যন্ত আমরা একটা পোকারও দেখা পাইনি, তারপরও মনের ভয় বলে একটা কথা ছিল।

রাত-দিনের হিসেব তো ওভাবে করতাম না আমরা। সন্ধ্যার পরপরই আসলে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে যেতাম। সেদিন আকাশে চাঁদটা এত সুন্দর। আমি আর হরিণ ঘুমোতে পারছিলাম না। দুজন আসলে গল্প করার মতো নতুন কিছু পাচ্ছিলাম না। কার জীবন কীভাবে কেটেছে, কার সংসার কীভাবে কাটছে, কেন আমরা এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছি, আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, এই কবরগুলো কাদের জন্য খোঁড়া হচ্ছে, কেন মাত্র পাঁচজন লোক দেওয়া হলো, কেন সময় বেঁধে দেওয়া নাই– এরকম হাজার বিষয়ে আমরা সমস্ত গল্প করে ফেলেছিলাম। বাকি ছিল একটাই কাজ। পরস্পরের শরীরকে চেনা। ইনিশিয়েটিভ হরিণ নিয়েছিল, আমি বাধা দিচ্ছিলাম, পরে মনে হলো বাধা দিয়ে কী হবে?

হরিণ বয়সে আমার চাইতে বড়ো হবে কিন্তু তাকে এই নির্জনে নতুন করে আবিষ্কার করে আমার বেশ ভালো লেগেছিল।

অন্যরা কি বুঝে ফেলেছিল? এমন একটা চিন্তা মাথায় কাজ করলেও আমলে নিইনি। এখানে সবার সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তারা হয়তো শ্রমিক, কিন্তু সুপারভাইজার হিসেবে আমাদের মতো দারুণ কাউকে পেলে কাজটা আর খুব একটা কষ্টের থাকার কথা নয়। ওরা নিশ্চয় এই গোপন তথ্যটা ফাঁস করে দেবে না। আর তাছাড়া ওরাও নিশ্চয় বুঝবে। তাই যখন আমরা অন্যে কী ভাববে চিন্তাটা বাদ দিতে পেরেছিলাম, তখন থেকে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষায় থাকতাম। আমি আর হরিণ, হরিণ আর আমি। ব্যাপারটা আসলে বোঝানোর মতো নয়।

এদিকে মাস পার হয়ে যাওয়াতে আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে আসছে, অথরিটি আসছে না কেন?

হরিণকেও চিন্তিত দেখালো। বলল, "এখন থেকে এক বেলা খেতে হবে।"

এমন করে দিন পার হচ্ছিল, মাস পার হচ্ছিল। না খেতে পেয়ে আমরা সবাই শুকিয়ে যাচ্ছিলাম। কবর তৈরি হয়েছে সাকুল্যে সাতশ কি আটশ। আমরা ভাবছিলাম, এই সাতশ থেকে আটশ কবর তো আমাদের লাগবে না। সবশুদ্ধ লোক আটজন। আটটা সুন্দর দেখে কবর পছন্দ করে শুয়ে পড়ব?

হরিণ কষ্ট করে হাসল।

"এত সহজে হাল ছাড়ব না।"

বাকিরাও তাই বলল।

আমি উদ্দীপিত হওয়ার ভান করলাম। কিন্তু ভেতরের ভয় কাটাতে পারছিলাম না। হরিণ ও আমার শারীরিক ভাষা বোঝার খেলাও ততদিনে পানসে হয়ে এসেছে।

আমাদেরকে কেন এভাবে নির্বাসনে পাঠানো হলো, সেই কারণ খুঁজে বের করতে করতে খাবারের শেষ দানাটিও ফুরিয়ে এলো। এরপর আমরা কয়েকদিন জল খেয়ে থাকলাম। কাজ বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। সেদিনই আমাদের বাবুর্চি একটা প্রস্তাব নিয়ে এলো আমার কাছে। বলল, বাকি শ্রমিকরা রাজি। এভাবে আমরা কয়েকটা দিন সময় বেশি পাবো। বাবুর্চি আমাকে বোঝাতে চাইল। আমি তার যুক্তির কাছে হার মানলাম।

তিন.

দীর্ঘদিন না খেতে পেরে, আমাদের শরীরের অবস্থা ছিল দুর্বল। আর যেহেতু দ্বীপের ভেতরে হরিণ ছিল, আমাদের হাতে বিকল্প ছিল না কোনো। আর হরিণকে জবাই করতে আমাদের খুব বেশি একটা অসুবিধে হয়নি।

অবশেষে আমরা আমাদের মুক্তির বার্তা দেখতে পেলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম বড়ো একটা জাহাজ আসছে। বাবুর্চির বুদ্ধিটা আমাদের কাজে এসেছিল।

বেজোড়
সজল চৌধুরী

মার্বেল পাথরের সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতেই দারোয়ানের রুমের পাশে খাঁচায় রাখা কোয়েল পাখিগুলো তারস্বরে ডাক দেয়। দেবেই বা না কেন? ভূতেদের তো কেবল পশুপাখিই ভালোভাবে অনুভব করতে পারে।

মানুষ মরে গিয়ে ভূত হয়। ভূতেদেরও সংসার হয়। কিন্তু ভূতের বাচ্চা তো মানুষ মরে হওয়া ভূত নয়। তাই ভূতের বাচ্চারা একটু আলাদা হয়। এরা হুবহু মানবরূপে দৃশ্যমান হতে পারে। খালি চোখে আলাদা করা না গেলেও কিন্তু আদতে তারা ভূতই। যেমনটা আমি।

দৃশ্যমান হবার সাধ ছিল না। কারণ দৃশ্যমান হতে গেলে বেশ কিছু যজ্ঞ করতে হয়। সাত সমুদ্রের পানি মিশিয়ে তাতে কী জানি একটা মিশিয়ে দ্রবণ বানাতে হয়। এই দ্রবণ আমাদের ওপরে মানে

ভূতের বাচ্চাদের ওপর কাজ করলেও মানুষ মরে হওয়া ভূতের ওপর করে না। বানাতে কষ্টসাধ্য হওয়ায় পারতপক্ষে কোনো কারণ ছাড়া কেউ দৃশ্যমান হতে চায় না।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও পার্কের আলো-আঁধারি কোণায় কড়াই গাছে বসে আরাম করছিলাম। শর্টকার্ট হিসেবে মানুষ কদাচিৎ এই পথ ব্যবহার করে বিধায় তাদের আনাগোনা খুব একটা থাকে না। একটা হালকা হৈচৈ শুনে এগিয়ে এসে দেখি একটা মেয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে, আর তাকে ঘিরে নোংরা পোশাকে তিনজন মানুষ। একজনের হাতে চাকু। মেয়েটার কাছে তার ব্যাগটা ছাড়াও সাথে আরো কিছু চাচ্ছিল। মেজাজটা চড়ে গেল। ভূত হবার কারণে আমি মানুষের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। তিনজনকেই ধরে পাশের লেকে ছুঁড়ে মারলাম। মেয়েটাকে বললাম, 'ভয় পেও না।' মেয়েটা মুখ থেকে হাত সরাতেই ভীতসন্ত্রস্ত মায়াবী মুখটা আমাকেই ভীতসন্ত্রস্ত করে দিল। এ আমি কী দেখলাম?

অদৃশ্যমান ছিলাম, তাই মেয়েটা কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে না দেখে টলতে টলতে দ্রুত পায়ে চলে গেল। আর আমার মনের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল। তারপর কয়েকদিন চোখের পাতা এক করতে না পেয়ে বাবার কাছে গেলাম। বাবা হলেন আমাদের সবচেয়ে বড়ো পুরোহিত। তার কাছে থেকে দ্রবণ নিয়ে দৃশ্যমান হবার পর কত কাণ্ড যে ঘটালাম। নীলার প্রেমে পড়ে মানুষের সাথে থাকছি আড়াই বছর ধরে। আজকে নীলার সাথে দেখা করার দিন। জরুরি তলব। হয়তো তার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে, সেকারণেই ডেকেছে।

যেকথা বলছে ভুলে গিয়েছি, আমার মতো ভূতেরা মানুষের প্রেমে পড়তে পারে কিন্তু সংসার করতে পারে না। ভূতকেই বিয়ে করতে হয়। কিন্তু আমি তো নীলাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আর তাকে যেহেতু বিয়ে করতে পাবো না–তাই আমাকে বেজোড় হয়েই থাকতে হবে–আজীবন।

নীলা পার্কের আলো-আঁধারি বেঞ্চে নীল রঙের থ্রিপিস পরে বসে আছে। তার পাশে বসতেই কোথা থেকে একটা কুকুর দৌড়ে এলো। ভূতের গন্ধ পেয়েছে যে। যাহ্! নীলা তো আবার কুকুরকে ভীষণ ভয় পায়। আর বুঝি না, কুকুরগুলো ভয় দেখাতে কোথা থেকে চলে আসে কে জানে!

নীলা আমাকে কুকুরটা তাড়িয়ে দিতে বলল। তাকে কী করে বোঝাই, কুকুরটা আমাকে দেখেই এসেছে। আমি যতই তাড়ানোর চেষ্টা করি, কুকুর ততই ঘেউ ঘেউ করে। আর ভয়ে নীলার মুখ ক্রমেই পাংশু বর্ণ ধারণ করে।

কুকুরটাকে কোনোমতে তাড়িয়ে নীলার পাশে বসতেই সে আমার অনুমান সত্য করে দেয়। তার বাবা তার বিয়ে ঠিক করেছে। আমার আর কী করার আছে? মানুষ হলেও তো একটা চেষ্টা করা যেত।

খুব কান্না পাচ্ছে। নীলার সামনে কাঁদতে পারছি না। নীলা আমাকে বোঝাচ্ছে কী কী করলে তার বাবাকে রাজি করাতে পারব। কিন্তু সে তো জানে না, কোনোকিছুতেই রাজি করানো সম্ভব না। কোনোকিছুতেই না।

আমি মাথা নিচু করে সব কথা শুনলাম। আমার নীরবতা আমার অক্ষমতা, নীলাকে রাগিয়ে দিল। রাগ ঝেড়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আমি বসে থেকে অসহায়ের মতো তার চলে যাওয় দেখলাম।

মেসে ফিরে এলাম। সমস্যা হতে পারে ভেবে সিঙ্গেল রুমে থাকি। রুমে এসে সারা রাত-দিন শুয়ে শুয়ে ছাদ দেখেই কাটালাম। কী করে নীলাকে পাওয়া যায় সেটাই শুধু ভাবি। কোনো না কোনো উপায় তো আছেই।

আমাদের জগতে এসেই বাবাকে সব বলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনো কি উপায় নেই?'

বাবা বললেন, 'একটা উপায় আছে। তবে একবার মানুষ হয়ে গেলে আর ভূত হওয়া সম্ভব না। আর অপঘাতে মৃত্যু হওয়া তো চলবেই না। নইলে কখনই ভূতেদের সভ্য জগতে আসা যাবে না।'

যা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ভূতেদের দুই জগৎ। সভ্য আর আদিম। আদিম জগতের বেশিরভাগই অপঘাতে মৃত্যুবরণকারী। এরা কখনই সংসার করতে পারে না। পুরো জীবন একাকী কাটিয়ে দিতে হয়। এদের কাজ হলো মানুষদের ভয় দেখানো আর ক্ষতি করা। মূলত এদের কারণেই মনুষ্য জগতে আমাদের নিয়ে এত কুৎসা রটে। আর সভ্য জগতটা হলো আমার জগতটা, এখানের সবকিছুই প্রায় মানুষের মতো।

আমার কাছে এখন পুরো জীবনটাই নীলাময়। তাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। তাই যতই কিছুই অসম্ভব থাকুক না কেন আমাকে মানুষ হতেই হবে। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর মানুষ হয়েই দৌড় দিলাম নীলার উদ্দেশ্যে। মনটা খুব ফুরফুরে। আলাদা একটা অনুভূতি। বুকে হৃদপিন্ডের অস্তিত্ব পাচ্ছি। ধুক পুক করছে।

সিঁড়ির শেষধাপে পা রাখতেই আজ আর কোয়েল চিৎকার দিল না। এটা খেয়াল করেই আমার ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু নাচতে পারলাম না, কারণ সেই মুহূর্তে দারোয়ান একটা নীল খাম দিয়ে বলল যে একটা মেয়ে আমাকে দিতে বলেছে।

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এটা কী নীলার বিয়ের আমন্ত্রণপত্র? দারোয়ানের টুলে ধপ করে বসে পড়লাম। হন্তদন্ত হয়ে খামটা খুলতেই একতাড়া কাগজ হাতে পড়ল। নাহ। এবার অনুমান সত্য হলো না। কোনো আমন্ত্রণপত্র নেই। স্বস্তি পেলাম। তবে আমন্ত্রণ পত্রের বদলে কয়েক পাতার চিঠি পেলাম।

চিঠিটা পড়ছি আর পড়ছি, আর আমার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে। চিঠিতে ও ক্ষমা চেয়েছে। আমার সামনে আর কোনোদিন আসবে না। সে তার নিজের গোপন কথাগুলো জানিয়েছে। জানিয়েছে আমার সামনে সে কেন আর আসবে না। আমার মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছা হচ্ছে। ইশ, যদি বিষয়টা কিছুদিন আগেও জানতে পারতাম?

সে লিখেছে সে আসলে একটা ভূত। ঠিক আমার মতো। মানে মানুষ হবার আগে যা ছিলাম। এই জন্যই কী তাকে দেখলেও কুকুর আসতো? কেন আমি মানুষ হলাম? এখন আমি কী করে তাকে পাবো?

তার বিয়ে ঠিক হয়েছে কোনো এক বিশাল পাকুড় গাছের ভূতের সাথে। সে আর কখনো ফিরে আসবে না। লজ্জায়, অক্ষমতায়।

আমি এখন কী করব? আত্মহত্যাও তো করতে পারব না। দুনিয়াতে কী পাকুড় গাছের অভাব আছে? কয়টাতে গিয়ে তাকে খুঁজবো? খুঁজেই বা কী হবে? ততদিনে সে কয়েক ভূতের মা হয়ে যাবে।

হায়রে ভালোবাসা! আমাকে বেজোড়ই রেখে দিলি।

চিঠি রুমে রেখে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। সাই সাই করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। খুব মরতে ইচ্ছা হচ্ছে। রাস্তার পাশেই ডাস্টবিন। নেড়ি কুকুরের আস্তানা। আজ আর কোনো কুকুরই আমার দিকে আসছে না। কিন্তু আমি চাচ্ছি কোনো এক কুকুর আসুক। ঘেউ ঘেউ করুক। প্রমাণ করে দিক, আমি এখনও ভূত।

কেউ প্রমাণ না করে বুঝিয়ে দিল আমি এখন একজন মানুষ। হৃদপিণ্ডটা ধুক পুক করছে।

একটা কাক ডেকে উঠল। নাকে ফুলের সুবাস ভেসে এলো। ডাস্টবিনে ফুলের গন্ধ! ডাস্টবিনের দিকে তাকালাম। কুকুরগুলো নিজেদের জগতে আছে। কোনো ফুলের অস্তিত্ব নেই। এমন সময় কেউ ঘাড়ে হাত রাখলো। চকিত ঘুরে তাকালাম।

নীলা! নীল রঙের শাড়ি, কালো টিপ, খোঁপায় রজনীগন্ধা, কবজিতে বকুল ফুলের মালা প্যাঁচানো। হাতে এক তোড়া গোলাপ। যেন এক ফুলের বাগান। আমাকে মুচকি হেসে সে বলল, 'কী কেমন হলো আমার ভেলকিবাজি? চিঠি পড়ার পর তোমার অবস্থা দূর থেকে দেখে যা মজা পেয়েছি! এত বোকা কেন তুমি? ভূত বলে কী কিছু আছে নাকি? বোকা একটা!'

আমার মাথাটা হালকা চক্কর দিল। পড়ে যাচ্ছিলাম। নীলা ধরে ফেলল। আমিও তাকে ধরলাম। ছাড়ব না। যদি হারিয়ে যায়। হাউমাউ করে কাঁদছি। হারিয়ে ফিরে পাবার আনন্দ টের পাচ্ছি। নিজেকে এত সুখী কখনও লাগেনি।

'আর কেঁদো না তো। আর কখনও এমন করব না। তিন সত্যি। এবার কান্না থামাও। আর বাবাকে আমি তোমার ব্যাপারে রাজি করিয়েছি। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি কেন কাঁদছি তাকে কী করে বোঝাই। হারিয়ে ফিরে পেয়েছি তাকে। তার জন্য ভূতেদের জগৎ ছেড়ে এসেছি। মানুষ হয়েছি।

আমি এখন আর বেজোড় নই। আমি এখন জোড়। আমি এখন জোড়।

বর্ণমালা

মাহী ফ্লোরা

স্বরে অ

এমন ভোর দেখেছে আমার চোখ, সারারাত তার চোখে ঘুম নেই। সারারাত একটা নিরুদ্দেশের দিকে। ভীষণ, খুব ভীষণ না পাওয়া মন, যেন সকাল হলেই দুটো চোখ দু'দিকে চলে যাবে! এ সকলই না ফেরার আয়োজন। এত কাছাকাছি থেকে দেখা নেই, জলও আর ছুঁতে নেই, সাগরে নামলে কান্না কি আর কান্না থাকে? রোদের ভেতর হয়ে ওঠে ভোরের শামুক।

স্বরে আ

পায়ে পায়ে হাঁটবে বলে নেমেছিলে পথে। ভয় আর শঙ্কায় মন্দিরে-রথে পুরোনো বাসি ফুলের গন্ধে অচেনা লাগে সঙ্গ। পায়ের ভেতর জড়িয়ে যেতে থাকে–

না বুঝতে পারাগুলো। এখন কি আর পথে নামার আগে আয়না দেখে না মুখ? দেখে। তবু শপথের ম্যুরাল–

টুকরো টুকরো অসুখে ভেঙে ভেঙে যায়। যেমন বর্ষায় ভেঙে যায় রাস্তার বুক।

প্রণয়

লুৎফুল কায়সার

চুপচাপ বসে আকাশ দেখছিলাম। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে ঠিক এভাবেই জানালা দিয়ে আকাশ দেখি। সন্ধ্যার ঠিক আগের আকাশটাও আমার মতোই নিঃসঙ্গ।

হ্যাঁ, আমি খুবই নিঃসঙ্গ। দীর্ঘকাল একা থাকলেও একাকিত্বকে কেন যেন ভালোবাসতে পারিনি। বৈচিত্রহীন এক জীবন আমার। আজকাল যেন সেটা আরও বেশি বৈচিত্রহীন হয়ে পড়েছে। সারাটা দিন বসে থাকি, রাতে টুকটাক এদিক-ওদিক যাই আর তারপর একটা সময়ে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ি।

এভাবেই দিন চলে যায়।

তবে আজকের কথা ভিন্ন। আমার বাড়ির পেছনে যে ছোট্ট জঙ্গলের মতো জায়গাটা আছে, সেখানে দুপুরের দিকে দুজন লোককে বসে থাকতে দেখেছি। ওরা কখন এসেছে সেটা আমি জানি না। দুপুরের দিকে যখন পেছনের জানালার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনই ওদের দেখলাম!

ব্যাপারটা অদ্ভুত-ই। এই গ্রামের লোকেরা ওই জায়গাটা এড়িয়ে চলে। গত কয়েক বছর ধরে আমি ওখানে কাউকে আসতে দেখিনি।

তবে ওদের দুজনের চেহারা দেখে ওদেরকে গ্রামের লোক বলে মনেও হয়নি। ওদের মধ্যে একজনকে কেন যেন আমার বেশ চেনা চেনা ঠেকেছে!

আচ্ছা, ওরা এখনও রয়েছে ওখানে? সন্ধ্যা হয়ে গেছে! এখন তো ওদের থাকার কথা নয়।

এসব ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই কখন পেছনের জানালাটার কাছে চলে গেছি নিজেই বুঝিনি!

অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে ওরা দুজন তখনও ওখানে বসে রয়েছে!

শুধু বসেই নেই, পুরোনো কাঠ-কুঠরো যোগাড় করে আগুনও জ্বেলে ফেলেছে! নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা।

এক অজানা কারণে ওদের কথাগুলো শোনার খুব ইচ্ছা হয়ে গেল। পেছনের দরজা দিয়ে বের হলাম।

প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। একটা মোটা গাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি জানি, এভাবে লুকিয়ে কারো কথা শোনা ঠিক নয়। কিন্তু তারপরেও কেন যেন মনে হচ্ছিল ওদের কথা না শুনলে আমার চলবেই না। আগে কিন্তু কখনোই এভাবে মানুষের কথা শুনিনি আমি!

বেশ মন দিয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

“তো এই বাড়িটা পর্তুগিজটা বানিয়েছিল, তাই না?” বলে উঠল প্রথম লোকটা।

"হুম, এখানেই আমি ইসাদোরাকে প্রথম দেখি! ও নিজেও পর্তুগিজ," বলল দ্বিতীয় লোকটা।

আমি যেন চমকে উঠলাম। এ কী বলছে লোকটা! এই নামটা এই অঞ্চলের লোকেরা দিনের বেলাতে পর্যন্ত মুখে আনে না। সেখানে ও রাতের বেলাতে এই নাম মুখে আনছে। এই দ্বিতীয় লোকটাকেই শুরু থেকেই কেন যেন আমার চেনা চেনা ঠেকছিল।

"কাম অন অনিমেষ! তুই এখনও এসবে বিশ্বাস করিস?" হাসতে হাসতে বলে উঠল অপরজন।

তার কথায় কান না দিয়ে অনিমেষ নামের লোকটা বলে চলল, "ইসাদোরা বলেছিল ও আমাকে ছেড়ে কখনও যাবে না। আমার পরিবারের লোকরাও জানত ওর কথা। ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার অনেক চেষ্টাই করেছিল তারা। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। শেষে ওরা আমার সাথে ইসাদোরাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সমস্যাটা শুরু হলো স্কুলে! মনে আছে কামাল, তুই আর তোর দলবল আমাকে নিয়ে কেমন হাসাহাসি করতি?"

"আরে এতদিন পর এসবের কথা তুলছিস কেন? স্কুলে আমরা তেমন ভালো বন্ধু ছিলাম না। আর এখন আমরা একসাথেই জব করছি। আর স্কুলে তোকে নিয়ে প্রায় সবাই হাসত। তুই চুপচাপ পিছনের বেঞ্চে বসে কথা বলতিস, একা একাই মাঠে খেলতিস আর একাই হাসতিস! আমরা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতি, 'ইসাদোরা আছে আমার সাথে,' আমরা কেউ ওকে দেখতাম না কেন? তবে একটা জিনিস আমার আজব লাগে এখনও!"

"কী?"

"তুই সবসময় ক্লাসে অমনযোগী থাকতিস, এটা অনেক স্যার খেয়ালও করতেন। তোকে ওনারা দাঁড় করিয়ে প্রশ্নও ধরতেন। কিন্তু তুই ঠিক ঠিক সব প্রশ্নের উত্তর দিতিস! কীভাবে? কিছু মনে করিস না, আজ হুট করে ঘুরতে আসার নাম করে তুই আমাকে এই জায়গায় নিয়ে এসে এসব অতীতের কথা তুলছিস। তাই আমিও কিছু তুললাম আর কী।"

"উত্তরগুলো ইসাদোরা আমার কানে কানে বলে দিত।"

"শাটআপ! এই বলার জন্য আমাকে এনেছিস? ইসাদোরা বলে কেউ নেই!"

"আছে! ইসাদোরা আছে! আমার এখনও মনে আছে একদিন তোদের হাসাহাসিতে অস্থির হয়ে আমি ইসাদোরাকে বলেছিলাম, 'ইসাদোরা! চলে যাও!' ও অনেক কষ্ট পেয়ে চলে গেছিল। আমার কথা ও ফেলতে পারে না!" বলতে বলতে চোখে পানি এসে গেল অনিমেষের।

"ধুর! ইসাদোরা নামে কেউ নেই! যদি থাকে তবে আমার সামনে এসে দেখা দিক!" চিৎকার করে উঠল কামাল।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না আমি। এক ছুটে চলে গেলাম ওদের সামনে। আমাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল অনিমেষ, কামাল উল্টো দিকে তাকিয়েছিল।

আমি হাত দিয়ে কামালের মাথাটাকে ঘুরিয়ে আমার দিকে করে দিলাম। 'মট' করে একটা শব্দ হলো! বিস্ফোরিত চোখে যেন আমার দিকে তাকিয়েছিল কামাল!

ওর মৃতদেহ ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল।

"ইসাদোরা! এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?" এই বলে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরল অনিমেষ।

"এখানেই ছিলাম! আজ থেকে তুমিও এখানে থাকবে! আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না!" ওকে বুকে চেপে ধরে বললাম আমি।

অন্তিম মুহূর্ত

জামসেদুর রহমান সজীব

কাটাবন ক্রস করার পর গাড়ির গতি কমিয়ে দিল জেসি। শক্ত করে গাড়ির হুইলার চেপে রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্য ট্র্যাকিং ডিভাইসটা চেক করে নিল।

গন্তব্য মহাখালী।

এমন নয় যে রুট চেনে না সে। ট্র্যাকিং ডিভাইসটা চেক করতে হয় যেন নিষিদ্ধ এলাকায় অনুপ্রবেশ না ঘটে। আশপাশের রাস্তাগুলো ফাঁকা থাকলেও সকল রাস্তায় ঢোকার অনুমতি নেই। ভুল রাস্তা মৃত্যুর মুখে নিয়ে ফেলবে। তাই বলা চলে মৃত্যু থেকে বাঁচতে ট্র্যাকিং ডিভাইসের বিকল্প নেই। একইসাথে এটা ব্যবহৃত হয় সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষার্থে। এর বাইরে এই যন্ত্রটার বিশেষ কোনো ব্যবহার নেই। শাহবাগ মোড়ে এসে গাড়িটা ঘরঘর শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে যায়। প্রচণ্ড বিরক্ত হয় জেসি। খুব কষ্টে এই মিনি বাসটা ব্যবহারযোগ্য করেছে। কিন্তু দিনে কয়েকবার তাকে এটাকে পুনঃব্যবহারযোগ্য করতে হয়। হাত ঘড়িটার বিপবিপ শব্দ কানে যেতেই সেদিকে নজর ফেরায় জেসি।

সময় ও তারিখ চেক করে।

রাত বাজে ১টা। ১৭ জানুয়ারি ২০৫৩।

সময় অনেক বদলে গেছে। বদলে গেছে গোটা পৃথিবী। আর এ সবকিছুই জেসির চোখের সামনে ঘটেছে। তার বয়স যখন মাত্র বারো, তখন রাশিয়ায় প্রথম গ্যাস অ্যাটাক হয়। ভয়াবহ সেই গ্যাস অ্যাটাকে পুরো পৃথিবী কেঁপে ওঠে। বছর দুয়েকের মাঝে চীন, আমেরিকা, কোরিয়াতেও পরপর গ্যাস অ্যাটাক শুরু হয়। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দেশগুলোতেও। এক একটা দেশ যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। বাংলাদেশে গ্যাস অ্যাটাক পড়ে ২০৩৬ সালে। জেসির বয়স তখন সতেরো। গ্যাস অ্যাটাকের মাত্র এক মাসের মাথায় একচল্লিশ কোটি মানুষের দেশ জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বর্তমানে মাত্র সাত লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে। অথবা তারও কম। দুঃস্বপ্নের মতোন লাগলেও এই ঘটনাটিই নির্মম বাস্তবতা।

গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট হতেই ধীরগতিতে চলতে শুরু করেছে জেসি। আশপাশের কিছু দেখার উপায় নেই, তবে মনে হচ্ছে বাংলামোটর সিগনাল ক্রস করেছে। ট্র্যাকিং ডিভাইস বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাটারি শেষ। বিপদ আশঙ্কা সত্ত্বেও কেবল দু'চোখের ভরসায় সামনে এগুতে হচ্ছে। তবে চোখেরও বিশ্বাস নেই। চার হাত দূরের জিনিস দেখাই বেশ কষ্টসাধ্য। সাদা ধবধবে ধোঁয়ায় চারপাশ লেপ্টে আছে। যেন মনে হয় আকাশের ঘন মেঘ মাটিতে নেমে এসেছে। গোটা পৃথিবীর এই একই অবস্থা। গ্যাস অ্যাটাকের পর অফুরান ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে সবকিছু। জেসির কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে। শ্বাস নিতে কষ্ট। অক্সিজেন মাস্কটা পরে নেয় মুখে। হাতঘড়ি দেখে। খুব দ্রুত তাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। সাহায্য চেয়ে তাকে নক দেওয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই কেউ বিপদে আছে। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয় জেসি।

ফ্লাইওভারের নিচে ট্রেনের বগিগুলো একটা আরেকটার সাথে জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে। কিছু বগি রেললাইনের ওপর এখনো রয়েছে, বাকিগুলো এদিক-সেদিক ছড়ানো ছিটানো। বাস, ট্রাক আর ছোটোবড়ো কতক গাড়ির জটলার পাশে একটি অ্যাম্বুলেন্স আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের লেলিহান ফুলকি একটু ওপরে উঠেই কালো ধোঁয়ার কুন্ডলি পাকিয়ে সাদা ধোঁয়ার সাথে মিশে যাচ্ছে। দূর থেকেও সেটা নজরে পড়ে জেসির। মহাখালী রেল ক্রসিংয়ের আগে গাড়িটা থামায়। অবশ্য সামনে এগুনোর পথও নেই, রাস্তা ব্লক। ট্র্যাকিং ডিভাইসটা হাতে তুলে নেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তবে চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত ভাবে, আশপাশেই হয়তো কেউ আছে যে সাহায্য চেয়ে সিগনাল পাঠিয়েছিল। জেসি মুখের অক্সিজেন মাস্ক ঠিক করে নেয়, একটা টর্চলাইট আর নিরাপত্তার জন্য একটা রিভলবার নিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে জ্বলন্ত অ্যাম্বুলেন্সের দিকে। চারপাশে বারবার দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। অমনোযোগী হলে কড়া মাশুল গুনতে হবে তাকে।

"এখানে কেউ আছেন?" একটা ছাউনির কাছে এসে নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করে জেসি।

কোনো সাড়া না পেয়ে সামনে এগুনো শুরু করে। মানুষের অস্তিত্ব খুঁজতে থাকে। পরিবেশটা অসম্ভব রকম ঠান্ডা। কিছুক্ষণ হলো শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। ধোঁয়া স্থির নেই, এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি শুরু করেছে। গায়ে কাঁটা দিল জেসির। কী করবে বুঝতে পারছে না। বাতাসের গতি বাড়তেই সিদ্ধান্ত নিল ফিরে যাবার। ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটা দিতেই পিঠে সজোরে আঘাত অনুভব করল। ছিটকে একহাত দূরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু সম্বিৎ হারালো না। পর মুহূর্তেই যে পাশ হতে আক্রমণ এসেছে সেদিক বরাবর দু'বার গুলি ছাড়লো রিভলবার দিয়ে। বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ উঠলো যেন। ভীত সত্রস্থ অবস্থায় ঠেলে উঠে ছুটতে লাগলো জেসি। ব্যথা আর ভয়ে শরীর জমে যাচ্ছে। তবুও প্রাণপণে ছুটছে। ধোঁয়ার কারণে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না কিছুই। রাস্তায় থাকা গাড়ির সাথে কয়েকবার ধাক্কা খেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে মিনি বাসটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দে থমকে গেল জেসি। চারপাশে চোখ বুলালো। কোথাও কেউ নেই। বাম কোমরে ব্যথা অনুভব করলো। হাত দিতেই উষ্ণতা টের পেল। রক্তে ভিজে গেল হাতটা। লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। প্রচণ্ড কান্না পেল জেসির। কিন্তু কাঁদতে পারছে না। একটা ছায়া তার দিকে এগিয়ে এলো। মুখ তুলে সেদিকটায় তাকিয়ে ভীষণরকম ভড়কে গেল সে। এক মুহূর্ত মনে হলো আয়নায় নিজেকে দেখছে। অবিকল জেসির মতোন একটি মেয়ে হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো, তবুও চেহারা বুঝতে কষ্ট হলো না। বড্ড অসহায় বোধ করলো জেসি। মেয়েটি তার পাশে এসে বসলো। জেসির মাথাটা তুলে নিজের কোলের ওপরে রাখলো। আস্তে করে তার মুখের অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলল। মেয়েটি বেশ শান্ত গলায় বলল, "শান্ত হও। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।"

জেসি বুঝতে পারে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। অপর মেয়েটিকে সে এবার চিনতে পেরেছে। সেই মেয়েটিই আসল জেসি। আর তারই ক্লোন সে। গ্যাস অ্যাটাকের কয়েক বছর পর চীন থেকে ক্লোন প্রজেক্ট চালু হয়। পুরো পৃথিবীজুড়ে একদিকে মৃত্যুর মিছিল, অপরদিকে ক্লোনের মাধ্যমে জীবন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। এদেশে অবশিষ্ট সাত লাখ মানুষের চার লাখই ক্লোন। কিন্তু মানুষ কখনো ক্লোনদের মেনে নিতে পারেনি। গ্যাস অ্যাটাকের পর এই ভয়াবহ সময়েও চলছে মানুষ আর ক্লোনদের শীতল যুদ্ধ। জীবনের একদম অন্তিম মুহূর্তে এসে মৃতপ্রায় জেসির নিজেকে ক্লোন ভাবতে ইচ্ছে করে না। তার মনে হয় সেও একজন মানুষ। খুবই সাধারণ একজন মানুষ। এই ভেবে চোখটা বন্ধ করে ফেলে সে। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও নিজেকে আশ্বাস দেয়, কোনো এক সুন্দর সকালে সে ফের চোখ মেলে তাকাবে। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবে এই অদ্ভুত পৃথিবীর বুকে।

মতি পাগলার ঘুড়ি

নীলা হারুন

মতি পাগলার লাল ঘুড়িটা উড়তে দেখা যায় সারাবছর। কী গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত, মতি পাগলার লাল ঘুড়ি উড়তে থাকে মধুধোয়া গ্রামের সীমানা ঘেঁষে।

মতি পাগলাকে তাই সবাই ঘুড়ি পাগলা বলেও ডাকে।

গ্রামের ছেলেরা কখনো মতি পাগলার ঘুড়ি কাটার সাহস করে না। কেননা লোকমুখে বহুল প্রচলিত আছে, যেই মতি পাগলার ঘুড়ি কেটেছে, তার মুখেই কাকের মল পড়েছে, অসুস্থ হয়েছে। তারপর পাগলার পা ধরে ক্ষমা চাওয়া পর্যন্ত দাস্তবমি চলতেই থাকে। অনেকেই তাকে একারণে সাধুও মানে। দুর্বলচিত্তের কারো কারো ধারণা সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু নিজেকে গোপন করে রেখেছে।

কেউ কেউ তাই মানতের মুরগীটা রেঁধে কিংবা বড়ো হাঁসের প্রথম ডিমটা সেদ্ধ করে দিয়ে আসে তাকে। আল্লাহর দুনিয়ায় যে করেই হোক এক থালা ভাত জুটে যায় তার কপালে।

মানুষে না কাটলেও গাছেরা ঠিকই মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে তার সাথে। বখাটে ছেলের মতো ঘুড়িটাকে জড়িয়ে ধরে ডালপালা বাড়িয়ে। পেঁচিয়ে যখন ছিঁড়ে যায় তখন এলাকার কোনো একটা দোকানে এসে মুখ কালো করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে। দোকানি হয়তো তাকে দেখে একটা কলা বাড়িয়ে দিল, সে মাথা নেড়ে মানা করে দেবে। তার হাতে ঘুড়িহীন নাটাই দেখেই দোকানি ঘটনা আন্দাজ করে নেয়, তারপর নতুন লাল ঘুড়ির ব্যবস্থা হয়। বিগত পঁয়ত্রিশ বছর এভাবেই চলে আসছে মধুধোয়া গ্রামে তার জীবন।

মতি আসলে এই গ্রামের ছেলে না। অনেকদিন আগে, ঘাটের কাছে নাকি মরা মানুষের মতো ভেসে উঠেছিল কিশোর মতি। কোথায় তার বাড়ি-এই এলাকার কেউ জানে না। মতির কিন্তু মনে আছে সবই। পিতৃহীন শিশু মতির সংসারে ছিল বড়ো বোন আর মা।

বোনটা রাগ করে চলে এসেছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। স্বামীর মার সইতে পারেনি সে। বোন তাকে কোলে বসিয়ে ভাতের লোকমা গুঁজে দিত। ছোটো মুখে বড়ো নলা ঠিকমতো জায়গা হতো না, ঠোঁট গালে ডালের দাগ লেগে থাকত। যেভাবে প্রায়ই বোনটার গালে লেগে থাকে কান্নার দাগ।

"আচ্ছা বুবু, তুমি এত কান্দো কেন?"

"কই কান্দি রে মনা?"

"দেখি তো। তুমি সবসময় কান্দো। এত কাইন্দো না।"

"আমার কপালে আছেই কান্দা। সুখ থাকলে কি আর কানতাম?"

মতি কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, "আল্লাহরে কইলে সুখ হইবো?"

“হ, হইবো। সুখ দুখ সব-ই তো আল্লাহর দান।”

“আচ্ছা বুবু, আল্লাহ কই থাকে?”

“আল্লাহ্ থাকে আরশে। মানে ওই আসমানে।”

ছোট্ট মতি বোনের কোল থেকে লাফিয়ে উঠে উঠোনে দৌড়ে যায়। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। সূর্যের প্রখরতায় চোখের পাতা কুঁচকে আসে। তবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, “আমার আপারে অনেক অনেক খুশী দিও আল্লাহ্। একটুও কান্দা দিও না।”

অবশ্য মায়ের ধমকে থেমে যেতে হয় তাকে।

বোনের দিকে আড়চোখে তাকায় সে। বুবুটা যে কী! এই এখন আবার কান্দে।

তার ছোটো হৃদয়ের পুরোটা দিয়ে সে বুবুকে ভালোবাসে। ইচ্ছা করে ছোটো হাতটা দিয়েই বোনকে ভাত খাইয়ে দিতে, কাজে সাহায্য করতে, বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে।

ইস! যদি বয়সে বড়ো হতো, বাজারে একটা দোকান দিত সে। বুবুর জন্য সব সুন্দর সুন্দর জিনিস আর ভালো ভালো খাবার কিনে আনতো সে। তখন নিশ্চয়ই আর কান্না করত না বোন।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শোনে তার বোন শ্বশুরবাড়িতে ফেরত গেছে। বুবুর ভাসুর নাকি নিতে এসেছিল বুবুকে। মতিকে ছেড়ে যেতে চায়নি মেয়েটা। কিন্তু সবার তিরষ্কারে বাধ্য হয়েই ঘুমন্ত ভাইয়ের কপালে চুমু এঁকে বেরিয়ে পড়েছে সে।

সেদিন মতি একা একা আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরলো। কান্না করলো, অভিমান হলো বোনের ওপর।

তারপর একসময় স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিন্তু মাসদুয়েক পর যখন বোনের লাশটা ফেরত এলো, আর সহ্য হয়নি মতির।

তার মা, গোলাপজানেরও কোনো জীবন ছিল না। লোকের বাড়ি খুঁটে খাওয়ার থেকে তিন বিয়ের জমির কে বিয়ে করাই উত্তম মনে করেছিল সে।

মায়ের বিয়ের মাংস ভাত খেয়ে হজম হয়নি, তখনই বোনের লাশের খবর এলো।

মা আর মতির কান্না হোক, কি নতুন বউয়ের প্রতি স্বাভাবিক আদিখ্যেতাই হোক, তিন বিয়ের জমিরই লোকজন নিয়ে গাঁয়ের লাশ গাঁয়ে ফিরিয়ে এনেছিল।

মতি ভাবে সেদিন যদি বুবুও মায়ের বিয়ে খেতে আসতো– তাহলে হয়তো সে বেঁচে যেত।

কিন্তু গোলাপজান বিবাহিত মেয়েকে কোন মুখে নিজের বিয়ের দাওয়াত দিত?

বোনের কবরের পাশে প্রবল বৃষ্টির সময়, হিম কুয়াশা ঢাকা ভোর অথবা সন্ধ্যায় বসে বসে সূরা ফাতিহা আর সূরা আহাদ কয় হাজারবার আউড়েছে শিশু মতি– তা এক আল্লাহ-ই জানেন। বিনা বেতনের মক্তবে এই দু’টো সূরাই তো শিখেছিল সে!

মাঝে মাঝে অবাক তাকিয়ে দেখে। এইটুকু কঞ্চির বেড়া, এক মোচড়েই ভেঙে যাবে– কিন্তু তবু কি অসম্ভব বাঁধা তাদের ভাই-বোনের মাঝে!

তার মনে হয় সেদিনের চিৎকার আল্লাহর কানে পৌঁছায়নি। আল্লাহ্ থাকেন ওই আরশে, এত ওপরে তার কণ্ঠ কি করে পৌঁছাবে। তাই একটা বুদ্ধি বের করেছিল মতি। লাল টকটকে ঘুড়ি উড়িয়ে দিত সে। এত উজ্জ্বল রঙ নিশ্চয়ই আল্লাহর চোখে পড়বে। যতটা উঁচুতে সম্ভব ঘুড়িটাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছে সে– একদম ওই মেঘের ওপর।

প্রথম প্রথম খোঁজ করলেও পরে আর ছেলেকে ডাকার চেষ্টা করত না গোলাপজান। মতি যে এখন আর এ সংসারের শিশু নয়– এটা বুঝে নিয়েছিল সে।

অতঃপর, পোয়াতী জননীর মুখটা শেষবারের মতো দেখে–মতি যে কোথায় গেছে তা গোলাপজান জানে না। জানলে হয়তো জমিরের হাতে পায়ে ধরে অসংখ্য ক্রোশ দূরের মধুধোয়া গ্রামে ছেলের খোঁজ করতে লোক পাঠাতো। স্বচ্ছল সমাজে যা অসম্ভব, বেমানান– তাই-ই জীবনের অসহায়ত্বের সামনে ফিকে হয়ে আসে।

মগডালে ফুটো হয়ে আটকে থাকা লাল ঘুড়ির মতোই অসহায় ছিল মতি, তার বোন আর মা।
কিন্তু দুঃখেরও দুঃখ আছে।

বেদনা চিরে নেয় যেমন আরো গভীর শোক শোনা গেল দেশজুড়ে মহামারী এসেছে। ছোঁয়াচে রোগ। কারো কাছে ঘেঁষলেই মরণ অবধারিত।

মধুধোয়া গ্রামেও আতংক ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। প্রথম প্রথম অবাধে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের হস্তক্ষেপে একে একে সব লোক ঘরবন্দি হলো, বাজারের দোকানগুলো বন্ধ হলো একদম।

জনমানবশূন্য, ভূতুড়ে বাজারে একা একা ঘুরে বেরিয়ে মতি ক্লান্ত হয়ে পড়লো। একখানা ঘুড়ি কিনে দেবার মানুষ সে খুঁজে পেল না। বাড়িগুলোর কেউ কেউ প্লাস্টিকের বাটিতে একটু ভাত মুড়ি দিল, কেউ কেউ ফিরিয়ে দিল খালি হাতেই। মানুষের পেটে ক্ষুধা, মনে আতঙ্ক। সব অচলপ্রায়। এর মাঝেই গ্রামের একজন মারা গেল। বিদেশ থেকে এসেছিল লোকটা, শ্রমিকের কাজ করত এক বন্দরে।

শ্বাস আটকে, ছটফট করে বিদেশফেরত লোকটার মৃত্যুর পর তাকে দেখতে গেল না কেউ। ছোঁয়াচে ভেবে তার লাশ দাফনের জন্য খাটিয়াও ধার দেওয়া হলো না। লোকটার পরিবারকে প্রায় একঘরে করে দিল সবাই। ওরা বাইরে বেরোলেই অন্যরা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে আসে।

মতির কোনো ডরভয় নেই। শ্রমিক লোকটার লাশ একটা পুরোনো বিছানা চাদরে পেঁচিয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছে সে আর মরহুমের বুড়ো বাপ।

গ্রামের বাইরে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দাফন দিয়েছে লাশ। এলাকার লোকের ধমকের চোটে মসজিদে রাখা খাটিয়া দিতে না পারলেও গ্রামের ইমাম চুপিচুপি এসে জানাজা পড়িয়ে গেছে। কেউ জানতে পারলে একঘরে করে রাখবে ইমামকেও।

কিন্তু লাশ দাফন দেওয়ায় মতি পাগলাকেও বাড়ির আশাপাশে ঘেঁষতে দেয় না কেউ তার পর থেকে। তাকে দেখলেই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে, যেন একটা ঘা-ওয়ালা কুকুর সে।

কাজেই ক্ষুধার্ত মতি পাগলা যে খাবারের আশায় কোথায় গেল কেউ টের পেল না।

একসময় সব স্বাভাবিক হলো।

জীবিতদের কেউ কেউ আশা করলো মতি পাগলার লাল ঘুড়িটাকে উড়তে দেখা যাবে গ্রামের সীমানায়। কিন্তু মেঘ সমান উঁচুতে আর কোনো লাল ঘুড়ি উড়তে দেখলো না কেউ।

একদিন গ্রামের লোকরা একটা প্রাচীন গাছের মগডালে আবিষ্কার করলো মতি পাগলার ফেলে যাওয়া শেষ ঘুড়িটা। সেটা নামিয়ে আনার সাহস করলো না কেউ, কারণ ঘুড়িটা পাহারা দিচ্ছিল অসংখ্য কাক।

রোদ, বৃষ্টি, শীতে পাহারাদারের হ্যারিকেনের মতো জ্বলজ্বল করে লাল টকটকে ঘুড়িটা।

যখন এসেছিলে অন্ধকারে

মেহেদী হাসান মুন

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে॥

তখন দেখি,পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে–
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে।।

গ্রামোফোনে রেকর্ডটা বেজে যাচ্ছে সকাল থেকেই। ঘোষবাবুর দোতলা পাকা বাড়িজুড়ে রবিবাবুর সুরের মূর্ছনা। সুবোধ ঘড়ি সারাইয়ে ব্যস্ত, সকালে ধরেছে ঘড়িটার কাজ বাক্সভর্তি নবস্প্রিং নিয়ে, এখনো সারতে পারলো না। সুবোধের বউদি রাজ্যেশ্বরী এসে বার দুয়েক কানমলা দিয়ে গেছে। সকাল থেকে নাওয়া নেই খাওয়া নেই, বিলাত থেকে নিয়ে আসা ম্যাগনিফায়ার চোখে দিয়ে একমনে ঘড়ি সারাই করছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, রাজ্যেশ্বরী সুবোধের ঘরে এসে রেকর্ড থেকে সুঁইটা সরিয়ে গান বন্ধ করে দিলো।

"কি গো সুবোধ বাবু? চান'খাবারের দরকার নেই নাকি? ঘড়িতে সারাদিন মুখ গুঁজে থাকলে কি খিদে মিটবে?"

সারাদিন পর অবশেষে সুবোধ টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকালো। ম্যাগনিফায়ারটা খুলে রেখে বউদির দিকে তাকিয়ে হাসিমাখা মুখে বলল, "ও বউদি। খাবারটা এ ঘরে দিয়ে যাও না। আর কিছুক্ষণ কাজ করলেই ঠিক ঠিক সারাই করে ফেলতে পারবো। এতদিনের কষ্ট, এভাবে ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছে করে না যে।"

রাজ্যেশ্বরী কপট অভিমানে মুখ বাঁকিয়ে বলল, "আহা! আমি যেন তার যত্ন'আত্তি করতে আছি। তা বাপু এতই যখন আলেসেমি, যত্ন'আত্তি চাও। একটা বিয়ে করে ফেল না। চারুলতার বাড়ি যাই কাল?"

"না, না বউদি। আরও পরে। কি যে বলো তুমি। থাক লাগবে না, আমিই আসছি।"

"থাক থাক, আর কষ্ট করতে হবে না ছোটো কত্তার। নিয়ে আসছি আমি খাবার। এর মাঝে এসে যেন ঘর গোছানো দেখি।"

"আচ্ছা। আমার লক্ষ্মী বউদি। ও বউদি রেকর্ডটা আবার ছেড়ে যাও না।"

"অন্য একটা গান লাগাই?"

"না না ওটাই। যখন এসেছিলে অন্ধকারে..."

বউদি যেতেই ম্যাগনিফায়ার চোখে লাগিয়ে সুবোধ ঘড়িটার দিকে তাকালো। ঘড়িটা ক'দিন আগে তাকে চারু দিয়েছে। বলেছে ওর দাদুর ঘড়ি, চিলেকোঠায় খুঁজে পেয়েছে, অচল। সুবোধের বাবার ঘড়ির ব্যবসা আর সুবোধও ছোটোবেলা থেকে ঘড়ির মাঝেই বড়ো হয়েছে তাই সুবোধকে

দিয়েছে। সুবোধও চারুকে মুগ্ধ করার জন্য লুফে নিয়েছে। ঘড়িটা সারাই করে, চকচকে করে, নতুন নব লাগিয়ে, স্বর্ণের একটা চেইনে ঝুলিয়ে কণ্ঠহার বানিয়ে চারুকে উপহার দেবে সে। চারুকে সে পছন্দ করে সেই কৈশোর থেকেই কিন্তু মুখ ফুটে বল নি কখনো। যদিও সুবোধের বাড়ির সবাই জানে যে সুবোধ চারুকে পছন্দ করে কিন্তু চারু জানে না কিছুই। হয়তো আন্দাজ করতে পারে সুবোধের কাণ্ডকারখানা দেখে। সুবোধ থিয়েটারে নাটক করার সময় জুলিয়াস সিজারের লাইন ভুলে যায় সামনের সারিতে বসা চারুকে দেখে, রসগোল্লার রস মেখে ফেলে কুর্তায় চারু হেঁটে গেলে পাশ দিয়ে, দোকানে ঘড়ির মালপত্র নেওয়ার সময় বাক্স ফেলে দেয় হাত থেকে চারুকে বারান্দায় ভেজা চুল মুছতে দেখলে। তাই এই ঘড়ি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য, সে কল্পনায় ভাবতে থাকে এই কণ্ঠহারে বাঁধা ঘড়ি নিয়ে সে যাবে চারুর সামনে, চারু ঘড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে, তার দিকে মুগ্ধতার দৃষ্টিতে তাকাবে, এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ঘড়ি থেকে একটা নব খুলে বাইরে পড়লো। নবটা তুলতে গিয়ে সুবোধ অবাক হলো। এরকম নব সে আগে কখনো কোনো ঘড়িতে দেখেনি। কিন্তু কেন যেন আবার পরিচিতও মনে হচ্ছে। চাকার মতো একটা নব তার পাশ দিয়ে লম্বা একটা সুইয়ের মতো কি যেন। কোথাও তো দেখেছে সে এটা কিন্তু মনে করতে পারছে না। তখনই হঠাৎ মনে পড়লো যে দাদার একটা বইয়ে সে এটার ছবি দেখেছিল। দৌড়ে গিয়ে দাদার শতচ্ছিন্ন পুরাতন বইটা নিয়ে এলো সে, তারপর খোঁজা শুরু করলো। অবশেষে এটার সাথে মেলে এরকম একটা ছবি খুঁজে পেল সুবোধ। এই বইয়ে মূলত ঘড়ির ইতিহাস বর্ণনা করা ছিল। পিটার হেনলির ঘড়ি আবিষ্কার থেকে, ঘড়ির বিবর্তন কিছুই বাদ যায়নি। এই ধরনের নবকে বইয়ে বলা হয়েছে "ভারজ অ্যান্ড ফলিয়ত"। এটি জার্মানিতে তৎকালীন সময়ের ঘড়িগুলোতে ব্যবহার হতো। কিন্তু সময় দেখাতে হেরফের হওয়ায় এবং পরে পেন্ডুলাম ও আধুনিক স্প্রিং আবিষ্কার হওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। চারুর দাদুর কাছে এত পুরোনো ঘড়ি থাকাটা বিস্ময়ের বৈকি। তিনিও হয়তো পৈত্রিকসূত্রে বা অন্য কোনো উপায়ে পেয়েছিলেন। এসব ঘড়িগুলো মূলত তখন দিনে দুইবার সঠিক সময় জানাতে ভুল করতো।

এত জেনে কাজ নেই তাই ম্যাগনিফায়ার চোখে গলিয়ে আবার কাজ শুরু করে সুবোধ। রবিবাবুর গান বাজতে থাকে, ভাসতে থাকে কলকাতার বাতাসে। বাতাসে চড়ে সেই গানের সুর চারুর ঘরেও এসে পৌঁছায়।

চারু জানে সুবোধদের বাড়ি থেকে আসছে গানের আওয়াজ। সেও গুনগুনিয়ে ওঠে। চারু বোঝে যে সুবোধ তাকে পছন্দ করে। সেও যে করে না এমনটা না। তবু চায় যে সুবোধ আগে বলুক তাকে, তারপর সে বলবে তার মনের কথা। চারু জানালা দিয়ে তাকায় সুবোধের ঘরের জানালায়। এত দূর থেকে ভালো মতো কিছু বোঝা না গেলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে সুবোধ টেবিলের ওপর ঝুঁকে কিছু একটা করছে। চারু মুচকি হেসে গুনগুণ করতে করতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। হঠাৎ দেখলো সুবোধ নেই টেবিলে, ভোজবাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যেন। চারুর গলা থেকে আপনা-আপনি একটা চিৎকার বের হয়ে এলো...

***

সুবোধের মনে হচ্ছে সে অনন্তকাল ধরে অন্ধকারে ভাসছে। চারপাশে কেবল ধোঁয়াশা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। সে কি বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে? শক্ত কিছুর ওপর এসে পড়লো যেন হঠাৎ। চোখটা ভালোমতো খুলতেই আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো কী হয়েছিল? বনবন করে ঘোরা মাথাটা একটু স্থির করতে চাইলো। সে তো ঘড়ি সারাই করছিল, ঘড়ি থেকে বের হওয়া নবটা ঢুকিয়েও যখন চালু হচ্ছিল না তখন একটা স্টিলের চিকন স্প্রিং পেঁচিয়ে দিয়েছিল সেটার সাথে যেন ঘুরিয়ে দম দেওয়া যায়। প্রথমবার ঘোরানোর সাথে সাথেই তো এমন হলো। সুবোধ চোখটা আস্তে আস্তে খুলতে লাগলো, আলো একটু একটু করে যেন চোখে সইতে লাগলো। সে দেখতে পেল বিশালাকার এক ঘরের মেঝেতে সে পড়ে আছে। আশপাশে পুরোনো আমলের বিভিন্ন ধরনের তালা ঝোলানো। হঠাৎ করেই সে প্রচণ্ড শীত অনুভব করলো, বুঝতে পারলো যে এখানে প্রচুর ঠাণ্ডা। গায়ের খদ্দরের কুর্তা আর ধুতিতে এই ঠাণ্ডা পোষ মানবে না। কি মনে করে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো ঘড়িটা এখনো সঙ্গে আছে তার। তখনই কার যেন পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। সুবোধ তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লো একটা দশাসই টেবিলের আড়ালে। উঁকি মেরে দেখলো এক ভিনদেশী লোক টেবিলে রাখা কলকব্জা নাড়াচড়া করছে। সুবোধ ভাবতে লাগলো যে সে কই এসে আটকা পড়লো। লোকটার পোশাক কিম্ভূত, অনেকটা বিদেশীদের মতো কিন্তু এখন তো আর এরকম পোশাক পরে না বিলেতে। হঠাৎ করেই ঘড়িটা হাত ফসকে পড়ে গেল সুবোধের।

সুবোধ দেখতে পেল লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চিৎকার করে সে বলে উঠলো, "wer bist du?" সুবোধ না বুঝে ভয় পেয়ে দ্রত ঘড়িটা চেইনসমেত হাতে তুলে নিলো। লোকটা আবার চিৎকার করে উঠলো, "কে তুমি?" সুবোধ অবাক হয়ে গেল। প্রথমবার সে ভাষা বোঝেনি কিন্তু এখন কীভাবে সে বুঝলো? লোকটা যতবার *কে তুমি* বলল সুবোধ অবাক হলো কারণ তার ঠোঁটের নড়াচড়ার সাথে কথা মিলছে না। সে ঠোঁটে তার ভাষাই বলছে কিন্তু সে শুনতে পাচ্ছে বাংলা কেবল। সুবোধ বলল, "আমি সুবোধ। কলকাতা থেকে এসেছি।"

এবার লোকটার অবাক হবার পালা। সে বলে উঠলো, "তোমাকে দেখে তো এ দেশের মনে হচ্ছে না। তুমি আমাদের ভাষায় কথা বলছো কীভাবে?" সুবোধও চমকে গিয়ে বলল, "একই প্রশ্ন তো আমারও।" হঠাৎ লোকটার চোখ পড়লো সুবোধের হাতের ঘড়ির ওপর, "আমার ঘড়ি তোমার কাছে কী করে এলো?"

"আপনার ঘড়ি? না, এ ঘড়ি তো চারুর। চারুর দাদুর।"

"না এটা আমার তৈরি ঘড়ি। আমার তৈরি করা প্রথম ঘড়ি। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম ঘড়ি। যদিও চালু করতে পারিনি, তাই এখনো প্রকাশ করিনি।"

"আপনার নাম কী একটু বলবেন?" সুবোধ অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্নটা করলো।

"পিটার। পিটার হেনলি।"

সুবোধের মনে হলো তার চারপাশ যেন দুলছে। এটা কীভাবে সম্ভব? পিটার হেনলি তো ঘড়ির আবিষ্কারক। যার হাত ধরে ষোলো শতকে ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ৪০০ বছর আগের কথা প্রায়। তাহলে কি সে ৪০০ বছর পেছনে...

"তুমি কি আমার ঘড়ি চুরি করেছ?"

"না, না। আমি চুরি করিনি। আমি তো মাত্রই এলাম। মি. পিটার আমার মনে হয় আমি সময় পরিভ্রমণ করে এসেছি। আপনার ঘড়ির কারণেই এমন হয়েছে।"

“মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?”

“মি. পিটার। আমি এই সময়ের না। আমি বিশ শতকের কলকাতা শহরের বাসিন্দা। আমি ঘড়ি মেরামত করি। এই ঘড়ি আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়েছিল সারাইয়ের জন্য। আমি সারাতে গিয়ে এখানে চলে এসেছি।”

“বলছো কী তুমি? তোমাদের সময়ও ঘড়ি আছে। তাহলে সে ঘড়ি কে আবিষ্কার করলো।”

“আপনিই করেছেন। অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি মি. পিটার। আপনার ঘড়ি আমাকে সময় পরিভ্রমণ করিয়ে অতীতে নিয়ে এসেছে।”

“দাঁড়াও আমি আমার ঘড়িটা চেক করি। আমি বেশ কয়েক বছর আগে সেটা বানিয়ে রেখেছিলাম।”

পিটার তার ঘড়ির বক্স খুঁজতে লাগলেন। সুবোধ জানালা দিয়ে নুরেমবার্গ শহর দেখতে লাগলো অবিশ্বাসী চোখে। হঠাৎ পিটারের ডাক শুনে সে দৌড়ে গেল। পিটার ধুলো পড়া একটা বাক্স নিয়ে বলতে লাগলো, “এই বাক্সেই রেখেছিলাম ঘড়িটা।”

দুজনেই বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। কিন্তু বাক্স খুলে কিছু পাওয়া গেল না। সুবোধ ও পিটার দুজনই অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে বারবার।

“এখানেই ছিল আমি নিশ্চিত।” মি. পিটার কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন।

“হয়তো দুটো ঘড়ি একই সময়ে থাকা সম্ভব না তাই।”

পিটার মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “তুমি কীভাবে এটা ঠিক করেছ? এই ঘড়ির জন্য আমি আমার জীবনের অনেক সময় দিয়েছি। আমি চাইছিলাম সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু সময়ের কাছে হার মানলাম। একটি খুঁতসর্বস্ব ঘড়ি বানালাম আর সে ঘড়িটিকে রেখে দিলাম ব্যর্থতার স্মারক হিসেবে।”

“কিন্তু আপনি ব্যর্থ নন পিটার। আপনাকেই ঘড়ির আবিষ্কারক মানা হয়। আমি আপনার ঘড়িতে একটা স্প্রিং ব্যবহার করে এটা চালু করেছি।”

সুবোধ পিটারকে দেখিয়ে দিতে লাগলো ঘড়িতে করা তার কারসাজি।

এই স্প্রিংটা আপনার ঘড়িকে দম দেয়। ভারস্টের চাকাকে ধাক্কা দেয় যে কারণে ঘড়ি সচল থাকে। যদিও আমাদের সময়ে এখন আর এ ধরনের চাকা ব্যবহার হয় না। এখন অনেক আধুনিক কলকব্জা ব্যবহার করা হয় তাই সময় ঠিক দেখায়। আপনার এই ঘড়িতে সময় ভুল দেখায় দিনে দুইবার। সকাল ৮ টায় আর রাত ৮ টায়।

“সুবোধ, জানো আমার মনে হয় আমার এই ভুলই সময় পরিভ্রমণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। আমি কারণ জানি না কিন্তু এটুকু জানি যে আমার ঘড়ি দিনে দুইবার ভুল সময় দেয় বলেই সে ভুল হওয়া সময়টায় সময় পরিভ্রমণ করতে পারছো হয়তো তুমি। আমি চাইলেই এখন স্প্রিং ব্যবহার করে এই ঘড়ি সারিয়ে নিজেকে প্রচার করতে পারি প্রথম আবিষ্কারক হিসেবে কিন্তু তাহলে মূলত আমি সময়কে নিয়ন্ত্রণ করবো আর মানুষের হাতে সময়ের নিয়ন্ত্রণ চলে এলে কি হবে তা ভাবতেই ভয় লাগছে। সুতরাং তোমাকে সময় পরিভ্রমণের কারণ খুঁজে বের করতে হবে, তারপর তোমার বর্তমানে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে পৌঁছে এই ঘড়ি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আমি এখনই ধ্বংস করে ফেলতে পারতাম কিন্তু তাহলে তুমি অতীতে আটকা পড়ে যাবে।”

“কিন্তু মি. পিটার আপনাকে তো ঘড়ির আবিষ্কারক বলা হয়। তার মানে একদিন না একদিন আপনি ঠিকই ঘড়ি আবিষ্কার করবেন। তাহলে?”

“অবশ্যই অন্য কোনোভাবে। আমি চেষ্টা করে যেতে থাকবো যতদিন সফল না হই। অন্য কোনো উপায়ে নিখুঁত সময় বলে দেবে এমন ঘড়ি বানানো যায় কিনা আমি চেষ্টা করে যাবো। হয়তো সফলও হবো কিন্তু সময় পরিভ্রমণের জন্য কোনো ঘড়ি আমি বানাবো না।”

“তাহলে এখন আমি কী করে বর্তমানে যাবো পিটার? কীভাবে জানবো সময় পরিভ্রমণের রহস্য?”

“তোমাকে ভবিষ্যতে যেতে হবে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সময়ের আরও রহস্যের খোলাসা হবে। তোমাকে জানতে হবে সময় পরিভ্রমণের কারণ কী? কীভাবে আমরা একে অপরের ভাষা বুঝতে পারছি? কীভাবে তুমি বর্তমানে যেতে পারবে? তুমি স্প্রিং উল্টোদিকে ঘুরানোর কারণে যেহেতু অতীতে চলে এসেছ সেহেতু এবার সামনের দিকে ঘোরালে হয়তো ভবিষ্যতে যেতে পারবে।”

“আমার খুব ভয় করছে পিটার। আমি যদি আর ফিরতে না পারি বর্তমানে। আমি যদি এই গোলকধাঁধার মাঝেই আটকা পড়ে থাকি সারাজীবন।”

“ভয় করো না সুবোধ। তুমি পারবে।”

সুবোধ ঘড়িটা হাতে নিয়ে স্প্রিং সামনের দিকে মোচড় দিলো। সাথে সাথেই তার চোখের সামনে থেকে পিটার, হলরুম সব উধাও হয়ে যেতে লাগলো। আবারও সেই অনুভূতি। শূন্যে ভাসমান মনে হলো নিজেকে। পিটারের মুখ অদৃশ্য হবার ঠিক আগমুহূর্তে তার ঠোঁটে অদ্ভুত এক হাসি দেখতে পেল। তারপর... সব অন্ধকার...

***

৫ আগস্ট, ২০৪৩;

ল্যাবরেটরি অব ওয়াচারস,

জ্যানেট এবং ক্রিস্টিনের আজ অফ ডে ছিল। চিফের বকুনি খেয়ে ল্যাবে আসতে হলো তাও। আজই নাকি একটা বডি চেক করতে হবে। আনআইডেন্টিফাইড বডি। তাই এত গুরুত্ব। জ্যানেট আর ক্রিস্টিন বেশ বিরক্তি নিয়েই বডির টেম্পারেচার বাড়াতে লাগলো। মানুষটার অবয়ব আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে, হার্টবিট পাওয়া গেল সাথে সাথেই। ওয়েকিং আপ প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বসলো বডিটা আর জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো।

“আমি কোথায়? আমি কোথায়?”

“আইডেন্টিফাই ইওরসেলফ।” জ্যানেট গ্লাসের বাইরে থেকেই বলল।

“আমি সুবোধ। আমি এখানে কেন? এটা কোথায়? এটা কত সাল?”

ক্রিস্টিন অবাক স্বরেই বলল, “২০৪৩ সাল। কেন?”

“হে ভগবান। তাহলে সত্যিই আমি ভবিষ্যতে চলে এসেছি।”

জ্যানেট দেখলো ছেলেটার বলা ইংলিশের সাথে তার ঠোঁটের নড়াচড়া মিলছে না। সে আবার প্রশ্ন করলো, “কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ?”

“আমি সুবোধ। আমি নুরেমবার্গ থেকে এসেছি, এর আগে এসেছি কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে।”

“মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?”

“মানে আমি অতীত থেকে এসেছি। সময় পরিভ্রমণ করে। এই দেখুন ঘড়ি। এটির সাহায্যে।”

ক্রিস্টিন জ্যানেটের মাইক্রোফোন অফ করে দিলো আর বলল, “জ্যানেট, হি ইজ হিয়ার। উই শুড কল দ্য চিফ।”

হেনরি সুবোধের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, সুবোধ চোখে চোখ মেলাতে পারছে না তাই বারবার নামিয়ে ফেলছে।

“তো তুমি বলতে চাইছ তুমি এই ঘড়ির সাহায্যে টাইম ট্রাভেল করছো? এটা তোমার জন্য পোর্টাল তৈরি করছে?”

সুবোধের নতুন শব্দবন্ধগুলো বুঝে নিতে কষ্ট হয় তবে সে বুঝতে পারে ঘড়ির কথা বলা হচ্ছে।

“জি হ্যাঁ। এই ঘড়ির সাহায্যেই আমি সময় পরিভ্রমণ করতে পারছি। এমনকি আপনার আমার ভাষাও বুঝতে পারছি এই ঘড়ির কারণে।”

“গ্রেট। তার মানে তুমি হচ্ছো পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম টাইম ট্রাভেলার। তা এই টাইম ট্রাভেল মেশিন আর পোর্টাল কীভাবে আবিষ্কার করলে?”

“না না। আমি আবিষ্কার করিনি। এটি মূলত ঘড়ির আবিষ্কারক পিটার হেনলির আবিষ্কার। কয়েকশ বছর পর কোনোভাবে আমার হাতে এসে পড়ে আর আমি সারাতে গিয়ে এই বিপদে পড়ি। এখন আমি আমার বর্তমানে কীভাবে ফিরবো সেটা জানতেই ভবিষ্যতে আসা।”

“তুমি একদম ঠিক জায়গাতেই এসেছ সুবোধ। আমরাই পারবো তোমাকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে। তার আগে তোমার বিশ্রাম দরকার। আজ ঘুমিয়ে পড়ো। কাল কথা হবে।”

সুবোধ একটু অবাকই হলো হেনরির সৌজন্যবোধে তবে এটা ভেবেও তার ভালো লাগলো যে ভবিষ্যতের মানুষ আসলে বেশ ভালো। তাকে যে রুমে শুতে দেওয়া হয়েছে সেখানে একটা বিছানা আর টেবিল ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে মজার ব্যাপার হলো টেবিলে যে ঘড়িটা সেট করা সেটি ঠিক তার হাতের ঘড়িটারই প্রতিরূপ। ঘুম আসছে না সুবোধের একদমই, টেবিলে বসেই সে ভাবতে লাগলো জীবনের হঠাৎ এমন বদলে যাওয়া। বাড়ির অবস্থা না যেন কি? মা, বউদি সবাই নিশ্চয়ই কাঁদছে। বাবা-দাদা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়তো। আচ্ছা, চারু কি কাঁদছে তার জন্য? এসব ভাবতে ভাবতেই ঘড়িটার দিকে তাকালো সে, এই ঘড়িটার জন্যই তার জীবনে এত সমস্যার সৃষ্টি হলো। সুবোধ হঠাৎ করে চোখ বড়ো বড়ো করে টেবিলের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। আচ্ছা ওরা আমার ঘড়িটার ঠিকঠিক প্রতিরূপ কীভাবে বানিয়ে ফেলল, আমি এসেছি মাত্র কয়েকঘণ্টা হয়েছে। তার মানে ওরা আগেই এই ঘড়িটা দেখেছে কোথাও।

সুবোধ দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল। দৌড়াতে দৌড়াতে দেখলো ক্রিস্টিন আর জ্যানেট নামের সে দুই তরুণী কাজ করছে ল্যাবে। সে এক ঝটকায় দরজা খুলে টেবিল থেকে একটা ছুরি নিয়ে জ্যানেটের গলায় চেপে ধরলো।

“চুপ। কেউ কোনো শব্দ করবেন না। আমাকে বলুন এসব কী হচ্ছে আমার সাথে? আমার ঘড়ির সাথে আপনাদের বানানো টেবিলের ঘড়িটার মিল কেন? কী লুকোচ্ছেন আপনারা?”

“প্লিজ প্লিজ। আমি সব বলছি। ডোন্ট কিল আস।”

“মিথ্যা বলার চেষ্টাও করবেন না। আমার মাথা ঠিক নেই এখন। যদি বুঝি মিথ্যা বলছেন তাহলে...”

“না না। আমি সত্যি বলবো। আমরা ভবিষ্যতে অনেক চেষ্টা করেছি সময় পরিভ্রমণের কিন্তু কোনোভাবেই সেটা পারছিলাম না। আমরা চাচ্ছিলাম প্যারালাল ইউনিভার্সে বা মাল্টিভার্সে থাকা

কারো সাথে যোগাযোগ স্থাপনের। কিন্তু আমরা কোনো পোর্টাল তৈরি করতে পারছিলাম না। আমরা কেবল একটা চেইন তৈরি করতে পেরেছিলাম যেটা দিয়ে বছরের ৩৬৫ দিন নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এই ডাইমেনশনেই কেবল টাইম ট্রাভেল করা যায়। কিন্তু দিনের চব্বিশ ঘণ্টার সময় কীভাবে নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে স্থির রেখে মাল্টিভার্সে ট্রাভেল করা যায় সেটি আবিষ্কার করতে পারছিলাম না। আমরা নিখুঁত ঘড়িগুলো দিয়ে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পরে বুঝতে পারি সময়কে তখনই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যখন তা নিয়ম মেনে থেমে থাকে। তাই আমরা অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি যে এমন কোনো খুঁত ঘড়ি পাওয়া সম্ভব নাকি যেটিতে সময় একটা নিয়ম মেনে থেমে থাকবে। সেই ঘড়ির সন্ধান পাই কয়েকশত বছর আগে কলকাতায় চারুলতা নামের এক নারীর কাছে। সে ঘড়ি তার স্বামী বিখ্যাত ঘড়ি ব্যবসায়ী সুবোধ ঘোষের মৃত্যুর পর নিলামে উঠেছিল আর সেখান থেকেই আমরা খুঁজে পাই তোমাকে। কিন্তু আমরা তো নষ্ট ঘড়ি নিয়ে এসে কোনো লাভ করতে পারতাম না। আমরা আশা করেছিলাম যে তুমি ঘড়িটা ঠিক করতে পারবে এবং তোমাকে প্রবোধ দিতে হবে সেটা ঠিক করার জন্য। তাই আমরা আমাদের তৈরি করা বছরের ৩৬৫টি দিনকে ছিদ্র করে বানানো পোর্টাল চেইনকে স্বর্ণে লেপে তোমার কাছে পৌঁছে দেই সময় পরিভ্রমণ করে, যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিটেক্টর হিসেবেও কাজ করবে। তোমার একটা গান শুনে মাথায় আসে চারুলতাকে ঘড়িটা সারাই করে গলার হার বানিয়ে উপহার দেওয়ার আর সেই প্রবোধ থেকেই তুমি ঘড়ি ঠিক করে ফেলো। ঘড়ি ঠিক করার সাথে সাথেই তুমি চেইনে ঝুলিয়ে স্প্রিং ঘোরালে আর অতীতে চলে গেলে পিটার হেনলির কাছে কারণ আমরা চেইনে সেট করে দিয়েছিলাম উল্টো ঘোরালে কোথায় নিয়ে যেতে হবে আর সামনে ঘোরালে কোথায়। সেখানে গিয়ে পিটার হেনলিকে দেখিয়ে আসলে তার ভুল, সে তোমাকে ভবিষ্যতে যেতে বলে দিলো আর তোমার দেখানো উপায় দেখে ঘড়ি আবিষ্কার করে ফেলল এই আশায় যে সে টাইম ট্র্যাভেল পোর্টাল আবিষ্কার করবে কিন্তু সে তো জানতো না যে টাইম ট্রাভেলের জন্য চেইন ও ঘড়ি দুটোরই প্রয়োজন হয়। আর এরপরই তুমি চলে এলে আমাদের কাছে আর আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের চেইন আর ঘড়ি। এ পারফেক্ট টাইম ট্র্যাভেল পোর্টাল। আমরা অতীত আগের মতো করেই সাজিয়ে দিতাম, পিটার হেনলি ঘড়ির আবিষ্কারক থাকতেন। চারুলতার স্বামী ঘড়ি ব্যবসায়ী সুবোধ ঘোষের মৃত্যুর পর নিলামে অন্য একটি ডুপ্লিকেট নষ্ট ঘড়ি বিক্রি হয়ে যেত। সবকিছু পারফেক্ট হতো। চিফ হেনরি তোমার কাছ থেকে ঘড়ি, চেইন নিয়ে তোমার মেমোরি মুছে দিয়ে আগের জায়গায় পাঠিয়ে দিতেন, সেখানে তুমি উঠে ঘড়ি সারানোর কথা ভুলে যেতে, চারুলতাকে ভালোবাসার কথা বলতে, নষ্ট ঘড়িটাকে নিজের বুকপকেটে সবসময় রেখে দিতে। আর পরে সেই ঘড়ি নিলামে তুলে দিতো তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী চারুলতা।”

সুবোধের মাথা ঘোরাতে লাগলো। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান মিলিয়ে এমন বিশাল একটা দাবাখেলার একমাত্র ঘুঁটি সে। রাগে, দুঃখে, হতাশায় সে রুম থেকে বের হয়ে দৌড়াতে লাগলো। এখন সে কী করবে? পুরো ল্যাবজুড়ে অ্যালার্ম বাজছে, নিশ্চয়ই ওরা জানিয়ে দিয়েছে। সুবোধ এখন কী করবে? এসব ভাবতে ভাবতে সুবোধ চেইনে বাঁধা ঘড়িটা দেখে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। ঘড়ির ভেতর থেকে ভারজের গোল চাকাটা বের করে কেবল স্প্রিং দিয়ে সুঁইটাকে ঝুলিয়ে আটকে দিলো। দেখলো ঘড়ির ডায়ালে ঘণ্টার কাটা বনবন করে ঘুরছে। সে টের পেল তার হাত থেকে ঘড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সিকিউরিটি গার্ডরা ধরে ফেলার সাথে সাথেই সুবোধ টের পেল যে তার মুঠো এখন খালি...

চারুলতা দুদ্দাড় করে দৌড়ে সুবোধের অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়লো। ইতি-উতি খুঁজেও সুবোধকে পেল না সে ঘরে। 'সুবোওওওধ' বলে চিৎকার করার আগ মুহূর্তে সে দেখতে পেল টেবিলে একটা চেইনে বাঁধা ঘড়ি পড়ে আছে। চারু ঘড়িটা হাতে তুলে নিলো, ঘড়িটার গায়ে অনেক আঁচড়ের দাগ, অচল। সুবোধের বউদি খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো চারুলতা একটা কণ্ঠহার হাতে নিয়ে কাঁদছে আর গ্রামোফোনে তখনও বেজে চলছে–

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে॥

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে–
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে।।

দ্বিচারিতত্ত্ব

শিহানুল ইসলাম

ব্যাংকের কাউন্টারে পাতলা ভিড়ের মুখে দাঁড়িয়েও সবিতার মনে পড়ল– আজকে ২৬শে অক্টোবর, খুব ভোরবেলা লন্ডন থেকে রয়েলের ফেরার কথা। রইস ভাই সেরকমই বলেছিল। সেই রয়েল, সেই পুরোনো মানুষটা। সেই ঘটনার পর– অন্তত বছর পনেরো বাদে দেখা হতে যাচ্ছে ওদের।

রয়েল লন্ডন প্রবাসী হওয়ার আগে ওর কথা একবারও মনে পড়েনি সবিতার। কী করে পড়বে? তখন শোকে একেবারে মূহ্যমান ছিল সে। অথচ দেশ ছাড়ার পরপরই একদিন মনে হলো– রয়েলকে তার কতখানি দরকার। অনেক কথা জমে আছে সবিতার বুকের মধ্যে। আর একটা প্রশ্ন। রয়েল কি এখনও মনে রেখেছে ওসব কথা?

না রাখলেও কিছু করার নেই। সবিতা ঠিক করে ফেলেছে যে, তাকে সত্যটা জানতে হবে। যেকোনো মূল্যে। নইলে যে আর কিছুতেই ভালো থাকা যাচ্ছে না। অঙ্কুরকে ভুলভাবে বুকের মধ্যে পুষে আর কোনো লাভ নেই। সে কেবলই পোড়াচ্ছে।

"এই যে, একশো একবার বলি– ভাউচারের উল্টোপিঠে মোবাইল নম্বর লিখুন। কানে যায় না কারো?" কাউন্টারে বসা ছিপছিপে তরুণীর কথায় ফিরে এলো সবিতা।

সবিতা তড়িঘড়ি করে বলল, "লিখে দিচ্ছি আপা।"

"আর কতবার বললে মনে থাকবে বলুন তো?"

"কী করবো আপা! ভুলোমনা মানুষ তো...।"

মুখে ও কথা বলল বটে সবিতা। কিন্তু সে জানে- সে মোটেও ভুলোমনা নয়। নইলে এতদিনের পুরোনো কাঁসুন্দি ঘাটতে ফের ওকে রয়েলের মুখোমুখি হতে হচ্ছে কেন? সেই ঘটনার দহনটুকু ভুলতে পারলে তাকে এভাবে নিজের জীবনটা আর বইতে হয়?

লাইন থেকে বেরিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবিতা। মাসের শেষে অঙ্কুরের এই ক'টা পেনশনের টাকার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকাটা যেন ওর কপালে ঈশ্বর নিজ হাতে লিখে দিয়েছেন। সরকারি ব্যাংকের যেরকম নিয়ম। পাশাপাশি দুটো লাইন। পুরুষগুলো বেশিরভাগই বয়স্ক, ছাপোষা। মহিলাগুলোও অমনই। সস্তার শাড়ি গায়ে, হাতে ভাঁজ করা নাইলনের ব্যাগ। টাকাটা নিয়েই মাসকাবারির দোকানে ছুটবে। এই তো জীবন।

এসব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে সবিতা। সে এমনই। কোনোকিছু তার ভবিতব্য হয়ে গেলে ঐ বিষয়াদির মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। সেই আবর্ত থেকে বেরিয়েও যে নতুন করে কিছু ভাবা যায়, সেকথা সবিতা জানে না। অবশ্য এর জন্যে সে নিজে যতখানি দায়ী, তারচে বেশি বোধহয় এই সমাজ, আরো বিস্তৃত অর্থে এই লোকসমাজ। সবিতার এই তেতাল্লিশ বছরের জীবনে সে যতবারই সামাজিক হতে চেয়েছে, লোকসমাজ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারই বা আর কী করার আছে! কিন্তু এভাবে আর কতকাল? রয়েল এসেছে, এবারে সে যদি একটু আলোর দেখা পায়।

বিকেল এলো খুব ধীরে। যেন দুপুরটুকু আজ বেড়াতে গিয়েছিল কোথায়। বিকেলের হাতে নিজেকে তুলে দিতে খুব দেরি হয়ে গেল। তবু তো সে ফিরেছে রয়েলের মতো। সবিতা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিল। পনেরোটা বছর কম নয়।

রিকশায় চেপে জেলখানার পাশ দিয়ে এগোচ্ছিল সে। রয়েলের মালতিনগরের বাসাটা কি আগের মতোই আছে? আর মানুষটা?

বাসাটা বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বিয়ের পর মাত্র দু'বার এসেছিল সে এ বাড়িতে। সাথে অঙ্কুর ছিল। ছিল একটা অজানা বন্ধন। এখন কিছুই আর নেই। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে গায়ে শাড়ির আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিল সবিতা। কলিং বেল বাজাতে হলো অনেকক্ষণ ধরে। বিয়ের পর এভাবেই, ঠিক এভাবেই নাগাড়ে বেল বাজাতো অঙ্কুর। যেন সবিতাকে একনজর দেখার জন্য তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। সবিতাও সচকিত। দরজা খুলেই সে বলতো, "যেন আর তর সইছে না!"

অঙ্কুর তখন সহসা ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছে, "সইবে কী করে? ঘরে এরকম সুন্দরী বৌ রেখে কি বাইরে মন টেকে?"

"খালি মুখে বড়ো বড়ো কথা। যখন শো করতে যাও, তখন মনে থাকে না এসব?"

"থাকবে কী করে! গান যে আমার আরেক প্রেমিকা।"

"বাহ! এভাবে দ্বিচারিত হইয়ো না সখা, আমি মরে যাবো।"

"দ্বিচারিত না হলে যে বুঝতেই পারতাম না– আমার বৌকে কতটা ভালোবাসি।"

"তবে আর আমায় ফেলে যাওয়া কেন?"

"প্রেমিকারা যে খুব উৎপাত করে।"

"ওসব তোমার মিথ্যে প্রেম। আমিই তোমার আসল প্রেমিকা।"

"তাই বুঝি! তাই বুঝি তুমি এত টানো আমায়?"

"টানি বলেই তো তুমি ঘরে ফিরে আসতে পারো।"

সবিতার এখন খুব বলতে ইচ্ছে করে– অঙ্কুর, আমি তো সেদিনও তোমার জন্য রাত জেগে বসে ছিলাম। ফিরে এলে না কেন? বুঝি সেই প্রেমিকা তোমায় আঁচলে বেঁধে রেখেছিল?

সবিতা সেসবের কিছুই উচ্চারণ করতে পারলো না। এই তো আর কিছুক্ষণ, এরপরই সেই ঘটনার মুখোমুখি হবে সে। অথচ সবিতা এখনো কেমন নির্বিকার। সে জানে না- রয়েল তাকে কতখানি আশ্বস্ত করতে পারবে।

দরজা খুলল রয়েল নিজেই। বেশ মুটিয়ে গেছে। সে তুলনায় সবিতা এখনো বিশেষ বুড়িয়ে যায়নি।

রয়েল প্রথমে ওকে চিনতেই পারেনি, তা ওর চাহনী দেখেই বোঝা গেল। কিন্তু একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সহজ গলায় বলল, "সবিতা! এসো, ভেতরে এসে।"

বসতে বসতে সবিতাও কথা বলল। "আপনি কেমন আছেন, রয়েল?"

"আছি আরকি। তুমি তো বেশ শুকিয়ে গেছো!"

"আমার কথা রাখুন। রইস ভাই সেদিন বলল- আপনি আজকে দেশে আসবেন।"

"আজ না, আমি গতকালকেই এসেছি।"

"যাক। আপনার সাথে আবার এভাবে দেখা হবে, কখনো ভাবিনি।"

"রইস ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় বলল– তুমি নাকি কী একটা ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতে চাইছো।"

"হ্যাঁ। আমার আসলে অঙ্কুরের ব্যাপারে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল।"

"সেকি কথা! অঙ্কুর সম্পর্কে আমার চেয়ে তুমিই তো ভালো জানো।"

"ভালো জানি বলেই তো অনেককিছু মেনে নিতে পারি না।"

"কী মানতে পারো না বলো?"

"ওর চলে যাওয়া।"

"দেখো, সেই বয়সেই ওর চলে যাওয়া আমিও মানতে পারিনি, এখনো পারি না। কিন্তু এসব তো সৃষ্টিকর্তা আমাদের হাতে দেননি। তার যখন যা ইচ্ছে হয়...।"

"আমি সেসব অস্বীকার করি না। কিন্তু এর বাইরেও তো কথা থাকে।"

"আচ্ছা, বলো। কী এমন জানতে চাও, যা কেবল আমিই জানি।"

সবিতা একটু থেমে বলল, "তার আগে আপনার হাতটা একটু ধরতে দেবেন?"

"হাত? হাত ধরতে হবে কেন?" রয়েল খানিকটা অপ্রস্তুত হলো।

"এই হাতেই তো মাথা রেখে অঙ্কুর শেষ নিশ্বাস ফেলেছিল, তাই না?"

কথাটা শুনে রয়েল একটু চমকালো বোধহয়। কিন্তু কিছু বলার নেই ওর। তবু সবিতার ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন পরে এসব কথা কেন টেনে আনছো?"

"আনছি। আনতে হচ্ছে বলে।"

"কেন, এব্যাপারে তোমার কোনো সন্দেহ আছে?"

"নাহ। আপনি স্বীকার করলে আর অবিশ্বাস করি কী করে!"

"আশ্চর্য! এটাই তো সত্যি। অস্বীকার করার কী আছে? ও গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার অপোজিটে দাঁড়িয়ে জলত্যাগ করছিল। সেইসময় একটা বেপোরোয়া ট্রাক এসে ওকে সরাসরি চাপা দেয়। এরপর

আমি, আর ড্রাইভার মিলে ওকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলি। আমার কোলের ওপরেই মারা গিয়েছিল সে।"

"কিন্তু লোকে যে বলে...।"

রয়েল কথাটা কেড়ে নিল। "খুন হবার কথা বলে তো! ওসব বাজে কথায় কান দেবে না একদম...।"

সেইসময় কলিংবেলটা ফের বেজে উঠল। কথার সুর ছিঁড়ে গেল ওদের। রয়েল দরজা থেকে ফিরে এসে বলল, "তুমি একটু বসো। আমি দুই মিনিটে নিচ থেকে আসছি।"

রয়েল উঠে যাবার সাথে সাথে চা এলো। কিন্তু সেটা ছুঁয়েও দেখলো না সবিতা। তার দৃষ্টি চলে গেছে সামনের শো-কেসের ওপর। সেখানে সাজানো আছে একটা হারমোনিয়াম, একসেট তবলা, এস্রাজ, সুঢৌল তানপুরা। অঙ্কুরের মতো রয়েল নিজেও গানবাজনা পছন্দ করে। সবিতা নিজেও অঙ্কুরের রেখে যাওয়া বাদ্যযন্ত্রগুলো সাজিয়ে রেখেছে। রয়েল গেলে হয়তো ছুঁয়ে দেখতো। ওদের বন্ধুত্ব যে এই সুরের বাঁধনেই বাঁধা।

সেই কলেজ জীবনে অঙ্কুরের সাথে যখন মেলামেশা, তখন থেকেই সবিতা রয়েলকে চেনে। বিয়ের পর তো রয়েল ওদের বাসায় অবাধে যাতায়াত করেছে। সন্ধের পর অঙ্কুরদের সূত্রাপুরের বাসায় বেশ গানের আসর বসতো। রইস ভাই ব্যস্ত মানুষ, তিনি আসতেন বেশ রাত করে। তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের চল ছিল। তুমুল রেয়াজ করে করে অঙ্কুর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল প্রায়। রয়েলদের যদিও পারিবারিক জুয়েলারি ব্যবসা, খানিকটা পতিপত্তিও আছে। কিন্তু বন্ধুর পেছনে অঢেল সময় বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি কখনো। অঙ্কুরের প্রায় সব শো-তেই রয়েল থাকতো। অনেক রাতে অনুষ্ঠান শেষ করে আবার ফিরে এসেছে একসাথে।

অঙ্কুরের সাথে সবিতারও পরিচয় এই গানের ভেতরেই। তখন সবিতা নিজেও টুকটাক গাইতো। ডিপার্টমেন্টের বসন্তবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গানের রিহার্সেলের সময় সবিতা দেখল– তার সাথে যারা ডুয়েট গাইতে চাইছে, তাদের ভেতর কারোর গলা তেমন সুবিধের নয়। স্কেলই ঠিকঠাক ধরতে পারে না। সে ভেবেই নিয়েছে– এই অকালপুরীতে তার সাথে টক্কর দেবার মতো গলা একটাও নেই। ডুয়েটে সমানে সমান না হলে চলে?

এর মধ্যে থেকে একটা ছেলে তার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে থাকে। বান্ধবী মারফত জানতে পারলো– ছেলেটার নাম অঙ্কুর। তাদের থেকে দুই বছরের সিনিয়র। হলে হবে কী, সবিতা অতটা লাজুক নয় যে ছেড়ে কথা বলবে। ফাঁক বুঝে সে ওকে ফিসফিস করে বলেছিল, "অমন করে তাকিয়ে থাকবেন না প্লিজ। অস্বস্তি হয়।"

অঙ্কুরও কম যায়নি। চোখে চোখ রেখে বলেছিল, "হলেও বা, আমার চোখ কোনো নিষেধাজ্ঞা মানছে না।"

"আপনি তবে চলে যান এখান থেকে। আমার রিহার্সেলে সুবিধে হয়।"

"কিন্তু আমার সাথে আপনার একটা ডুয়েটের রিহার্সেল আছে যে!"

"বলেন কী! আপনিও গাইতে পারেন?"

"না পারলে কী আর এসেছি!"

সবিতার ভাবখানা এমন যে, হাতি-ঘোড়া গেল তল, চামচিকে বলে...। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি রিহার্সেল শুরু হলো, তখন বিস্ময়ের অন্ত রইলো না তার। নিজে গাইবে কী, অঙ্কুরের গানের গলা শুনে সে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে গেল। এমন একজন গুনী মানুষকে কি তার অমন অবজ্ঞার চোখে দেখা ঠিক হয়েছে?

এরপর কোত্থেকে জানি কী হয়ে গেল। দুজনেই একসময় বুঝতে পারলো যে, তাঁরা একে অপরের প্রেমে পড়েছে। ওদের দেখা হয়, অনেক কথা হয়। সেই অনেক কথার ভিড়ে আসল কথাটাই আর বলা হয়ে ওঠে না। কী অসম্ভব ছটফটানির মধ্যে দিয়ে গেছে তখন সবিতা। তবু ভালো ছিল, ভীষণ প্রিয় ছিল সময়টা। কোনো তীব্র ভালোবাসা পাবার আগমুহূর্তে মেয়েরা বুঝতে পারে, সে দূর্লভ কিছু একটা পেতে যাচ্ছে। এই পেতে যাওয়ার মনকামনায় ভর করে প্রচণ্ড অহংকার এসে বাসা বাঁধে ভেতরে। সবিতার সেই অহংকারের নাম অঙ্কুর।

রয়েল নিজের মধ্যস্থতায় সেই অহংকারটুকু সবিতার গলায় পরিয়ে দিয়েছে। চেয়ে চেয়ে দেখেছে অনেকদিন। আবার ঐ হাতেই সেই অহংকারটুকু জলের মতো আঙুলের ফাঁক গলে লুটিয়ে পড়েছে সেদিন। অঙ্কুর সত্যিই মাটিতে মিশে গেছে। সেই সাথে সবিতাকেও মিশিয়ে গেছে। কেবল ফেলে গেছে সূত্রাপুরের ছিমছাম একটা সংসার। একটা চাকরির সম্ভাব্য সমস্ত পেনশন। আর এক গভীরতম ধোঁয়াশা।

কিন্তু এসবের আর দরকার কী? সেই অহংকারটুকুই যদি গলায় না থাকলো। সবিতা আর সমৃদ্ধ কীসে?

রয়েল ফিরে এসেই বলল, “একি! চা’টা খেলে না?”

“আমি দুপুরের পর কিছু মুখে দিই না আর।”

“তা না খাও, অন্তত চা...।”

“বাদ দিন না।”

একটু থেমে রয়েল ফের বলল, “বুঝলে সবিতা, লোকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। যত্তসব উল্টোপাল্টা কথা ছড়িয়ে বেড়ায়। পত্রিকাগুলোও যেমন, খবর বেচার লোভে যা তা প্রচার করে। নইলে ওরকম একটা ঘটনাকে রঙচঙ মাখিয়ে...।”

সবিতা ওকে শেষ করতে দিল না। “তার চেয়ে আপনি সত্য কথাটা বলুন না রয়েল। খুনের কথা শুনলেই আমার কেবল মনে হয়– কোনো ধারালো ছোঁরা দিয়ে অঙ্কুরের বুকে ক্রমাগত খোঁচানো হয়েছে। এই দৃশ্যই কেবল আমার চোখের সামনে ভাসে। আর...।”

“আর কী?”

সবিতার গলা বুঁজে এলো। “থাক ওসব কথা।”

রয়েল বোধহয় কথাটা ধরতে পারল। “দেখো সবিতা, বন্ধু বলে বলছি না। আমার চেয়ে তুমিই ওকে বেশি চিনতে। যতটুকু দেখেছি- ও তোমাকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসতো। নিজের সবটুকু উজার করে দিয়ে তোমাকে আগলে রাখতে চেয়েছে। এমন স্বামী ক’জন মেয়ের কপালে জোটে বলো তো! এখন ভাগ্যের মারপ্যাঁচে একটা দূর্ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা মেনে নিয়েই তোমাকে বাঁচতে হবে। এটাই যে সত্যি, এটাই বাস্তব। মানুষটাই যখন নেই, তখন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কোনো হেঁতু দেখি না। ভুলে যাও ওসব।”

"আমি পারি না রয়েল। আমি আপনার মতো করে ভাবতে পারছি না। গত পনেরোটা বছর হলো এই যন্ত্রণা আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রিয় মানুষটার মৃত্যু এমনিতেই কত যন্ত্রণার, তারওপর এমন একটা ধোঁয়াশা। আপনি বলছেন এক্সিডেন্ট, লোকে বলে খুন। কোনটা বিশ্বাস করবো আমি?"

"আমার কথাই কেবল বিশ্বাস করবে তুমি। অঙ্কুর খুন হতেই পারে না। ওর কোনো শত্রু ছিল না কখনো। অত ভালো, নিরাপরাধ একজন মানুষকে কে খুন করবে ওভাবে?"

"আমিও তো সেটাই বলি। সে কারোর কোনো ক্ষতি করেনি কোনোদিন। তবু পত্রিকার লোকগুলো ওভাবে লিখল...!"

"সবিতা, আমি বলছি তো- ওটা খুন ছিল না, এক্সিডেন্ট। স্রেফ একটা দূর্ঘটনা।"

সবিতা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঠেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। "লোকে অনেক কথা বলে রয়েল। যে মানুষটাকে অন্ধের মতো ভালোবেসেছিলাম আমি, তার অমন মৃত্যু কী করে মেনে নিই বলুন। এরপর আর ভালো থাকা যায়?"

নিজের সোফা থেকে উঠে এসে সবিতার পাশে বসল রয়েল। এরপর গভীর মমতায় আস্তে করে ওর কাঁধে হাত রাখল। স্পর্শটা পেয়ে সবিতার হুঁশ ফিরল যেন। অন্যের বাড়িতে বসে এরকমভাবে নিজেকে খুঁইয়ে ফেলা যে ভালো কথা নয়, এমনটা বুঝতে পেরেই বোধহয় ধাতস্থ করল নিজেকে।

"তুমি আমায় কেন বিশ্বাস করছো না সবিতা?" রয়েল ওর চোখে চোখ রাখলো।

"করতেই তো চাই। কিন্তু আপনিই সেসময় জোর দিয়ে কিছু বলেননি।"

"এখন তো বলছি। ওটা একটা এক্সিডেন্টই ছিল। আমার নিজের চোখে দেখা জিনিস ভুল হবে?"

"সত্যি তো! আমার এটা খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে জানেন।"

"করবেই তো। এটাই যে সত্যি।"

"আচ্ছা, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি তাহলে আজকে উঠি। যাবার আগে একদিন আসুন।"

রয়েল কিছু বলতে পারলো না আর। সবিতাও আর কিছু শোনার জন্যে বসে রইল না সেখানে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো সে। গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে তার কেন জানি মনে হচ্ছে- ব্যালকনি থেকে রয়েল তাকে দেখছে। দেখুক। তার পরনে আধময়লা শাড়ি। ঘাড়ের কাছে ঘাম চিটিচিটে ময়লা জমে আছে। চুলে, খোপায় তার দৈন্যতার ছাপ বসানো। এসব দেখে কি রয়েল ভাববে- সে এত দুঃখ নিয়ে বেঁচে আছে কী করে? ভাবুকগে। সে জানে না- তার বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য প্রদীপ আছে। যার নাম অহংকার। সেই ধিকি ধিকি জ্বলা প্রদীপটাই এতদিন শুকিয়ে খটখটে হয়ে ছিল। আজকে যেন রয়েল তা ফের জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন কি আর সেই কাগজ বয়ে বেড়ানো চলে?

ব্যাগ ঘেটে একটা পত্রিকার কাটিং বের করলো সে। সেই দূর্ঘটনার পরদিনই এটা ছাপা হয়েছিল।

'বেশ্যাপাড়ায় সঙ্গীতশিল্পী অঙ্কুর চৌধুরীর রহস্যজনক মৃত্যু'

কাটিংটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল সবিতা। এরপর হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে সামনে এগোলো সে। অহংকারে, মাথা উঁচু করে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

তেলাপোকা
আসিফ রুডলফায

শফিক প্রচণ্ড তেলাপোকা ভয় পায়। বাঁকানো শুঁড় আর কাটা কাটা পাওয়ালা পোকাগুলোকে দেখলেই তার ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। আর কী অদ্ভুত ব্যাপার- তার বাড়িতে এই একটি পতঙ্গের কোনো অভাব নেই! খাটের নিচে, বুকশেলফের চিপায়, বাথরুমের কোণে, কোথায় নেই এই তেলাপোকা! রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ যদি অন্ধকারে পানি খেতে যায় বা বাথরুমে যায় তবে পায়ের নিচে গোটা দুই তেলাপোকা তো পড়বেই।

শফিকরা আগে মাদারটেক থাকত। শুধুমাত্র বাড়িতে তেলাপোকার উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় সে বাসা বদলে খিলগাঁয় পাঁচতলা উঁচুতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিল। ভাবল এত উঁচুতে পোকামাকড় পৌঁছতে পারবে না। তার সে আশায় গুড়ে বালি, তেলাপোকার উৎপাত এখানেও। শফিকের মনে হলো, পুরোনো আসবাবপত্রে তেলাপোকা বাসা বেঁধেছে, তাই সে বাসা বদলে যেখানেই যাচ্ছেন তেলাপোকাও তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। সে পুরোনো বেশ কিছু ফার্নিচার বেচে দিল। তার স্ত্রী শাহানা বেশ নাখোশ হলো, বিশেষ করে বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া আলমারিটা বেচে দেওয়ায় সে শফিকের সাথে দুইদিন কোনো কথা বলল না। কিন্তু এত কিছু করেও সমস্যার কোনো সমাধান হলো না, তেলাপোকা শফিকের পিছু ছাড়ল না।

কিছু মানুষের প্রতি কীট-পতঙ্গ অপেক্ষাকৃত বেশি আকর্ষিত হয়, শফিকও সম্ভবত সেই ধরনের কেউ। রাতের বেলা তার গায়ে তেলাপোকা উঠবেই। প্রায়ই তার কাপড়ের মধ্যে তেলাপোকা লুকিয়ে বসে থাকে। শফিক না বুঝে ওই কাপড় গায়ে দিয়ে পোকার স্পর্শ পাওয়া মাত্র চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে। শফিকের চার বছরের মেয়ের নিশি বাবার লাফঝাঁপ দেখে সে কী হাসি। মাঝে মাঝে শাহানাও মেয়ের সাথে হাসিতে যোগ দেয়, কখনো আবার স্বামীর এহেন ছেলেমানুষি আচরণে ভ্রু কুঁচকে তাকায়।

তেলাপোকা দেখলে একটু গা ঘিনঘিন করে না এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। কিন্তু শফিকের তেলাপোকা ভীতি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। অবশ্য এর কারণ আছে। শফিকের বয়স যখন নয়-দশ হবে, তখন একবার তাকে পাড়ার বদ পোলাপান জাপটে ধরে একটা ঢাউস তেলাপোকা জ্যান্ত গিলিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই থেকেই শফিকের তেলাপোকা ভীতি মাত্রাতিরিক্ত।

শফিক শেভ করছে। ধারালো রেজরের আচড়ে ঘন শুভ্র ফেনার প্রলেপ কেটে কেটে মসৃণ ত্বক অনাবৃত হচ্ছে। বাথরুমের ভেতর বেশ গরম। শফিকের ঘাম ঝরছে। এমনি সময় কোত্থেকে এক তেলাপোকা উড়ে এসে শফিকের ঘাড়ে পড়ল। শফিক চমকে উঠে একটা ছোটোখাটো লাফ দিল। গালের সাথে চেপে ধরে থাকা রেজর ব্লেড এই সুযোগে একটা গভির দাগ ফেলে দিল শফিকের মুখে। শফিক দাঁত চেপে খিস্তি করে উঠল। গালটা বেশ ভালোই কেটেছে, শুভ্র ফোমের ওপর একটা

টকটকে লাল ধারা একেবেকে চিবুক বেয়ে নেমে আসছে। শফিক তাড়াতাড়ি টিস্যু পেপারে ডেটল ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। টিস্যু সরিয়ে সে আয়নায় ভালো করে দেখার চেষ্টা করল কতটুকু কেটেছে।

এই সময় শফিকের জীবনের সবচে অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে গেল। বেসিনের নিচ থেকে একটা গাবদা তেলাপোকা ফুড়ুৎ করে লাফ দিয়ে এসে পড়ল ওর মুখে। তারপর শফিক কিছু বুঝার আগেই তেলাপোকাটা সড়সড় করে ওর গালের সদ্য কাটা ক্ষত দিয়ে চামড়ার ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে শফিক এমনকি একটা চিৎকার দেওয়ারও সময় পেল না। সম্বিত ফিরে পেতেই শফিক পাগলের মতো নিজের গাল খামচাতে শুরু করল। মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই জান্তব চিৎকার বেরিয়ে আসছে। দেখতে দেখতেই সে খামচে চিবুকের ক্ষতটা আরও বড়ো করে ফেলল। চেঁচামেচি শুনে শাহানা যখন বাথরুমে উঁকি দিল ততক্ষণে শফিকের ডান গাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে। শফিক নখ বিধিয়ে গাল থেকে প্রায় ইঞ্চি খানেক চামড়া তুলে এনেছে। শাহানা ছুটে গিয়ে শফিকের হাত চেপে ধরল। কাঁদোকাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে, এমন করছ কেন?”

শফিক কোনো উত্তর দিল না। সে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে।

শফিককে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। উন্মাদের মতো সে নিজের গাল খামচানোর চেষ্টা করছে। তাকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো। ডাক্তার ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। কিন্তু এতে তার মাথা ঠাণ্ডা হলো না। কাঁপাকাঁপা গলায় সে ডাক্তারকে জানালো, তার চামড়ার ভেতর একটা তেলাপোকা ঢুকে গেছে। যেভাবে হোক ডাক্তারকে ওটা বের করে দিতেই হবে। রোগীর আবদার শুনে ডাক্তার তো হেসেই খুন। তার হাসি দেখে শফিক খেপে গেল। ডাক্তারকে গাল দিয়ে বসল। ডাক্তারও চট করে উত্তেজিত হয়ে গেলেন, কম্পাউন্ডারকে ডেকে শফিক আর শাহানাকে বের করে দিলেন।

রাস্তায় নেমে শফিক বাড়ি ফিরতে রাজি হলো না। আরেকজন ডাক্তার দেখাতে হবে। সেখানে কাজ না হলে হাসপাতালে যেতে হবে। যেভাবেই হোক তার শরীর থেকে তেলাপোকাটা বের করতে হবে।

গভীর রাত। কিন্তু শফিকের চোখে ঘুম নেই। সে বাতি জেলে বিছানায় পা তুলে বসে আছে। তার শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। তার শরীরের ভেতর একটা তেলাপোকা ঢুকে গেছে, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু কথাটা কাউকে বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না। এমনকি শাহানা পর্যন্ত তার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না, এমন ভাব করছে যেন তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অথচ সে চামড়ার নিচে তেলাপোকাটার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। পোকাটা ওটার লোমশ পাগুলো ওর চামড়ার ভেতরে ঘসছে, শফিকের শরীরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পোকাটা তার ভেতর চলাচল করতে চেষ্টা করছে। প্রথমে গালের মধ্যেই ঘাপটি মেরে ছিল। এখন মনে হচ্ছে ওটা চোয়াল বেয়ে গলার কাছে চলে যাচ্ছে।

খাটের পায়ায় হেলান দিয়ে আছে শাহানা। তার প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে কিন্তু চোখে ঘুম আসছে না। হঠাত শফিকের কী হয়ে গেল। মানুষটা সবসময়ই পোকামাকড় ভয় পেত, ব্যাপারটা কিছুটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের হলেও শাহানা কখনই তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ছয় বছরের বিবাহিত জীবনে শফিককে আর কখনো এমন পাগলের মতো আচরণ করতে দেখেনি শাহানা। কী করবে কোনো দিশা না পেয়ে মা’কে ফোন দিয়েছিল। মা বলেছে রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে। কাল সকালে উনি এসে দেখে যাবেন।

বাবার অবস্থা সবচে সহজভাবে নিয়েছে ছোট্ট নিশি। প্রথম থেকেই সে চোখ বড়োবড়ো করে বাবাকে দেখছিল আর একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। এখন সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে খাটের কোণে।

শফিক ঢোক গিলে বলল, “শাহানা, পানি খাবো।”

শাহানা পানি আনতে গেল। শফিক বসে বসে ঘামতে লাগল। পোকাটা আবার নড়তে শুরু করেছে। সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে পোকাটা তার চামড়ার ভেতরের দেওয়ালে আঁশওয়ালা পা বিঁধিয়ে একটু একটু করে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। শফিকের প্রবল ইচ্ছে করছে নখ দিয়ে খামচে গাল কেটে তেলাপোকাটা বের করে আনে। তেলাপোকাটা ওর চোখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সেকি!! পোকাটা কী ওর চোখ খেয়ে ফেলবে!!!

***

পরের দিন শফিক অফিসে গেল না। তার ধারণা তার শরীরের সর্বত্র তেলাপোকাটা ঘুরে বেরাচ্ছে। এক রাতেই ওর চেহারা অনেক বদলে গেছে, চুল উস্কু খুস্কু, চোখ কোটরাগত। শুধু তাই না, ওর আচার-আচরণও কেমন ক্ষ্যাপার মতো হয়ে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ শরীরের এখানে সেখানে থাবা মারছে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। নিশি গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, “বাবা, তেলাপোকাটা এখন কী করছে?” উত্তরে শফিক এত জোরে গর্জে উঠল যে নিশি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলল। বিকালের দিকে শাহানার মা এলেন। মেয়ে জামাইয়ের অবস্থা দেখে গম্ভীর হয়ে এক টুকরো কাগজে শাহানাকে এক সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা লিখে দিলেন। ওকে বললেন দেরি না করতে। শাহানা পরের দিনই শফিককে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেল।

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি আর সবার মতো শফিককে নিয়ে হাসাহাসি করলেন না। মনোযোগ দিয়ে শফিকের কথা শুনে গেলেন। সব শেষে বললেন, “তেলাপোকাটা এখন কোথায় আছে?”

শফিক হাত দিয়ে দেখালো কাঁধের কাছে।

ডক্টর বললেন, “আপনি এক কাজ করতে পারেন। আপনি জায়গাটা স্ক্যান করে দেখতে পারেন আসলেই ওখানে কিছু আছে কিনা। আপনি একবার স্ক্যান করালেই সবার কাছে ব্যপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।”

শফিক সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল। স্ক্যান করানো হলো। জরুরি ভিত্তিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রিপোর্ট পাওয়া গেল। স্ক্যান পিকচারে কোনো তেলাপোকার চিহ্নও নেই। শফিক বিশ্বাস করতে পারল না। সে আরও একবার স্ক্যান করালো। ফলাফল একই।

বাড়ি ফিরে শফিক সোজা বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি আটকে দিল। তারপর বহু সময় আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। ভয় পেয়ে শাহানা গিয়ে বাথরুমের দরোজায় ধাক্কা দিল। ওপাশ থেকে কোনো উত্তর এলো না। অবশেষে শাহানা গিয়ে ওপরের ফ্ল্যাট থেকে বাড়িওয়ালার ছেলেকে ডেকে নিয়ে এলো। দুজন মিলে বাথরুমের দরোজা ভেঙে দেখল শফিকের দেহটা এলিয়ে পরে আছে ভেজা মেঝেতে। শফিকের কাঁধ থেকে রক্তের একটা মোটা ধারা নেমে এসেছে। মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে। শফিকের হাতে ধরা একটা রক্ত মাখানো ব্লেড। শফিক নিজের কাঁধ কেটে তেলাপোকাটা বের করে আনার চেষ্টা করছিল।

দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। আটটা সেলাই পড়ল। এক ব্যাগ রক্ত দেওয়া হলো। শাহানা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। শফিক নির্বাক।

শফিক অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিল। সারাদিন নিজের মনে বিড়বিড় করে। আর শরীর চুলকায়। ওর হাতের কাছে এখন আর কোনো ধারালো বস্তু রাখা হয় না। হাতের নখ একেবারে ছোটোছোটো করে কেটে দেওয়া হয়েছে। এই নখহীন আঙুল দিয়েই সে চুলকে শরীরের কয়েক জায়গার চামড়া তুলে ফেলছে। এই ক'দিনে ওর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। চেহারা দেখলে চেনা যায় না। এভাবে অফিস কামাই করে কতদিন চলবে! শফিকের চাকরিটা ভালো, কিন্তু ওর বস এক নম্বরের খাটাশ। শফিককে একটুও দেখতে পারে না। এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি নিতে থাকলে কবে যেন চাকরি থেকেই ছাটাই করে দেয়। শাহানা একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। সেও স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এখন সারাক্ষণ শফিকের পাশে। সে রাত জেগে শফিকের পাশে বসে থাকে। ওকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়। চোখের আড়াল করলেই আবার কোনো অঘটন করে বসে। দুশ্চিন্তা এবং রাত জেগে থেকে শাহানার স্বর্ণাবরণ মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবে এত পাহারা দিয়েও শেষ রক্ষা হলো না। চার বছরের নিশি সারাক্ষণ বাবার আশেপাশে ঘুরঘুর করে। বাবার শরীরে ঢুকে পড়া তেলাপোকাটা নিয়ে তার আগ্রহের অন্ত নেই। একমাত্র সেই বাবার শরীরে একটি তেলাপোকার অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেনি। সারাদিন সে বাবাকে এটা সেটা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। বাবা তার বেশির ভাগ প্রশ্নেরই জবাব দেয় না। তাতে তার আগ্রহের কোনো কমতি নেই।

এক বিকেলে নিশি বলল, "বাবা তেলাপোকাটা কী খায়?"

শফিক খসখসে গলায় বলল, "আমার শরীরের ভেতর থাকে, আমাকেই খায়।"

নিশি এবার জ্বলজ্বলে চোখে বলে, "ওটা কে তেলাপোকা মারার ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলা যায় না?"

কথাটা শফিকের মাথায় গেঁথে গেল।

কয়েক দিন ধরেই শফিকের মনে হচ্ছে তেলাপোকাটা তাকে ভেতর থেকে একটু একটু করে খেয়ে ফেলছে। পোকাটা নরম মাংসে চোয়াল বসিয়ে একটু একটু করে ছিঁড়ে নেয়, সেই জায়গায় তীব্র একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভূত হয়। শফিক দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে। নিশির কথাটা তাকে একটা নতুন আইডিয়া দিল। ঘরে তেলাপোকা মারার চকের অভাব নেই। কিছু চক ভেঙে পানির সাথে গুলে খেয়ে ফেললে কেমন হয়? বিষাক্ত চক রক্তের সাথে মিশে ছড়িয়ে পড়বে শরীরের প্রতিটি শিরায়। তেলাপোকাটা যেহেতু ওর রক্ত মাংস খেয়েই বেঁচে আছে, রক্তের মাধ্যমে বিষ ঢুকে পড়বে পোকাটার শরীরে!

শাহানা পর দিন বাজার থেকে ফিরে দেখল শফিক অচেতন হয়ে বিছানায় পরে আছে। তার মুখ দিয়ে সমানে ফেনা গড়াচ্ছে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। প্রায় দুই ঘণ্টা জমে-মানুষে টানাটানির পর ডাক্তারদেরই জয় হলো। দু'দিন পর শফিক সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তাকে এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখা হবে, এমন কি বাথরুমে গেলেও চোখের আড়াল করা যাবে না। অবশ্য তার দরকার ছিল না।

সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শে শফিককে কড়া ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। সে দিনের বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই থাকে। যতক্ষণ জেগে থাকে সেই সময়টাও সে একটা ঘোরের মধ্যে বসবাস করে। তার দিন তারিখের হিসাব গুলিয়ে গেছে। আগের অনেক কথাই সে আর মনে করতে পারে না। একদিন নিশিকে দেখিয়ে সে শাহানাকে জিজ্ঞেস করে এই বাচ্চাটা কে?

শফিক নিজের মনেই বিড়বিড় করে, কখনো হাসে। শফিকের অসুস্থতার খবরটা প্রথম দিকে শাহানা কিছুটা চেপেই রেখেছিল, ইচ্ছে করেই আত্মীয়দের সবাইকে জানায়নি। কিন্তু কীভাবে কীভাবে যেন সবাই জেনে গেল শফিকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে সারাক্ষণ তার মাথার ভিতর একটা তেলাপোকার সাথে কথা বলে। আত্মীয়েরা দল বেধে দেখতে এলো। তারা একেক জন একেক রকমের কথা বলছে। শফিকের এক মামা আছেন বেশ পরহেজগার মানুষ। তিনি দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন জিনের আছর হয়েছে। এর চিকিৎসা ডাক্তারি বইতে নেই। তার চেনাশোনা ভালো ফকির আছে। তার কাছ থেকে তাবিজ এনে দিলেই এক হপ্তার মধ্যে জিন বাপ ডেকে পালাবে। তাবিজ আনতে দশ হাজার টাকা লাগবে। মামার পিড়াপিড়িতে তাবিজ আনা হলো। সেই তাবিজ পরে শফিকের পাগলামি আরও বেরে গেল। ইদানীং তাকে দেখলে চেনা যায় না। অথচ এই চেহারা দেখেই ভার্সিটি পড়ুয়া শাহানার মনে হয়েছিল যেভাবে করেই হোক, এই অসম্ভব রূপবান পুরুষটিকে না পেলে সে বাঁচবে না। শাহানার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একা বাথরুমের দরজা আটকে চিৎকার করে ঘণ্টাখানেক কেঁদে নেয়। সেটা সম্ভব হয় না। এতক্ষণ শফিককে চোখের আড়াল রাখা সম্ভব না।

একরাতে অদ্ভুত একটা গিসগিস শব্দে শাহানার ঘুম ভেঙে গেল। সে বাতি জেলে দেখল শফিক ঘুমের মধ্যে এপাশ-ওপাশ করছে, মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে আহআহ শব্দ করছে। শফিক এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমায় ঠিকই, কিন্তু ওর ঘুম কখনই গভীর হয় না। মানুষটা যে ভীষণ কষ্টে আছে এটা তার ঘুমন্ত মুখেও স্পষ্ট ফুটে থাকে। কিন্তু শফিকের কারণে শাহানার ঘুম ভাঙেনি। অদ্ভুত গিসগিস শব্দটার উৎস খুঁজতে মেঝের দিকে নজর যেতেই ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মেঝেতে অগুনিত তেলাপোকা। যেন কেউ একটা জীবন্ত লাল কার্পেট দিয়ে মেঝে মুড়ে দিয়েছে। তেলাপোকাগুলো সশব্দে তাদের পাখা নাড়ছে, গিসগিস শব্দটা সেখান থেকেই আসছে।

এত তেলাপোকা কোত্থেকে এলো। বাতি জ্বালালে তেলাপোকারা সাধারণত ছুটে আসবাবপত্রের আড়ালে চলে যায়। কিন্তু এই পোকাগুলো নড়ার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না। শুধু শূন্যে তাদের বাঁকানো শুঁড় তুলে পাখা কাঁপাচ্ছে। শাহানার মনে হলো তেলাপোকাগুলো বুঝি ওর দিকেই চেয়ে আছে। ওরা যেন শাহানাকে কিছু বলতে চাইছে। হঠাৎ শাহানার মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে হাতে একটা শলার ঝাড়ু নিয়ে উন্মাদের মতো তেলাপোকাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শপাং শপাং ঝাড়ুর বাড়িতে পোকাগুলো চিরে-চেপ্টা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড, পোকাগুলো ছুটে পালাচ্ছে না। যেটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

“মা, কী করছ?” নিশির ঘুম জড়ানো কণ্ঠে শাহানার সম্বিত ফিরে এলো। ঘামে তার গায়ের সাথে শাড়ি লেপ্টে গেছে। ঘরময় মরা তেলাপোকা ছড়িয়ে আছে, ওগুলোর থেতলানো শরীর থেকে কটু গন্ধ বেরুচ্ছে। নিশির ঘুম মাখা চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। নিশির বাবাও জেগে উঠে বসেছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে দেখছে মৃত তেলাপোকাগুলোকে।

***

তেলাপোকাগুলো স্পষ্টই শাহানার পিছু নিয়েছে। সে যেখানে যায় পোকাগুলোও তার পেছন পেছন যায়। যেন ওরা সারাক্ষণ শাহানাকে নজরে রাখছে, ওকে পাহারা দিয়ে চলেছে। শাহানার মনে হচ্ছে শফিকের

সাথে ওরও ইদানীং মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একেক সময় শাহানা খেপে গিয়ে খালি পায়েই পোকাগুলোকে মেঝেতে পিষে ফেলে। পোকাগুলো নির্দ্বিধায় প্রাণ দেয়, কিন্তু শাহানার পিছু ছাড়ে না।

শফিক এখন একা একাই শরীরের তেলাপোকাটার সাথে কথা বলে। যতক্ষণ জেগে থাকে পুরোটা সময় পোকাটার সাথে বিড়বিড়-ফিসফাস করেই কেটে যায়। নানা বিষয়ে তাদের কথাবার্তা হয়। এই যেমন কিছুক্ষণ আগে ওরা এভ্যুলুশন নিয়ে কথা বলছিল। মানব শ্রেণি এভ্যুলুশনের শীর্ষে অবস্থান করছে, অথচ মানুষের চেয়ে হাজার বছরের পুরোনো হয়েও তেলাপোকা প্রজাতির বিবর্তন এক জায়গায় থেমে আছে। শত উল্কাবৃষ্টি, অগ্নুৎপাত, আইস এইজ, নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন কিছুতেই তাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দেখা গেছে তারা অর্থপ্রোডা শ্রেণির মধ্যে সবচে রেজিলিয়েন্ট প্রাণী। এই রেজিলিয়েন্সির ধরে রাখার জন্যেই কি তাদের বিবর্তন ত্যাগ করতে হয়েছে? অন্যান্য সকল প্রাণী যেখানে বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে আরও শক্তিশালী করেছে, নিজের পরিবেশের সাথে নিজেকে আরও খাপ খাইয়ে নিয়েছে; সেখানে বিবর্তনহীনতাই তেলাপোকাকে দিয়েছে অনন্ত অস্তিত্বের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এমন যদি হতো, তেলাপোকা নিজের রেজিলিয়েন্সি টিকিয়ে রেখেই অন্যান্য দিকগুলোতে বিবর্তন ঘটাতে পারত? কিন্তু শত সহস্র বছর ধরে যার বিবর্তন থেমে আছে, তীব্র পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তাও যার মিউটেশন ঘটাতে পারেনি সে কীভাবে হঠাত করে নিজের বিবর্তন ঘটাবে? উপায় অবশ্য একটা আছে। সে যদি কোনোভাবে বিবর্তনের সিঁড়িতে সবচে অগ্রগামী প্রজাতিটির সাথে নিজেকে মার্জ করতে পারে...

শফিক গোসল করছে। শাওয়ার চলছে। ঝিরঝিরি পানির সহস্র ক্ষুদে বর্শা শফিকের মুখে আঘাত হানছে। ওর বড়ো ভালো লাগছে। বাথরুমের দরজা সামান্য ফাঁক করা। দরজা পুরোপুরি বন্ধ করা নিষেধ। শাওয়ারে ভিজতে ভিজতে শফিক মাথায় হাত বুলালো। একি! আঙুলের সাথে এক গোছা চুল উঠে এসেছে। পাগলের মতো সে মাথায় হাত চালালো আর মুঠিভর্তি করে গোছা গোছা চুল উঠে এলো। এসব কী হচ্ছে! চুল উঠে গিয়ে মাথার এক পাশের নগ্ন তালু দেখা যাচ্ছে। শফিকের বমি পেয়ে গেল। মুখ ভর্তি করে সে বেসিনে বমি করে ফেলল। বমির সাথে কিছু লাল রক্তও বেরিয়ে এলো। শফিক লক্ষ্য করল হলুদাভ বমি আর রক্তের মিশ্রণে আরও কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট শক্ত একটা কিছু। শফিক জিনিসটা হাতে তুলে আনল।

একটা দাঁত।

শফিক হা করে দেখল মাড়ি থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। মাড়ির ওই জায়গাটায় আঙুল ঢুকিয়ে টানতেই খচ করে আরেকটা দাঁত খুলে এলো। ওর চুল দাঁত সব পড়ে যাচ্ছে কেন!? এই সময় শরীরের ভেতর থেকে তেলাপোকাটা খসখসে গলায় কথা বলে উঠল। সে বলল, “সময় হয়েছে।”

***

কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে ভেজা শরীরেই শফিক বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। শাহানা খাটে বসে নিশির একটা ফ্রক সেলাই করছিল। শফিককে দেখে তার হাত থেমে গেল। শফিকের সারা শরীর ভেজা, মাথার একপাশে কোনো চুল নেই, চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মতো।

শফিক এসে শক্ত হাতে শাহানার কাঁধ চেপে ধরল। শাহানা চেচিয়ে উঠল, “এই শফিক কী করছ, লাগছে তো!”

শফিক গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে শাহানাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। ওর কোমর থেকে তোয়ালেটা খসে পড়ল মেঝেতে। ভেজা নগ্ন শরীর নিয়ে সে চড়ে বসল শাহানার ওপর। শাহানার নিশ্বাস আটকে আসছে। সর্বশক্তি দিয়ে সে শফিককে ঠেলে নামাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু শফিকের শরীরটা যেন পাহাড়ের মতো ওর ওপর চেপে বসেছে, শত ধাক্কায়ও একচুল নাড়াতে পারছে না। শফিকের আঙুলগুলো লোহার মতো শক্ত হয়ে গেঁথে যাচ্ছে ওর মাংসে। শাহানা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চাইছে। কিন্তু পাশের ঘরেই নিশি খেলছে। ঘরের দরজা ভেজানো, চিৎকার দিলেই নিশি ছুটে আসবে। তাকে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে হবে। শাহানার বুক ধ্বক ধ্বক করছে, মেয়েটা কখন ঘরে ঢুকে পড়ে! শফিক নির্মম হাতে শাহানার শাড়ি পেটিকোট টেনে নাভির কাছে তুলে ফেলে।

শফিক ওকে ধর্ষণ করছে!

***

কেউ একজন ডাকছে।

কে ডাকে?

একটু একটু করে শাহানার চেতনা পরিষ্কার হয়ে আসে। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। শাহানা মৃদু আর্তনাদ করে উঠে।

কেউ একজন ডাকছে।

"আম্মু আম্মু..." নিশি ডাকছে। দু'হাতে সে মায়ের কাঁধ ঝাকাচ্ছে।

নিশির ওপর চোখ পড়তেই প্রবল ব্যথা উপেক্ষা করে শাহানা চট করে উঠে বসে। দ্রুত শাড়িটা শরীরে পেঁচিয়ে নেয়।

"আম্মু তোমার কী হয়েছে?" নিশির দুই চোখ ভরা বিস্ময়।

"কিচ্ছু হয়নি আম্মু। তুমি ঠিক আছো?"

"হ্যাঁ, আমার আবার কী হবে? কিন্তু তুমি এভাবে শুয়ে ছিল কেন?"

"এমনি আম্মু, তোমার বাবা কোথায়?" শাহানা দ্রুত ঘরের এদিক ওদিক তাকায়।

"বাবা তো নাই।" নিশি জবাব দেয়।

শফিককে ঘরের কোথাও দেখা যায় না। বাইরে থেকে খুব হল্লা শোনা যাচ্ছে। নিশি বারান্দায় গিয়ে দেখল নিচে রাস্তায় অনেকগুলো মানুষ গোল হয়ে জটলা করছে। এই সময় কেউ কলিং বেল টিপল। শাহানা দরজা খুলে দেখে বাড়িওয়ালার ছেলেটা। ছেলেটা আমতা আমতা করে বলল, "আপা একটু নিচে আসেন।"

"কেন কী হয়েছে?" শাহানা জিজ্ঞেস করে।

"জরুরি ব্যাপার, আপনি একটু নিচে যান। নিশি আমার কাছে থাক।"

শাহানা নিচে গিয়ে দেখল শফিকের থেতলানো লাশ রাস্তায় পড়ে আছে। সে নাকি পাঁচ তলার বারান্দা থেকে লাফ দিয়েছে। রাস্তার মানুষজন দেখেছে।

শাহানা বিস্ময় বা বেদনা কিছুই অনুভব করল না। তার চোখের দৃষ্টি মরা মাছের মতো। ও দেখতে পেল শফিকের মাথাটা প্রায় দুই ভাগ হয়ে গেছে। কালো রক্ত জমে আছে জায়গাটায়। সেই রক্তে একটা তেলাপোকা উলটে পড়ে আকাশের দিকে পা ছুড়ছে।

***

পাঁচ মাস পরের কথা।

শাহানা প্রেগন্যান্ট।

মা'কে সাথে নিয়ে শাহানা ডক্টরের চেম্বারে এসেছে। আজ তার আল্ট্রাসনোগ্রাম করানো হয়েছে। পেটের ভেতর বাচ্চাটা একটু একটু নড়ছে। একটু পরেই ওর ছবি দেখতে পাবে, শাহানার ভীষণ ভালো লাগছে।

শাহানার ডাক্তার সেলিনা চৌধুরী। শাহানার নগ্ন পেটে এক ধরনের প্রলেপ মাখানো হলো। তারপর সেলিনা ওর পেটে স্ক্যানারটা চেপে ধরলেন। সামনের মনিটরে কাঁপাকাঁপা একটা ডিজিটাল ইমেজ ফুটে উঠল। শাহানার অনভিজ্ঞ চোখে এই অদ্ভুত ইমেজে ওর বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না। সে বলল, "ডক্টর, আমার বাচ্চাটা কোথায় তো বুঝতে পারছি না।"

ডক্টর সেলিনা চিন্তিত মুখে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার কপালে ভাঁজ পড়েছে। এসব কী দেখাচ্ছে! মনিটরটা কি নষ্ট হয়ে গেল!

মরিয়ম খালার বাগানবাড়ি

অপু তানভীর

মিতু আমার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে রইলো। কাল রাতে ওর সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার খানিকটা তর্কাতর্কি হয়েছে। কথার এক পর্যায়ে সে বালিশ নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেছে। ভেবেছিলাম যে ক'দিন আমার সাথে সে আর কথা বলবে না। কিন্তু দেখলাম আজকে দুপুর না গড়াতেই আবার একই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছে। আমি আর নতুন করে এই ব্যাপারটা নিয়ে আর ঝগড়া করতে চাই না।

"আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না তুমি ঐ বাড়িতে যেতে চাও না কেন? কী এমন সমস্যা শুনি তোমার?"

"আমার ভালো লাগে না, ব্যাস! তোমাকে তো আমি যেতে মানা করিনি। চাইলে আমি তোমাকে ঐ বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি!"

"হ্যাঁ, তোমার খালা, তোমাকে দেখতে চেয়েছে আর আমি গিয়ে হাজির হবো? গিয়ে কী বলবো শুনি? অপু আসেনি, আমি তার সাবস্টিটিউশন গুডস হিসাবে এসেছি?"

বুঝতে পারছিলাম যে মিতু রেগে যাচ্ছে। আমি ওর দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি জানি আমি যখন মিতুকে জড়িয়ে ধরে থাকি মিতুর রাগ আস্তে আস্তে পড়তে

থাকে। এক সময় দেখলাম যে তার রাগ পড়ে গেল। মিতু শান্ত কণ্ঠে বলল, "বুড়ো একটা মানুষ। যে কোনো সময় মারা যাবে। তোমাকে একবার দেখতে চাচ্ছে। যাওয়া উচিৎ না?"

ঝগড়া করলে প্রতি উত্তর দেওয়া যায় কিন্তু এমন নরম সুরে বললে সেই কথা না মেনে উপায় নেই। আমি বললাম, "আচ্ছা তোমার যেমন ইচ্ছে। যাবো আর দেখা করে চলে আসবো! কেমন?"

মিতু হাসলো। তাই হবে!

মিতু খুশি মনে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আমি বসে রইলাম নিজের ঘরে। মনের ভেতরে একটা ভয় কাজ করতে থাকলো! ঐ বাড়িটাকে আমি ছোটোবেলা থেকে ভয় পাই। ভয় পাওয়ার পেছনে কারণও আছে। কারণটা মনে হলেই আমার এখনো শরীরটা শিউরে ওঠে।

মরিয়ম খালা আমার আপন খালা নন। মায়ের দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন হন সম্ভবত। আমি সম্পর্কটা ঠিকমতো জানিও না। তবে প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন। আমাদের সব ভাইবোনদের খুব আদর করতেন। বিশেষ করে আমাকে বেশি আদর করতেন। মায়ের কাছে শুনেছিলাম যে তার আমার বয়সী একটা মেয়ে ছিল। ছোটো থাকতেই মেয়েটা নাকি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। এই জন্যই সম্ভবত আমাকে বেশি আদর করতেন!

তিনি আমাদের বাসায় মাঝেমধ্যে আসতেন, আমাকে আদর করতেন। এর ভেতরে কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা দেখা দিল যখন আমরা মরিয়ম খালার বাসায় বেড়াতে গেলাম। তখন ক্লাস ফাইভে কিংবা সিক্সে পড়ি! গরমের ছুটিতে ঠিক হলো আমরা সবাই যাবো মরিয়ম খালার বাসায়। বাড়িশুদ্ধ মানুষ সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ঠিক হলো সপ্তাহখানেক সবাই সেখানেই থাকবো।

মরিয়ম খালাদের বাড়িটা বিশাল বড়ো। মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখানে। আগে এই বাড়িটা নাকি এক জমিদারের বাগানবাড়ি ছিল। খালুর বাবা এলাকার নাম করা উকিল ছিলেন। তিনিই নাকি সুযোগ বুঝে এটা কিনে নিয়েছিলেন। মেরামত করে নিজের বাগানবাড়ি বানাবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু খালুর বাড়িটা এতই পছন্দ হয়ে গেল যে সে নিজের জন্য বাড়িটা তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে নিলেন। তারপর এই মুন্সিগঞ্জেই নিজের ব্যবসাপাতি নিয়ে স্থায়ী হয়ে গেলেন।

আমার নিজেরও বাড়িটা খুব পছন্দ হলো। বাড়ির পেছনে বিশাল বাগান। বাগান পেরোলে আবার একটা বড়ো সান বাঁধানো পুকুর! মরিয়ম খালার দুই ছেলে। খালিদ আর রনি। পিঠাপিঠি ভাই তারা। আমার বড়ো ভাইয়ার সমান বয়স। যাই হোক সারাদিন আমরা পুরোবাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতাম। সারাদিন হইচই চলছেই। ছোটোরা আছেই, বড়োরাও মাঝে মধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিতেন। আর খাওয়া-দাওয়ার কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। প্রথম চার-পাঁচদিন কীভাবে চলে গেল আমি টের পেলাম না। আমার কাছে মনে হলো এই বাড়ি ছেড়ে আমি আর কোনোদিন যাবো না। সারাজীবন এখানেই থাকবো। কিন্তু ছয় নম্বর দিনে এসে আমার সেই ইচ্ছে একেবারে উবে গেল। সন্ধ্যার সময় তখন। খালিদ ভাইয়ারা বাড়ির ভেতরে নেই। তারা বাইরে মাঠে খেলতে গেছে। বড়ো আপু ঘরের ভেতরে কি যেন করছে। আমি একা একা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছি বাড়ির ভেতরে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি পুকুরটার কাছে। পুকুরের সানবাঁধানো সিঁড়িতে বসলাম।

বাড়ির এদিকটা বলতে গেলে সবসময় ফাঁকাই থাকে। মানুষজন থাকে না। কেবলই গাছগাছালি আর পুকুর। একজন মালি আছে পুরো বাগান আর পুকুর দেখাশোনা করার জন্য। তবে সে বিকেল বেলা বাসায় চলে যায়। পুরো এলাকাটা কেমন নির্জন হয়ে আছে। একেবারে শান্ত। আমার হঠাৎ কেমন যেন ভয় করে উঠলো। আমার মনে হলো এখানে আর মোটেই থাকা উচিৎ না। একটু আগেই আযান দিয়েছে। আমাদের কাজের বুয়ার মুখে শুনেছি যে আযানের পরের এই সময়টা নাকি ভালো না। এই সময়ে নানান অশরীরি আর ভূতপ্রেত ঘুরে বেড়ায়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এখান থেকে চলে যাওয়ার একটা তাগাদা অনুভব করলাম। একটা সিঁড়ি ওপরে উঠতে যাবো তখনই মনে হলো যেন

পেছনে পুকুরে পানির নড়ে উঠলো। নড়ে উঠলো বলতে কেউ পুকুরের পানি থেকে ওপরে উঠে আসতে গেলে যেরকম আওয়াজ হয় ঠিক সেই রকম। আমার অবচেতন মনে বারবার আমাকে বলল আমি যেন কোনোভাবেই পেছন ফিরে না তাকাই, পেছনে তাকালেই আমি ভয়ংকর কিছু দেখতে পাবো। কিন্তু আমার মাথাটা আপনা-আপনি ঘুরে গেল। মাথা ঘুরানোর সাথে সাথেই আমার বুকের ভেতরে ধ্বক করে উঠলো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি কি দেখেছিলাম আমি আজও নিশ্চিত করে বলতে পারবো না, তবে সেই জিনিসটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। আমার কেবল ভাসা ভাসা এই টুকু মনে আছে যে আমার বয়সী একটা মেয়েকে দেখেছিলাম। চেহারাটা একেবারে সাদা। মনে হচ্ছিল যেন অনেক দিন পানির নিচে থেকে তার গায়ের রং একেবারে সাদা হয়ে গছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে হেসেছিল। সাথে সাথে তার মুখ আর চোখ দিয়ে পানি বের হতে শুরু করলো। এইটুকু দেখেই আমার আত্মা উড়ে গিয়েছিল। আমি চিৎকার করে দৌড় দিয়েছিলাম। বাড়ির উঠানে আসতে আসতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই।

রাতে আমার জ্ঞান ফিরলে আমি নাকি কাউকে ঠিকমতো চিনতে পারছিলাম না। তার পরদিনই আমার নিজেদের বাসায় ফিরে আসি। তারপর আবার ভাইয়া আর আপু ঐ বাড়িতে বেড়াতে গেলেও আমি যাইনি অনেকদিন। মরিয়ম খালাও আমাকে নিয়ে যেতে আর জোড়াজুড়ি করেননি। সম্ভবত আমার ঐ অবস্থা দেখে তিনি নিজেও খানিকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তবে আমার প্রতি তার ভালোবাসা কমলো না। আমাদের বাসায় এলেই সেটা আমি টের পেতাম।

দ্বিতীয়বারের মতো আবার গেলাম যখন মিতুর সাথে আমার বিয়ে হলো। মরিয়ম খালা নিজে এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। বললেন যে যেতেই হবে ঐ বাড়িতে। আমি মিতুকে নিয়ে আবারও হাজির হলাম ঐ বাড়িতে। তবে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যেকোনো ভাবেই আমি ঐ পুকুর পাড়ে যাবো না। কিন্তু মিতুর কেন জানি পুকুরপাড়টা খুব বেশি পছন্দ হলো। দিনের বেশির ভাগ সময় সে সেখানেই কাটাতে লাগলো।

পুরো বাড়িতে তখন মানুষ বলতে খালা আর খালু। আর তাদের কিছু চাকর-বাকর। খালুর বয়স হয়ে গেছে অনেক বেশি। দুই ছেলেই থাকে কানাডাতে। আমাদের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তারা খালা-খালুকে কতবার করে কানাডাতে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছেন কিন্তু খালা খালু নাকি কোনোভাবেই রাজি হননি। তারা ঐ বাড়ি ছেড়ে কোনোভাবেই যাবেন না।

আমরা যাওয়াতে বাড়িটা আবারও মানুষে ভরে উঠলো। প্রথম দু'দিন মনের ভেতরে ভয় কাজ করলেও আস্তে আস্তে সেটা কাটিয়ে উঠলাম। আমিও মিতুর সাথে পুকুরে পাড়ে সময় কাটাতে থাকলাম। খালার আদর-আপ্যায়নে মিতু একেবারে গলে গেল। জানিয়ে দিল যে সময় পেলেই আমরা এখন থেকে এই বাড়িতেই বেড়াতে আসবো। কোনো অযুহাত চলবে না।

এই ক'দিনে আমার রাতে ঠিকমতো ঘুম আসতো না। নতুন জায়গাতে আমার এমনিতেও ঘুম আসতে চায় না। তা ছাড়া ঐ ভয়টা মনের ভেতরে একটু রয়েই গেছে, তাই রাতে ঘুম আসতে আমার একটু সময় লাগতো। মিতু এদিক দিয়ে বেশ ভাগ্যবতী। সে যেখানেই যাক না কেন ঘুমের ব্যাপারে তার খুব একটা সমস্যা নেই। আমি বাড়ির ভেতরে এদিক-ওদিক হাঁটতে থাকি। খালাদের বাসায় চমৎকার একটা লাইব্রেরি আছে। আমি সেখানে গিয়েও বই নাড়াচাড়া করি। তবে আজকে সেটাও ভালো লাগছিল না। কি মনে হলো সিঁড়ি বেয়ে আমি ছাদের দিকে হাঁটা দিলাম। আকাশে আজ চাঁদ উঠেছে বেশ। সব কিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। বাতাসটাও স্নিগ্ধ আর মোলায়েম মনে হলো। মিতুর সাথে কিছু এখানে থাকতে পারলে ভালো লাগতো।

ছাদে কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করতেই মনটা শান্ত হয়ে এলো। মনে হলো যে এখন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই আমার ঘুম আসবে। সিঁড়ি ঘরের দিকে পা বাড়াতে তখনই আমার চোখ চলে গেল পুকুরের

দিকে। ছাদ থেকে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে পুকুর পাড়টা দেখা যায় পরিস্কার। সেদিকে তাকাতেই আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো। আমার চোখের ভুল হওয়ার কথা না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত দূর থেকেও আমার সেই ঘোলা চোখ আর পানিতে ভেজা ফ্যাকাসে সাদা চামড়ার মেয়েটিকে চিনতে মোটেই কষ্ট হলো না। আমার মনে হলো আমার পায়ে যেন শিকল বেঁধে দিয়েছে। আমি নড়তে পারছি না। মেয়েটি একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমিও তার দিকেই তাকিয়ে আছি।

"কী দেখছো?"

আমি চমকে ফিরে তাকালাম। তাকিয়ে দেখি মিতু দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে জানে পানি এলো। আমার কাছে এগিয়ে এসে মিতু বলল, "কী ব্যাপার? এরকম লাগছে কেন তোমাকে?"

আমি মিতুর সেই কথার জবাব না দিয়ে বললাম, "আচ্ছা দেখো তো পুকুর পাড়ে কেউ আছে কিনা!"

মিতু রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দেখলো কিছু সময় তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, বিশাল বড়ো বড়ো ভূত রয়েছে দাঁড়িয়ে। তুমি এখনও সেই পুরোনো কথা মনে রেখেছো?"

আমি হাসলাম। মিতুর উপস্থিতিতে আমার ভয় কেটে গেছে। আমি এবার মিতুর দিকে ভালো করে তাকালাম। বললাম, "তুমি এখানে?"

মিতু বলল, "ঘুম ভেঙে দেখি তুমি পাশে নেই। মনে হলো লাইব্রেরিতে আছো। সেখানেও না পেয়ে এখানে চলে এলাম। এসে দেখি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছো।"

আমি আবার লজ্জিতভাবে হাসলাম। তারপর বললাম, "তোমার কথাই মনে করছিলাম। ভাবছিলাম তুমি পাশে থাকলে চমৎকার হতো।"

"ইস ঢং!"

"ঢং না। সত্যিই বলছি।"

কিছু সময় মিতুর সাথে হাঁটাহাঁটি করলাম। তারপর মনে হলো এই জ্যোৎস্নায় মিতুর সাথে একটা ছবি তোলা দরকার। একটা চেকইন দিলেও মন্দ হবে না। ইনজয়িং জ্যোৎস্না উইথ মিতু।

মিতুকে বললাম, "তুমি এখানে বসো, আমি এক দৌড়ে মোবাইলটা নিয়ে আসি। একটা ছবি তোলা যাক। ভয় পেও না কিন্তু।"

মিতু মুখ ভেঙচিয়ে বলল, "ইস আমি তোমার মতো ভয় পাই না। যাও জলদি যাও।"

আমি দৌড়ে নিচে নেমে এলাম। বিছানার পাশের টি-টেবিলের ওপরেই ফোনটা রাখা। ফোন হাতে নিয়ে আবার বের হতে যাবো তখনই আমার চোখ গেল বিছানার ওপর। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো আসছে পরিস্কার। সেই আলোতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে মিতু বাচ্চাদের মতো করে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। ঠিক যেমনভাবে ওকে রেখে গিয়েছিলাম।

আমার বুকের ভেতরটা আবারও কেমন কেঁপে উঠলো। অনুভব করলাম কেউ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমার কেন জানি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে মোটেই সাহস হলো না।

আমি মিতুর পাশে শুয়ে পড়লাম চুপচাপ। সারাটা রাত আমার এক ফোটা ঘুম এলো না। মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে এই বাড়িতে আর একটা মুহূর্তও নয়। কাল সকালেই আমাকে চলে যেতে হবে। অফিসের কাজের অযুহাত দেখিয়ে পরদিনই ঐ বাড়ি থেকে চলে আসি ঢাকাতে।

তারপর আর যাওয়া হয়নি। এরপর খালু মারা গেছেন, খালার স্ট্রোক হয়েছে কিন্তু আমি ঐ বাড়িতে একবারও যাইনি আর। কিন্তু এবার যেতে হলো। পরদিনই মিতুকে নিয়ে আবারও হাজির হলাম মরিয়ম খালার বাড়িতে। বাড়ি ভর্তি লোকজন। খালার দুই ছেলে দেশে ফিরেছে, তাদের আর আমাদের পরিচিত সবাই এসেছে। খালার অবস্থা আসন্ন। আর খুব বেশি সময় নেই।

খালিদ ভাই আমাকে বেশ কয়েকবার ফোন দিয়েছেন। খালা নাকি আমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছেন। বাসায় পৌঁছানোর পরপরই খালিদ ভাই আমাকে সরাসরি তার ঘরে নিয়ে গেলেন। খালা বিছানাতে শুয়ে আছেন। তার আশেপাশে অনেক মানুষ। কিছু পরিচিত আর কিছু অপরিচিত। দেখলাম আস্তে আস্তে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। ঘরের ভেতরে মিতু, আমি আর খালিদ ভাই রয়েছে। খালা আমাকে চোখের ইশারাতে কাছে যেতে বললেন। আমি কাছে গেলাম। বুঝলাম তিনি আরও কাছে যেতে বলছেন। বেশি জোরে কথা বলতে পারছেন না। আমি আমার কানটা খালার আরও কাছে নিয়ে গেলাম। খালা আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "খুখু তোরে খুব পছন্দ করতো বাজান, ওরে দেইখা ভয় পাইস না। তুই ছাড়া আর কেউ ওরে দেখোনের নাই। ওরে একটু দেইখা রাখিস। ভয় পাইস না।"

আমি অবাক হয়ে খালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার বুঝতে বাকি রইলো না খালা আসলে কি বলতে চাইছে। খুখু খালার সেই পানিতে ডুবে যাওয়া মেয়েটির নাম। আমি যে ভয় পেয়েছিলাম এটার কারণ খালা জানতো।

খালা মারা গেলেন দুপুরের দিকে। দাফনের কাজ শেষ করতে করতে বিকেল হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগ দিয়েই বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। কেবল কাছের ক'জন আত্মীয় রয়ে গেল। রাতের বেলা খালিদ ভাই আমাকে অদ্ভুত একটা তথ্য দিলেন। খালা অন্যসব সম্পত্তি তাদের দুই ভাইয়ের নামে লিখে দিয়ে গেলেও এই বাড়িটা আমার জন্য দিয়ে গেছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে আমি যেন এই বাড়িটা নিই। মাঝেমধ্যে এখানে থাকি।

আমি খালিদ ভাইকে বললাম, "আমি এই বাড়ি নিয়ে কী করবো? এটা তোমাদের। তোমরাই নিয়ে নাও।"

খালিদ ভাই বলল, "মায়ের শেষ ইচ্ছেটা রাখ তুই। আমরা কেউই আর দেশে আসবো না। এই জায়গা সম্পত্তি দিয়ে কী করবো বল, নিজেদের যা আছে তাই অনেক। তুই মাঝেমধ্যে এসে একটু দেখে রাখিস।"

আমি আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। ঠিকই বুঝতে পারছিলাম যে খালা কেন এই বাড়িটা আমাকে দিয়ে গেছেন।

পরিশিষ্ট

"আব্বু ,সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে যাবে না?"

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার ছোটো মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। এত সময় সে পুরো বাড়িটা দৌড়াদৌড়ি করে ক্লান্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা পুকুর থেকে হাত পা পরিষ্কার করে বাসার দিকে পা বাড়িয়েছে। আমাকেও সাথে যেতে বলছে। আমি বললাম, "তুমি যাও, মামণি, আমি আসছি।"

সে আর দাঁড়ালো না। বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। পুকুর পাড়ে। আজও আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় করে বেশ। তবুও আমি দাঁড়িয়ে থাকি। ভয় করলেও আমার দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সত্যিই যদি খুখু থেকে থাকে, সে নিশ্চয়ই জানে যে, আমি তার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ভয় পেলেও দাঁড়িয়ে আছি।

ভাগ্যে আমার লেখা ছিল মরিয়ম খালার বাড়িতেই থাকতে হবে। সেটা আমি চাইলেও এড়াতে পারলাম না। অফিস আমাকে নতুন ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে এই মুন্সিগঞ্জে পাঠালো। ঢাকা থেকে খুব বেশি দূরে নয় বলে আমার আপত্তি কোনোভাবেই টিকলো না। অফিস থেকে বলা হলো যে কয়েক বছর আমাকে এখানে থাকতে হবে। কাজকর্ম গুছিয়ে আনার পরে আবার আমার পোস্টিং ঢাকাতে করা হবে। আমার রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

শুরুতে ভেবেছিলাম যে এই বাড়িতে থাকবো না কিন্তু মিতুর কারণে সেটাও পারলাম না। তার কথা হচ্ছে নিজেদের এত বড়ো থাকতে ভাড়া বাসায় কেন থাকবো! তারপর থেকেই এখানেই আছি। আমাদের ছোটো মেয়ে টুনুর জন্মও এখানেই। এই বাড়িতে আসার পরে আমাদের কারোই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু সবসময়ই কারো উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। বারবার কেন জানি মনে কেউ আমাকে দেখছে কোথা থেকে। আমাদের আদৃশ্য আত্মীয়ের মতো করে আমাদের সাথে সাথে আছে। মরিয়ম খালা যেমন করে আমাকে খুব আদর করতেন, আমাকে খুব আপন বলে মনে করতেন, আমার কেন জানি মনে হয় যে তার মেয়েও একইভাবে আমাকে খুব আপন বলে মনে করে। আমার খারাপ কিছু মনে হয় না। এখনও একটু একটু ভয়ের অনুভূতি হলেও আমার এই বাড়ির প্রতি একটা আলাদা মায়া জন্মে গেছে, কেবল বাড়িই সেই অদৃশ্য খুখুর প্রতিও। মরিয়ম খালার কথাটা কানে আমার প্রায়ই বাজে!

"খুখু তোরে খুউব পছন্দ করে। ওরে ভয় পাইস না।"

আমি পুকুরটাকে পেছনে রেখে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। কানে হঠাৎ করেই সেই শব্দটা শুনতে পেলাম। কেউ যেন পানি থেকে উঠে আসছে। আমি চোখ বন্ধ করে খালার কথাটা আবার মনে করার চেষ্টা করলাম, "খুখু তোরে খুউব পছন্দ করে। ওরে ভয় পাইস না।"

দই সমাচার

রিফাত আহমেদ

মিষ্টির দোকান থেকে দই কিনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় এক গাড়ি পুলিশ এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। গাড়ি থেকে নেমেই কয়েকজন পুলিশ সোজা বন্দুক আমার দিকে করে বললো, "এই প্যাকেটের মধ্যে কী আছে এক্ষুণি বের করুন, নাহলে আপনাকে গুলি করতে বাধ্য হবো।"

ভয়ে আমার হাত পা কাঁপছে। সকাল সকাল এ কি বিপদে পড়লাম রে বাবা।

ভয়ে ভয়ে বললাম, "স্যার এর মধ্যে বগুড়ার দই আছে।" সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশকে লক্ষ্য করে বললাম, "স্যার আমার বিয়েশাদি হয় নাই। আপনি দয়া করে বন্দুকটা বুকের দিকে অথবা মাথার দিকে তাক করে ধরুন। ওখানে গুলি লাগলে আমি আর এই জীবনে বিয়ে করতে পারবো না। ছোটোবেলা থেকে আমার বিয়ে করার খুব ইচ্ছে।"

পিছন থেকে এসআই সাহেব এগিয়ে এসে বললো, "মানুষের এত ইচ্ছে থাকতে তোর এই বিয়ে করার ইচ্ছের কারণটা কী?"

আমি বললাম, “বিয়ের পর অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চা হবে। তারপর শিশুপার্কে গিয়ে এক ব্যাটার ওপর প্রতিশোধ নিবো। সেদিন প্রেমিকার সাথে শিশুপার্কে গেছিলাম। এক ব্যাটা আমাদের ঢুকতে দেয় নাই। বলছে ওখানে শিশু ছাড়া ঢোকা নিষেধ।”

এসআই আমার কানমলা দিয়ে বললো, “পরিবার পরিকল্পনার শ্লোগান শুনিস নাই? দুইটি বাচ্চার বেশি নয়। একটি হলেই ভালো হয়।”

আমি কাচুমাচু হয়ে বললাম, “স্যার বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটির বেশি। সেইখানে আমার ৩-৪ বাচ্চাকাচ্চা আপনাদের কাছে বেশি হয়ে গেল?”

এসআই ধমক দিয়ে বললো, “অই তুই চুপ থাক। বেশি কথা বলিস। ঐ কেউ একজন এর প্যাকেট খুলে দেখ ভিতরে কি আছে।”

একজন এগিয়ে এসে প্যাকেট খুলে দেখে বললো, “স্যার ভিতরে দই ছাড়া কিচ্ছু নাই।”

এসআই বললো, “দইটাও চেক করে দেখ। গাড়ির ভিতরে দেখ চামুচ আছে সেটা নিয়ে আয়।”

কনস্টেবল একটা চামুচ এনে দই থেক এক চামুচ মুখে দিয়েই বললো, “স্যার ফার্স্টক্লাস দই। জীবনে এমন দই খাই নাই।”

এসআই বললো, “কি, তাই নাকি? সত্যি ভালো তো?”

কনস্টেবল বললো, “জি স্যার। একদম খাঁটি দই।”

এবার আমার বিশেষ জায়গায় দিকে বন্দুক তাক করে থাকা কনস্টেবল এসআইকে বললো, “স্যার বউয়ের যন্ত্রণায় বাসায় মিষ্টি খাইতে পারি না। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে ওখান থেকে এক চামুচ দই খাই? খুব খাইতে ইচ্ছে করতেছে।”

এসআই বললো, “ঠিক আছে খা। তবে এক চামুচের বেশি খাবি না।”

এরপর সেই কনস্টেবল এক চামুচ মুখে দিয়েই বললো, “স্যার দই খেয়ে মুখের চুলকানি বেড়ে গেছে। আরেক চামুচ খাই স্যার?”

এসআই বললো, “ঠিক আছে খা।”

এবার খেয়াল করে দেখলাম, সব পুলিশ সদস্যরাই এসআইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ এরাও খেতে চায়।

আমি দৌড়ে গিয়ে সেই কনস্টেবলের হাত থেকে দইয়ের হাঁড়ি দুইটি কেড়ে নিয়ে বললাম, “স্যার আর দই দেওয়া যাবে না। আপনার দুই কনস্টেবল আমার এক হাঁড়ির অর্ধেক দই শেষ করছে। আমি আর দই দিবো না।”

এবার আরেক কনস্টেবল বলে উঠলো, “ও ভাই আমারে এক চামুচ দই দেন না। এমন করেন কেন?”

আমি রেগে গিয়ে বললাম, “দেখেন ভাই। আমার আব্বা আমাকে এমনেই বিশ্বাস করে না। ভাববে আমি রাস্তায় দই খেয়ে হাড়ি খালি করেছি। আপনারা থাকেন আমি চালালাম।”

এসআই সাহেব বললেন, “আজ নির্বাচন জানো না? এসব প্যাকেট নিয়ে ঘুরলে পুলিশ সন্দেহ করবেই। যাই হোক, এটা কোথাকার দই?”

আমি বগুড়ার দই বলে বাসার দিকে হাঁটতে লাগলাম। একবার পিছন ফিরে দেখি সবাই আমার হাতের দইয়ের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে ভাবছি বাসায় গিয়ে আব্বারে কি জবাব দিমু।

বাসার প্রায় সামনে চলে এসেছি। দেখি গলির মোড়ে কয়েকজন পুলিশ সদস্য দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম শেষ। এবার আর আমার দই নিয়ে বাসায় যাওয়া হবে না। কোনো চিন্তা না করেই দইয়ের প্যাকেট দুইহাত দিয়ে শক্ত করে ধরে দিলাম ভৌ-দৌড়।

আমি দৌড়াচ্ছি পুলিশ সদস্যরা আমার পিছে পিছে দৌড়াচ্ছে। আমি আরো জোরে দৌড়াচ্ছি। ওরাও আমার পিছু আরো জোরে দৌড়াচ্ছে। বেশকিছু দূর দৌড়ানোর পর হাল ছেড়ে দিলাম। ইতোমধ্যে উনারা আমাকে ধরে ফেললো। আবার বন্দুক আমার দিকে তাক করে বললো, "সত্যি করে বল এই প্যাকেটের মধ্যে কী আছে?"

আমি বললাম, "আমার জীবন থাকতে বলবো না।। এর আগেরবার যে ভুল করছি সেটা আর করবো না।"

একজন পুলিশ সদস্য এসে আমার কাছে থেকে দইয়ের প্যাকেট কেড়ে নিয়ে খুলে দেখে বললো, "আরে এর মধ্যে তো দই।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ দই।"

উনি বললেন, "তাহলে তুই দৌড়াচ্ছিলি কেন?"

আমি রাগ নিয়ে বললাম, "আপনারা মানুষের হাতে দই দেখলেই খাওয়া শুরু করেন। এই ভয়ে দৌড় দিছি।"

হঠাৎ একজন পুলিশ সদস্য বললো, "তোর কথা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। চল থানায় চল।"

আমি থানায় দইয়ের প্যাকেট নিয়ে বসে আছি। এর মধ্যে আব্বা এসে হাজির।

আব্বা, "তুমি কী করছো? পুলিশ তোমাকে ধরছে কেন?"

আমি, "আব্বা আমি পুলিশকে দই খাইতে দেই নাই। তাই আমাকে ধরে নিয়ে আসছে।"

আব্বা, "জেলে বইসা আমার সাথে মজা করো?"

আমি, "আব্বা বিশ্বাস করেন আমি মজা করতেছি না।"

হঠাৎ সেই এসআই এসে বললো, "আরে তুই এইখানে কেন?"

এসআই আর আব্বাকে পরের ঘটনা সব খুলে বলতেই এসআই বললো, "তোকে মুক্তি দিতে পারি এক শর্তে।"

আব্বা বললেন, "কী শর্ত এসআই সাহেব?"

এসআই বললেন, "দইয়ের হাড়ি দুটো আমাকে দিতে হবে। নাহলে সাতদিন জেল খাটতে হবে।"

আব্বারে বললাম, "আব্বা আমার সাতদিন জেল খাটতে কোনো সমস্যা নাই। আপনি দইয়ের হাড়ি দুইটা নিয়ে যান।"

আব্বা আমাকে ধমক দিয়ে বললো, "তুই চুপ থাক হারামজাদা। এসআই সাহেব হাড়ি দুইটা আপনি রাখেন। তবুও আমার ছেলেরে ছাইড়া দেন।"

আমি আর আব্বা থানা থেকে বের হচ্ছি। এমন সময় এসআই সাহেব বললেন, "কিছুদিন ধরে বউ রাগ করে শ্বশুর বাড়ি গেছে। আমার বউয়ের রাগ আবার বগুড়ার মিষ্টি দই ছাড়া ভাঙানো যায় না।"

থানার বাইরে আইসা আব্বাকে বললাম, "আব্বা জোরে হাঁটেন।"

আব্বা বললেন, "কেন?"

আমি বললাম, "আপনি না বলছিলেন একটা টক দই আর একটা মিষ্টি দই নিতে। এরা তো মিষ্টি দইটা খাইছে টক দইটা নিচে আছে। এসআইয়ের বউ যখন টক দইয়ে মুখে দিবে তখন কি হবে একবার ভেবে দেখেছেন?"

হঠাৎ খেয়াল করে দেখলাম আশেপাশে আব্বা নাই। কিন্তু একটু দূরে চোখ রাখতেই টের পেলাম আব্বার মতো একটা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে।

মীরার কার্নিশে
শ্রাবণী জুঁই

মীরার কার্নিশে শালিক, দোয়েল এবং মাঝে মাঝে কাক-চিলেরও উৎপাত হতো।
কখনও বা শ্যাওলার বুক চিরে অচেনা গাছের ঝাড়ে
নয়নতারা ফুটত।
আমাদের কৈশোর কেটে যেত মীরার কার্নিশে,
সেখানে ছেলেমানুষী রোদ জমাতাম,
টিফিন বক্সে জোছনা, ওয়াটার বটলে বৃষ্টি।
সবুজ কাঁচে আলোর পোকা প্রায়ই আটকে কেমন ঝিঁকমিকিয়ে দিত সকালটা!
মীরার কার্নিশে পড়ে থাকত দিক হারানো হলদে সবুজ ঘুড়ি, উলেন লাল বল, আমাদের ফেরারী শৈশব।
মীরার কার্নিশে কখনও পড়ে থাকত সুনীল, আজাদ, গুণ কিংবা রুদ্র,
আমাদের কৈশোরের দৃপ্তকণ্ঠ সুকান্ত মীরার কার্নিশে ঘুরে ঘুরে বলত–
'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ,
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি...'
আমাদের গলার ভেতরে বারুদের জ্বালা
আমরা প্রত্যেকেই তখন ভীষণ বিদ্রোহী
মীরার কার্নিশ জ্বলে পুড়ে ছারখার
স্লোগানে, বিপ্লবে, বিদ্রোহে, বিস্ফোরণে।
মীরার কার্নিশে অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকত
প্রথম প্রেমের অস্ফুট গোলাপ, শখের কলম, খুচরো পয়সায় জমানো উইন্ড চাইম।
মীরার কার্নিশে ঝরে যেত বাসি বকুল মালা,
শাল পাতায় শিউলী কিংবা ভাঙা কাঁচের নীল চুড়ি
কিশোর প্রেমের স্বাক্ষী হতে আধপোড়া শতেক চিঠি!
কতগুলো জীবন আবর্তিত হয়েছিল মীরার কার্নিশে?
কতগুলো বিপ্লব অংকুরেই হারিয়েছিল দিশা?
কতগুলো বালক কিশোর হয়েছিল?
কতগুলো কিশোর হারিয়েছিল মন?
তার হিসেব জানে ফিঙে রঙা বিকেলগুলো,
হারানো মার্বেলগুলো, ছোট্ট সে ছেলে পিনোকী ও
হ্যামিলনের বাঁশি, ম্যাচ বাক্স, ভাঙা নাটাই।

তারাই জানে;
তারাই জানে কতগুলো চারাগাছ বড়ো হতে হতে
একদিন আকাশ ছুঁয়ে বলেছিল–
‘প্রিয় মীরা,
ভালোবাসা নিও।’

কুটুম পাখি

রুদ্র কায়সার

বেজায় গরম পড়েছে এ বছর। ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ফসলের মাঠ। দীঘিলপাড়ের মানুষগুলো অতিষ্ট হয়ে পড়েছে গরমের তীব্রতায়।

শুধু মানুষই নয়, গরমে অতিষ্ট গাঁয়ের বোবা পশুপাখিগুলোও। নেড়িকুকুরগুলোর জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে মুখের ভেতর থেকে—ঝরছে লালা। অস্থির হয়ে উঠেছে গৃহপালিত প্রাণীগুলোও। এরই মধ্যে আবার বেড়েছে কাকের উৎপাত। কোথা থেকে যেন সহসা একদল দাঁড়কাক এসে হাজির গাঁয়ে। মাঝারি আকারের যে মরা মান্দার গাছটা গাঁয়ে প্রবেশের পথে দাঁড়িয়ে আছে, ওতে গিয়ে ঠাই নিয়েছে ওরা। গতবছর এই সময় ঝড় হয়েছিল। ছিপছিপে গড়নের গাছটার ওপর তখন বজ্রপাত হয়। অথচ এ বছর বৃষ্টির কোনো নামগন্ধই নেই। দুপুরবেলায় ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় পথিকেরা যখন ঐ পথ ধরে ঘরে ফেরে, বিশ্রী *কা কা*রবে তাদের ক্লান্তি আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় কাকগুলো। বিরক্ত পথিকেরাও তখন কর্কশকণ্ঠে অলক্ষুণে দাঁড়কাকগুলোকে গালাগাল দিয়ে খেকিয়ে ওঠে। শূন্য হাতেই ঢিল ছুড়ে মারার ভঙ্গিমা করে চেষ্টা করে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর। কিন্তু কাকগুলো অনড়। ওভাবেই গাছের ডালে বসে থাকে। আরও বেশি করে কা কা শব্দে ডাকতে থাকে। কাকগুলোকে দেখে গনু মিয়াঁ বলেছিল— যখন কোনো গ্রাম উজাড় হয়, তখন কাকেরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমায়। ওরা নাকি কারোর দূর্ভাগ্যে সঙ্গ দেয় না। তবে দূর্ভাগ্যকে সাথে করে ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তে।

আধুনিক সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি এ গ্রামটিতে তার ছোঁয়া এখনও লাগেনি। আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ যেমন হয়, এ গ্রামটিও তেমন—একটা অজপাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায়! এ গাঁয়ের অশিক্ষিত মানুষগুলো সভ্যতা থেকে এতটাই দূরে যে, গাঁয়ের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনা এদের কাছে অন্যের মুখে মুখে পৌঁছায়। আর এতেও সময় লাগে প্রায় পাঁচ থেকে ছ'দিন। কখনও কখনও অনেক খবর তাদের কাছে পৌঁছয়ই না—থেকে যায় একেবারে অজানা।

কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এ গাঁয়ের মানুষগুলো। আর এর সবটাই নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর। তাই বৃষ্টির দেখা নেই মানে কাজও নেই। বৃষ্টির অপেক্ষায় অলসভাবে সময় কাটে তাদের।

দুপুরের খাবার খেয়ে বেশির ভাগ মানুষ তাই সময় কাটানোর জন্য জড়ো হয় গাঁয়ের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত শতবর্ষী বটবৃক্ষটির নিচে। দিনের এই সময়টাতে ওদিকটাতে তিরতির করে বইতে থাকে মৃদু হাওয়া। সেই হাওয়ায় প্রায় জুড়োয় মানুষগুলোর। মেতে উঠে খোশগল্পে।

ঘর্মাক্ত শরীরে প্রতিদিনকার মতো আজও চাষাভুষা মানুষগুলো জড়ো হয়েছে বটগাছের নিচে। মেতে উঠেছে এ গল্পে সে গল্পে। গনু মিয়াঁর পাশে বসে আছে কালু। তাকে উদ্দেশ্য করে গনু বলল, "হুনছানি কালু, শউরের তন মানু বউ-পোলাপান লগে কইরা নাহি গেরামের দিক আয়। শউরে হুনলাম ম্যালা গ্যাঞ্জাম চলে। মানুগুলারে মাইরা ফালাইছে নাকি। মরা মানু পইড়া আছে যেইহানে সেইহানে।"

গাঁয়ের প্রবীণদের অন্যতম হলো এই গনু মিয়াঁ। তবে সে একদমই তার বয়েসী অন্যদের মতো নয়। অন্যরা যেখানে বার্ধক্যের কাছে আত্মসমর্পন করেছে, গনুকে সেখানে বার্ধক্য এখনও ছুঁতে পারেনি। চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে। কুঁচকে গেছে শরীরের চামড়া। তবুও প্রতিদিন মদন ময়রাকে দুধ দিতে পায়ে হেঁটে গঞ্জের হাঁটে যায়। ফেরার সময় গাঁয়ের মানুষের জন্য নিয়ে আসে বিভিন্ন খবর।

ষাটোর্ধ্ব গনুর কথায় খোশগল্পে মেতে থাকা লোকগুলো তাদের গল্পে ইতি টেনে তার দিকে তাকায়।

"হ গো কাহু, হুনছি শউরের তন মানু গেরামে আয়তাছে," জবাবে কালু বলে। "কাইলগো গঞ্জে গেছিলাম আমি। তহন দেখছি। দু'গা মানু... তয়..." একটু থামে কালু। মানুষ মেরে ফেলার গল্পটা কালুর কাছে ভূত দেখার গল্পের মতোই অবিশ্বাস্য মনে হয়। এমন কিছু সে কারো মুখে শুনেনি। শুনবেই বা কী করে, সে তো আর গনু মিয়াঁর মতো গঞ্জে গিয়ে এর ওর সাথে গল্প করে না। মনের বিস্ময় ফুটে ওঠে কালুর কণ্ঠে, "তয় শউরে মানু মাইরা যেইহানে সেইহানে ফালায় রাখছে হেইডা তোমার তন হুনলাম।"

"হ রে। হুনলাম দ্যাশের অবস্থা নাকি ভালা নারে, কালু। মিলিটারি নামছে নাকি দ্যাশে। হ্যারা মানু মারতাছে, ঘরবাইত্তে আগুন দিতাছে। হেন্দু-মুসলমান ব্যাবাকরে চিতা দিতাছে।"

"এই খবর তুমি হুনলা কইত্তন, কাহু?"

"গঞ্জে আইজ শউরের মানু আইছেলো চাইর-পাঁচজন। মদন ময়রার মিষ্টির দুহানেই বইছিল তারা। আমি তহন ওহানেই ছিলাম।" তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ফিরে গনু। "মদনের দুহানে খাইতে বয়া হ্যারাই তো এই গল্প কইলো। ঢেহার তন আইছে তারা। ঢেহায় নাহি রাইতে ঘর-বাইত্তে আগুন দিছে, মানু মারছে। রাস্তার চাইরধারে খালি মরা মাইনসের লাশ পইড়া আছে। রাস্তায় পইড়া পইড়া পচতাছে লাশগুলান। গোর দেওনের কেউ নাইক্কা!"

গনু মিয়ার হাঁটুর ওপর হাত রাখে কালু। "কও কি, কাহু! মানুরা কি মানুগোরে এ্যামবালে মারবার পারে! আমি কি তোমারে মারবার পারুম? এডা তুমি কী কও!"

কালুর দিকে ফিরে গনু। "মানুরা মানুগো মারে নাই। কী কই আর হুনোছ কী, ছ্যামড়া?" রাগে যায় গনু। "কইলাম মিলিটারিরা মানু মারতাছে। ঢেহায় মিলিটারি নামছে।"

দিনের পর দিন একই সাথে থেকে আসছে এই মানুষগুলো। ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কখনো কখনো ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু আবার তারা ঠিকই মিলে গেছে। মানুষ কখনও মানুষ মারবে এমনটা এই সহজ-সরল চাষাভূষা মানুষগুলো ভাবনাতেও আসে না। তাই গনু মিয়ার মুখে শোনা ঘটনাগুলো শহরের ইট-পাথরের তৈরি অট্টালিকার মতোই কঠিন আর অভেদ্য মনে হয় তাদের কাছে। মানুষ মেরে রাস্তায় ফেলে রেখেছে—এই খবর শুনে তারা বিস্মিত না হয়ে পারে না। মিলিটারি কী জিনিস তারা তাও জানে না, কখনও দেখেওনি। কিন্তু গনু মিয়ার মুখে মিলিটারির কথা শুনে মনের মাঝে তারা ঠিকই মিলিটারির একটা চিত্র এঁকে নেয়।

“ও, আইচ্ছা! মিলিটারিনি মানু মারে!”

“হ,” একেবারে ছোট্ট করে জবাব দেয় গনু।

গনুর পাশে বসে আছে হারু বেপারি। গনুর দিকে খানিকটা ঝুঁকে সে বলে, “মিলিটারির প্যাঁচাল পাইড়া তোমার আর আমার কী হইবো, জ্যাডা? এই বছর অহনও বৃষ্টির দেহা নাই। না খায়া মরতে হয়নি দেহো। মিলিটারি মানু মারে ভাইব্বা কাম নাই। তয় আমার মনে অয় আমাগো গেরামে মিলিটারি আইবো না। এইহানে আইবো কী করবার লাগি! গরমে সেদ্দ হইতেনি?”

“হ, ঠিকি কইছস তুই,” হারুর কথায় সায় দেয় গনু। "আমরার সেডি নিয়া ভাইব্বা কাম নাই। এমনিই আরকি কইলাম তোগোরে। মিলিটারি এইহানে আইবো এমন কথা আমিও কই নাইক্কা। আমার মনেও হয় নাই এমনডা... ...”

গনু মিয়ার কথা চলতে থাকে আপন গতিতে। তার গল্পের কোনো শেষ নেই। সবাই তা নীরবে শুনে যায়। ছোটো বাচ্চাগুলোর মধ্যে মিলিটারি নামক কৌতূহল ঘুরাফেরা করতে শুরু করে। গনুর মুখে যখন কথার ফুলঝুরি বলছে, সেই সময় মায়ের কোলে বসা হারুর মেয়ে—বিনতি, চুপিচুপি মাকে জিজ্ঞাসা করে, “মা, মিলিটারি কী?”

সাত বছরের মেয়ের এই প্রশ্নের জবাব জানা নেই জুলেখার। গ্রামের অন্যদের মতো সেও জানে না মিলিটারি আসলে কী। তার কাছেও এটি একটি শব্দ মাত্র। একেবারেই নতুন শব্দ। তবুও মেয়েকে জবাবে কিছু না কিছু বলা চাই, নইলে বিরক্ত করে মারবে।

“কুটুম চিনোস? গ্যালো মাসে তোর কুডি খালা আর খালু আইছিল যে। মিলিটারি হইলো কুটুম।”

“হ্যারা কি আমাগো বাড়ি আইবো, মা?”

“আইবো। তুই নক্কী হইয়্যা থাকলেই আইবো। তোর লাইগা ভালা ভালা জিনিস নিয়া আইবো। তোর খালু গ্যালো বা নজেন নিয়া আইছিল, মনে আছে?”

মাথা নাড়ে বিনতি। মায়ের কথায় খুশি হয় সে। পুনরায় প্রশ্ন করে সে, “কহন আইবো মিলিটারি কুটুম?”

ঘনঘন প্রশ্ন করে যাওয়ায় বিরক্ত হয় জুলেখা। তবুও নিজেকে দমিয়ে রাখে। মেয়েকে সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

“কুটুম কী আর এমনে এমনে আহে! কুটুম আহে পাখি ডাকলে।”

“কুটুম পাখি কহন ডাকবো?”

এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না জুলেখা। ক’বার আর ছেলে ভুলানো মিথ্যা গল্প বানানো যায়। তাই একটু রাগতস্বরে চোখ রাঙায়। “ডাকবো, ডাকবো। সময় হইলেই ডাকবো। অহন তুই চুপ কইরা ব, নইলে মিলিটারি আইসা তোর মুখ হিলাই কইরা দিবো। গরমে মানু বাঁচে না আর তোর কতা ফুরায় না। এত কতা কই খুইজ্জা পাস?”

মা যে রেগে গেছে তা বুঝতে বাকি থাকে না মেয়ের। তাই সেও গাল ফুলায়। তবে আর কোনো প্রশ্ন করে না। মা-মেয়ের আলাপন শেষ হয় এভাবেই। ঠিক তখনই মাথার ওপর ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটার একটা শাখার ওপর উড়ে এসে বসে একটা দাঁড়কাক। কর্কশ গলায় খ্যা... খ্যা... শব্দে যেন খেকিয়ে ওঠে। বার কয়েক ডাকার পর উড়ে গিয়ে বসে অদূরে থাকা মেহগনি গাছটায়। আবারও বিশ্রি শব্দে ডেকে ওঠে। বিরক্ত হয় উপস্থিত মানুষগুলো। কাকটা আজ

দীঘলিপাড়ের প্রতিটা বাড়িতেই হানা দিয়েছে। জ্বালিয়েছে রাস্তার কুকুরগুলোকেও। ওটাকে তাড়া করে বেয়াড়া নেড়িগুলোও দৌড়ে বেরিয়েছে গ্রামজুড়ে। ঘেউ ঘেউ শব্দে গ্রামকে করে তুলেছে অশান্ত।

সেই সময় কোত্থেকে যেন সেখানে এসে হাজির হয় সিধু পাগলা। দৌড়ে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে, “আয়তাছে, আয়তাছে। কারুর বাঁচন নাইক্কা। ব্যাবাকরে মাইরকা হেলাইব। নয়া কুটুম আয়তাছে।”

১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগ হয়, সেই সময় এ গ্রামে আগমন ঘটে সিধু পাগলার। নাম ব্যতীত কোনো কিছুই উদ্ধার করা যায়নি তার সম্পর্কে। মানুষগুলোর সাথে মিশে মিশে ওদের ভাষা ভালোভাবেই রপ্ত করে ফেলেছে সিধু। হয়ে গেছে মানুষগুলোর একজন। গ্রামে এর ওর বাড়ি থেকে যা পায় তা খেয়ে বাঁচে সে। আর রাতে হারুর বাড়ির গোয়ালঘরের ফাঁকা কোণটাতে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কয়েক দিন কোনো খোঁজ থাকে না। ক’দিন পর আবার দেখা মেলে তার। আজকেও এমনটাই ঘটেছে। বেশ কয়েকদিন ধরে সিধুর দেখা মিলছিল না। কোথায় ছিল কে জানে।

“ডাক, জোরতে ডাক,” চিৎকার করে বলে সে।

কাকটা উড়াল দেয়। সিধু কাকটাকে তাড়া করে ছুটে যায় পিছু পিছু।

ধীরে ধীরে বেলা পড়তে শুরু করলে থেমে যায় বাতাস। কোথাও একফোঁটা বাতাস নেই। গরম যেন হঠাৎ করেই বাড়তে থাকে। লক্ষণ দেখে মনে হয় ঝড় আসবে। অনেক জোরেশোরে ঝড় আসার আগে এভাবেই পৃথিবী শান্ত হয়ে যায়।

বিকালে মেঘ জমতে শুরু করে আকাশে। মরা মান্দারগাছে থাকা দাঁড়কাকগুলোর অস্থিরতা সারাদিনের তুলনায় হঠাতই যেন বেড়ে যায়। অপয়া কাকগুলো বিশ্রী কা কা শব্দে গ্রামটাকে মাথায় তুলে। বিরক্ত হয় মানুষগুলো। কিন্তু সিধু একদমই বিরক্ত নয়। বরং দাঁড়কাকগুলোকে উৎসাহ দিয়ে যায়।

“ডাক ব্যাডারা, আরও জোরতে জোরতে ডাক। ব্যাবাকরে পলাইতে ক। চইল্লা যাইতে ক বহুত দূর। নইলে ব্যাবাকতে মারবো ফ্যালবো।”

কাকেদের উৎপাত বন্ধ হলো রাতে। কুকুরগুলোও শান্ত হয়েছে। বৃষ্টির সম্ভবনা দেখে সবাই আগেভাগেই ঘরে ফিরেছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা মিথ্যায় পরিণত হলো—বৃষ্টি বা ঝড় কোনোটারই দেখা মিলল না। তবে আকাশ এখনো মেঘলা। ফলে অন্ধকারটা আরও তীব্র হয়েছে। কার মৃত্যুশোকে যেন নীরবতা পালন করছে। হঠাৎ করে তখন দূর থেকে অস্পষ্টভাবে সিধু পাগলার চিৎকার ভেসে আসতে শোনা গেল। সময়ের সাথে সাথে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

“আয়া পড়ছে। ব্যাবাকে ভিডাবাড়ি ছাইড়া পলাও। বাঁচপার চাইলে পলাও। কাউরে বাঁচপার দিবো না ওরা। পলাও ব্যাবাকে, আয়া পড়ছে...”

সিধু পাগলার চিৎকারের সাথে সাথে দূর থেকে অস্পষ্টভাবে আগুন আগুন বলে চিৎকার করার শব্দ ভেসে আসতে শুরু লাগল। সেই সাথে ভেসে আসতে লাগলো একসাথে অনেকগুলো নারী ও পুরুষের আর্তনাদ, শিশুর চিৎকার, গবাদিপশুর ডাকাডাকি, কাকের কা কা শব্দ, রাস্তার নেড়িকুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ চিৎকার। আর তারসাথে সকলের একেবারেই অপরিচিত ঠা ঠা ঠা..., চি চি... শব্দ। মুহূর্তেই অস্থির করে তুলল চারপাশ। দীঘলিপাড়ের এমনরূপ এ গাঁয়ের মানুষগুলো আগে কখনও দেখেনি। তাদের পূর্বপুরুষদের মুখেও এমনকিছু শোনেনি। বিদঘুটে অন্ধকার রাতের তিমিরের রাজত্ব দখল করে নিলো গ্রামের ছোটো-বড়ো ছনের ঘরগুলোতে জ্বলতে থাকা আগুনের রক্তিম শিখা।

অকস্মাৎ শুরু হওয়া আর্তনাদ, চিৎকার, কা কা শব্দ, ঘেউ ঘেউ শব্দ, অপরিচিত ঠা ঠা ঠা... ও চি চি... শব্দ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবকিছু শেষ করে দিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। আবারও শান্ত হয়ে গেল দীঘলিপাড় গাঁ। একেবারে শান্ত আর নিশ্চুপ। কাকগুলো চুপচাপ বসে রইলো পোড়া মরা মান্দারগাছের ডালে। পোড়া গন্ধ মৌ মৌ করছে চারপাশে—মানুষ, গবাদিপশু, গাছ, ছনের ঘর পোড়ার গন্ধ; রক্ত পোড়ার উৎকট গন্ধ, মাংশ পোড়ার উটকো গন্ধ, বারুদের গন্ধে চারপাশ ছেয়ে আছে চারপাশ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দীঘলিপাড় গ্রামটা পরিণত হলো শশ্মানে।

হারুর বাড়ির পোষা কুকুর ভোলা আর ওর সঙ্গিনী কুকুরটা উঠোনের একপাশে পড়ে আছে। কুকুর দুটোর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিনতি। মুহূর্তের মধ্যে কীসব ঘটে গেল কিছুই সে বুঝতে পারে না। কেন-ই-বা এত চিৎকার চেঁচামেচি; আবার হঠাৎ করে সেগুলো কেন বন্ধ হয়ে গেল—কিছুই সে জানে না। জানে না মা-বাবা'ই বা কেন এভাবে উঠোনের মাঝে শুয়ে আছে। বিনতির একটু দূরে কপালে হাত রেখে বসে আছে সিধু পাগলা। তার ময়লা, ছেঁড়া জামা আর পুরোনো লুঙ্গিতে রক্ত লেগে আছে।

পূবের আকাশে ফ্যাকাসে রেখা পড়তে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে গিয়ে সবকিছু পরিষ্কার হয়। হারুর ছোট্ট ছনের ঘরটা পুড়ে গেছে রাতে। পুড়ে কালো হয়ে গেছে ঘরের পেছনের আমড়াগাছটা। পোড়া গাছটায় কোথা থেকে যেন একটা পাখি উড়ে এসে বসে। "কুড়া কুটো... কুড়া কুটো..." বলে ডেকে ওঠে।

সাথে সাথে হাসি ফুটে ওঠে বিনতির মুখে। সিধু পাগলার কাছে ছুটে যায় সে। সিধুর চিবুকে আলতো করে হাত রেখে বিনতি বলে, "কাহু, কুটুম পাখি ডাহে। দেইক্কো কুটুম আইবো। মিলিটারি কুটুম আইবো, মায় কইছে।"

সিধু কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বিনতি দিকে।

সরে আসে বিনতি। ছুটে যায় মায়ের কাছে। বাবা ঘুমালে তাকে ডাকা বারণ। তাই সে উঠোনে শুয়ে থাকা মায়ের কাছে শুটে যায়। মায়ের গায়ে হাত রেখে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে নিচুস্বরে মাকে ডেকে বলে, "মা, ও মা। উডো। দ্যাহো কুটুম পাখি ডাহে। মিলিটারি কুটুম আইবো, মা? কও না মা কহন আইবো। আমার লাইগা ভালা কী আনবো। ও মা... ..."

দৃষ্টি আকর্ষণ
ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।
অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

আমি মানেই সব
তাহমিদ রহমান

আমি চেয়েছিলাম সবকিছু হতে,
গল্পকার, কবি, ছবি আঁকিয়ে... সঅঅব।
আমি একবার গায়ক হতে চেয়েছিলাম,
গানের মাস্টারের কাছে যেয়ে কিছুদিন সা-রে-গা-মা-পা শিখেছিলাম।
আমি চিন্তাশীল হতে চেয়ে দিনরাত চিন্তা করেছিলাম।
আমি ডাক্তার হবো ভেবে মেডিকেলের গাদাখানেক বইয়ের লিস্টিও বানিয়ে ফেলেছিলাম।
উঁচু উঁচু দালান দেখে স্থপতি হওয়ার ইচ্ছেও যে জাগেনি, তা বললে মিথ্যে বলা হবে।
কখনও বা বিমানের ভেতরে বসে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নও দেখেছিলাম।
দিনশেষে আমি আজ কিছুই নই; আবার অনেক কিছুই।
যখন আমি ভালোবাসার গল্প লিখেছিলাম, মানুষ আমাকে 'রোমান্টিক' উপাধি দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল।
ঠিক যখন আমি ব্যর্থতা আর হতাশা নিয়ে কবিতা লিখে ফেললাম, আমি হয়ে গেলাম হতাশাগ্রস্থ যুবক!
অবশ্যই 'কবি' উপাধি পাইনি। কবি হওয়া কি চাট্টিখানি কথা?
ছবি আঁকিয়ে হওয়ার ইচ্ছেতে যখন হাতে রং তুলি আর পেন্সিল তুলে নিলাম, কাগজের দামের কাছে আমার প্রতিভা হারিয়ে গেল।
আর গায়ক? তবে বলুন তো, কাক কবে কোকিল হয়েছে?
এরপরে ডাক্তার, স্থপতি কিংবা বৈমানিক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হতে না হতেই বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো শিক্ষা জীবনের যাবতীয় প্রশংসাপত্র।
কেউ কখনও আমার ইচ্ছেটাকে দেখেনি, সবাই শুধু দেখেছে কিংবা ভেবেছে তারা নিজে যা চেয়েছে।
বলেছে– তারা যা শিখে এসেছে।
কখনই কেউ এগিয়ে এসে বলেনি, 'তুমি মানেই সব। তুমি আছো বলেই সব আছে। তুমি নেই মানে সব অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার।'

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

দ্য ট্রাইগন অ্যাফেয়ার

মোজাম্মেল হোসেন তোহা

সিআইএ'র মস্কো স্টেশনের ফিল্ড এজেন্ট মার্থা পিটারসন যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। এখনও ঘণ্টা তিনেক সময় আছে। রাত দশটার মধ্যেই তাকে প্যাকেজটা ডেলিভারি দিতে হবে। কিন্তু তার আগে পেছন থেকে অন্য কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে এত বেশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যে, তাতেই কয়েক ঘণ্টা সময় পেরিয়ে যাবে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথমে নিজের বাসায় গেলেন মার্থা। পোশাক পাল্টে পরে নিলেন গ্রে কালারের একটি শার্ট এবং স্কার্ট, সেই সাথে মাথায় দিলেন রাশিয়ানদের মতো একটি হ্যাট। তবে তার আগে শার্টের ভেতরে, ব্রা'র একপাশে বেল্ট দিয়ে আটকানো প্লাস্টিক হোল্ডারের সাথে বেঁধে নিলেন সিআইএ'র দেওয়া SRR-১০০ সার্ভেইল্যান্স রিসিভারটি।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তার দুটোকে শার্টের কলারের পেছন দিয়ে বের করে আনলেন। এরপর চুল এবং হ্যাটের আড়ালে ঢেকে ইয়ারপিস দুটোকে কানে গুঁজে নিলেন। সবশেষে ঢোলা শার্টের আড়ালে স্কার্টের পাশে কোমরে গুঁজে নিলেন ছোটো একটি গাছের গুঁড়ি। এটাই হচ্ছে সেই প্যাকেজ, যা তাকে ডেলিভারি দিতে হবে মস্কোর ফরেন মিনিস্ট্রিতে কর্মরত সিআইএ'র এজেন্ট ট্রাইগনের (TRIGON) কাছে।

বাসা থেকে বেরিয়ে ধীরেসুস্থে নিজের গাড়িতে উঠলেন মার্থা। শোনার চেষ্টা করলেন SRR-১০০ সার্ভেইল্যান্স রিসিভারটিতে কোনো শব্দ হয় কিনা। সিগারেটের প্যাকেটের সমান আকারের রিসিভারটি মূলত এক ধরনের রেডিও, যা আশেপাশে থাকা কেজিবির এজেন্টদের নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি ধরতে পারে। মার্থার ওপর যদি একাধিক কেজিবি এজেন্ট নজর রেখে থাকে, তাহলে তিনি বের হওয়ামাত্রই তারা একে অন্যকে সেটা রিপোর্ট করার কথা। আর সাথে সাথেই সিআইএ'র দেওয়া মার্থার রিসিভারে তা ধরা পড়ার কথা। কিন্তু রিসিভারটি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ– কেউ মার্থাকে অনুসরণ করছে না।

তারপরেও আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে ঘণ্টাখানেক মস্কো শহরজুড়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়ালেন মার্থা। প্রচণ্ড গতিতে যেতে যেতে হঠাৎ করেই বাঁক নিয়ে পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়লেন কয়েকবার। বেশ কয়েকবার ঢুকে পড়লেন প্রায় সম্পূর্ণ নির্জন কানাগলির ভেতরেও। কিন্তু না, একবারও মনে হলো না কেউ তাকে অনুসরণ করছে। তারপরেও নির্ধারিত স্থানে নিজের গাড়ি নিয়ে

উপস্থিত হওয়ার মতো সাহস করলেন না তিনি। ট্রেন স্টেশনের সামনে গাড়ি পার্ক করে পরপর দুইবার ট্রেন বদল করে এরপর এসে উপস্থিত হলেন পূর্বনির্ধারিত স্থানে– মস্কোর একটি নির্জন পার্কে। এখানেই তার প্যাকেজটা ডেড ড্রপ করার কথা।

ডেড ড্রপ হচ্ছে গুপ্তচরদের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাৎ ছাড়াই তথ্য বা জিনিসপত্র আদান-প্রদানের পদ্ধতির নাম। যখন কোনো স্পাই কারো সাথে সরাসরি দেখা করে তার হাতে কোনো তথ্য বা প্যাকেজ তুলে দেয়, তখন সেটাকে বলা হয় লাইভ ড্রপ। কিন্তু এতে যেকোনো একজনের ওপর নজরদারি থাকলেই অপরজনেরও ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে লাইভ ড্রপের পরিবর্তে ডেড ড্রপই এসপিওনাজ জগতে বেশি জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে প্রথমে একজন স্পাই সবার অলক্ষ্যে পূর্বে থেকে নির্ধারিত কোনো স্থানে প্যাকেজটি রেখে আসে, এরপর অন্যজন সুবিধামতো সময়ে গিয়ে সেটি উদ্ধার করে আনে।

ডেড ড্রপ পদ্ধতিতে ফেলে আসা প্যাকেজটি যেন রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী সাধারণ পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, সেজন্য প্রায় সময়ই সেটিকে বিভিন্ন ছদ্মবেশ দেওয়া হয়। এই বিশেষ দিনে মার্থার হাতে যে প্যাকেজটি ছিল, সেটিকে দেওয়া হয়েছিল শুকনো গাছের গুঁড়ির ছদ্মবেশ। সিআইএ'র টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট হুবহু গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে একটি ফাঁপা খোলস করেছিল। তার ভেতরেই মার্থা ভরে নিয়েছিলেন তাদের এজেন্ট ট্রাইগনের কাছে হস্তান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র– একটি ছোটো নোটবুকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি; একটি বিশেষ কলম, যার ভেতরে লুকানো ছিল একটি মিনিয়েচার ক্যামেরা; ক্যামেরার সাথে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রো ফিল্ম এবং ক্যাসেট; এবং অদৃশ্য কালিতে লেখার জন্য বিশেষ ধরনের কার্বন পেপার।

পার্কের ভেতরে প্রবেশ করে মার্থা গুণে গুণে হেঁটে গেলেন নির্দিষ্ট একটি ল্যাম্পপোস্টের কাছে। রাত তখন প্রায় পৌনে দশটা। আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। তারপরেও সাবধানতার জন্য মার্থা একটু থেমে নাক ঝাড়ার ভঙ্গি করলেন। এরপর টিস্যু পেপার বের করার সময় এক সুযোগে চট করে কোমরের পাশ থেকে বের করে নিলেন গাছের গুঁড়িটা। এরপর টিস্যু ফেলে দিয়ে জুতার ফিতা বাঁধার ভঙ্গি করে নিচু হয়ে বসে আস্তে করে গুঁড়িটা গড়িয়ে দিলেন রাস্তার পাশের নির্দিষ্ট ল্যাম্পপোস্টটির গোঁড়ার দিকে। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মস্কোর কনকনে শীতের মধ্য দিয়ে সেদিন রাতে মার্থা পিটারসন আরো ঘণ্টা দেড়েকের মতো হাঁটাহাঁটি করেছিলেন। এরপর এগারোটার দিকে আবার ফিরে এসেছিলেন সেই একই স্থানে। ল্যাম্পপোস্টের গোঁড়ার দিকে তাকিয়ে তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। গাছের গুঁড়িটি সেখানে নেই। তার পরিবর্তে পড়ে আছে দুমড়ে-মুচড়ে থাকা ছোটো একটি দুধের প্যাকেট। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যেই ট্রাইগন এসে গাছের গুঁড়িটি নিয়ে গেছে। আর দুধের প্যাকেটের ভেতরে করে তার জন্য রেখে গেছে নতুন একটি প্যাকেজ, যার ভেতরে হয়তো আছে মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন কোনো ডকুমেন্ট, গোপন কোনো পরিকল্পনা।

প্যাকেটটি আস্তে করে তুলে পার্সের ভেতরে ভরে নিলেন মার্থা। এরপর ফিরে এলেন বাসায়। তার আজকের মিশন সফলভাবেই শেষ হয়েছে।

***

মার্থা পিটারসনের গুপ্তচরবৃত্তিতে যোগ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এসপিওনাজ জগতে তিনি প্রবেশ করেছিলেন অনেকটা বাধ্য হয়ে, স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তিনি দু'চোখে অন্ধকার দেখছিলেন, তখন। কিন্তু এর আগে সারাজীবন এসপিওনাজ জগত সম্পর্কে তিনি এতটাই উদাসীন ছিলেন যে, ১৯৬৯ সালে বিয়ের পর তার স্বামী জন পিটারসন যখন তাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি

সিআইএ-তে যোগ দিতে যাচ্ছেন, মার্থা তখন তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সিআইএ জিনিসটা কী? তারা কী করে?

জনের সাথে মার্থার পরিচয় হয়েছিল ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষে। ফিজিক্সের ছাত্র হলেও জনের সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করেই তিনি ভিয়েতনামে চলে যান যুদ্ধ করতে। ওদিকে মার্থা তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করে তিনি শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। জন ভিয়েতনাম থেকে ফিরে আসার পর ১৯৬৯ সালে তারা বিয়ে করেন। পরের বছরই জন সিআইএ-তে যোগ দেন একজন প্যারামিলিটারি অফিসার হিসেবে।

সিআইএ'র অফিসার হিসেবে ১৯৭১ সালে জনের পোস্টিং হয় লাওসে। তার সাথে সেখানে গিয়ে ওঠেন মার্থাও। লাওস হচ্ছে ভিয়েতনামের পাশে অবস্থিত ছোটো একটি রাষ্ট্র, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত-সমর্থিত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। জনের কাজ ছিল গোপনে লাওশিয়ান যুবকদেরকে টাকা দিয়ে রিক্রুট করা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নর্থ ভিয়েতনামিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো।

সময় কাটানোর জন্য মার্থা নিজেও সিআইএ'র স্থানীয় স্টেশনে ক্লার্ক হিসেবে চাকরি করতে শুরু করেন। কিন্তু তার জীবন থমকে দাঁড়ায়, যখন যুদ্ধের একপর্যায়ে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে যুদ্ধক্ষেত্র তদারকি করতে গিয়ে জনের হেলিকপ্টার নর্থ ভিয়েতনামিজ সৈন্যদের আক্রমণের মুখে পড়ে। তাদের একে-৪৭ রাইফেলের গুলিতে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয় এবং এতে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন জন।

মার্থা পিটারসনের বয়স তখন মাত্র ২৭ বছর। সদ্য বিধবা হয়ে যখন তিনি দু'চোখে অন্ধকার দেখছিলেন, তখন জনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাকে পরামর্শ দেয়, তার উচিত সিআইএ'র ক্ল্যান্ডেস্টাইন বিভাগে চাকরির জন্য আবেদন করা। তিনি তিনটা ভাষা জানতেন, স্বামীর কল্যাণে তার সিআইএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে টুকটাক ধারণা ছিল, তিনি লাওসের মতো জায়গায় কঠিন পরিবেশে জীবনযাপন করেছেন, এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং বুদ্ধিমতী– কাজেই তার চাকরি না পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

পরামর্শ অনুযায়ী মার্থা সিআইএ'র চাকরির জন্য আবেদন করেন। এবং যথাযথ ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের পর সিআইএ তাকে গ্রহণ করে। ১৯৭৩ সালের জুলাইর ৩ তারিখে, তার স্বামী জনের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন তিনি সিআইএতে যোগদান করেন। সে সময় সিআইএ'র অভ্যন্তরে নারী কেস অফিসার বলতে গেলে ছিলই না। যে অল্প কয়েকজন নারী সিআইএতে চাকরি করত, তাদের অধিকাংশেরই কাজ ছিল অফিস ভিত্তিক রুটিন কাজ– নথিপত্র দেখাশোনা করা, বড়োজোর তথ্য বিশ্লেষণ করা। কিন্তু মার্থা পিটারসন গোঁ ধরে ছিলেন– তিনি ফিল্ড এজেন্ট হিসেবেই চাকরি করবেন। তার বিশ্বাস, সে যোগ্যতা তার আছে।

ট্রেনিংয়ের জন্য সিআইএ মার্থাকে ভার্জিনিয়ার "ফার্মে" পাঠায়। সেখানে তাকে এসপিওনাজ জগতের যাবতীয় কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফিল্ড এজেন্টদের প্রধান কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। এবং সেজন্য তাদেরকে এমনসব মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করে, যাদের হাতের নাগালে বিপুল পরিমাণ তথ্য আছে। মার্থার ট্রেনিংয়ের অন্যতম অংশ ছিল একদল লোকের মধ্য থেকে এ ধরনের সম্ভাব্য লোকদেরকে খুঁজে বের করা, তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সম্ভব হলে তাদেরকে রিক্রুট করার চেষ্টা করা।

ট্রেনিং শেষে শুরু হয় নতুন সমস্যা। সিআইএ মার্থাকে যেসব জায়গায় পোস্টিংয়ে পাঠাতে চাইছিল, মার্থা সেসব জায়গায় যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি পরপর জাতিসংঘে এবং বার্মায় পোস্টিংয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। কারণ তার মতে সেসব জায়গায় দায়িত্বগুলো ছিল খুবই মেয়েলি ধরনের, সেগুলোতে কোনো রকমের অ্যাডভেঞ্চার ছিল না। তিনি আগ্রহী ছিলেন পুরুষদের মতো ফিল্ডে গিয়ে কাজ করতে। ঠিক এরকম সময় একদিন তাকে ডেকে পাঠান সিআইএ'র মস্কো স্টেশন চিফ।

সত্তরের দশকে মস্কো ছিল সিআইএ'র জন্য সবচেয়ে কঠিন স্থান। মস্কোর রাস্তাঘাটে তখন কেজিবির এজেন্টরা গিজগিজ করত। যেকোনো আমেরিকান রাশিয়ায় পা দেওয়ামাত্রই কেজিবির গোয়েন্দারা তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত। প্রত্যেক আমেরিকানই ছিল তাদের দৃষ্টিতে একেকজন সন্দেহভাজন। এরকম পরিস্থিতিতে সিআইএ'র মস্কো স্টেশন চিফ মার্থার মতো একজনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। তিনি আশা করেন, যেহেতু কেজিবি জানে সিআইএ কোনো নারীকে ফিল্ড এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করে না, এবং যেহেতু মার্থারও অতীতে গুপ্তচরবৃত্তির কোনো ইতিহাস নেই, তাই তিনি হয়তো খুব সহজেই কেজিবির চোখ এড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পোস্টিংয়ের জন্য শুরু মার্থার নতুন ট্রেনিং। এবার তাকে শেখানো হয় বিভিন্ন স্পাইক্র্যাফ্ট বা স্পাইদের জন্য উপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যবহার– কীভাবে চলন্ত গাড়ি থেকে মিনিয়েচার ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে হয়, কীভাবে ডেড ড্রপ ফেলে আসতে বা উদ্ধার করতে হয়, কীভাবে গোপন তথ্য আদান-প্রদান করতে হয়। সেই সাথে শুরু হয় তার রাশিয়ান ভাষার কোর্স। দিনে আটঘণ্টা করে দীর্ঘ দশ মাস ধরে তিনি রাশিয়ান ভাষা শেখেন। একইসাথে তায়াকোয়ান্দো নামে এক ধরনের কারাতেও শেখেন, নিতান্তই শখের বশে।

অবশেষে সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে মার্থা পিটারসন মস্কোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শুরু হয় তার নতুন অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ দ্বৈতজীবন। তার কভার পরিচয় হয় দূতাবাসের একজন ক্লার্ক হিসেবে। সকালবেলা তার কাজ ছিল আমেরিকায় যেতে ইচ্ছুক রাশিয়ানদের সাক্ষাৎকার নেওয়া, তাদের কাগজপত্র প্রস্তুত করা। কিন্তু বিকেল বেলা তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সেসময় তার কাজ মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এবং সম্ভাব্য ডেড ড্রপের উপযুক্ত লোকেশন বাছাই করা, যেখানে অনুসরণকারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সহজেই সিআইএ'র এজেন্টরা তথ্য বিনিময় করতে পারবে।

মস্কোতে নামার পরপরই অবশ্য মার্থার সিআইএ'র জীবন শুরু হয়নি। প্রথম কয়েকমাস তার কাজ ছিল খুবই স্বাভাবিক জীবনযাপন করা, যেরকমটা একজন দূতাবাসের ক্লার্কের করার কথা। ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার, সোনালি চুলবিশিষ্ট মার্থা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। ৩০ বছর বয়সী একজন সুন্দরী তরুণীর বিদেশে গিয়ে যা করার কথা, মার্থা তাই করতে শুরু করেন। তিনি একটা সোভিয়েত গাড়ি কিনেন এবং অফিসের পর বিকেলে নিয়মিত বিভিন্ন পার্টিতে গিয়ে উচ্ছল সময় কাটাতে শুরু করেন। মার্থার ডাক নাম ছিল মার্টি। অত্যন্ত পার্টি-প্রিয় হওয়ার কারণে দূতাবাসের ভেতরে তার নাম হয়ে যায় পার্টি মার্টি।

কয়েক মাস এভাবে যাওয়ার পর যখন সিআইএ'র কর্মকর্তাদের মোটামুটি ধারণা হয় যে, মার্থা হয়তো তার কেজিবির অনুসরণকারীদেরকে সফলভাবে ধোঁকা দিতে পেরেছেন, তখন তাকে প্রথমবারের মতো ফিল্ডে নামানো হয়। এক সন্ধেবেলা মার্থা পরীক্ষামূলকভাবে SRR-১০০ সার্ভেইল্যান্স রিসিভারটি পরে দূতাবাস থেকে বের হন। প্রথমে যখন তার পাশে সিআইএ'র আরেকজন কেস অফিসার ছিল, তখন তিনি ইয়ার পিসের মধ্য দিয়ে শুনতে পাচ্ছিলেন রাশিয়ানরা

বলাবলি করছে– "টার্গেট বেরিয়ে এসেছে, টার্গেট এখন ডানদিকে যাচ্ছে..."। কিন্তু যখনই মার্থা তাকে ছেড়ে রাস্তার অন্যদিকে মোড় নিয়ে একা হাঁটতে শুরু করেন, তখনই রিসিভার সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। মার্থা বুঝতে পারেন, কেজিবির কাছে তিনি আর গুরুত্বপূর্ণ না। তারা তাকে দূতাবাসের সাধারণ একজন ক্লার্ক হিসেবেই বিশ্বাস করেছে।

সেদিন ফিরে এসে রিপোর্ট করার পরেই নতুন দায়িত্ব এসে পড়ে মার্থার ওপর। তাকে এখন থেকে নিয়মিত মস্কোতে অবস্থিত সিআইএ এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, ডেড ড্রপ ফেলে তাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিতে হবে, এবং তাদের দেওয়া বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে স্টেশনে পৌঁছাতে হবে। এবং এদের মধ্যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হবে ট্রাইগন– সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করা সেই কর্মকর্তা, যে ছিল সে সময় মস্কোর অভ্যন্তরে সিআইএ'র সবচেয়ে মূল্যবান এজেন্ট।

***

এজেন্ট ট্রাইগনের প্রকৃত নাম আলেক্সান্ডার দিমিত্রিভিচ ওগোরডনিক। তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। ১৯৭০ সালে যখন কলম্বিয়ার সোভিয়েত দূতাবাসে সেকেন্ড সেক্রেটারি হিসেবে তার পোস্টিং হয়, তখন তিনি প্রথম সিআইএ'র নজরে পড়েন।

ওগোরডনিক আর দশজন সাধারণ সোভিয়েত কর্মকর্তার মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন পশ্চিমের বিলাসবহুল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট। দুই হাতে অর্থ ব্যয় করতেন, পার্টিতে যেতেন এবং অবাধে মেয়েদের সাথে মিশতেন। দেশে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বোগোটাতে তিনি দূতাবাসেরই আরেক কর্মচারীর স্ত্রী ওগলা সেরোভোর সাথে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। প্রেম এবং পার্টির পেছনে দেদারছে টাকা উড়ানোর কারণে তার অর্থসংকট দেখা দিতে শুরু করলে তিনি কৌশলে দূতাবাসের একটি গাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকা মেরে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সিআইএ সবসময়ই এ ধরনের দুর্নীতিবাজ এবং দুশ্চরিত্রের কর্মকর্তাদের সন্ধানে থাকে, যেন তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করে বিভিন্ন তথ্য আদায় করা যায়। ফলে তারা বোগোটার হিলটন হোটেলে ওগোরডনিকের সাথে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করে এবং তাকে সিআইএ'র হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। ওগোরডনিক তখন অর্থসংকটে ছিলেন, ফলে তিনি সহজেই রাজি হয়ে যান। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে তিনি সিআইএ'র হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। সিআইএ'র অভ্যন্তরে তার কোড নেম হয় সিকে ট্রাইগন, যেখানে সিকে অংশটি হচ্ছে সোভিয়েত এজেন্টদের জন্য নির্ধারিত কোড।

সিআইএ ওগোরডনিককে গোপন নথিপত্রের ছবি তোলা, সাংকেতিক ভাষায় তথ্য আদান-প্রদান করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর ওগোরডনিক সিআইএ'র কাছে দূতাবাসের গোপন নথিপত্রের ছবি তুলে পাঠাতে শুরু করেন। কলম্বিয়ায় নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সাথে কলম্বিয়ান সরকারের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও এসব নথিপত্রের মধ্যে ছিল অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকান রাষ্ট্রে সোভিয়েত কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আলোচনা। তার দেওয়া তথ্যগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার একবার মন্তব্য করেছিলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনকালে তিনি এরকম গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য আর দেখেননি।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে ওগোরডনিককে মস্কোতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে তার চাকরি হয় সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বিভাগে। এবং এর ফলে শুধু দক্ষিণ আমেরিকা না, পুরো দুনিয়ার সবগুলো দেশের সোভিয়েত দূতাবাসের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

আদান-প্রদানকৃত বার্তা, তাদের পরিকল্পনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন চলে আসে ওগোরডনিকের হাতের মুঠোয়। তিনি হয়ে ওঠেন সোভিয়েত ইউনিয়নে সিআইএ'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্পাই।

ঠিক এরকম সময়ে মার্থা পিটারসনের পোস্টিং হয় সিআইএ'র মস্কো স্টেশনে। দায়িত্ব পেয়েই তিনি ওগোরডনিকের কাছে বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। ঠিক কবে, কোথায়, কীভাবে ডেড ড্রপ আদান-প্রদান করা হবে, সে সম্পর্কিত নির্দেশাবলি একটি কাগজে লিখে, সেটি একটি গাড়ির সিগারেট লাইটারের ভেতরে ভরে তিনি আস্তে করে ওগোরডনিকের গাড়ির গ্লাসের ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়ে আসেন। এরপর শিডিউল অনুযায়ী নিয়মিত তার সাথে তথ্য এবং প্যাকেজ আদান-প্রদান করতে থাকেন।

মার্থার সরবরাহ করা কলমের ভেতরে লুকানো মিনিয়েচার ক্যামেরা ব্যবহার করে ওগোরডনিক অফিসে বসেই সবার সামনে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের ছবি তুলে ফেলতেন। ফাইলগুলো টেবিলের ওপর খুলে রেখে কলমটা হাতের মুঠোয় ধরে ওপর থেকে পৃষ্ঠা বরাবর তাক করে কলমের ক্যাপের ওপর চাপ দিলেই ছবি উঠে যেত। প্রতিটি ফিল্ম ৮০ পৃষ্ঠা করে ছবি ধারণ করতে পারত। ওগোরডনিক ফাইলগুলো পড়ার ভঙ্গি করে একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টে যেতেন আর ক্যাপ চেপে চেপে ছবি তুলে ফিল্মে সংরক্ষণ করে রাখতেন। পরে নির্ধারিত দিন ডেড ড্রপের মাধ্যমে সেগুলো ফেলে আসতেন মার্থার জন্য।

১৯৭৫ সালের শুরু থেকে ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মার্থা পিটারসন এরকম ১২টি প্যাকেজ বিনিময় করেছিলেন এজেন্ট ট্রাইগনের সাথে। কিন্তু ১৯৭৭ সালের শুরুর দিক থেকে তার পাঠানো তথ্যের মান নিয়ে সিআইএ'র সন্দেহ হতে শুরু করে। এবং এরপর জুনের ২৬ তারিখে মার্থা যখন ডেড ড্রপ ফেলে এক ঘণ্টা পর ফিরে আসেন, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। গভীর রাত, প্রচণ্ড বৃষ্টি, এর মধ্যেই মার্থা দেখতে পান, পার্কের বাইরে একটা সাদা রঙের ভ্যান পার্ক করা আছে। ভ্যানের ভেতরে হালকা বাতি জ্বলছে।

আতঙ্কে মার্থার সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। এরা কী কেজিবির এজেন্ট? তার ওপর নজরদারি করছে? দ্রুত পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়েন তিনি। এবং সেখানে হঠাৎ করেই অন্ধকার ফুঁড়ে তার সামনে উদিত হয় টর্চ হাতে, রেইনকোট গায়ে দেওয়া বিশালদেহী এক ছায়ামূর্তি। দুজন দুজনের দিকে এক মুহূর্তে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তারা। এরপরই দুজন দুজনকে পাশ কাটিয়ে চলে যান। পার্কের ভেতরে একটু আড়ালে গিয়েই একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়েন মার্থা। তার শরীরের সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। অপেক্ষা করতে থাকেন তিনি। এক একটা মিনিট যেন তার কাছে এক একটা ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছিল।

অবশেষে মিনিট বিশেক পর সাহস সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ান তিনি। অন্যদিক দিয়ে ঘুরে উঁকি দেন ভ্যানটার দিকে। না, কোথাও কিছু নেই। চলে গেছে ভ্যানটা। রহস্যময় সেই লোকটাও কোথাও নেই। ফিরে গিয়ে নির্ধারিত ল্যাম্প পোস্টের নিচে উঁকি মারেন মার্থা। এবং দেখতে পান তার ফেলে যাওয়া কাঠের গুঁড়িটি তখনও পড়ে আছে আগের জায়গাতেই। দীর্ঘদিনের মধ্যে এই প্রথম ট্রাইগন তার শিডিউল মিস করেছেন। তবে কি আসলেই কোনো বিপদে পড়েছেন তিনি? কেজিবির নজরে পড়ে গেছেন?

মার্থা স্টেশনে ফিরে আসার পর সিআইএ সিদ্ধান্ত নেয়, তারা ট্রাইগনকে নতুন আরেকটি ডেড ড্রপের তারিখ দেবে। ট্রাইগনের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সিআইএ'র আরেকটি মাধ্যম ছিল। যদি সরল, একমুখী কোনো নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হতো, তাহলে সিআইএ প্রতিদিন নির্দিষ্ট

সময়ে পশ্চিম জার্মানির একটি রেডিও স্টেশন থেকে নির্দিষ্ট একটি ফ্রিকোয়েন্সি থেকে কতগুলো নাম্বার পড়ে শোনাতো। ট্রাইগন ঐ নাম্বারগুলো টুকে নিতেন এবং এরপর পূর্ব নির্ধারিত কোড দিয়ে ডিসাইফার করে তার অর্থ উদ্ধার করতেন।

রেডিও স্টেশন থেকে সিআইএ ট্রাইগনকে নির্দেশ দিলো, জুলাইয়ের ১৫ তারিখ নতুন প্যাকেজ বিনিময়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি যদি প্রস্তুত থাকেন, তাহলে যেন সেদিন সকালে রাস্তার পাশের একটি নির্দিষ্ট সাইনবোর্ডের গায়ে একটি লাল রংয়ের বৃত্ত এঁকে দেন। ১৫ তারিখ সকাল বেলা অফিসে যাওয়ার সময় মার্থা উঁকি মেরে দেখলেন, ঠিকই সাইনবোর্ডটিতে একটি লাল রংয়ের বৃত্ত এঁকে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন রাতে ট্রাইগন ডেড ড্রপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। যদিও নিখুঁত গোল করে কোনো কিছুর ছাঁচে ফেলে আঁকা বৃত্তটি দেখে মার্থার মনে একবার সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল যে, ট্রাইগন কেন এতটা নিখুঁত করে দাগ দেবেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাবনাটাকে খুব একটা পাত্তা দিলেন না তিনি। প্রস্তুতি নিতে লাগলেন সন্ধ্যার অভিযানের জন্য।

***

১৫ জুলাই, ১৯৭৭। মার্থা পিটারসন হাজির হয়েছেন লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামের নিকটে মস্কো নদীর ওপরে অবস্থিত ক্রাসনোলুজস্কি ব্রিজের সামনে। এটাই আজ তার ডেড ড্রপ লোকেশন। সম্ভাব্য অনুসরণকারীকে খসানোর জন্য অন্যান্যবারের মতো আজও তিনি এখানে এসেছেন বিস্তর পথ ঘুরে। এবং ব্রিজে ওঠার আগেও তিনি আশেপাশে ভালো করে খুঁজে দেখেছেন, কানে লাগানো ট্রান্সমিটার রিসিভারে ভালো করে শোনার চেষ্টা করেছেন, না কোথাও কেউ নেই।

মার্থার সাথে তার পার্সের ভেতরে আছে ট্রাইগনের উদ্দেশ্যে ফেলে যাওয়ার জন্য একটি প্যাকেজ। তবে অন্যান্যবারের মতো এটি দেখতে গাছের গুঁড়ির মতোও না, সিগারেটের প্যাকেটের মতোও না। এবারের প্যাকেজটি নিরেট একখণ্ড কংক্রিটের মতো। বিষমাকৃতির কংক্রিটের টুকরোটির গায়ে চারটি স্ক্রু লাগানো আছে, যা খুব ভালো করে লক্ষ না করলে কারো চোখে পড়বে না। কিন্তু চোখে পড়লেও অনেকেই স্ক্রুগুলো প্রথম চেষ্টায় খুলতে পারবে না। কারণ সাধারণ স্ক্রু যেখানে খুলতে হয় ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে, সেখানে এই স্ক্রুগুলো খুলতে হবে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরিয়ে। আর স্ক্রুগুলো খুললেই ফাঁপা কনক্রিটের বক্সের ভেতরে পাওয়া যাবে ট্রাইগনের জন্য সিআইএ'র সরবরাহ করা জিনিসগুলো।

রাত সাড়ে দশটার সময় মার্থা ব্রিজের একটি নির্দিষ্ট পিলারের খুপরির ভেতরে আস্তে করে কনক্রিটের টুকরোটি রেখে দিলেন। এরপর ব্রিজ থেকে নেমে আসতে লাগলেন। ব্রিজ থেকে রাস্তায় এসে নামতে যখন আর মাত্র চারটি সিঁড়ি বাকি, ঠিক তখন হঠাৎ তার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো তিনজন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ রাশিয়ান পুরুষ। তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, "ধর ওকে, কোনোভাবে যেন পালাতে না পারে।"

মার্থার পালানোর উপায় ছিল না। তিনজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ তাকে ধরে রেখেছিল। কিন্তু তারপরেও তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট, আমাকে তোমরা আটক করতে পারো না।" তার চিৎকার করার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। ট্রাইগন যদি প্যাকেজ নেওয়ার জন্য আশেপাশে উপস্থিত হয়ে থাকেন, তাহলে যেন চিৎকার শুনেই সাবধান হয়ে যেতে পারেন।

লোকগুলো মার্থার চিৎকার অগ্রাহ্য করে তার হাত থেকে পার্স ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পার্স রক্ষা করার জন্য মার্থা যখন তার হাত ঝাড়া দেন, তখন তার বাহু ধরে রাখা একজনের হাত সরে গিয়ে তার বুকের পাশে রাখা ট্রান্সমিটারে গিয়ে ঠেকে। লোকগুলোর ধারণা হয়, সেখানে হয়তো

পিস্তল বা অন্য কোনো অস্ত্র রাখা আছে। তারা তার বুকের ভেতরে হাত দিয়ে ট্রান্সমিটারটা বের করার চেষ্টা করতে থাকে।

এতে মার্থা আরো ক্ষেপে যান। তিনি তার কারাতের বিদ্যা প্রয়োগ করে একাই তিনজনের সাথে মারামারি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু একপর্যায়ে তাদের সামনে একটি ভ্যান এসে থামে। সেখান থেকে আরো আরো কয়েকজন নেমে এসে যোগ দিলে মার্থাকে হার মানতে হয়। তারা তার বুকের পাশ থেকে ট্রান্সমিটারটা বের করে নেয়। কিন্তু ধরা পড়ার আগে তিনি প্রায় সবাইকে কমবেশি জখম করতে সক্ষম হন। তার লাথি খেয়ে কেজিবির এক এজেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

সেদিন গভীর রাতে কেজিবি সদস্যরা মার্থাকে নিয়ে হাজির হয় মস্কোর কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কা প্রিজনে। কেজিবির একজন ইন্টারোগেটর মার্থাকে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে থাকেন। কিন্তু মার্থা কিছুই স্বীকার করেননি। তিনি জানতেন, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকার কারণে তারা তাকে আটক করেও রাখতে পারবে না, নির্যাতন করেও তার কাছ থেকে কোনো তথ্য বের করার চেষ্টা করতে পারবে না। সকালের আগেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

কেজিবির এজেন্টরা ঘটনাস্থল থেকে কংক্রিটের প্যাকেজটিও উদ্ধার করে এনেছিল। প্রশ্নকর্তা মার্থার সামনেই প্যাকেজটি খুলে এক এক করে ভেতরের জিনিসগুলো বের করতে শুরু করেন। অন্যান্য জিনিসের সাথে সেখানে একটি কলমও ছিল, যার ভেতরে ছিল আরেকটি উন্নত মডেলের মিনিয়েচার ক্যামেরা। কলমটি দেখামাত্রই প্রশ্নকর্তা সেটিকে একপাশে সরিয়ে রাখেন এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “খবরদার, কেউ এটা ধরবে না।”

তার মুখ থেকে এই কথা শোনামাত্র মুষড়ে পড়েন মার্থা পিটারসন। তিনি বুঝতে পারেন, ট্রাইগন সম্ভবত ধরা পড়ে গেছে। কারণ কেজিবির হাতে ধরা পড়লে নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে ট্রাইগন সিআইএ’র কাছে আত্মহত্যার জন্য এল-পিল তথা লিথাল পিল বা বিষাক্ত ট্যাবলেট চেয়েছিলেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে মার্থা নিজেই সেই ট্যাবলেট সরবরাহ করেছিলেন। এবং সেটি ছিল হুবহু এরকমই একটা কলমের ভেতর। ট্রাইগন যদি ধরা না পড়ে থাকে, তাহলে কেজিবির কলমটাকে সন্দেহ করার কথা ছিল না।

মার্থা ধরা পড়েছিলেন রাত সাড়ে দশটার সময়। রাত দুইটার দিকেই কেজিবি তাকে ছেড়ে দেয়। পরদিন সকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্থাকে পার্সোনা নন গ্র্যাটা তথা অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাকে দেশত্যাগের নির্দেশ দেয়। ফলে মাত্র দুই বছরের গুপ্তচরবৃত্তির জীবনের সমাপ্তি টেনে দেশে ফিরে আসেন মার্থা।

এজেন্ট ট্রাইগন তথা আলেক্সান্ডার ওগোরডনিকের ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছিল, সেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিআইএ’র কাছে অজানা রয়ে যায়। বহু বছর পর তারা জানতে পারে, সিআইএ’র এক সাবেক কর্মকর্তাই ট্রাইগনের পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিল কেজিবির কাছে। কয়েকমাস নজরদারি করার পর কেজিবি ট্রাইগনের বাসায় অভিযান চালায়। বাধা দিয়ে লাভ নেই, তাই ট্রাইগন সহজেই আত্মসমর্পণ করেন।

তিনি কেজিবিকে বলেন, তাকে কিছু কাগজ আর তার কলমটা দিলে তিনি তার সকল অপরাধের লিখিত স্বীকারোক্তি দিবেন। কেজিবি যখন কাগজ এবং তার ফাউন্টেইন পেনটা তার হাতে তুলে দেয়, তখন তিনি তা দাঁতের নিচে নিয়ে কামড় বসিয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যে সিআইএ’র দেওয়া সেই বিষাক্ত ট্যাবলেট-যুক্ত কলমটা থেকে বিষ বেরিয়ে তার মুখ থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে আলেক্সান্ডার ওগোরডনিকের।

দিনটি ছিল ১৯৭৭ সালের ২৬ জুন, যেদিন মার্থার ফেলে যাওয়া ডেড ড্রপ মিস করেছিলেন তিনি।

বাবু বিভ্রাট

মোস্তফা মনোয়ার আকিব

২৫বার রিং হওয়ার পর ফোন ধরল যূথী। আমার মনমেজাজ সাম্প্রতিক সময়ের আবহাওয়ার থেকেও উত্তপ্ত।

ফোন ধরেই যূথী বলল, "হ্যালো, আমার বাবুটা, বলো..."

"তোমার বাবু মানে? আমি বাবু নাকি?"

"হ্যাঁ, তুমি আমার বাবু!"

"তুমি আমাকে আর বাবু বলবা না!"

"না, বলব।"

"কেন বলবা?"

"কারণ, আমার বাবু বলতে ভালো লাগে। কি কিউট হয় বাবুরা! তুমি আমার কিউট বাবু।"

"তাহলে, আমিও যা ভালো লাগে তাই বলে ডাকব তোমাকে?"

"হ্যাঁ, বলবা!" যূথীর কণ্ঠে আহ্লাদী ভাব।

আমি সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললাম, "তাহলে তুমি আমার প্যাঁচা। হ্যালো আমার প্যাঁচা, ভালো আছো?"

মুহূর্তেই যূথীর মধুমাখা কণ্ঠ কর্কশ শোনালো, "মানে কী? তুই আমাকে প্যাঁচা বললি কেন?"

"প্যাঁচা আমার ভালো লাগে তাই!"

জানতাম, ওপাশ থেকে ফোন কেটে যাবে। হলোও তাই। ছোটোবেলায় বাবু কেন উভলিঙ্গ শব্দ, তা ঠিকঠাক বুঝতাম না। কিন্তু এখন বুঝি; কারণ, গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডকে এবং বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডকে বাবু বলে ডাকে, তাই বাবু একটি উভলিঙ্গ শব্দ। সে যা হোক, এই বাবু ডাক নিয়ে বেশ ঝামেলায় আছি। কেবল আমি নই, আমার গোটা পরিবার ঝামেলায় আছে।

সেদিন ছোটো ভাই আমার মোবাইল ফোনটা চেয়ে নিল। কাকে যেন মেসেজ পাঠাবে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে আমাকে বলে, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ভাইয়া, তুই এত নিচ, ছিঃ!"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, "কী হলো?"

ছোট ভাই বলল, "তুই আমার গার্লফ্রেন্ডকে আই লাভ ইউ লিখে মেসেজ দিছিস!"

আমি এবার মহাকাশ থেকে পড়লাম, "মানে?"

"এই যে তুই 'বাবু' নামে সেভ করা কন্টাক্টে মেসেজ দিছিস, 'বাবু, আই লাভ ইউ!'"

লজ্জায়-অপমানে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল! তারপরও রাগ সংবরণ করে বললাম, "আমার গার্লফ্রেন্ডকে আমি বাবু ডাকি।"

সেদিন ক্লাস থেকে বাসায় ফিরে এসে দেখি মা-বাবার মধ্যে সিরিয়াস ঝগড়া। মা নাকি দরজা বন্ধ করে রেখেছেন; কিছু একটা করে ফেলবেন। আমাদের কাজের বুয়া মা-বাবার ঝগড়ার কথোপকথন আমাকে বয়ান করল। ঝগড়ার সংলাপগুলো ছিল এ রকম—

"বুড়ো বয়সে তোমার ভীমরতি যায় না?"

"মানে কী?"

"মানে কী জানো না? হাড়হাভাতে বুড়ো! ছিঃ, বুড়ো বয়সে এই দেখার বাকি ছিল আমার! এই মুখ আমি এখন কীভাবে বাইরে দেখাবো! এর আগে মরে যেতাম, সেই ভালো ছিল! এসব রং-তামাশা আর দেখতে হতো না! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

"আশ্চর্য! কী হয়েছে বলবে তো?"

"আমার আর কিছু বলার বাকি আছে? আজকেই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব..."

সেই থেকে নাকি রুমের দরজা বন্ধ। বুয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন এমন হলো?" উত্তরে সে বলল, আজ দুপুরে ল্যান্ডফোনে নাকি কোনে এক মেয়ে ফোন করেছিল। মা সেটা রিসিভ করেছিলেন। তারপর থেকেই এই অবস্থা। আমার মনে পড়ল, গত রাত থেকে রাগ করে আমার মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছি। কেউ ফোন করলে আমাকেই করবে। সেটা যূথী হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কিন্তু এতে বাবার ওপর মায়ের রাগ হওয়ার কারণ কী?

বিকেলবেলা মা কিছুটা শান্ত হলেন। রুম থেকে বেরোনোর পর কড়া এক কাপ চা খেয়ে বললেন, "চোখের সামনে ঘুরঘুর করবি না। সামনে থেকে দূর হ। বাপ হয়েছে হাড় বজ্জাত, ছেলেপুলে আর কী হবে!"

আমি ভীরু পায়ে দুরুদুরু বক্ষে আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, "মা, কার ফোন এসেছিল যে তুমি এত খেপে গেলে?"

মা এমন একটা ঝাড়ি দিলেন যে চায়ের কাপটাও মনে হয় একটু কেঁপে উঠল, "কার আবার, তোর গুণধর জনকের! ফোন ধরে চুপ করে ছিলাম; ও মা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বলে কিনা, 'বাবু, আই লাভ ইউ! প্লিজ ফোন কেটো না, বাবু!' ন্যাকা! কত্ত বড়ো বদমাইশ!"

আমার হাতের তালু আর পায়ের তালু ঘেমে একাকার। কপাল বেয়ে যে পরিমাণ ঘাম ছুটছে, সে পরিমাণ লবণ-পানি স্বয়ং মঙ্গলগ্রহেও নেই! তারপরও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, বেচারা বাবাকে বাঁচাতে সত্যি কথাটা বলে ফেললাম, "মা, আসলে ওটা আমার ফোন ছিল! ফোন বন্ধ ছিল বলে ল্যান্ডফোনে নক করেছিল।"

মায়ের মুখটা এবার খানিকটা নমনীয় দেখালো। ছেলের মুখে এমন মেয়েবন্ধু-সম্পর্কিত তথ্য জেনেও কেন জানি নিশ্চিন্তের একটা আভা ফুটে উঠল। তারপরও আবার চোয়াল শক্ত করে জানতে চাইলেন, "তুই নিশ্চিত? দে দেখি ফোন তোর ওই মেয়েবন্ধুকে!"

আমি বাধ্য ছেলের মতো আড়ালে গিয়ে মেয়েবন্ধু ওরফে প্রেমিকা যূথীকে ফোন করলাম। আমার ধারণা সত্যি। মাকে এসে সেটা জানালাম। মা খানিকক্ষণ কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর নাম আবার কবে থেকে বাবু হলো?"

আমি লজ্জায় পারলে মাটিতে মিশে যাই। উত্তরে আর কী-ই বা বলার আছে। ততক্ষণে বাবা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মা লজ্জামিশ্রিত কপট রাগের ভঙ্গি করে বললেন, "তুই জানিস না, তোর বাবাকেও আমি বাবু বলে ডাকি! বেয়াদব কোথাকার! দূর হ চোখের সামনে থেকে!"

বাবা ওরফে আমার মায়ের ‘বাবু’ তখন মিটিমিটি হাসছেন। আর কান পেতে শুনলাম, আমার ছোটো ভাই ‘হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছি’ ভাব করে তার গার্লফ্রেন্ডকে বলছে, “শোনো বাবু, হা হা হা...আজ বাসায় যা একটা কাণ্ড হয়েছে না! হা হা হা...”

(রস+আলোতে প্রকাশিত)

সমুদ্রাহত

মোবারক খান হৃদয়

যেই লোকটি এই মাত্র ঘর থেকে বের হলো,
ধরা যাক তার হঠাৎ মনে হলো আত্মহত্যার কথা।
ধরা যাক লোকটি সুনসান একটা ব্রিজ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করলো।
যাবতীয় যাপন, হাসি, গান, বুকভর্তি কথা, মধ্যাহ্নের সুনসান ঘুম পেছনে ফেলে-
লোকটি আত্মহত্যা করলো।
লোকটার আত্মহত্যার খবর একটা পাখি জানলো,
আর পাখিটা ডানায় লোকটির আত্মহত্যা নিয়ে ছুটে গেলো ঝর্ণার কাছে,
ছলছল করতে থাকা ঝর্ণা সেই খবর নদীকে দিলো,
যেহেতু নদীর আর কোথাও যাওয়ার নেই,
চিরকাল মাছেদের দুঃখ বইতে থাকা সেই নদী, সেই নদী-
লোকটির আত্মহত্যা বুকে নিয়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের কাছে গেল।
সমুদ্র শুধু নীল নীল ঢেউ নিয়ে গর্জন করতে করতে লোকটার দুঃখ নিয়ে সাতদিকে ছুটে গেল।
লোকটার দুঃখ নিয়ে ছুটে গেল কান্নাবিভোর সমুদ্র, লোকটার মৃত্যু নিয়ে ছুটে গেল থৈ থৈ মহাকাল।
আমি শুধু বারবার লোকটার লাশ, আপন শরীরে নিয়ে, বারবার লোকটার জীবন আপন শরীরে নিয়ে, একটা ব্রিজ, একটা সুনসান ব্রিজ থেকে আমি বারবার লাফিয়ে পড়ছি লোকটার আত্মহত্যার দিকে, আর বারবার কেবল একটা মৃত্যু নিয়ে,বারবার কেবল একটা আত্মহত্যা নিয়ে-
আমার বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে সাতটি সমুদ্র।

লিডার

The chairman we wanted.

মানুষ বাঁচাতে
রূপকথার মতো যে গল্পকে সত্য হতে হবে

তানভীর মেহেদী

কাল রাতে চন্দ্রপুরের ওপর দিয়ে একটা ছোটোখাটো ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু বড়ো ঝড় বয়ে গেছে বিকেলবেলা।

সেই ঝড়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন থানার ওসি আর ইউএনও। ৬৩০ বস্তা চুরি যাওয়া চাল নিজের বাড়িতে নেওয়ার অভিযোগ শুনে তারা এসেছিলেন।

চন্দ্রপুর ইউনিয়ন।

এই ইউনিয়নের মানুষজন চাঁদের আলোর চেয়ে সূর্যের আলো বেশি পছন্দ করে। দিনের মতো পরিষ্কার তাদের মাথার ভেতরটা।

একদিনে হয়নি, ধাপে ধাপে এসব হতে হয়।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে চন্দ্রপুরের চেয়ারম্যান। নাম সাইফুল তালুকদার। একসময়ের সব তালুক শেষ হয়েছে। তবে শুধু ভালোবাসার তালুকটা রয়ে গেছে।

এলাকার অনেক ঘরে বিল্ডিং উঠেছে। তবে তার টিনের ঘরে এখনও বিল্ডিং উঠেনি।

থাকার ঘর ছাড়া অতিরিক্ত দুটো ঘর আছে তার। একটাতে মানুষ রাখা। একটাতে চাল ডাল, শুকনো খাবার।

মানুষ রাখার ঘরে থাকে তিনজন। বড়ো ঘরে দূরত্ব রেখে ঘুমাতে কষ্ট হয় না।

ওসি সাহেবের সাথে থাকা কনস্টেবল চালের বস্তা গুনলেন। ৬৩০ বস্তার সাথে আরও ১৮০ বস্তা চাল বেশি আছে। সরকারি চালের সিল লাগানো বস্তার সংখ্যা ১০০। বাকিগুলোতে রাইস মিলের নাম লেখা।

"বস্তা কোথায় ফেলছেন চেয়ারম্যান সাহেব?"

"বস্তা ফেলি নাই।"

"বস্তা পাল্টায়া চাল হালাল করছেন সেইটা স্বীকার করেন।"

"আমি চালের মিল থেকে কিনে এনেছি। রিসিট সাথে আছে।"

"ওসব বানানো যায়।"

"আপনার কথাও বানানো যায়।"

"সত্যটা বলুন।"

“দরজা খুলুন।”

ওসি সাহেব নিজের হাতে দরজা খুললেন। এ ঘরের বাইরের দিকের দরজা দিয়ে উঠোন দেখা যায়। একদম পুকুরপাড় পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত উঠান। সেখানে চুন দিয়ে দূরে দূরে মানুষ দাঁড়ানোর জন্য মার্ক করা। ২৫ জনের মতো দাঁড়াতে পারে সেখানে।

একদম ২৫জনই দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের প্রায় সবাই মধ্যবয়সী। খেটে খাওয়া মানুষের মতো দেখতে তাদের চেহারা। কেউ কেউ গৃহিণীদের মতো।

“আপনারা কারা?”

“আমরা মানুষ।”

“এখানে কী চান?”

“ব্যাখ্যা।”

“কীসের ব্যাখ্যা?”

“কেন এসেছেন?”

“চালের খোঁজ নিতে।”

“পেটের খোঁজ নিতে আসছিলেন?”

আগত সম্মানিত ব্যক্তিরা চুপ করে গেলেন। একসাথে অনেক চাল কোথাও ট্রাকে করে গেলে সবাই সন্দেহ করে। এমন সন্দেহেই কেউ হয়তো তাদের জানিয়েছিল এই খবর। কিন্তু এই চাল চুরির চাল না। সাইফুল চেয়ারম্যান নিজের টাকায় কিনে এনেছেন।

নিজের টাকা পুরোপুরি না। তার এলাকার যারা দেশের মধ্যে বড়ো চাকরি করা, বড়ো ব্যবসায়ী আছেন তাদের লিস্ট আছে তার কাছে। লিস্ট ধরে ধরে সবার থেকে অনুদান সংগ্রহ করা হয়েছে। যতটা সবার সামর্থ্য তারচেয়ে বেশি করেই সবাই দিয়েছেন।

যে যতটা পারে দিয়েছে। সেদিন এক রিকশাওয়ালার বউ তার মাটির ব্যাংকে জমানো সব টাকা দিয়ে গেছেন।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, “আপনারা চলবেন কীভাবে?”

তিনি বললেন, “চায়ের দোকানদার সবুরের বউ যেমনে চলবো আমিও সেমনেই চলবো।”

চেয়ারম্যান সাহেব এতক্ষণে আবার মুখ খুললেন।

তিনি বললেন, “আপনাদের ১০ টাকার চাল থেকেও আমি ১০০ বস্তা কিনেছি। আমার এলাকার একজনে ৫ কেজি করে কিনলে কত কেজি হয় সেটা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসেব করে সেই অনুযায়ী চাল আমি কিনে এনে আমার ঘরে ঢুকিয়েছি। আমার মানুষেরা অতদূর গিয়ে চাল কিনে আনতে পারবে না। আর এতে সামাজিক দূরত্বও থাকে না। আর যাদের সামর্থ্য নাই তারা ১০ টাকা কেজিতেও কিনতে পারবে না। আমি নিজে কিনে এনেছি। এখন নিজ দায়িত্বে তাদের ঘরে পৌঁছে দিবো।”

আরো বললেন, “চালের বস্তা আমি নিজে মাথায় করে দিয়ে আসি না। আমার দিয়ে আসার মতো লোক আছে। মানুষের জন্য কাঁদার লোক আছে। আপনাদের যদি লোক লাগে জানাবেন। আমি পাঠিয়ে দিবো।”

উপস্থিত ভদ্রলোকদের যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। যাওয়ার সময় তাদের চোখ আটকে গেল ঘরের টিনের দেওয়ালের একটা পোস্টারে। সাইফুল চেয়ারম্যানের নাম দিয়ে সেখানে লেখা,

“মার্কার নাম বাংলাদেশ”

প্রচারে বাংলাদেশের জনগণ।

“এইটা কোন ইলেকশনের মার্কা চেয়ারম্যান সাহেব?”

“আমার মনের ইলেকশনের। এই মার্কা আমার মার্কা। আমার শক্তি। যতদিন এই মার্কার ইজ্জত রাখতে পারবো ততদিন এই মানুষগুলার সাথে এক কাতারে দাঁড়ায়া থাকবো।”

“আপনার ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশনের মার্কা যেন কী ছিল?”

“সেইটা আমি মনে রাখি নাই।”

গর্বে মাথা উঁচু করবেন না লজ্জায় মাথা নিচু করবেন বুঝলেন না ওসি সাহেব কিংবা ইউএনও। যাওয়ার আগে হাত রাখলেন চেয়ারম্যান সাহেবের কাঁধে।

বললেন, “কেন করতেছেন?”

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, “ডিউটি করতেছি স্যার। আমার ডিউটি ৯টা ৫টা না। আমার ডিউটি সারাদিন। চেয়ারম্যান মেম্বার বেঁচে থাকতে ইউনিয়নের কেউ না খেয়ে মরতে পারবে না। এইটাই জনপ্রতিনিধিগিরি। এইটাই নেতা। এই হ্যাডম ছাড়া লিডার হওয়া যায় না।”

সাইফুল চেয়ারম্যান বললেন, “আমি কারো দিকে তাকিয়ে থাকি না। আমার এখান থেকে কাঁদলে গণভবন পর্যন্ত শব্দ যায় না। আমার গ্রামে সকালে যার পেট খালি থাকে তাকে সন্ধ্যার পর ভাত দিলে হবে না। সকালের ভাত অন্তত দুপুরের আগে দিতে হবে। আপনাদের কাগজ কলমের হিসাব আমি বুঝি না। আমি আমার এলাকার দায়িত্ব নিছি, আপনারা বাংলাদেশের দায়িত্ব নেন।”

পরিতৃপ্তির মতো লজ্জা নিয়ে চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে বের হলেন ওসি সাহেব আর ইউএনও। এই গল্প তারা কি কাউকে বলতে পারবেন? দেশের সিস্টেম কি এই সত্য হজম করতে পারবে? এমন সততা কি রাষ্ট্র তার জনগণের সামনে দেখাতে পারবে?

রাত আটটা।

অন্ধকার গ্রামের রাস্তা।

মোবাইলের আলো জ্বেলে পথ চলতে হয়। আশপাশ নীরব হয়ে গেছে ততক্ষণে। পাখিরা ডাকছে না। মুরগীর খামার থেকে পোল্ট্রি মুরগীর শব্দ ভেসে আসছে শুধু।

ইউএনও সাহেব কান পাতলেন বাতাসে। সাথে কান পাতলেন ওসি সাহেবও।

অনেকদূর পর্যন্ত শোনার চেষ্টা করলেন।

একদম গণভবন পর্যন্ত।

তবে তারা কিছুই শুনলেন না। শুধু একটু দূরের এক বাড়ি থেকে এক ছেলের ছড়া পাঠের শব্দ ভেসে এলো।

বানান করে করে আদর্শলিপি পড়ছে সে,

আ ম রা য দি না জা গি মা কে ম নে স কা ল হ বে?
তো মা র ছে লে উ ঠ লে গো মা রা ত পো হা বে ত বে!

জয়নবের মৃত্যু

সালমা সিদ্দিকা

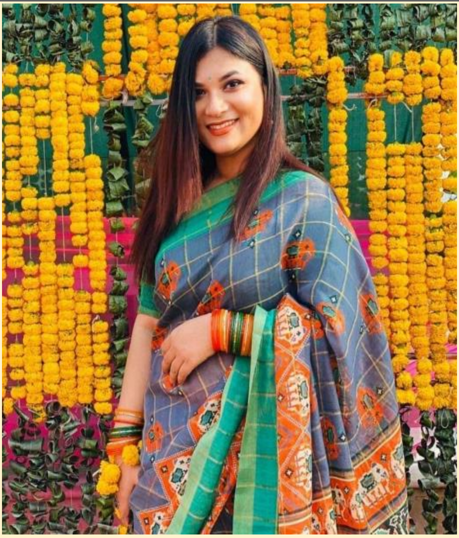

জয়নবের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে কেউ জানে না। ভোর বেলায় সুফিয়া বেগম ওজু করতে মুড়াপাড়া মসজিদের পাশের পুকুরে যাওয়ার সময় পুকুর পাড়ের ঝোপের মধ্যে জয়নবের নগ্ন পা দেখতে পায়। দেখার ভুল ভেবে প্রথমে কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে। ঝোপ সরিয়ে চাপা স্বরে চিৎকার করে ওঠে সুফিয়া। লম্বা হয়ে পড়ে আছে জয়নব। চোখ দুটো খোলা, যেন আসমানের দিকে মনোযোগসহকারে তাকিয়ে কিছু দেখছে।

সুফিয়া দৌড়ে বাড়ি ফিরে আসে, হাঁপাতে হাঁপাতে তার স্বামী রইসুদ্দিনকে সব বলে। রইসুদ্দিন ঘুমের ঘোরে অর্ধেক বোঝে আবার অর্ধেক বোঝে না। তবে বৌয়ের শরীরে থরথর কাঁপন দেখে চোখ কঁচলে উঠে বসে, গায়ে শার্ট চাপিয়ে সুফিয়াকে নিয়ে পুকুর পাড়ে আসে। সুফিয়ার কথার ঠিক-ঠিকানা নেই, প্রায় রাতেই নাকি জ্বিন দেখে সুফিয়া। তাই পুকুর পাড়ে আসলেই জয়নবের লাশ পড়ে আছে কিনা নিজ চোখে দেখা প্রয়োজন মনে করলো রইসুদ্দিন।

আসলেই জয়নবের লাশ। গায়ে পরিপাটি কাপড়, কোনো রক্ত নেই, আঘাত নেই। এক সারি কালো পিঁপড়া হেঁটে চলছে জয়নবের নীলচে হাতের ওপর, হাতে এখনো সোনার চিকন চুড়ি। রইসুদ্দিন বেশিক্ষণ লাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলো না, মনে হয় খোলা চোখে জয়নব আকাশ পাতালের সব গোপন রহস্য ভেদ করতে পারবে, যেন রইসুদ্দিনের বুকের ভেতর জয়নবের প্রতি গোপন লালসার অন্ধকার গলি ঘুপচি চিনে ফেলবে জয়নব। দৃশ্যটা দেখে রইসুদ্দিনের গা কেমন শিউরে ওঠে। হালকা শীতেও কেমন ঘেমে উঠে রইসুদ্দিনের কপাল। সুফিয়াকে নিয়ে ছুটে আসে কালামের বাড়িতে।

জয়নবের স্বামী কালাম, রইসুদ্দিনের ছোটোবেলার বন্ধু। বছরখানেক হলো ঢাকা শহরের চাকরির পাট চুকিয়ে নতুন বৌকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে কালাম। ঢাকায় গেলে কেউ গ্রামে ফেরে না—এমনটাই ভাবতো রইসুদ্দিন। কিন্তু সুন্দরী বৌ নিয়ে কালাম যখন গ্রামে বাস করতে চলে এলো তখন অনেকের মতো রইসুদ্দিনেরও চোখ কপালে চড়ে ছিল। তারপর গ্রাম্য পরিবেশে বেশ গুছিয়ে মানিয়ে একবছর পার করে দিলো কালাম আর জয়নব।

তবে কালামের বৌটা যেন কেমন কেমন। সুন্দরীদের একটু দেমাগ থাকেই, তাই বলে এত কেন হবে যে স্বামীর বন্ধুকে দেখলেও কেমন ঠাট দেখিয়ে সামনে থেকে সরে পড়তে হবে? কতবার রইসুদ্দিনের ইচ্ছা হয়েছে কালামের বাড়িতে বসে দু'কাপ চা খাবে, সাথে মুড়ি কিংবা বিস্কুট। তাকে আপ্যায়ন করবে জয়নব, যাকে নিয়ে গ্রামের পুরুষদের মধ্যে কত কেচ্ছা! কিন্তু জয়নব কাউকে

তোয়াক্কা করে না, ঘর থেকে দুদণ্ডের জন্য বের হয় না, পুকুর পাড়ে যায় না, মুদির দোকানে যায় না, কেউ কোনোদিন জয়নবকে কালামের সাথে কোথাও বেড়াতেও যেতে দেখেনি। অথচ গাঁজা ফেন্সি ব্যবসায়ী আনোয়ার মিয়া কেমন নির্দ্বিধায় কালামের বাড়িতে যাতায়াত করে। পয়সাওয়ালা বলেই বুঝি আনোয়ার মিয়ার এত কদর। সফরপুরে আনোয়ার মিয়ার প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিও আছে, সেখানেই কালাম ডেলিভারি ট্রাক চালায়।

বৌকে আনার পরে কালাম তার পুরোনো বাড়ির চারদিকে টিনের উঁচু বেড়া লাগিয়েছে। যেন বৌ না, কোনো এক গুপ্তধন নিয়ে এসেছে, যাকে সবার নজর থেকে আড়াল করতে হবে। কালামও কেমন যেন সবার থেকে একটু দূরে দূরে থাকে, সকাল সকাল ফ্যাক্টরিতে যায়, গভীর রাতে ফেরে, কখনো আবার চিটাগং পোর্টে যেতে হয় বলে দু'তিনদিন ফেরেও না। কালামের বাবা মা বহুদিন আগেই মারা গেছে, এখনো গ্রামে তার কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। গ্রামের এইসব আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের সাথে তার দেখাই হয় না। যতক্ষণ বাড়ি থাকে, বৌকে ছেড়ে ঘর থেকে বের হয় না। এই নিয়ে লোক হাসাহাসি কম হয়নি। গ্রামের বৌ-ঝিরা জয়নবকে হিংসা করে, সাথে অদ্ভুত এক ধরনের ঘৃণাও কাজ করে। সুফিয়া তো পেছনে পেছনে জয়নবকে জমিদারের ঝি ডাকে। এত অহংকার কিসের? রূপ কি গ্রামে শুধু তার একলার? কালাম সাধারণ ট্রাক ড্রাইভার, টাকা কড়ি কী আর এমন আছে যে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না? শেষ দুপুরে এ পাড়ার বৌ-ঝিরা যখন পুকুরে গোসল করতে এসে গল্পের ঝুড়ি মেলে বসে তখন সেখানে জয়নব সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও জয়নবের কিচ্ছা ঠিকই উপস্থিত থাকে। তাতে অবশ্য কালাম অথবা জয়নবের কিছু যায় আসেনি কখনো।

কালামের এত সাধের বৌটা মরে গেল কেমন করে সেটা ভেবে রইসুদ্দিন চিন্তায় পড়ে। টিনের গেটে ঝমঝম শব্দ তুলে ডাকতে থাকে রইসুদ্দিন। কিছুক্ষণ পরেই কালাম বেরিয়ে আসে। স্ত্রীর লাশ পাওয়া গেছে শুনে কেমন বোকার মতো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পুকুর পাড়ে মানুষের ঢল, শরৎ শেষের স্বচ্ছ সকালের আলোয় জয়নবের নাকফুল ঝিলমিল করে। পুলিশ এসেছে তদন্ত করতে। এরই মাঝে খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষ এমন তামাশা দেখতে হাজির হতে দেরি করে না। একটু দূরে কালাম বসে আছে। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাকে বিশেষ বিচলিত মনে হচ্ছে না, বিষয়টা অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক।

পুলিশকে খবর দিয়েছে মুড়াপাড়া মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান মোখলেস সাহেব। তাঁর মসজিদের পাশের পুকুর ব্যবহার করে গ্রামের সাধারণ মানুষ। মসজিদের পাশে লাশ পড়ে থাকার বিষয়টা মোটেই হালকা ভাবে নেওয়ার কারণ নেই, তার ওপর একজন মহিলার লাশ। সামনেই চেয়ারম্যান ইলেকশনে মনোনয়ন নেওয়ার ইচ্ছা মোখলেস সাহেবের। তাঁর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আনোয়ার মিয়া যেকোনো সুযোগে তাঁকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবে। তাঁর করা পুকুর পাড়ে লাশ পাওয়া নিয়ে নানান কুকথা হবে। তাছাড়া কালাম আনোয়ার মিয়ার প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতেই কাজ করে। তাই ভালো তদন্ত হওয়া দরকার বলে পুলিশকে জরুরি তলব দিয়েছেন।

পুলিশ অফিসার আমজাদ বেশ অনেকক্ষণ জয়নবের লাশ দেখলো। প্রাথমিক সুরতহালে লাশের শরীরে হত্যার আলামত পাওয়া গেল না, আশেপাশে কোনো পায়ের ছাপ নেই। তবে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট না দেখে কিছু বলা যাবে না। অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে লাশ এমন সটান পড়ে থাকতে পারে না, মৃত্যু যন্ত্রণার ছাপ থেকেই যেতো। আত্মহত্যা নয়তো?

আমজাদ ইশারায় কালামকে ডাকে। কালাম ধীরে সুস্থে উঠে আসে।

“কালাম মিয়া, বৌরে তুমি মারছো নাকি?”

“জি না, আমি তারে ক্যান মারুম?” শান্তভাবে বলে কালাম।

“গ্রামের লোকজন বললো তুমি তারে ঘরে আটকায় থুইতা, কারো লগে মিলা মিশা করতে দিতা না? ঘটনা কি সত্যি?”

“সে কারো সাথে মিলা মিশা করতে চায় না, ঘরেই থাকতে চায়, আমি আটকায় থুই না।” মাথা নিচু করে কালাম বলে।

“কুনডা সত্যি কুনডা মিথ্যা সেইটা থানায় নিয়া দুইডা বাড়ি খাইলেই বলবা। শুনলাম তোমার লগে এনার দ্বিতীয় বিয়া, প্রথম বিয়া কার সাথে হইছিল?”

“আমি কইতে পারি না এত কিছু।”

“হুম,বৌয়ের প্রথম স্বামীর কথা জানো না, এইটা বিশ্বাস করতে বলো? সবই কইবা। তোমার বৌয়ের বাপ ভাইগোরে খবর দিছো? তারা কই?”

“জয়নবের বাপ নাই, এক ভাই আছে, তারে ফোন কইরা খবর দিছে রইসুদ্দিন। সে আসতেছে।”

“আসলে সরাসরি থানায় আসতে কইবা। আমরা লাশ নিয়া যাইতেছি, পোস্টমর্টেম হবে।”

কালামের চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠে। “স্যার, জয়নব এমনেই মরছে, তারে কাটাকাটি কইরেন না, লাশটা দিয়া দেন। আমি দাফন-কাফন করি।”

আমজাদ চাপা ধমক দিয়ে মারমুখী ভঙ্গিতে বলে, “ক্যাঁ? ডরাইসোস? লাশ কাইট্টা বুঝতে হইবো না, ক্যামনে মারছোস? বিষ দিয়া নাকি ইনজেকশন দিয়া?”

কালাম আবার শান্ত হয়, হটাৎ ছলকে ওঠা উত্তেজনায় লাগাম টানে। আমজাদকে আর কিছুই বলে না।

সকাল এগারোটার দিকে জয়নবের ভাই জয়নাল আমজাদের সাথে দেখা করতে থানায় আসে। সে মনে মনে মহা বিরক্ত। শাকুরগঞ্জে তার ইলেক্ট্রনিক্সের বিশাল দোকান, সাথে দুইটা চাল ভাঙানোর মেশিনও আছে, তার নানান ব্যস্ততা। এর মধ্যে জয়নবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিন ঘণ্টা বাসে চড়ে এখানে আসতে হয়েছে। তার কোমর ব্যাথা করছে।

“জয়নাল মিয়া, আপনার বইন জয়নব মারা গেছে– সেইটা তো শুনছেন। গ্রামের মানুষ বলাবলি করতেছে তার স্বামী তাকে মাইরা পুস্কুনির পাড়ে ফালায় থুইছে।”

জয়নালের মুখ কুঁচকে গেল।

“আমার এই বইনের বিষয়ে আমার তেমন কিছু জানা নাই। সাত বছর আগে তার বিয়া দিছিলাম অনেক আশা কইরা, এক বিরাট অবস্থা সম্পন্ন লোকের সাথে। সেই সংসারে দুই পোলা হইছে। এরপরে শয়তান ঢুকলো জয়নবের মইধ্যে। গ্রামের কোনো এক পোলার সাথে ভাব ভালোবাসা করলো। ওর জামাইয়ের মান সম্মান কিছু আর থাকলো না। হঠাৎ একদিন শুনি সে তার স্বামীর বাড়ি থেইকা কই জানি ভাইগা গেছে। ভাইয়ের পরিবার, স্বামীর পরিবার কারোর জন্যই তার কোনো পরোয়া নাই। আমাগো লাইগা জয়নব তখনই মইরা গেছে। বুকে পাত্থর বাইন্ধা ফালাইছি। এরপরে জয়নব আবার কী করলো জানেন? সতেরো দিন পরে কই থেইকা জানি স্বামীর বাড়িতে ফেরত

এলো। সে নাকি তার পোলাদের দেখতে চায়। তার পিরিতের নাগর নাকি মইরা গেছে। তার স্বামী তাকে লাথি দিয়া বাইর কইরা দিছে। কী করবো বলেন? চুমা দিয়ে ঘরে নিবে? যাই হোক, পরে লোক মুখে শুনছি সে নাকি কোনো এক ট্রাক ড্রাইভারকে বিয়া করছে। এমন দুশ্চরিত্র মেয়ে মানুষের এর চেয়ে ভালো আর কী হইবো? মইরা থাকবো না রাস্তায়? আপনেই বলেন?"

"আপনার সাথে আপনার বইনের কোনো যোগাযোগ ছিল না?"

"কয়েকবার সে ফোন করছে, পোলাদের জন্য কান্দাকাটি করছে। আমি আর কী করতে পারি? নিজেরই হাজারটা যন্ত্রণা। জয়নবের প্রথম স্বামী পাওয়ারফুল লোক। তার ট্রাক ড্রাইভার স্বামী কী করছে না করছে, সেইটা তারে জিজ্ঞাস করেন। নিজেই নাকি আবার বিষ খাইয়া মরলো? আমারে এত দূরে টাইনা আনার কোনো দরকার দেখলাম না।"

জয়নালের মুখ আরো কুঁচকে গেছে। বোনের লাশ দাফন হবে নাকি পোস্টমর্টেম হবে এই ব্যাপারে তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হচ্ছে না।

"আপনে বইনের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো মামলা করতে চান না? আপনার বইনের লাশ পোস্টমর্টেম করতে না করতেছে তার স্বামী।"

"কিয়ের মামলা? আমি এইসব জায়-ঝামেলার মধ্যে নাই। আপনাদের যা ইচ্ছা করেন। খুন হইছে মনে করলে চেক মাইরা দেখেন। আমার বহুত কাম আছে, আমি গেলাম।"

আমজাদ আশাহত হয়। জয়নবের অবস্থা সম্পন্ন ভাইয়ের কাছ থেকে মাল-পানি খসানোর কোনো সুযোগ দেখা যাচ্ছে না। কালামের কাছ থেকেও ফুটা পয়সা পাবার কোনো আশা নেই।

আমজাদ জয়নালের এজাহার নিয়ে তার সই নিলো। জয়নাল হাঁফ ছেড়ে পালালো প্রায়।

মাদ্রাসা কমিটি পক্ষর থেকে অপঘাতে মৃত্যুর মামলা হলো। আমজাদের মন বলছে এই লাশের পেছনে আরো রহস্য আছে, পোস্টমর্টেম করলেই অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। এই মহিলার আবার অন্য কারো সাথে পরকীয়া ছিল না তো? যে মানুষ একবার স্বামীকে প্রতারণা করতে পারে, সে আবারও করতে পারে। গ্রামের অনেক পুরুষই নাকি জয়নবের প্রতি গোপন প্রণয় লালন করতো। মোখলেস সাহেবও তেমন আভাস দিলেন। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার।

কালামকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে আমজাদের ঘরের এক কোণায় রাখা কাঠের চেয়ারে। মুকুন্দ পাড়ায় ডাকাতির বিষয়ে জরুরি কিছু কাজ নিয়ে ওখানকার থানা থেকে একটা দল এসেছে, তাদের সাথে মিটিং করতে হচ্ছে। তাদের সাথে আলাপ শেষ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। আমজাদ এই সময় বাসায় গিয়ে দুপুরের খাবার খায় আর আধ ঘণ্টা খাটে গড়াগড়ি করে নেয়। সব সেরে থানায় ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে চারটা।

কালামের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল আমজাদ। কনস্টেবল হেলাল এসে মনে করিয়ে দিলো। কালামকে পাশের একটা ঘরে ডেকে আনা হলো।

লম্বা টেবিলের এক পাশে কালাম বসেছে একটা টুলের ওপর, আরেক পাশে চেয়ারে আমজাদ বসা। প্রথমেই ভয়ানক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সন্দেহভাজনের দিকে তাকিয়ে থাকে আমজাদ। এতে দুর্বল অপরাধী অনেক সময় কাবু হয়। আজকেও তাকিয়ে আছে আমজাদ কিন্তু কালাম নির্লিপ্তভাবেই বসে আছে। একবার মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুললো। কিছুক্ষণ পর শান্ত কণ্ঠে বললো, "স্যার, কখন যাইতে দিবেন?"

আমজাদ বাঘের মতো চিৎকার করে বললো, "তামশা পাইছোস? বৌরে মাইরা এখন কি বাড়ি গিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমাবি? সত্যি কইরা বল, কেমনে মরছে তোর বৌ? তোর বৌ ঘর থেইকা বাইর হইতো না আবার আনোয়ার মিয়া নাকি তোর বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো? তার সাথে কী ঘটনা? সত্যি কইরা বল, নাইলে আমরা জানি কেমনে কথা পেট থেইকা টাইন্যা বাইর করতে হয়।"

কালাম একটুও বিচলিত না হয়ে বললো, "আনোয়ার স্যার আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো, এই কথা মিথ্যা। তিনি মাত্র দুইবার আমার বাড়িতে আসছে। সবাই জানে আনোয়ার স্যারের কিছু আলাদা ব্যবসা আছে, বিভিন্ন জিনিসের ব্যবসা। সেগুলার বিষয়ে টাকা পয়সার কিছু লেনদেন করতে উনি দুইবার আসছিল। স্যার আমাকে ভাইয়ের মতো বিশ্বাস করে। উনার বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাই । এইটাই আমার কাম।"

আমজাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালামের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে। আমজাদের মনে হচ্ছে কালামের মধ্যে কোনো একটা অস্বাভাবিকতা আছে। নিজের অজান্তেই আমজাদ কিছুটা সমীহ করে তুই থেকে তুমিতে উত্তরণ করলো।

"কালাম মিয়া শুনো, গ্রামের মানুষজন বলছে তোমার বাড়ি থেইকা কান্দনের আওয়াজ আসতো। কারণ কী?"

কালাম মাথা নিচু করে আমজাদের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বললো, "স্যার, আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিল। তার পেটে বেদনা উঠলে সে কানতো। অন্য কিছু না। তারে আমি পছন্দ করতাম।" কালামের গলা কেঁপে উঠলো একটু।

"তার প্রথম স্বামী আর সন্তানদের সাথে যোগাযোগ ছিল? তার কোনো দুঃখ কষ্ট ছিল যার জন্য সে আত্মহত্যা করতে পারে বইলা তুমি মনে করো?"

কালাম আবার চোখ তুলে তাকিয়ে স্থির কণ্ঠে বললো, "জি স্যার, তার দুঃখ ছিল কিন্তু সে আত্মহত্যা করে নাই, আমি জানি। সে এমনেই মরছে। তার লাশটা কাইটেন না স্যার।" কালাম আর্জি করে।

আমজাদের ক্লান্ত লাগছে। কালাম কিছু করেনি বলেই তার মনে হচ্ছে। তারপর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসা পর্যন্ত কালামকে থানায় রাখতে হবে। নিয়ম।

কালামকে লকআপে নেওয়ার সময় বারবার পোস্টমর্টেম করতে বারণ করতে লাগলো। আমজাদের বিরক্ত লাগছে। সাথে মাথাও ধরেছে। অযথা একটা মামলায় জড়িয়ে কালামের মাধ্যমে আনোয়ার মিয়াকে ফাঁসানোর চেষ্টা। এসব বহুবার দেখেছে আমজাদ। মাঝখান থেকে পুলিশের যন্ত্রণা।

কালামকে যে সেলে রাখা হয়েছে সেখানে আরো দুইজনকে রাখা হয়েছে। একজন বুড়ো লোক প্রথম থেকেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। দুবার শুধু মাথা বের করে থু করে থুতু ফেললো, সম্ভবত মানসিক ভারসাম্যহীন। আরেকজন অল্প বয়সী ছেলে চুপচাপ বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আর কিছুক্ষণ পরপর হাত পা চুলকাচ্ছে। নেশাগ্রস্ত চোখমুখ। কালামকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, "কুত্তার বাচ্চা, কী দেখস? খুনের মামলায় আসছি। এমন চাইয়া থাকলে চোখ গাইল্লা দিবো। আমার কাছে জিনিস আছে।" বলে পকেটে হাত দিয়ে কি যেন স্পর্শ করলো ছেলেটা। উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখেই বোঝা যায় সে ভীত। কালাম চোখ সরিয়ে নিলো।

রাত গভীর হয়, যৌবনবতী পূর্ণিমার দ্বিতীয় দিনের আলো খুপড়ি ঘরের ক্ষুদ্র জানালা ঠেলে ঢুকতে চায়। নেশাগ্রস্ত ছেলে ঘুমের মধ্যে খল খল করে হাসে, বিড়বিড় করে কি যেন বলে। হয়তো কোনো

সুখস্বপ্নে বিচরণ করছে সে। পাগল লোকটা নিশ্চুপ কম্বলের নিচে নিজেকে ঘুমের আবরণে আড়াল করেছে যেন।

কালাম ঘুমায় না। টিপটিপ বুকে কিসের যেন অপেক্ষা করে। চোখ দুটো কচকচ করে তবু ঘুম আসে না। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকে। রাতের একেক প্রহরে একেক গন্ধ থাকে, জয়নব শিখিয়েছে। তারপর থেকে রাত জাগার নেশা কালামের। আজকের অপেক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। তবুও কালাম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

উথাল-পাথাল জোছনার হাত ধরে জয়নব আসে। কালামের হৃদস্পন্দন তীব্র হয়, যেমনটা জয়নবকে প্রথম দেখে হয়েছিল, ঠিক তেমন। জয়নব কালামের সামনে এসে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বলে, "আপনেরে ক্যান আটকায় রাখছে?"

কালাম হেসে ফেলে। দীর্ঘক্ষণ থানায় আটকে থাকার যন্ত্রণা ভুলে যায়। "তুমি আমারে বিরাট ঝামেলায় ফালায় দিছো। পুস্কুনির পাড়ে কে বলছিল পইড়া থাকতে?"

"ক্যান আপনে জানেন না, পুন্নিমায় আমি বাইরে থাকি? কালকে কী যে হইলো, চান দেইখা পুরান কথা সব মনে হইয়া গেলো। ঘরে আসতে ইচ্ছা করলো না।"

জয়নবের চোখে মেঘ জমে, অন্ধকারেও কালাম দেখতে পায়। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, "এইখানে আসলা ক্যামনে? ওরা তোমারে কাটে নাই তো?"

"নাহ, আরো কত জায়গা থেইকা পালায় আসছি আগে, এইটা তো কিছুই না।"

কালাম মায়াময় ভঙ্গিতে জয়নবের হাত ধরে বলে, "তোমার কষ্ট হইছে?"

জয়নবের দৃষ্টি উদাস হয়, চোখের মেঘ আরো গাঢ় হয়। হয়তো এখনই বৃষ্টি নামবে। জয়নবকে কাঁদতে দেখতে ভালো লাগে না কালামের।

"আমার আর কিয়ের কষ্ট? আমি তো সেইদিনই মইরা গেছি যেদিন আমার স্বামী ওই লোকটারে খুন করলো। আচ্ছা, আমার স্বামী যদি আমারে না ভালোবাসে, তাইলে আমি কি আরেকজনকে ভালোবাসতে পারবো না? কই আছে এমন নিয়ম যে স্বামীর লাত্থি ঘুষি খাইয়াও তার কাছেই পইড়া থাকতে হবে? আমি এই নিয়ম মানি না, মানি না। তার জন্য আমার বুক থেইকা পোলা দুইটারেও কাইড়া নিলো? ক্যান এমন করলো?"

বিনবিন নিচু শব্দে কাঁদতে শুরু করলো জয়নব। কালাম এই প্রশ্নগুলো লক্ষবার শুনেছে। তার কাছে এসবের কোনো জবাব নেই, তাই প্রতিবার জয়নবের প্রশ্ন শুনে কালাম অসহায় বোধ করে।

"আমি তো মইরাই গেছি। এই লাশটার জন্য আপনের কেন এত মায়া?"

কালাম জানে না জয়নবের প্রতি তার কেন এত মায়া। চার বছর আগে কেরানীগঞ্জে একটা চালান পৌঁছাতে গিয়ে জয়নবের সাথে প্রথম দেখা। চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল কালাম। জয়নব চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক কি যেন দেখছিল, উদ্ভ্রান্ত অবয়ব। কালাম মুগ্ধ হয়েছিল, এত সুন্দর একটা মানুষ! জয়নবকে দেখে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে মনে হচ্ছিল, হাতে স্বর্ণের মোটা বালা। সন্ধ্যার পরে অন্ধকার ঘুপচি গলির চায়ের দোকানের আশেপাশে এই মহিলা কী করছে?– এই ভেবে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কালাম। সস্তা খাবারের সন্ধানে জায়গাটায় ভীড় জমিয়েছে দিনমজুর রিক্সাওয়ালা আর নেশাখোর মানুষ। কেউ কেউ মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখছে জয়নবকে। এমন সুন্দরী মহিলা দেখলে সবাই এভাবেই তাকিয়ে থাকে।

কালাম জয়নবের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “আপনে কী কিছু খুঁজতেছেন?”

জয়নব থমকে তাকালো। তারপর কালামকে অবাক করে বললো, “জি, আমি রহমান ডাক্তারের চেম্বার খুঁজতেছি। আমার মৃত্য হইছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। উনি নাকি দেখলেই বুঝতে পারবে, আমার মৃত্যু হইছে কিনা।”

মহিলা বিকারগ্রস্ত, কালামের কোনো সন্দেহ রইলো না। তবু কি ভেবে বললো, “আমি চিনি রহমান ডাক্তার, আমার সাথে চলেন।”

কালাম তখন একটা পিকআপ ট্রাক চালাতো। সোনার বালা জোড়ার প্রতি কেমন একটা লোভ জন্মেছিল, কিন্তু অল্প সময়ে লোভের গলা চেপে ধরলো মুগ্ধতা।

জয়নব সরলরেখার চেয়েও সরল, মাঝে মাঝে কালামের মনে হয় সরলতা নয়, এটা বোকামি। সেদিন যদি কালাম না হয়ে অন্য কেউ জয়নবকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতো? জয়নব এমন বোকা, কালামের সাথে এক কথায় চলে এলো! কেন এভাবে নির্দ্বিধায় কালামের সাথে চলে এলো এই প্রশ্নের জবাবে জয়নব হেসে বলে, “আপনে পারছেন আমার কোনো ক্ষতি করতে? পারেন নাই। কেউ পারতো না। মরা মানুষের আবার কিয়ের ডর?” কথাটা বলেই আবার কেমন গম্ভীর হয়ে যায়, চোখের গভীরে কেমন রহস্য ঘূর্ণি তোলে, কালামের তখন মনে হয় জয়নব মোটেই বোকা নয়।

কালাম সেদিন থেকে জয়নবকে আগলে রেখেছে। প্রথম প্রথম জয়নব যখন বলতো– সে মৃত, কথাটাকে জয়নবের হেঁয়ালিপনা ভেবে উড়িয়ে দিতো কালাম। কিন্তু ধীরে ধীরে কালাম বুঝতে পারে আসলেই জয়নবের প্রাণ নেই। জয়নব খায় না, ঘুমায় না, গভীর রাতে পুরোনো প্রেমিকের নাম ধরে ডেকে কাঁদে। জয়নবের বরফ শীতল শরীরে স্পর্শ করে কালাম উষ্ণ হয় না। জয়নবের নিষ্প্রাণ শরীরের প্রতি আকর্ষণবোধ ধীরে ধীরে মরে যায়। বেঁচে থাকে এক পরম মায়া। জয়নবকে বিয়ে করেও বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে শরীর জুড়ায় কালাম। অদ্ভুত সমীকরণে জয়নবের সাথে বেঁচে থাকে কালাম। পরিবারশূন্য কালাম পেঁচানো লতার মতো জয়নবের লাশকে জড়িয়ে জীবন বাঁচায়। জয়নব মৃত– এই বিষয়টা খুব স্বাভাবিক হয়ে যায় কালামের কাছে। জগতে কত আশ্চর্য ঘটনাই তো ঘটে। ছোটোবেলায় কালাম শুনেছিল গ্রামের এক মহিলা নাকি কুকুর সন্তান প্রসব করেছে। আরেকবার পিকআপ ট্রাকের ভয়াবহ এক দুর্ঘটনা ঘটার ঠিক আগ মুহূর্তে কালাম দেখলো সাদা লেবাস পরা কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরলো। ট্রাক দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও কালাম বেঁচে ছিল, তার গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি। সেই সাদা আলখাল্লা পরা পুরুষ অথবা নারী তাকে রক্ষা করেছিল। এমন অদ্ভুত কান্ড দুনিয়াতে ঘটলে মৃত মানুষ জ্যান্ত মানুষের মতো চলাফেরা করার ঘটনাও ঘটতে পারে।

পূর্ণিমা এলে জয়নব ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এমন রাতে তার প্রেমিকের সাথে পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল হয়তোবা, কালাম ঠিক জানে না পূর্ণিমার সাথে জয়নবের কীসের সম্পর্ক। জয়নবের সব অস্বাভাবিকতার সাথে এটাও যোগ হয় কালামের স্বাভাবিক তালিকায়। গোলমাল বাধে বছরখানেক আগে কিছু মানুষ যখন জয়নবের লাশটা কালামের ঘরের পাশেই পড়ে থাকতে দেখে। পুলিশ এসে নানা ঝামেলা শুরু হয়। বহু কষ্টে সেই ঝঞ্ঝাট থেকে জয়নবের লাশ নিয়ে এখানে পালিয়ে আসে কালাম, থিতু হয় এই গ্রামে। এখানে জয়নবের অতীত কেউ জানবে না বলেই তার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু জয়নবের সৌন্দর্য উপচে পড়ে কালামের উঁচু দেওয়াল ভেদ করে। কৌতূহলী মানুষের উঁকিঝুঁকিতে জয়নবের অতীতের কত কিছুই না প্রকাশ পেয়ে যায়!

কালাম জয়নবকে সাবধান করে দিয়েছিল এমনভাবে জায়গা-অজায়গায় পড়ে না থাকতে, মানুষ ভুল বোঝে, কিন্তু জয়নব শোনে না। হুটহাট এখানে-ওখানে এলিয়ে শুয়ে থাকে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। দেখে মনে হয় মৃত লাশের চোখ খুলে আছে। ঘরে ফিরে এমন দৃশ্য দেখে ভয় পেত প্রথম প্রথম। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরের বাইরে এমন করে পড়ে থাকলে লোকে তো লাশ ভেবে পুলিশকে খবর দেবেই। কালাম জয়নবকে সেজন্য ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করে।

"কাইল রাইতে ঘরের বাইরে না গেলে হইতো না? এখন কেমন ঝামেলায় পড়লাম, কও দেখি?" কালাম ফিসফিস করে বলে।

"কী করমু? আমার বুকটা কেমন খালি খালি লাগতেছিল। আমারে কে জানি অভিশাপ দিছিল, তার জন্য মইরাও মরি না।" জয়নবের কথা অন্ধকারে মিলায়।

কালামের চোখে দ্বন্দ্ব লাগে। একবার মনে হয় জয়নব না, কেমন একটা আলো ছড়িয়ে পড়ে হাজত প্রকোষ্ঠে। জয়নব হারিয়ে যায়। কালাম অসহায় বোধ করে। কোনো কিছুর বিনিময়ে সে জয়নবকে হারাতে চায় না। সে হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে জয়নবকে হাতড়ে বেড়ায়। নিচু কণ্ঠে ডাকতে থাকে "জয়নব, জয়নব।"

কম্বলের নিচ থেকে কচ্ছপের মতো মাথা বের করে অবাক হয়ে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কালামকে দেখে বুড়ো কয়েদি। হঠাৎ অদ্ভুত হলুদ উজ্জ্বল আলোতে তার চোখ ঝলসে যায়।

পরদিন আমজাদ অদ্ভুত খবর পায়। জয়নবের লাশ মর্গ থেকে গায়েব, সাথে হাজত থেকে কালামও হাওয়া! এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। লাশ গুম হওয়ার দুর্বল সম্ভাবনা থাকলেও হাজত থেকে কয়েদি কেমন করে পালিয়ে গেল, আমজাদের মাথায় ঢোকে না। জেলখানায় কালামের সাথে থাকা এক পাগল বলেছে রাতে নাকি জ্বীন এসে কালামকে নিয়ে গেছে, সে নাকি হলুদ আলো দেখেছে। আমজাদ অবশ্য সেটা বিশ্বাস করে না, পাগল মানুষ তো কত কিছুই বলে।

হয়তো কোনোদিন কালাম আর জয়নবকে অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে, অন্য কোনো মায়ার কুটিরে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

নিশি মিয়া

কল

রাজীব চৌধুরী

রাত প্রায় একটা।

কলটা কেমন আছে দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু বাইরে যাওয়া নিষেধ। তাই যেতে পারছে না প্রাণ। প্রাণের প্রাণ এখন ভয়ে ওষ্ঠাগত। কিন্তু কিছুই করার নেই। বাইরের বারান্দায় তখন হুটোপুটি।

আসলেই কি কিছু ধরা পড়েছে?

নাকি সব ভ্রম? প্রাণ ভাবতে থাকে। এপাশে জানলার ঠিক পাশেই প্রাণ বসে আছে। খাটের ওপর বসে আছে বলব– নাকি আধশোয়া? মানুষ এভাবে শোয় না। প্রাণের প্রাণ ওষ্ঠাগত না হলে সেও এভাবে কখনোই শুতে পারত না। কিন্তু কিছুই করার নেই। প্রাণের এখন জীবন বাঁচাতেই হবে।

প্রাণ যে ঘরে বসে অথবা শুয়ে আছে- সেই ঘরের চার কোণে চারটা মানুষের মাথার খুলি রাখা আছে। ঘরের চার দিকে একটা সাদা দাগ দেওয়া আছে। দাগটা দেওয়া হয়েছে আটা দিয়ে। এই আটার দাগের বাইরে যাওয়া বারণ। কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না। শুধু বাইরে থেকে র্যাব অথবা পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢুকলে সেটা অন্য হিসাব। কিন্তু সেটা না হলে কোনো পরিস্থিতিতেই বাইরে যাওয়া যাবে না। প্রাণের প্রাণ হরণের সম্ভাবনা আছে। তাই এত জটিল পরিস্থিতি।

হুটোপুটির শব্দ হচ্ছে।

একটা বেড়াল... হ্যাঁ বেড়ালই তো...

প্রচণ্ড হুটোপুট শুরু হল। লোহার শেকলের ঝনঝন ঝনঝনাৎ।

একটা বেড়াল।

বেড়ালটা কি ঘরের ভেতর ঢুকতে গিয়ে আটকেছে কলে?

প্রাণ জানলাটা খুলতে চায়। কিন্তু মন সায় দেয় না। শরীর তো কত কথাই বলে। মাথার ভেতর কত প্রশ্ন। কিন্তু মন বলে- খোলার দরকার নেই। বাড়তে থাকে রাত। বাড়তে থাকে বেড়ালের হুটোপুটি।

ইস! এটার এখন কী দশা?

প্রাণ নিজেই নিজেকে বলে! গিয়ে ওটাকে ছাড়িয়ে কলটা আবার ঠিক বসিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু নিশি মিয়ার কথা প্রাণের অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। নিশি মিয়া বলেছে- কোনোভাবেই বারান্দায় যাওয়া যাবে না। কোনোভাবেই না। অনেক কিছু শুনবে। অনেক কিছু শোনানো হবে। কিন্তু কোনোভাবেই বারান্দায় যাওয়া যাবে না।

প্রাণ কি এখন বেড়ালটাকে বাঁচাতে যাবে? দেখা গেল এটা আসলেই একটা বেড়াল? দেখা গেল নিশিমিয়ার বলা প্রতিটি কথাই মিথ্যা। প্রাণের আশংকাই সত্য। কিন্তু মনের একটা কোণে কে যেন ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলছে, "প্রাণ, তুই শুনিস না। তুই কিছুই শুনিস না। তুই শুয়ে থাক। তুই অপেক্ষা কর। রাত পোহালে তুই ঠিক বাইরে গিয়ে দেখবি ওখানে কিছুই নেই..."

বুকের ভেতর কে যেন কথাগুলো বলে উঠল।

কণ্ঠটা কি নিশি মিয়ার?

নিশি মিয়া একজন প্রেতসাধক। প্রাণ ওনার কাছে গিয়েছিল গত তিনদিন আগে। যদিও সমস্যাটা বেশ পুরাতন। গতবছর প্রাণ সুদুর রাজশাহী থেকে এসেছে চট্টগ্রামে। সে চাকরি নিয়ে এসেছে। চীনা টোবাকো কোম্পানি লিমিটেড। এই টোবাকো কোম্পানিতে বছর দুয়েক হলো সে চাকরিটা পেয়েছে। গতবছর হুট করে ওর বদলি হয়ে গেল চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে এসে পড়ল বিপাকে। কোম্পানির চাকরি। কিন্তু ওর রেস্ট হাউজে থাকতে ইচ্ছে করে না। রেস্ট হাউজে একা একা থাকতে হয়। পুরো বাড়ি জুড়ে একা। কেউ নেই। একটা চাকর আছে। পানু। ব্যাটা একটা বামন। ছোটো ছোটো হাত পা। আর একটা দাঁত সোনার। সেই সোনার তৈরি দাঁত ফিক করে হাসলেই ভয়ে কলিজা শুকিয়ে যায়। মূলত এই পানুকে দেখেই ভয়ে রেস্ট হাউজে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রাণ। কিন্তু বিধি বাম। ওর এইচওডি মানে হেড অব ডিপার্টমেন্ট ওকে এখানেই বরাদ্ধ দিয়েছে। সে একজন ম্যানেজার। এই চীনা লোকগুলো এক কথার মানুষ। আপনাকে যদি সে বলে যে দিনের বাইশ ঘণ্টা কাজ করবে– তাহলে সে বাইশ ঘণ্টাই কাজ করবে। এর বেশিও না। আবার কমও না। চীনা অফিসার ওকে চিচি করে বলল, "টুমি হইলা বং। তোমার সমিস্যা কী?"

এই চীনা একটু একটু বাংলা শিখেছে। তাতেই ভয়ংকর বাংলা বলতে শুরু করে মাঝে মাঝে। আর প্রাণ যখনই বলেছে এই বাংলোতে সে থাকবে না সাথে সাথে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। বেচারা কেন থাকবে না এটাই বলতে পারেনি ভয়ে।

এদিকে রাতের বেলা খাবারের টেবিলে পানু যখন ভাত বেড়ে সামনে দাঁড়ায়- তখনই প্রাণে প্রাণের ভেতরে মা বাবার নামে গালাগাল শুরু হয়ে যায়। এই ব্যাটা পরে থাকে একটা ছোটো হাফপ্যান্ট। নাক নেই বললেই চলে। চোখ দুটো কুতকুতে। মাথায় চুল বেশ লম্বা। পেছনে ঝুটি বেঁধে চুলগুলোকে আটকে রাখা যায় না। সামনে চলে আসে। আর পানু বার বার সেই চুলগুলোকে পেছনে সরায়। এটা ওর মুদ্রা দোষ বলা যায়। সে এর মাঝে দু'দিন পার করেছে। এই দু'দিনে টের পেয়েছে- পানু কপালে চুল চলে না এলেও মাথার সামনে থেকে চুল সরানোর চেষ্টা করে। এটা ওর মুদ্রা দোষ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বেশ হাসির। পানুকে দেখেই অবশ্য আরো হাসি পায়। কারণ পানুর স্বর্ণ প্রীতি।

পানু খুব সোনা পছন্দ করে। ওর একটা দাঁত যে সোনার সেটা প্রাণ আগেই দেখেছে। এরপর দেখেছে ওর কানে একটা সোনার দুল। ওর হাতে একটা সোনার আংটিও আছে। হয়তো আরো অনেক কিছু আছে। কিন্তু সে দেখতে পায় না। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো পানু হাঁটার সময় দূর থেকে ঝুম ঝুম শব্দ হয়। হয়তো ওর পায়ের কোথাও একটা নুপুর আছে। ছোট্ট নুপুর। এক পায়ে নুপুর তো মেয়েরা পরে। আর পানু সেটা কেন পরে এটা জানা হয়নি তখনো।

ভাত খাওয়ার টেবিলটা বাংলোর নিচতলায়। পুরো ভবনটা দোতলা। খুবই সুন্দর একটা বাংলো। চট্টগ্রাম শহরে এখনো এরকম একটা বাংলো আছে সেটা ভাবতেই ভালো লাগে। প্রথম দিন যখন এই বাংলোর দিকে তাকালো প্রাণ– দেখেই চোখ জুড়িয়ে গেল। রেডিসন হোটেল থেকে মাত্র মিনিট

পাঁচেকের দূরত্বে এমন একটা সুন্দর লনওয়ালা বাড়ি ওকে থাকার জন্যে দেওয়া হবে এটা স্বপ্নেই ভাবতে পারছিল না। বাড়িটা পুরো লাল ইটের তৈরি। সামনে বিশাল লন। আসলে বাড়িটা যত বড়ো ততটুকু লন। কিন্তু চট্টগ্রামের মতো শহরে এমন একটা জায়গা থাকতে পারে এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। বিশেষ করে এই ব্যস্ত শহরের একদম প্রাণকেন্দ্রে এমন একটা জায়গা থাকা আসলেই বিলাসিতা। কিন্তু চায়না টোবাকো এটা কিনে ফেলেছে। ভয়ের বিষয় হলো চায়না টোবাকো এখন বাংলাদেশের অধিকাংশ বড়ো কোম্পানিতে শেয়ার কিনে নিজেদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাতারে নিয়ে যাচ্ছে। যেকোনো দিন শোনা যাবে চায়না টোবাকো এখন বাংলাদেশ সরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এরকম হলে অবাক হওয়ার কিছু হবে না। কিন্তু এসব নিয়ে প্রাণের তেমন কোনো টেনশন নেই। ওর কোম্পানি এখন ফুলে ফেঁপে একাকার। চট্টগ্রাম শহরের অর্ধেক কিনে ফেলেছে। অবশ্য এটা হওয়ারই ছিল। একটা দেশের অর্ধেকের চেয়ে বেশি জনগোষ্ঠী যখন টাকার লোভে নিজেদের বিক্রি করে দেয় সেই দেশের এরকম কিছু একটা হবে এটা ধারণা করাই যায়। তবে প্রাণ নিশ্চিন্ত। এই কোম্পানিতে চাকরি পাওয়া ওর ধ্যান জ্ঞান ছিল। একসময় ওর কোম্পানির কাছে সরকার প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকা পেত। তখন সরকারের তিনজন মন্ত্রীকে প্রাণ ম্যানেজ করেছিল বলেই চাকরিটা পেয়েছে। আর সেই ম্যানেজের চোটে সেই পাওনা দশ হাজার কোটি কমে গিয়ে পনেরো হাজার কোটিতে নেমে এসেছে। তবে প্রাণ জানে- এই টাকা কোনোদিনই চায়না টোবাকো দেবে না। প্রাণের কাজই হলো সরকারের বিভিন্ন লেভেলে ঘুষ দিয়ে এই টাকার হার প্রতিমাসে কমিয়ে আনা। এজন্যে প্রাণকে প্রতি মাসে লাখখানেক স্যালারি দেওয়া হয়। আর এখন দেওয়া হচ্ছে বাড়ি ও গাড়ির সুবিধা। তবে প্রাণ জানে- এই পাওনা একবার মওকুফ হয়ে গেলেই প্রাণকে লাথি দিয়ে কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। সে এরকম হতে দেখেছেও। তাই সে আস্তে ধীরে কাজ করে। খুব ধীরে ধীরে কাজ করলে এসব কোম্পানি মোটেও বুঝতে পারে না। ওরা ভাবে এক কোটি খরচ করে যদি ১৫০০০ কোটি মওকুফ করে ফেলা যায় তাইলে ভালোই। কিন্তু প্রাণ এই কাজ কোনোভাবেই দশ বছরের আগে করবে না। মোটামুটি বছর পনেরোর টার্গেটে আছে সে। এজন্যেই সে এতকাল সাধনা করে ল' পড়েছে। আর এখন সেই সুফল ভোগ করছে। দেশের কী হলো– তাতে তার কিছুই যায় আসে না। কিন্তু বাড়িটা ওকে ভোগাচ্ছে। প্রচুর ভোগাচ্ছে।

প্রাণ এই বাড়িতে আসার পরেই প্ল্যান করে ওর বউকে নিয়ে আসবে। প্রাণ চাকরিটা পেয়েই বিয়ে করেছে। এই ক'দিন প্রাণের সাথেই ছিল। কিন্তু এখন ওর বউ মিনি থাকে দেশে। সে চট্টগ্রামে। দূরে দূরে থাকা ভালো লাগে না। অনেক কষ্ট করে বউ পেয়েছে। আজকালকার বাজারে টাকা থাকলেই বউ পাওয়া যায়- এটা পুরোপুরি ভুল কথা। এই যেমন প্রাণ- হিন্দু পরিবারের সন্তান। বেশ শক্তপোক্ত একটা গোত্রের ছেলে। কিন্তু মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাত্র অবস্থায় যাদের সাথে টাল্টি বাল্টি করতো- তাদের এখন সে এড়িয়ে চলে। সেই মেয়েগুলোর সাথে প্রেম করা যায়- কিন্তু বিয়ে তো করা যায় না। সুনয়না নামের এক মেয়ের সাথে কয়েকবার রুম ডেট করে ছেড়ে দিয়েছে সে। এর আগে যতগুলো ডেট করেছে- সুনয়না মেয়েটা সবচে ভালো ও সুন্দরী। কিন্তু প্রথমদিনেই ডেটে রাজি হয়ে যাওয়া সুনয়নার সাথে আরো ষোলো জনের প্রেমের ঘটনা শোনার পর প্রাণের বুকের ভেতর ছুঁচো দৌড়ানোর মতো শব্দ হয়েছিল। বেচারা! ভেবেছিল- এবার একজন সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু বিধি বাম- সে সেক্সম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছিল। কিন্তু সেই সুনয়নার পর আরো তিনজনের সাথে প্রেম করেছে- কিন্তু কোনো না কোনোভাবে বিয়ের কথা চলাকালীন অবস্থায়

বিয়েটা হচ্ছিল না। কোনোভাবেই ব্যাটে বলে হয় না। হয় মেয়ের বাবা বেঁকে বসে। নইলে মেয়ের ভাই। কখনো মেয়ে নিজেই পালায়। কখনো জানা যায় মেয়ের আগে বিয়ে হয়েছে। একবার শুনল- মেয়ে একবার এবোর্শন করিয়েছে- কিন্তু এর আগেই প্রাণের হাত ধরা থেকে চুম্বন- সব হয়ে গেছে। মোট কথা- প্রাণ হলো সেই অভাগা- যার টাকা আছে- কিন্তু সেই টাকার সমান মাথায় চুল ও সৌভাগ্য দুটোর একটাও নেই।

অনেক কষ্টবিষ্ট শেষে সে বিয়ে করেছে মিনিকে।

কিন্তু বিয়ের তিনদিন পর চতুর্থদিন রাতে সে জানতে পারে মিনিরও একটা বিশাল সমস্যা আছে। সমস্যাটা হলো মিনিকে একটা জ্বিন খুব পছন্দ করে। মোট কথা- বেচারার এতদিন মানুষের প্রেমিকার সাথে ফষ্টিনষ্টি করার পর জ্বিনের প্রেমিকার সাথে ভুল করে বিয়ে হয়ে গেছে। এবং প্রতি অমাবস্যা রাতে সেই *তিনি* আসেন। মিনির সাথে ছিনিমিনি খেলতে চান। তখন মিনি আর মিনি থাকেন না। হয়ে যান পাগলিনী। ঘরের জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু পরেরদিন একদম সুবোধ বালিকা।

প্রাণ বিয়ের তিনদিনের দিন রাতে হঠাৎ মিনির এই রূপ দেখে ভয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিল। কিন্তু এখন সেই ভয়ের চাইতেও ভয়াবহ কিছু ঘটছে। প্রাণের মনে হলো- সেই ভয় এই ভয়ের কাছে কিছুই না। আসলেই কিছু না। এরচে' জ্বিনের গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘর করা অনেক সুখকর ছিল।

এরপরেই প্রাণ খোঁজ পায় নিশি মিয়া নামে একজন প্রেতসাধক আছে। তিনি যেকোনো প্রেত দূর করে দিতে পারেন। এই খোঁজ পাওয়ার পরদিন প্রাণ বামুনপুরা গ্রামের দিকে রওনা দেয়। তিনদিন পর যখন নিশি মিয়ার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন দেখে নিশি মিয়াকে সে যেমন ভেবেছিল তার ঠিক উলটো। ভেবেছিল লাল কাপড় পরা কোনো সাধুটাধু হবেন। কিন্তু ছেঁড়া শার্ট প্যান্ট পরা একটা পাগলের মতো নিশি মিয়া। চুলে জট। সেই জটে ঘুন ঘুন করছে পোকা। হয়তো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নানারকম পোকার বাসা। এই লোক কীভাবে ভূত ছাড়ায় মোটেও বুঝতে পারেনি প্রাণ। কিন্তু প্রাণ এসব তুকতাকে বিশ্বাস করে। নিশি মিয়াকে খুঁজতে খুঁজতে মোল্লাবাড়ির পুকুর পাড়ে এসে দেখে নিশিমিয়া বসে আছে। একটা গাছের তলায়। সেই গাছে অনেকগুলো কাক বসে আছে। এতগুলো কাক কেন দিনের এই সময় গাছের ডালে বসে আছে বুঝতে না পেরে চুপ মেরে দাঁড়ায় প্রাণ।

"কী চাই?"

"জ্বি ঔষধ দ্যান।"

মিনমিন স্বরে মিনির জন্যে ঔষধ চায় প্রাণ। তখন নিশি মিয়া বলে, "তোরে ঔষধ তো দিতিই পারি। কিন্তু তোর তো কপালে অনেক দুঃখ আছে রে!"

"কী বলেন এইসব?"

"আইচ্ছা-যা এইবার তোরে এই তাবিসডা দিলাম। তোর বউরে গলায় পরায়া দিস। সব ঠিক হইয়া যাইব।"

নিশিমিয়াকে প্রাণ অনেক সাধাসাধি করেও একশোটা টাকাও গছাতে পারল না। নিশিমিয়া নেয়নি। প্রাণকে একটা মাছ কিনে দিতে বলেছিল। প্রাণ দৌড়ে গিয়ে বাজার থেকে একটা ইলিশ মাছ নিয়েও এসেছিল সেটা। কিন্তু নিশিমিয়াকে আর পাওয়া যায়নি। নিশিমিয়াকে আর গ্রামে দেখাই যায়নি।

সেবার প্রাণের স্ত্রী মিনিকে গলায় তাবিজটা বেঁধে দেওয়ার পর মিনির আর মাথায় কোনো সমস্যা হয়নি। শুধু একদিন রাতে হঠাৎ করে ঘরের বাইরে থেকে কে বা কারা যেন ঢিল ছুড়তে শুরু করে। একটা দুটো ঢিলের পর ঘরের দরজা ভাঙার শব্দ শুরু হয়। কেউ দরজা ভাঙতে চাইছে। মিনির নাম ধরে চিৎকার করতে থাকা সেই লোকগুলো যে মিনির অশরীরী বয়ফ্রেন্ড সেই জ্বিনের- সেইটা একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝবে। আর প্রাণ তো পঁয়ত্রিশের অর্ধবৃদ্ধ। মানে আর পাঁচ বছর পরেই সে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। এটা সে নিজে বিশ্বাস করে। অবশ্য বিশ্বাস করার কারণও আছে। ওর পরিবারের কেউ পঞ্চান্ন বছরের বেশি বাঁচেনি। ওর দাদার দাদা থেকেই ট্রেন্ড চলে আসছে। সবাই দ্রুত বিয়ে করে। আবার দ্রুত মরেও যায়। শুধু প্রাণের বেলায় মেয়ে পেতে দেরি হওয়াতে একটু দুশ্চিন্তাই হয় ওর। ওর সন্তান বড়ো হবার আগেই ফুটুস(!) হয়ে গেলে ওর স্বপ্নের কী হবে এটা ভাবতে ভাবতে ও ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে।

প্রাণ এই চট্টগ্রামে চলে আসার পর মিনিকে নিয়ে আসে।

মিনির আবার ফুল খুব ভালো লাগে। আর তখন মিনির সামনে তখন শত শত কাগজ ফুল। মিনি যে কী খুশি! প্রাণ মিনিকে খুব ভালোবাসে। এটা অবশ্য সে প্রকাশ করে না। মেয়েদের কাছে ভালোবাসা প্রকাশ করলেই মাথায় উঠে যায়। এটা প্রাণ বিশ্বাস করে। এজন্যেই সে মিনির সামনে কখনোই এই "ভালোবাসি" শব্দটা উচ্চারণ করেনি।

মিনি এসেই ঘরে একটা পূজার ঘর বানালো। সে হিন্দু বাড়ির বউ। তাকে তো পূজার ঘর বানাতেই হবে। পূজার ঘর মানেই বিশাল কারবার। এই ঘরে আগে কারা ছিল জানা নেই। কিন্তু এখন দেখলে যে কেউ বলবে এই ঘরে অবশ্যই হিন্দু কেউ থাকে। পুরো ঘরের প্রতিটি দুয়ারের ওপর ফুলের মালা দিয়ে মোড়ানো, সাথে নিম পাতার ছাউনি। সুন্দর ফুলের নকশা কেটে পুরো ঘরের প্রতিটি দরজার নিচটা এমনভাবে সাজিয়েছে মিনি- যেকারো মন ভরে যাবে। প্রাণের অবশ্য এটা খুব ভালো লাগে। ধর্ম-কর্ম কখনো মন থেকে করেছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু সংস্কারগুলো ভালো লাগে। আর কুসংস্কারগুলো আঁকড়ে ধরে থাকে। এই যেমন জ্বিনের ব্যাপারটা যাকে বলতে চায়- সেই হেসে উড়িয়ে দেয়। প্রাণকে কেউ বিশ্বাস করেনি। এমনকি ওর পিয়ন মুল্যামিয়াও না। মুল্যামিয়ার আসল নাম মোল্লা মিয়া। কিন্তু সে মুলা বিক্রি করে। অফিস শেষ করে মুলা বিক্রি করতে যায় বাজারে। এজন্যে ওর নাম হয়ে গেছে মুল্যা মিয়া। সে অফিসেও মুলা বিক্রি করে। একদিন সে প্রাণের কাছে মুলা বিক্রি করার জন্যে ময়লা দাঁতগুলো বের করে বলল, "স্যার মুলা নেবেন? দশ টাকা কেজি।"

"মুল্যা মিয়া- তুমি জ্বিন দেখছ?"

"না, স্যার, আমার দাদায় জ্বিন পালত। আমি দেহি নাই।"

"আমার একটা পরিচিত জ্বিন আছে জানো?"

"কন কী স্যার? আপনে তো তাইলে কামেল মানুষ।"

"আরে- আমার পরিচিত মানেই যে আমি কামেল তা তো না। আমার ওয়াইফ চেনে। ওকে ভালোবাসে..."

এটা শুনেই মুল্যা মিয়া বিচ্ছিরি ইঙ্গিতের হাসি হাসে। দেখেই গা পিত্তি জ্বলে যায় প্রাণের। দুই কেজি মুলা কিনে মুল্যা মিয়াকে বিদায় দেয়। বাসায় এসে বউকে মুলা দেয়। কিন্তু বউ কেন জানি রান্নাঘরের দিকে যেতে চায় না। দিনের বেলা সব ঠিক থাকে। সব ঠিক। সব কাজ করবে। কিন্তু সন্ধ্যার

পর নিচতলার রান্নাঘরে কোনোভাবেই মিনিকে ঢোকানো যাবে না।এই কাজ করবে শুধুই পানু। এই পানুকে নিয়েই মিনির নতুন সমস্যার শুরু। সেদিন মুলা নিয়ে বাসায় ঢুকতেই মিনি প্রাণের বুকে এসে কাঁদতে থাকে।

"কী হইছে বলো? কানতেছ কেন?"

"আমার এইখানে থাকতে ইচ্ছা করে না।"

"ক্যান? এত সুন্দর বাড়ি কী বাপের জন্মে দেখছ?"

"তুমি আমাকে বাড়ি নিয়াও খোঁটা দিবা?"

প্রাণ হাসতে থাকে। মিনি জানে। প্রাণ এভাবেই সারাদিন মিনির সাথে খুনসুটি করে। কিন্তু মিনি এখন খুনসুটি মুডে নেই। খুনের মুডে আছে।

"তুমি জানো? এই বাড়ির ঐ পানুর মধ্যে সমস্যা আছে।"

"কী সমস্যা? তোমারে কিছু বলছে? বাথরুমে উঁকি দিসে?"

"তুমি যে কী বলো না? ও কি বাথরুমে উঁকি দিতে পারবে? এত পিচ্চি!"

"আচ্ছা আমাদের পানুর হাইট কত হবে বলো তো?"

"দুই ফিট?"

"কী? এত ছোটো? কিন্তু আমার তো মনে হলো ওর হাইট আমার কোমরের সমান হবে।"

"আরে না। ও আমার রানের কাছে পড়ে থাকে।"

"তা কী হইছে ওর?"

"ওর সমস্যা আছে।"

"কী সমস্যা?"

"ও কেমন করে জানি তাকায়।"

"তোমার বুকের দিকে তাকাইছে? এক্কেরে চোখ আলগা কইরা দিই খুনতি দিয়া? কও একবার...?"

প্রাণ চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু মিনি প্রাণের মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দেয়।

"**শশশশ**- দেওয়ালের ও কান আছে। সাবধানে বলো।"

"কী! কী হইসে খুলে বলো তো?"

"আমার না ওর সামনে হাঁটতে ইচ্ছা করে না। ও আমার দিকে তাকায় না। কখনোই তাকায় না। কিন্তু আমার মনে হয় ও থাকাকালীন অন্য কেউ আমার দিকে তাকায়।"

"কী বলো? কালকেই একটা শনি পূজা দাও।"

"কী সব ছাতা মাথা। এই জন্যে কেউ শনি পূজা দেয়?"

"তুমি না- সবসময় বেশি বুঝো। দাও খাবার দাও..."

কথাবার্তা সেখানে থেমে যায়। কাপড় পালটে প্রাণ স্নানঘরে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রাণের অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়। ট্যাপের পুরোনো কলটা ছাড়তেই ভ্যাটভ্যাট শব্দ করে জল পড়ে। কিন্তু সেই জল থেকে কেমন যেন গন্ধ বের হচ্ছে মনে হয়। বেসিনের কলটা ছাড়তে গিয়েই মনে হয় জানালা দিয়ে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে কেউ নেই। কিন্তু প্রাণ ঠিক দেখেছে- ওখানে কিছু একটা ছিল। কেউ একজন তাকিয়ে আছে। এটা কি পানু? কিন্তু পানু তো এত লম্বা নয়। তাইলে কে? পানুর কথা মনে হওয়ার কারণ সে সোনালি একটা কিছু দেখেছে। আর এই

বাড়িতে একমাত্র পানুই আছে যার কানের দুল সোনার। এক দেখায় তো দাঁত দেখা যায় না। কিন্তু কালের সোনালি দুল ঠিক দেখেছে প্রাণ।

ভাত খেয়ে পানুকে ডাক দিল প্রাণ।

"পানু ভাই? ও পানু ভাই..."

পানু যেন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকতেই হাজির।

"বলেন।"

পানুর খটখটে কণ্ঠ শুনেই প্রাণের বুকের ভেতরটা ধপাস করে লাফিয়ে উঠল। এত দ্রুত কেউ ডাক দিলেই আসে- এটা ধারণায় ছিল না। এর আগে কখনো হয়নি। কিন্তু হঠাৎ পানুর শব্দটা ওর হার্টকে টেনিস বলের মতো ড্রপ খাইয়ে ছেড়েছে।

"তুমি কি বাইরে ছিলা?"

"আমি তো এখানেই ছিলাম। পাশের রুমে।"

"কী করো ওখানে?"

"কেন ঘর ঝাড়ু দিই..."

কথা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। পরদিন প্রাণের স্ত্রী মিনি বিছানায় ঘুমাতে যাবার আগে শুয়ে শুয়ে আবারও অভিযোগ করে। এবার অভিযোগ আরো গুরুতর।

"জানো আমার না মনে হয় এই পানু লোকটা দুইজন।"

"মানে কী? গাঞ্জা খাওয়া শুরু করস নাকি?"

"ধুর- তুমি কী যে বলো না? গাঞ্জা খাবো কেন? আমি সিরিয়াস।"

"কীভাবে বুঝলা? একজন দুইজন হয় কেমন করে?"

"কারণ আমি ডাকলেই পানু ধাম করে সামনে চলে আসে।"

"সেটা আমিও টের পাইসি।"

"কিন্তু সে কাজ করতেছিল অনেক দূরে।"

"মানে?"

"এর মানে হলো," কণ্ঠটাকে একদম খাদে নামিয়ে এনে বলল, "আমি জানতাম। তাই ওকে রান্নাঘরে একটা কাপড় আনতে পাঠাই। আর সাথে সাথেই ডাক দিই। অমনি সে পাশের ঘর থেকে এসে হাজির। অথচ এই সময়ের মধ্যে কোনোভাবেই রান্নাঘর থেকে কাপড়টা নিয়ে আসা সম্ভব না।"

"এতে কী প্রমাণ হয়? সে তো কাপড় অন্য কোথাও থেকেও আনতে পারে।"

"তা পারে। কিন্তু সে আনেনি। আমি নিশ্চিত। কারণ ওকে আমি রান্নাঘরে পাঠিয়ে বেলকনি থেকে পুরোটা দেখেছি। এখান থেকে রান্নাঘরে যেতে পুরো পাঁচ মিনিট লাগে। আমি এর আগে মোবাইলে স্টপওয়াচ দিয়ে মেপেছি। আর ফিরে আসতে পুরো পাঁচ মিনিট। একটু এদিক-সেদিক লাগতে পারে। কিন্তু লাগে। এর নিচে পারা যায় না। হয়তো পনেরো সেকেন্ড এদিক-সেদিক হয়। আমি মেপেছি। কিন্তু পানু ডাক দিলেই পাশের ঘর থেকে এসে হাজির হয়।"

"এর একটা বিহিত করতে হবে।"

"কিন্তু কোনো বিপদ যদি হয়?"

"আরে কী হবে? ওর চাকরি খেয়ে দেব। তাইলে আমাদের এইচওডি ওকে ওএসডি করে অন্য কোথাও পাঠায়ে দেবে। অথবা চাকরি খেয়ে দেবে।"

"বেচারা না খেয়ে মরবে। এত বেটে মানুষ। কোথায় চাকরি পাবে বলো?"

"কিন্তু আমরা তো অস্বস্তিতে আছি।"

"ওকে জিজ্ঞেস করলেই হয়..."

পরদিন প্রাণ ও মিলি দুজনেই পালা করে পানুকে এই ব্যাপারে নানারকম ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পানু একেবারে নিশ্চুপ। এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। অফিসে চীনা এইচওডিকে এসব বলতেই প্রাণকে দুইদিনের বেতন কাটাসহ তিনদিনের বেতনহীন ছুটি দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। প্রাণ পড়ল অদ্ভুত সমস্যায়। এই চীনা কোম্পানির সমস্যা হলো কোম্পানি যাকে চাইবে– তার বিরুদ্ধে যদি একহাজার বারও নালিশ করা হয়- তবুও তার কিছু হয় না। আর কোম্পানি যখন চাইবে না তখন হাজার ভালো কাজ করলেও রক্ষা নাই। মুহূর্তেই চাকরি নট।

প্রাণ পড়ল মহা ঝামেলায়। এই সমস্যার কথা বেশি লোকজন জানতে পারলে ওর নিজের চাকরি নিয়েই সমস্যা শুরু হবে। কিন্তু একটা বিহিত তো করা যায়। সেদিন প্রাণ ও মিনি অনেক ভেবেচিন্তে সমস্যাটার সমাধান বের করে। পানুকে বাজারে পাঠানো হয়। সে বাজারে যেতেই প্রাণ বের হয়ে যায়। চালের আড়তে চলে যায় সে। সেখান থেকে পনেরোটা চালের পাটের বস্তা নিয়ে ঘরে ফেরে। কিন্তু কোনোভাবেই যেন কেউ দেখতে না পায়- সেভাবেই কাজ শুরু করে। পানুকে বাজারে পাঠানোর আগে এমনভাবে বাজারের লিস্ট করে যেন এই বাজার শেষ করতে দুই-তিন ঘণ্টা পার হয়ে যায়। সেখানে হেন কোনো জিনিস নেই লেখা হয়নি। দশ রকমের ডাল, তিল, তিশির তেল থেকে শুরু করে মৌচাকের মোম পর্যন্ত ছিল। আরো ছিল দেড়শো বছরের পুরোনো মধু। এসব জিনিস যে এলাকা থেকে কিনতে হবে সেটা পুরাতন চট্টগ্রাম। সেই চট্টগ্রামের একেবারে পুরাতন অঞ্চল খাতুনগঞ্জের পসারির দোকানগুলোর মাঝে সবচে বিখ্যাত "পিতাম্বর শাহ" থেকে সব কিনে ফেরার পর পানু ঘরে ফিরতেই টের পেল ঘরের গৃহস্থ দুজনের মুখে খুব হাসি।

পানু প্রথমে কিছুই বুঝল না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর যখন কোনোভাবেই প্রাণ ও মিনি কেউ ডাকছে না- তখন পানুর মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

পাগলের মতো হয়ে গেল পানু। এদিক যায়-ওদিক যায়। কী যেন একটা খুঁজছে ও। কী খুঁজছে? প্রাণ তাকিয়ে তাকিয়ে পানুকে দেখে। পানুর চোখে জল। সে কিছু একটা খুঁজছে। মুখ দিয়ে জন্তুর মতো একটা গোঙানির শব্দ বেরুচ্ছে। পানুর স্বর এমনিতেই একটু মেয়েলি। আর এই স্বরটা শুনলে যে কেউ ভয় পাবে। সে খানিক পরে চিৎকার করে কান্না শুরু করল। এঘর-ওঘর–পুরো বাড়ি দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে। শেষে কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে গেল পানু।

প্রাণের চোখে মুখে তখন আনন্দের হাসি। সে কাজটা শেষ করতে পেরেছে। বাজার থেকে পনেরোটা চালের বস্তা নিয়ে এসে প্রাণ ও মিলি দুজনে আলাদা আলাদা এমনিতেই হাঁটতে শুরু করল ঘরে। ঘরে তখন পানু নেই। দুজনে পুরো ঘর খুঁজে ফেলল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। তখনই হঠাৎ প্রাণ বুদ্ধি করে "পানু-উউউউউ" বলে ডাক দিল।

অমনি ওদের পাশের ঘর থেকে পানু বের হয়ে এলো। পানু নয়। কিন্তু সেও পানু। অন্য একজন পানু। আর এই পানুকেই খুঁজছিল দুজনে। পানু ওদের সামনে আসতেই দুজনে চ্যাংদোলা করে এই পানুকে বস্তায় ভরল। এরপর সেটা বেঁধে আরেকটা বস্তায় ভরল। এভাবে পনেরোটা বস্তায় পানুকে ভরে একটা বিশাল পোটলা বানালো দুজনে। এরপর সেই বস্তা সমেত পানুকে একটা গর্তে ফেলে দিল। গর্তটা প্রাণ নিজেই খুঁড়েছে। এই পানুকে গর্তে ফেলে দিতে মোটেই বাঁধল না ওর। ভয়াবহ

কাজটা করতে মোটেও মন খারাপ হলো না। মিনি আরো বাড়ে। সে এই পানুর কানের দুল আর হাতের সোনার ব্রেসলেট খুলে নিজের আঁচলে বেঁধে ফেলল। এরপর এই বাড়িতে যে পানু নামে দুজন লোক ছিল সেটা পানু আর প্রাণ দম্পতি ছাড়া সবার অগোচরেই মিটে গেল।

কিন্তু পানু গেল কই?

সে কি পাগল হয়ে গেছে?

এই বাকি পানু তবে কে ছিল? একজন তো নিশ্চিত মরেছে। মাটির তলায় বেশি হলে আধঘণ্টা দম থাকে। আর পনেরোটা বস্তা পেরিয়ে বাতাস ঢোকার কথাই না। তাই মাটির নিচের পানু অনেক আগেই ধরাধাম ত্যাগ করেছে। কিন্তু মাটির ওপরের পানু কই? কোথায় গেল ও?

দুর্ভাগ্য শুরু হলো সেদিন রাতে।

রাতটা সৌভাগ্য নাকি দূর্ভাগ্যক্রমে ছিল অমাবস্যা। আর সন্ধ্যার পর পর শুরু হল আসল ঘটনা। সন্ধ্যায় এক কাপ চা নিয়ে বসে ছিল প্রাণ। বেডরুমের পাশে বিশালাকারের টানা বারান্দা। আর সেই বারান্দায় বিকেলে বসে বসে এক কাপ চা খায় সে। আর সন্ধ্যার পর আরেক কাপ। তবে সন্ধ্যায় আজকে আর বাইরে বারান্দায় বসতে ইচ্ছে করল না। একটু একটু বাতাস হচ্ছে বাইরে। তাই বেডরুমেই চা নিয়ে এলো মিনি। মিনির সাথে খুনসুটি করছিল ও। তখন ধমাধম শব্দ। কেউ এসেছে নিচতলায়। দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে লাইটের সুইচ চাপল মিনি। কিন্তু কোনো লাইট তো জ্বলল না। ইলেক্ট্রিসিটি ফল করেছে কি? ভাবতে ভাবতে এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখে আশেপাশে সব বাড়িতে আলো জ্বলছে। ওদের বাড়িটা এলাকার সবচে নিচু বাড়ি। মাত্র দোতলা। আশেপাশে সবগুলো বাড়িই পনেরোতলার ওপর। একটু দূরের হোটেল রেডিসন তো ঝাড়া বিশতলা। সবখানে আলো আছে। শুধু বাইরের বাতি জ্বলছে না। টানা বারান্দা থেকে নিচের দিকটা দেখার চেষ্টা করল মিনি। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে দুজন মানুষ এসেছে। দুজনের কারো শরীরের অবয়ব বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দুজন মানুষকে বোঝা যায়। মিনি ঘরের ভেতর গিয়ে প্রাণকে ইশারা করে। প্রাণ বের হয়ে এসে লাইটের সুইচে হাত দেয়। অমনি একটা ধাক্কা খায় ও। সুইচের একটা তার বেরিয়ে ছিল। ওতে একটা শর্ট খেয়ে হাত দুয়েক দূরে গিয়ে পড়ল ও।

ঘটনাটা এমনভাবে ঘটল- যে প্রাণ নিজেই কী ঘটল বুঝতে পুরো তিন সেকেন্ড সময় নিল। এরপর উঠে আবার সুইচে হাত দিয়ে লাইট জ্বালালো। আর লাইট জ্বালাতেই নিচে দেখে কেউ নেই। মিনি বুঝতে পেরে যখন নিচে আলোয় তাকালো তখন নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ও তো ঠিক দুজনকে দেখেছিল। কিন্তু এখন কেউ নেই কেন? কারা ওরা?

দুজনেই ঘরের ভেতর ঢুকতেই আবার ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। বাইরে সাথে সাথে বের হলো প্রাণ। পেছন পেছন মিনি। ওরা বাইরে লাইট বন্ধ করেনি। আর তাতেই অবাক হয়ে গেল দুজনেই। বাইরে আসতেই ধাক্কা ও শব্দ দুটোই হাওয়া। কেউ নেই। কিস্যু নেই আশেপাশে। বারান্দা থেকে ছোটো রাস্তাটা দেখা যায়। খুব ছোটো একটা রাস্তা। একটা গাড়ি যাতায়াত করতে পারে। শুধু এই বাড়িটার জন্যেই বানানো। প্রাণের অফিসিয়াল গাড়িটা গ্যারেজে পার্ক করা আছে। প্রাণ নিজেই ড্রাইভ করে। এদিক-সেদিক নিজেই চালিয়ে যায়। তাই কোনো ড্রাইভার রাখা হয়নি। আর মানুষ বলতে ছিল পানু। সেও তো মাটির নিচে। নাকি ওপরে?

প্রাণ পানুর কথা ভেবে কপাল কুচকে তাকায়।

ঠিক তখনই– শত শত পাথরের টুকরো এসে আছড়ে পড়ে ওদের ওপর। একটা টুকরো মিনির কপালে পড়তেই ও অজ্ঞান হয়ে যায়। আর প্রাণ যদি বসে না পড়তো- তাহলে ওর মাথাও দু'টুকরো হয়ে যেত। ফেরোশাস এক একটা খুনে পাথরের টুকরো ছুটে আসছে ওদের দিকে। প্রাণ দ্রুত মিনিকে পাজাকোলা করে তুলে নেয়। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে কোনোরকমে দরজাটা বন্ধ করতে না করতে আরো খানবিশেক পাথরের টুকরো ছুটে আসে। মিনিকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। মিনির মাথায় বিচ্ছিরিভাবে কেটে গেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। প্রাণের হাতে লেগেছে। ব্যথা করছে জায়গাটা। কিন্তু মিনিকে মুখে চোখে পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে তুলে দ্রুত পিস্তল বের করল প্রাণ।

প্রাণের কাছে একটা পিস্তল থাকে সবসময়। জায়গা-জমি নিয়ে যাদের কারবার– তাদের আত্মরক্ষার জন্যে সবসময় পিস্তল রাখতে হয়। প্রাণেরও পিস্তল আছে। অবশ্যই আন্দরকিল্লা আর্মস শপ থেকে কেনা সুন্দর ঝকঝকে ওয়ালথার পিপি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানার প্রিয় অস্ত্রটা অনেকদিন ধরে কেনার কথা ভেবে রেখেছিল প্রাণ। আর বিয়ের কয়েকমাস আগে এক-দুটো ফোনের হুমকি পেয়ে এটা কিনে ফেলেছে। লাইসেন্স করা আছে এটার। লাইসেন্স নাম্বার সাত লক্ষ তেরো। এর মানে সাত লক্ষ বারোটা বন্দুক ওর আগে লোকজন লাইসেন্স করিয়েছে।

ওয়ালথারটার নল দরজার ফাঁক দিয়ে বের করে ধীরে ধীরে দরজা খুলল প্রাণ। পাথর বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘর থেকে বের হয়ে জায়গাটা দেখে নিল ও। আশেপাশে কেউ নেই। কোনো ছোকরার দল আক্রমণ করেছে ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে চোখ ছানাবড়া। কোনো পাথর পড়ে নেই বারান্দায়! একটা ও পাথর নেই! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না ও।

ঘরের ভেতর ঢুকে খিল এঁটে দিল প্রাণ।

খাটের ওপর মিনি বসে ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। প্রাণের হাতে পিস্তল দেখে আবারও অজ্ঞান হবার জোগাড়। সে জানতো না যে ওর স্বামীর কাছে পিস্তল আছে!

সেদিন আর কিছু ঘটেনি।

পরদিন একই সময় আবারও একই ঘটনা। কেউ বাসার বাইরে গেট ধাক্কাধাক্কি করে ঢিল ছুড়ে ক্লান্ত হয়ে চলে গেছে।

কিন্তু প্রাণ জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল। কেউ আসেনি। গেট এক বিন্দুও নড়েনি। কেউ ধাক্কায়নি। শুধু শব্দ শোনা গেছে। ব্যাপারটা নিশিমিয়াকে জানাতেই হবে- ভেবে পরদিন ভোরেই সে রওনা দেয় বামুনপুরা গ্রামে। এবার সে মাছ কিনে নিয়ে যায় নিশিমিয়ার কাছে। নিশিমিয়াকে সে আগের জায়গাতেই একইরকমভাবে বসা অবস্থায় পেয়ে যায়।

"নিশিমিয়া কেমন আছেন? শরীর ভালো?"

"আছি ভালা। তুমি? কেন আসছ?"

"আমার সমস্যা..."

নিশিমিয়াকে কিছুই লুকালো না ও। কথায় আছে ডাক্তার ও প্রেতসাধকের কাছে কিছু লুকাতে নেই। তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ সব বলে থামার পর তাকালো নিশিমিয়ার দিকে।

নিশিমিয়া ফোকলা দাঁতে ফিক করে হেসে বলল, "চলো তোমার বাসায় যাবো।"

গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত নিশিমিয়া প্রাণের সাথে একটা কথাও বলেনি। প্রায় তিন ঘণ্টা পর যখন দুজনে প্রাণের বাংলোর সামনে এলো- অমনি নিশিমিয়া মাটিতে বসে বিড়বিড় করে কী সব যেন পড়তে শুরু করল।

খানিক বাদেই সেই প্রাণের বাংলোর চৌহদ্দিতে ঢুকে পুরো জায়গাটা ভালো মতো দেখল। তারপর একটা কোদাল নিয়ে আসতে বলল।

নিশিমিয়ার কথা মতো প্রাণ সেই পানুর মতো দেখতে লোকটাকে যেখানে কবর দিয়েছিল ওখানে খুঁড়তে শুরু করল। হাত পাঁচেক খুঁড়তে খুঁড়তে ক্লান্ত প্রাণ নিশিমিয়ার দিকে তাকিয়ে হা হয়ে গেল। নিশি মিয়া হাসছে...

"তুমি ওরে পাবা না। তুমি জানোই না তুমি কারো এখানে পুতিছ।"

"কে?"

"ওর কি এক দাঁত সোনার বান্ধা আছিল?"

"হ্যাঁ। এক হাতে আংটিও ছিল। ওটা আমার বউয়ের কাছে। এক কানে দুলও ছিল। ওটাও..."

"সব ফালাও। সব মিছা। বড়ো ভুল করিছ বাজান। তোমাগো বাঁচানো দুষ্কর।"

"কী বলেন? আমি কী করলাম?"

"এ বড়ো দুষ্ট প্রেত।"

"প্রেত?"

"দুই ফুটি প্রেত। দুই ভাই। একজন পানু-আরেকজন মানু। তুমি মানুরে খুন করতি চাইছ? কিন্তু পারো নাই। এরা মরে না। মাটির তলে রাখা তো আরো অসম্ভব। এরা ইফ্রিতের চ্যালা।"

"ইফ্রিত?"

"চিনো নাই? চিনবাও না। তোমাগো ঘরে যে থাকত সে ইফ্রিতের চ্যালা। পানু-মানু। দুষ্ট প্রেত। এরা মানুষের মতো থাকে। যে ঘরে থাকে- সেই ঘরে আয় উন্নতি বাড়তে থাকে। তোমার বউ কি পোয়াতি?"

প্রাণ মিনির দিকে তাকায়। মিনির নিশ্চুপ মুখ দেখে বুঝে ফেলে সব। মিনি প্রাণকে জানায়নি। দুই মাস ধরে ওর রজঃস্রাব বন্ধ!

"তুমি এক কাম করো- তোমার বউ রে এখনি আমার তাবিজসহ বাড়িত পাডায়া দাও।"

"একা?"

"হ একা। নইলে তুমি থাকলি ওরে বাচান যাইব না। এই জ্বিন তিন জনারে ছাড়ে না। তুমি থাকলি তিন জন হইয়া যাইবো।"

"মানে? আমি আর আমার বউ মিলে তো দুইজন।"

"নাহ- তোমার বউর পেটের বাচ্চাসহ তিন। তিনেরে ইফ্রিত ছাড়ে না। তোমাগোরে ছাড়ত না। কোনোভাবে এই বাড়িতে ঢুকতি পারলি ছাড়ত না। মাইরা ফালাইত। আর সাথে আছে পানু মানু। তোমাগোর লাশও পাওয়া যাইত না ওরা ঢুকতে পারলে।"

"তাইলে তো ভয় নাই। ওরা ঢুকতে পারে নাই।"

"কেমনে বুঝলা যে আজকেও পারব না?"

ভ্যাবলা চোখে তাকায় প্রাণ। ইফ্রিত জ্বিনকে নিয়ে নিশিমিয়ার মুখে শুনে ভয়ে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। এরা সবচে খারাপ জ্বিন। যাকে একবার ধরে তার প্রাণ না বের হওয়া পর্যন্ত এরা ছাড়ে না। সবচে কঠিন সত্যটা হলো এই ইফ্রিতের কাছেই মিনি জিম্মি ছিল। মিনিকে তখন ছেড়ে দিলেও এখন সে আবারও মিনির সন্ধান পেয়ে গেছে। নিশিমিয়ার মুখে কথাগুলো শোনার আধঘণ্টার মধ্যে মিনিকে একটা বাসে তুলে দিল প্রাণ। সাথে বেশ কিছু টাকা পয়সাও দিল। একা

একা ওকে বাড়িতে পাঠাচ্ছে- এরকম আর কখনো হয়নি। মিনির পাশে বৃদ্ধা বসেছে। উনাকে বার বার মিনির খেয়াল রাখার কথা বলে প্রাণ বাজারে গেল। নিশিমিয়া একটা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছে। অনেক কিছু ছিল তাতে। বেশ কিছু লোহার কল। ময়দা- ভেড়ার দুধ থেকে শুরু করে ঈগলের নখ পর্যন্ত।

জিনিসগুলো বাসায় নিয়ে আসার পর দেখল নিশি মিয়া ওর ঘরের ভেতর বসে আছে। আর ঘরের চার কোণায় চারটা মাথার খুলি। এই খুলিগুলো যে নিশিমিয়াই রেখেছে সেটা আর জিজ্ঞেস করল না ও।

ঘরের মেঝেতে একটা বৃত্ত এঁকেছে আটা দিয়ে। এরপর অনেকগুলো চিহ্ন দিয়ে ওতে অনেক কিছু বসিয়েছে। নিয়ে আসা ভেড়ার দুধ মুখে নিয়ে পুরো ঘরে ছিটিয়েছে। নিশিমিয়ার কাজ দেখে অবাক প্রাণ। এ কী করছে এই লোক? আজকালের এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ এসব ঝাড়ফুঁক করে!

কিন্তু নিশি মিয়া করছে। কী সব মন্ত্র বলতে বলতে লোহার কয়েকটা টুকরা একত্র করে একটা কল বানিয়ে ফেলতে নিশিমিয়ার সময় লাগল এক ঘণ্টা। কলটা বারান্দায় বসিয়ে দিয়ে পুরো ঘরের চারপাশে আটা দিয়ে দাগ কেটে দিল নিশিমিয়া। ঘরের পর পুরো বাড়ি দাগ দিয়ে বেঁধে দিল। কিন্তু বাড়ির সামনে একটা জায়গা খালি রেখে ধীরে ধীরে গেট দিয়ে বের হয়ে চলে গেল। নিশিমিয়াকে চলে যেতে দেখল প্রাণ। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সারাটাদিন বেশ ধকল গেছে। এবার প্রাণ ঘুমাবে। নিশিমিয়া শর্ত দিয়েছে- সন্ধ্যার পর কোনোভাবেই এই ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। কোনোভাবেই না। এমনকি নিশিমিয়া এসে ডাকলেও না। তাই তো প্রাণ বসে আছে।

বাইরে আবারও হুটোপুটির শব্দ।

এটা কি কুকুর?

একটা বেড়াল এত বড়ো হতে তো পারে না। কেমন যেন গাঁইগুঁই শব্দ করছে এখন। ঘেউ ঘেউ ডেকে উঠল এরপরেই। আহ না জানি কাদের কুকুর! নিশিমিয়ার কলে আটকে এখন বেচারার প্রাণ যায় যায় হয়তো!

কিন্তু নিশি মিয়া তো বের হতে নিষেধ করেছে।

কিন্তু...

প্রাণ উঠে দাঁড়ায়।

ঘরের ভেতর থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে।

ঠিক তখন ছাদের ওপর কারা যেন দৌড়াতে শুরু করল। হুটোপুটির এক পর্যায়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো। বিশালাকারের কোনো একটা বাঘ জাতীয় কিছু যদি কোনো মানুষকে কামড়ে ধরে কিন্তু কিছু করতে পারে না আর মানুষটিও ছুটতে পারে না– তখন যেরকম হুটোপুটি হয় সেরকম শুরু হয়েছে। ধপাধপ সেই শব্দের সাথে যোগ হয়েছে বারান্দার চিৎকার।

“প্রাণ-আমারে বাঁচাও প্রাণ...”

কণ্ঠটা নিশি মিয়ার। প্রাণ স্পষ্ট নিশি মিয়ার কণ্ঠ শুনতে পায়। কিন্তু শব্দটা ঘরের দরজার বাইরে থেকে আসছে।

“নিশিমিয়া আপনি? আপনি না চলে গেছিলেন?”

প্রাণ দরজার বাইরে কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করে দরজার কাছাকাছি গিয়ে। নিশিমিয়াই বলে দিয়েছিল- এই সাদা দাগের বাইরে শরীরের কোনো অংশই দেওয়া যাবে না। একটু বের হলেই বিপদ। কিন্তু নিশিমিয়া নিজেই তো এসেছে। বারান্দা দিয়ে নয়- দরজা দিয়ে এসেছে।

"প্রাণ আমার একটা জিনিস ঘরে ফালায়া গেছি। ওটা নিতে হইব।"

"কীহ? ঘরে কিছু নাই নিশিমিয়া। আপনি চইলা যান।"

"কী কও! আমার জিনিস আমারে দিয়া দাও প্রাণ। নইলে এই জ্বিন আমারে মাইরা ফালাইব।"

প্রাণ নিশিমিয়ার কণ্ঠ শুনেই দ্বন্দ্বে পড়ে। নিশিমিয়া কী ফেলে গেছে?

ঘরের ভেতর তাকায় প্রাণ। কিন্তু তেমন কিছু নাই। ঘরে একটা খাট, একটা আলমিরা ছাড়া আর কিছু নাই।

"আমি জানি আপনি নিশি মিয়া না। নিশি মিয়া আমারে বলছে যেন আমি দরজা না খুলি। খুললেই বিপদ।"

"তোমারে আমিই বলছিঃ। এখন দরজা খোল। আমার বিপদ প্রাণ!"

"কোনোভাবেই না।"

এদিকে দরজার গায়ে ধাক্কা বাড়তে থাকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা প্রায় খুলে যেতে শুরু করেছে। প্রাণ কী করবে এখন? নিশিমিয়ার কথা কি তবে মিথ্যা? নিশিমিয়া তো বলেছিল এই ইঙ্গিত যদি এইবার ব্যর্থ হয় তাহলে জীবনে আর আসবে না। কিন্তু...

প্রাণ বিছানায় বসে পড়ে।

মাথার ওপর ধুমাধুম কারা যেন লাফাচ্ছে।

বারান্দায় দরজা ধাক্কা দিচ্ছে কেউ, হুটোপুটি, চিৎকার বেড়েছে।

দরজা ধাক্কা দিয়ে বিচ্ছিরি গালাগাল চলছে নিশিমিয়ার কণ্ঠে...

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল প্রাণ। কান বেয়ে রক্ত বের হতে শুরু করেছে ওর। আর সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মাথাটাই ছিঁড়ে যাবে। শব্দগুলো সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এইবার মরেই গেল প্রাণ! ঘরের ভেতর একটা ছোটোখাটো ঝড় বয়ে চলেছে। বিশালাকারের কালো ঘুর্ণি তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে প্রাণ এই ঘুর্ণির ভেতর ডুবে যাবে। শব্দের যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করল ও।

এরপর আর কিছু মনে নেই প্রাণের। সে জ্ঞান হারায়। পরদিন অনেক বেলা করে যখন প্রাণের জ্ঞান ফেরে তখন নিজেকে বিছানায় খুঁজে পায় প্রাণ। ওর দরজা হাট করে খোলা ছিল।

কিন্তু আটার দাগের কোনো ক্ষতি হয়নি। ওর শরীর অক্ষত আছে। প্রচণ্ড শক্তিতে কেউ দরজাটা ভেঙে ফেলেছে। ওর পুরো বাড়ি তছনছ হয়ে গেছে এক রাতেই। প্রচণ্ড শক্তিশালী কেউ করেছে সবকিছু। কিন্তু সেই শক্তি যে আর আসবে না সেটা টের পেল বারান্দায় গিয়ে। নিশি মিয়ার বানানো কলে একটা কাক মরে পড়ে আছে। কালো কুচকুচে সেই কাকের কোনো চোখ নেই। চোখের জায়গায় অদ্ভুত দুটো গর্ত। সেই গর্তগুলোর দিকে তাকালেই শরীর গুলিয়ে ওঠে প্রাণের... ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয়। মনে হয় ডুবে যাবে ও। একবার ডুবলেই আর কখনো প্রাণ নামের কারো অস্তিত্ব থাকবে না। কেউ খুঁজেও পাবে না...

এ জার্নি বাই প্রাইভেটকার

শাহীন মহিউদ্দীন

বড়োমামাকে কিছুদিন আগে মলম পার্টির লোকজন কী যেন খাইয়ে সবকিছু ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। যদিও এটা হলো পুরাতন ঘটনা। তবে আমার নতুন ঘটনার সাথে এটা জড়িত। কেননা আমার ঘটনার সাথে এটার সাদৃশ্য আছে অনেক। তো নতুন ঘটনা হলো, শায়েস্তাগঞ্জ থেকে সিলেট আসার জন্য গোলচত্বর থেকে সামনে এগিয়ে ব্রিজের সামনে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্যে হানিফ, আল-মোবারাকা কিংবা বিআরটিসির বাসে করে সিলেট আসা। হবিগঞ্জ টু সিলেট বাস সার্ভিসের যে অবস্থা তাতে করে ব্রিজের সামনে থেকে উঠা ছাড়া আর কোনো অপশন নেই।

তো বাসের অপেক্ষায় যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন একজন লোক এলো। এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, “সিলেট যাবেন?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

সে বললো, “আমিও যাবো। কোন বাসে যাবেন?”

আমি বললাম, “দেখি কোনটা আগে আসে।”

এরপর যে যার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। এর কিছুক্ষণ পর আরো দুইটা ছেলে এলো। ছেলে দুইজন আসার পর একটা প্রাইভেটকার এলো। একটা ছেলে ইশারা দিয়ে কারটি দাঁড় করিয়েছে। ছেলে দুইজন পরিচিত। পরিচিত বলতে মুখ পরিচিত। তারা প্রতিদিন এখানেই এভাবেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্যাসেঞ্জার দিয়ে ড্রাইভার থেকে পঞ্চাশ-একশো টাকা করে নেয়। ছেলে দুইটা আমাদের উদ্দেশ্যে বললো, “এটায় করে চলে যান।”

জিজ্ঞেস করলাম, “ভাড়া কতো?”

তারা বললো, “হানিফের ভাড়াই দিয়েন। মানে ভাড়া দেড়শ টাকা।”

আমি আর ঐ ভদ্রলোকটি উঠে গেলাম। ভদ্রলোক সামনে আর আমি পেছনে বসলাম।

কারে উঠেই কয়েকটা সেলফি নিলাম। মনে মনে জিতছি একটা ভাব ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নানারকম চিন্তা উদয় হতে থাকলো। আরে এত কম টাকায় কারে করে নিয়ে যাচ্ছে। কাহিনি কী? মামার মতো আমারে কিডন্যাপ করে ফেলবে না তো? মামা বলছিলেন কিডন্যাপের সময় কিডন্যাপার ল্যাপটপ নিয়ে উনার পাশে বসছিল। উনাদের কারো কাছেই ল্যাপটপ নেই। যাক বাঁচা গেল। আসলেই জিতছি আমি।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকের একটা ফোনকল এলো। উনি ফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে উনার ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করলেন। এবার আমার অবস্থা প্রায় শেষ। যা ভাবছিলাম তাই। ভদ্রলোকটি ল্যাপটপে কিছুক্ষণ গুতাগুতি করার পর আমার মনে হলো সমস্যা নাই। ল্যাপটপ থাকলেই তো আর কিডন্যাপার হতে পারে

তা তো না। গাড়ি তো আর থামাচ্ছে না। মেইন রোডেই আছে। আমি মাস্ক বের করে মুখে লাগিয়ে নিলাম। মাস্ক লাগানোর কারণ যাতে তারা কোনো স্মেল দিয়ে আমায় অজ্ঞান করতে না পারে।

মাস্ক লাগানো শেষ করতে না করতেই গাড়িটি বামে ঢুকে গেল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হইছে, মামা?"

ড্রাইভার বললো, "ফুয়েল শেষ। ফুয়েল নিতে হবে তাই।"

ভাবলাম, সামনের ভদ্রলোক তো আর বের হচ্ছে না; সমস্যা নেই। ওমা! ঠিক এই টাইমেই উনার একটা কল এলো। উনি বের হয়ে গেলেন। ড্রাইভারও বাইরে, ভদ্রলোকটাও। আমি একা কারের ভেতরে। এবার ড্যাম শিওর আমি যে কিডন্যাপ হইছি।

কিছুক্ষণ পর দুজনেই এলো। মনে মনে ভাবলাম আর যাই হোক তারা কিছু দিতে চাইলে ভুলেও খাবো না। আর তারা কিছু খাইতে এখন অবধি বলেনি সো কিডন্যাপের প্রশ্নই আসে না। গাড়ি আবারও ছাড়লো। মেইন রোড ধরে গাড়ি এগিয়ে চলছে...

কিছুদূর যাওয়ার পর আবারও গাড়ি থামালো। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, "আবার কী হইছে মামা?"

ড্রাইভার বললো, "সামনের ভদ্রলোকের নাকি বমি বমি ভাব হচ্ছে, তাই পান খাবে।"

মনে মনে বললাম, "একজন মানুষের সমস্যা হতেই পারে স্বাভাবিক।"

ভদ্রলোক পান খেয়ে এসে আমাকে একটা পান দিলো।

এবার তো আমি শেষ। বললাম, "আংকেল আমি তো পান খাই না।"

উনি বললেন, "সিগারেট চলে?"

আমি সেটাও মানা করলাম। পরে দুই প্যাকেট আচার আর কয়েকটা সেন্টারফ্রুট হাতে ধরিয়ে দিলো। এবার আর না করতে পারিনি। নিয়ে নিলাম। তবে খাবো না বলে মনস্থির করে রেখেছি। তাই ব্যাগের পকেটে রেখে দিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, "এইগুলো তো চলে তাই না?"

আমি বলছি, "হ্যাঁ, সমস্যা নাই।"

এই ফাঁকে আমার মাথায় বুদ্ধি চাপলো ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার। তাই একটা স্ট্যাটাস দিলাম। যদি কিডন্যাপ হই তাহলে এটা কাজে দিবে। সঙ্গে গাড়ির নাম্বারও দিয়ে দিলাম।

আবারও গাড়ি চলছে...

প্রায় সিলেটের কাছাকাছি চলে আসছি। হুমায়ূন চত্বর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। হুমায়ূন চত্বরের দিকে গাড়ি ঢুকতেই দেখি কীসের স্ট্রাইক চলতেছে। আমি নেমে যেতে চাইছিলাম। ড্রাইভার নামতে না দিয়ে অন্য একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। অনেকগুলো গলির চিপাচাপা দিয়ে যেতে যেতে কোথায় নিয়ে এলো বলা মুশকিল। ভয়ে মনে মনে যতো দোয়া দুরুদ আছে পড়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি হুমায়ূন চত্বর দেখা যাচ্ছে। হুমায়ূন চত্বর দেখা মাত্রই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নেমে ভাড়া মিটিয়ে চলে এলাম।

ফোনের চার্জ খতম। বন্ধ হয়ে গেছে। বাসায় এসে চার্জে বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন দুপুর দুইটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠলাম। উঠেই ফোন অন করে দেখি মিসডকল এলার্টে প্রায় শ'খানেক মিসডকল। ডাটা অন করতেই দেখি মেসেঞ্জারে শ'খানেক মেসেজ। কাহিনি কি?

পরে বুঝতে পারলাম আমার ফেসবুকের স্ট্যাটাসের জের ধরে সারা গ্রাম শুদ্ধ সবাই জেনে গেছে আমি কিডন্যাপ হয়ে গেছি। সকলের বিশ্বাসেরও কথা। দু'দিন আগে মামাকে আর তার দু'দিন পর

আমাকে। এটা পুরোপুরিই টার্গেট করেছে আমাদের পরিবারকে। সবাইকে আশ্বাস দিলাম আমার কিছুই হয়নি। আমার এক কাজিন তো ফোনের ওপর ফোনই দিচ্ছিল। ফোন ধরে যখন বললাম আমার কিছুই হয়নি। তখন সে আরো দুইবার ফোন দিয়ে শিওর হলো আসলেই আমি ঠিক আছি কিনা। আমি তাকে শিওর করলাম যে, আসলেই আমি ঠিক আছি। এরপর আর কী! পরিস্থিতি আবারো ঠান্ডা। সবাই বুঝলো যে এটা জাস্ট একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

কিছুদিন পর আবারো সেই ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি। কাকতালীয়ভাবে সেই কারটি আবারও এসে হাজির। আমাকে দেখেই ড্রাইভার বলে ফেললো, "না, মামা, আপনারে নেওয়া যাবে না। দরকার হইলে আমি খালিই চলে যাবো।"

বলেই সে চলে গেল। ঘটনা কী? আমি তো তারে সেদিন কিছুই বুঝতে দেইনি। তাহলে হইছেটা কী? তখন ইমিডিয়েটলি আমার কাজিন রে ফোন দিলাম, কেননা সে-ই সেদিন বেশি উৎকণ্ঠায় ছিল। তাই ওরে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, সেদিন তুই কী করছিলি?"

সে বললো, "তোর ফেসবুকের সেই পোস্টে গাড়ির নাম্বারসহ থাকায় আমি তারে খুঁজে বের করে পুলিশে দিতে চাইছিলাম। হয়তো দিয়েও দিতাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তোর ফোন খোলা পেয়ে যাই বিধায় তারে আর কিছু করিনি ছেড়ে দেই। তবে তোরে ফোনে পাওয়ার আগ অবধি খুব করে দিছি কয়েকটা। পরে যখন জানলাম তুই সেফ তাই কিছু না বলে ছেড়ে দিছি।"

বেচারা ড্রাইভারের কথা ভেবে অনেকটা আফসোস করলাম। ধুর, আমার জন্যেই নিরপরাধ লোকটাকে হেনস্তা হইতে হইছে। হীনমন্যতায় ভুগছিলাম। আমার বোকামির জন্যে লোকটাকে হেনস্থা। ধ্যাৎ!

দিনদিন যখন হীনমন্যতা বেড়েই চলছিল, তখন গাড়ির নাম্বার আর সেই কাজিনের সহায়তায় তারে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে আর এই গাড়ি চালায় না। মালিকের কাছে তার যে নাম্বার ছিল সেটা নাকি বন্ধ এখন। তাই আর কী করার মন খারাপ করে চলে এলাম। এটা নিয়ে কয়েকদিন ঠিকঠাক ঘুমাতেও পারিনি।

প্রায় মাসখানেক পর,

আমার সেই কাজিনের ফোনে ঘুম ভাঙলো। ফোন ধরতেই বললো, "দুইটা গুডনিউজ আর একটা ব্যাড নিউজ আছে তোর জন্যে। এখন আগে কোনো নিউজটা শুনবি তুই-ই বল।"

আমি বললাম, "গুড নিউজ দুইটা বল আগে।" সে বললো, "প্রথম গুড নিউজটা হলো, তোর সেই ড্রাইভারের খোঁজ পেয়েছি। আর দ্বিতীয় গুডনিউজ হলো, মামাকে যারা কিডন্যাপ করেছে তাদের দুইজনকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এবং মামা কনফার্ম করেছেন ওরাই কিডন্যাপার।"

ওর কথা শুনে অনেক খুশি হলাম। খুশিতে লাফিয়ে উঠার মতো অবস্থা আমার। এবার ব্যাড নিউজটা শোনার পালা। যেই দুইটা গুডনিউজ পাইছি এখন এমন ব্যাড নিউজটা যাই হোক আমার তাতে কিছু যায় আসবে না। তবুও শোনা উচিত। তাই ওরে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাড নিউজটা কীরে?"

তখন সে বললো, "ব্যাড নিউজটা হচ্ছে মামার কিডন্যাপার দুইজনের একজন তোর সেই ড্রাইভারটা!"

মনে করো
জাকিয়া ফেরদৌস

মনে করো, এক চাঁদনী রাত।
এই আজকের মতো, রুপোলী আলোয় মায়াময় রাত।
ঠান্ডা বাতাসের এলোমেলো পরশ,
মনে করে নাও, তুমি আমি দুজনায়
পাশাপাশি বসে।
খোলা ছাদে, মাদুর বিছিয়ে, কাধে মাথা রেখে;
নয়তো কোনো পাহাড়ী মাঠে সবুজের চাদরে
পাশাপাশি শুয়ে, হাতে হাত রেখে,
দেখছি জ্যোৎস্না রাতি।
ভেবে নাও, তুমি আর আমি,
চাঁদের নীলচে আলোয় ভেসে যাওয়া নদীর পাড়ে,
বসে আছি একসাথে,
তোমার পরনে সেই পাঞ্জাবিটা, আমি শাড়িতে।
চোখে টানা কাজলে, তোমার চোখের আবেশ মাখিয়ে
চেয়ে রয়েছি অনন্তকাল।
মনে করো, এমনি এক রাতে,
ছোট্ট কোনো সংসারে, সারাদিনের ক্লান্তিতে,
ঝুল বারান্দাটায়, বেতের চেয়ারে বসে,
চায়ের কাপে হারিয়ে গেছি, আমরা দুজন।
মনে করে নাও, সেদিন তুমি শুধুই আমার,
আমি আজকের মতোই তোমার আছি।
কেউ নেই আমাদের মাঝে,
না ভাগ্য, না সময়, না মহাকাল...
পাশাপাশি বসে, অনুভবে শুধু,
আমরা দুটি প্রাণী-
কতকালের বাসনায়, স্বপ্নমুখর চোখে,
ভালোবাসায়...
মনে করো,
এমনি এক রাতে,
চাঁদের সাথে... আমরা দু'জন...

বাবা

শ্রাবণ সাহা

আমার ছেলের নাম সুবর্ণ। নামটা অবশ্য আমি নিজেই রেখেছি। বয়স সবেমাত্র এক। দেখতেও বেশ চমৎকার। হামাগুড়ি থেকে দাঁড়ানোটাও এখন বেশ শিখে গেছে। কিন্তু আমি একটা ভীষণ দুঃখবোধে ভুগি। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মুখটা কেমন কালো করে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়।

কোলে নিতে চাইলে কান্নায় চারদিক মাথায় তোলে। অথচ আমি ছাড়া অন্য সবার কোলেই দিব্যি হাসি মুখে ঘুরে বেড়ায়। শুরুতে ভাবতাম, বাচ্চা মানুষ; তাই কোনো কারণে হয়তো আমাকে ভয় পায়। কিন্তু এই ব্যাপারটা গত ছয়মাস ধরে ঘটে চলেছে।

প্রতি রাতে বাসায় ফেরার সময় আমি ওর জন্য অনেক চকলেট নিয়ে আসি। চকলেটগুলো হাতে দিলে সেগুলোও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখন ওর দিকে তাকালে বেশ রাগান্বিত মনে হয়। অথচ আমি ওকে কী ভীষণ রকম-ই না ভালোবাসি!

মা, মামা, কাকা কিংবা এর থেকে কঠিন শব্দগুলোও এখন ও বলতে পারে। কিন্তু বাবা ডাকটা শিখাতে গেলেই কান্নায় আমার স্ত্রীর মুখ খামচে দেয়।

এ নিয়ে আমার স্ত্রীও যেন বেশ বিব্রত। যেমনটা সেদিন আমার প্লেটে ভাত দিতে দিতে বলছিল, “দেখো এ মাসেই ও বাবা ডাকটাও শিখে যাবে।”

আমি ভাতে সামান্য লবণ নিতে নিতে অবশ্য মাথা নেড়ে স্ত্রীর সাথে সহমত জানাই।

আজকাল বিভিন্ন জার্নাল কিংবা ইন্টারনেট ঘেঁটে বেড়াই। “পিতা ফোবিয়া” বলে কিছু আছে কিনা খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু এরকম কখনই কিছু পাই না।

আমি এক পরিচিত ডাক্তার এর সাথে এগুলো নিয়ে কথা বলি। উনি আমাকে স্ত্রী এবং ছেলেকে সাথে করে নিয়ে আসতে বলেন।

পরদিন তাদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হব। ঠিক তখনি আমার ফোন বেজে ওঠে। ফোনটা রিসিভ করলে ওপাশ থেকে জানানো হয়, কয়েক ঘণ্টা আগে আমার বৃদ্ধ পিতা মারা গেছেন। ফোনটা রেখে বিরক্তিকর কণ্ঠে বলে উঠি, “উফফ! মারা যাবারও উনি সময় পেলেন না।”

তারপর আমি প্রিয় ছেলেকে বাসায় রেখে আমার পিতার লাশ বৃদ্ধাশ্রম থেকে আনতে বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

উধাও

মোহাইমিনুল ইসলাম বাপ্পী

"কী মকবুল, এটাই কি সেই গ্রাম?"

"জ্বি, স্যার, তাই তো মনে হচ্ছে।"

"তাই তো মনে হচ্ছে মানে! তিন বছর ধরে তোমার পোস্টিং এখানে, এখনও জানো না?"

"বোঝেনই তো, স্যার, আদিবাসী এলাকা! তার ওপর আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে থাকে সারা বছর। বাঙালি-আদিবাসী ঝামেলা, আদিবাসী-আদিবাসী ঝামেলা, পাহাড়ি শান্তিবাহিনীর আতঙ্ক... এত কিছু সামলে নিয়ে এই গভীর এলাকায় আসা পুলিশের পক্ষে পোষায় না সব সময়। তাল থেকে তিল হলে কমিউনাল দাঙ্গা হয়ে যাবে। সেন্সিটিভ বিষয়, বোঝেন-ই তো। মিলিটারি, বিডিআর আছে। ওরাই এই এলাকার ঝামেলাগুলো সামলায়। আমরা অফিশিয়াল দিকগুলো দেখি। পুলিশকে খুব একটা পাত্তা দেয় না আদিবাসীরা। পুলিশ তো পুলিশ, বাঙালিদেরই বহিরাগত মনে করে!"

"তো এখন মিলিটারিদের ডাকো না! নিজে এসেছ কেন? কেস ফাইল তো আমাদের লিখতে হয়, তাই না! এমন গা ছাড়াভাবে থাকলে হবে? নাকি এভাবেই চলে এখানকার দিনকাল?"

মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে রুদ্র তালুকদারের। খাগড়াছড়ির এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার বদলি এমনি এমনি হয়নি। এক রাজনৈতিক ব্যক্তির কাজের সমালোচনা করেছিল সে একটা ভরা সভায়। এরপর কিছু বোঝার আগেই নিজেকে আবিষ্কার করলো এই দুর্গম এলাকায়। অল্প সময়ে পুলিশের চাকুরিতে দ্রুত উন্নতি করেছিল বলে নিজের চারিদিকে একটা কাল্পনিক নিরাপত্তার বলয় কল্পনা করে নিয়েছিল। সেদিন সে বুঝতে পারলো, পাগলের সুখ মনে মনে। বৃথাই এতদিন ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল সে।

এই এলাকায় আসার পর দিনগুলো খুব একঘেয়ে কাটছিল ওর। থানায় কেস তেমন একটা আসেই না। পাহাড়িরা পা মাড়ায় না এদিকে বাধ্য না হলে। ইন্টারনেটেরও দুরবস্থা। টেনে টুনে টু-জি পাওয়া যায়। মোবাইল নেটওয়ার্ক যে আছে, তাই বুঝি ঢের!

এমন নিরানন্দ দিনে হঠাৎ করে গতকাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। সকালে থানায় এসে সে দেখে, গ্রামবাসী ভিড় করেছে থানার সামনে। এইটুকু জায়গায় প্রায় ৪০-৫০জন মানুষ জড়ো হয়েছে। এত মানুষ সকাল সকাল কী করছে থানায়, বুঝতে পারলো না সে। তবে তাদের মুখ থেকে যে গল্পটা ও শুনলো, তাতে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়লো তার। এমন বিদঘুটে ঘটনা আগে কখনো সে শোনেনি।

গ্রামবাসী যা বলেছিল, তার সারমর্ম অনেকটা এমন–

গতকাল একটা উৎসব ছিল এখানে। আদিবাসীদের নিজেদের কিছু সাংস্কৃতিক উৎসব থাকে। এটিও তেমন এক উৎসব ছিল। পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত আদিবাসীদের গ্রামটি। দু'দিকে দু'টো

বড়ো বড়ো পাহাড়। পাহাড় না পেরিয়ে ওখানে যাবার কোনো উপায় নেই। গতরাতে উন্মুক্ত উপত্যকায় সবাই মিলে আনন্দ করছিল, উৎসব পালন করছিল। আগুন জ্বালিয়ে ছাগলের মাংস ঝলসে নিচ্ছিল খাওয়ার জন্যে। আগুনের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আদিবাসীরা। পাহাড়ি মেয়েরা নাচ-গান করছিল শরীর দুলিয়ে। আর ছেলেরা মদ গিলছিল। নিজেদের তৈরি মদ। এসব প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসীরা বিভিন্ন উৎসবে নিজেদের বানানো মদ খায়। উৎসব উদযাপনের একটি অলিখিত অংশ এটি। তাদের আশেপাশে ঘুরছিল অন্যান্যরা। বয়স্করা বেশিরভাগই ঘরে ছিল। একটু রাত হয়ে এসেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের অনেকেই।

হঠাৎ প্রচণ্ড আহাজারি, চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পায় সবাই। ভূমিকম্পের মতো প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে সব কিছু। অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়, খাট থেকে নিচে আবিষ্কার করে নিজেদের। প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠেছিল যেন পাহাড়টা। সবাই আতঙ্কিত হয়ে বাইরে ছুটে আসে। কিন্তু এসে দেখে, কেউ নেই উৎসবমুখর জায়গাটাতে। বাইরে একদম শূন্য একটা উপত্যকা। জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। আগুনটা জ্বলছে শুধু। আগুনের ওপর ঝলসাতে থাকা ছাগলের মাংসগুলোও গায়েব।

এমন তো হবার কোনো কারণ নেই! তারা আশেপাশের পাহাড়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলো রাতেই। কিন্তু না, হারিয়ে যাওয়া কারোই দেখা পেল না তারা। সকাল হতে আরও আবিষ্কার করলো, শুধু যে এতগুলো মানুষ দুম করে উধাও হয়ে গেছে তাই নয়, এমনকি গরু-ছাগল, হাস-মুরগী পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেছে! বাসার বাইরে রাখা কাপড়-চোপড়, ছোটোখাটো জিনিসপত্রসহ গায়েব। ডাকাত পড়েছিল কী? মনে হয় না। হঠাৎ ভূমিকম্প অনুভূত হবারও বা কারণ কী? গতরাতে ভূমিকম্প হলে এতক্ষণে তো জানাজানি হতো। কোনো ভূমিকম্প হয়নি। হলেও বা এত মানুষ গায়েব হবে কেন! তাহলে আসলে হয়েছিল কী ওখানে? এতগুলো মানুষ তো আর এমনি এমনি উধাও হয়ে যেতে পারে না!

সেই রহস্যের সমাধান করার জন্যেই সকাল সকাল সেই গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে ইন্সপেক্টর রুদ্র তালুকদার। সঙ্গে এসেছে এস আই মকবুল। অনেক উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছেছে তারা এখানে।

চারিদিকে তাকালো রুদ্র। সব কিছু কত সহজ-স্বাভাবিক! পরিপাটি, সবুজ, পাহাড়ি একটা গ্রাম। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। ছবির মতো এই সুন্দর গ্রামে এতগুলো মানুষ চট করে উধাও হয়ে গেছে, বিশ্বাস হতে চায় না।

“মকবুল, এখানে তো তেমন কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি না। সব কিছু স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।”

মকবুল মাথা দোলালো। “জি স্যার, আমারও তাই মনে হচ্ছে। সবাই যদি আসলেই নিখোঁজ হয়ে থাকে, তাহলে তারা বোধহয় স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়েছে। মারামারি, হাতাহাতি, জোরাজুরির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।”

রুদ্র একমত হলো।

“আচ্ছা, দূরের ওই বাড়িটা কার? এই ছোটো গ্রামে এত বড়ো বাড়ি?”

পাহাড়ের পাদদেশে বেশ বড়ো আকৃতির একটা বাড়ি দেখা গেল। ধবধবে সাদা দেয়াল বাড়িটির। দেখে মনে হয় কোনো ধনকুবের থাকে।

মকবুল মাথা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর দিলো, “ওহ, ওটা হলো এক পাগলা বিজ্ঞানীর। নাম অ্যালেক্স ক্লাইভ।”

“কোনো দেশী?”

“বোঝা মুশকিল। ভারতীয় চেহারা। বাঙালি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তবে আবার মেক্সিকানও হতে পারে। নাগরিকত্ব ইউরোপের কোনো এক দেশের, ঠিক মনে নেই। ক্রিশ্চান মিশনারিরা এই এলাকার কিছু জায়গা কিনেছিল পাহাড়ে। তাদের কাছ থেকেই জমিটা নিয়ে বাড়ি বানিয়েছে সে। এলাকায় আছে প্রায় ১০ বছর হলো। বাড়ি থেকে কখনো বের হয় না। কাছেই একটা চার্চ আছে। সেখান থেকে একটা ছেলে এসে মাঝে মাঝে বাজার করে দিয়ে যায়। গ্রামের কেউ তাকে কখনো দেখেনি। তবে কোনো অজ্ঞাত কারণে তাকে ভয় পায় এলাকাবাসীরা। ঘাঁটায় না।”

“চলো ঘুরে আসা যাক অ্যালেক্স সাহেবের বাড়ি থেকে!”

“স্যার, ক্রিশ্চান মিশনারিরা লোকটাকে পছন্দ করে। তদন্ত করতে গিয়ে আবার না কোনো কমিউনাল দাঙ্গা...”

“আরে এত ভয় পেলে চলে! চলো সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আসি! চা-টা খেয়ে ফিরে আসব।”

বাড়িটার দিকে পা বাড়ালো রুদ্র। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিছু নিলো মকবুল। পাহাড় কেটে সুন্দর সিঁড়ি বানানো হয়েছে এখানে। বাড়িতে যাবার জন্যই বোধহয়।

বাড়ির আঙিনায় ঢুকে কতগুলো বড়ো বড়ো লোহার পাত দেখতে পেল রুদ্র। সারি সারি করে সাজিয়ে রাখা। গায়ে আবার এক রকম বৈদ্যুতিক তার পেঁচানো।

“এগুলো কী জিনিস?”

মকবুল মাথা দোলালো। উত্তর দিলো, “আমি জানি না, স্যার।”

পাতগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রুদ্র। ছুঁয়ে দেখলো। উঁহু, লোহা বা ইস্পাত নয়। এটা সম্ভবত লেড। এতগুলো লেডের পাত এভাবে মাটিতে গেঁড়ে রাখা হয়েছে কেন? পাগল বিজ্ঞানীর কোনো অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট?

“মে আই হেল্প ইউ?”

বাঁজখাই গলায় বলে উঠলো কেউ একজন। উচ্চারণে কড়া ব্রিটিশ টান। মকবুল চট করে পেছনে ফিরলো। রুদ্র ধীরে সুস্থে তাকালো। দীর্ঘদেহী লোকটাকে দেখতে পেল পেছনে ফিরে। পরনে কালো প্যান্ট আর বাদামী শার্ট। হাতে দামী একটা ঘড়ি। চোখগুলো ধূর্ত।

রুদ্র ইংরেজিতে তাকে জিজ্ঞেস বললো, “আমি ইন্সপেক্টর রুদ্র তালুকদার। আর ও সাব ইন্সপেক্টর মকবুল। আপনি নিশ্চয়ই অ্যালেক্স ক্লাইভ? আপনি কি বাংলা জানেন?”

দীর্ঘদেহী লোকটার মুখে হাসি ফুটলো। ঝরঝরে বাংলায় বলে উঠলো, “জি। বাংলাটা বেশ ভালো জানি। আমি পশ্চিম বঙ্গে কাটিয়েছিলাম কয়েক বছর। আর হ্যাঁ, আমিই অ্যালেক্স ক্লাইভ। ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।”

অ্যালেক্সের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরলো রুদ্র। মকবুলের সাথেও হাত মেলালো সে। এরপর জিজ্ঞেস করলো, “হঠাৎ আগমন আপনাদের? কোনো সমস্যা?”

রুদ্র এখনই সমস্যাটা নিয়ে বলতে চাইলো না। উত্তর দিলো, “না না, কোনো সমস্যা নয়। এমনি দেখা করতে এলাম। এলাকায় নতুন পোস্টিং হয়েছে তো! ভাবলাম চা খেয়ে যাই।”

“নিশ্চয়ই, আসুন!”

অ্যালেক্সের ড্রয়িংরুমটা বেশ সুন্দর, পরিপাটি। অ্যালেক্স নিজেই গিয়ে চা বানিয়ে নিয়ে এলো চটপট। ততক্ষণে বাড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রুদ্র। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন অসাধারণ। মানতে হলো তাকে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে অ্যালেক্সকে জিজ্ঞেস করলো,

“আচ্ছা মিস্টার ক্লাইভ, কী নিয়ে গবেষণা করেন আপনি?”

“সবকিছু নিয়ে।” হাসতে হাসতে বললো অ্যালেক্স।

“সবকিছু বলতে?”

“দ্য থিওরি অব এভরিথিং। এমন একটা থিওরি, যা দিয়ে শুধু একটা দু’টো ব্যাপার নয়, সবকিছু ব্যাখ্যা করা যাবে।”

“স্টিফেন হকিং যেটা করতে চেয়েছিলেন?”

“জানা আছে দেখি আপনার। দারুণ! হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।”

“আচ্ছা, বাইরে কতগুলো লেডের পাত দেখলাম, দাঁড় করিয়ে রাখা।”

“ওহ! খেয়াল করেছেন? লেডের বুঝে ফেলেছেন?”

“এগুলোর কাজ কী?”

মুখের হাসিটা মুখে গেল অ্যালেক্সের। “দুঃখিত। এ বিষয়টি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা সম্ভব নয়। তা করতে আমি বাধ্যও নই।”

রুদ্র সরু চোখে তাকালো তার দিকে। এতক্ষণ ধরে সে লক্ষ্য করেছে, দু’বার পেছনের দরজাটার দিকে তাকিয়েছে অ্যালেক্স। কিছু একটা কি আছে ওখানে?

“পেছনের ঘরটাতে কী আছে?”

চমকে উঠলো যেন সে কিছুটা। “ওখানে আমার ল্যাব। কেন?”

“আমি কি দেখতে পারি?”

“না, পারেন না। আপনারা আসতে পারেন এখন।”

রুদ্রের চেহারা একটু কঠিন হলো। কঠিন গলায় সে জিজ্ঞেস করলো, “গতকাল গ্রাম থেকে অর্ধেক মানুষ উধাও হয়ে গেছে। গরু-ছাগলসহ সব গায়েব গ্রামের! এ ব্যাপারে আপনি কী জানেন?”

চমকে উঠলো যেন অ্যালেক্স। “কী? কী বললেন আপনি? গ্রামের অর্ধেক মানুষ গায়েব হয়ে গেছে?”

“হ্যাঁ। বাইরে বসে নাচ গান করছিল তারা উৎসবে। বেমালুম উধাও হয়ে গেছে যেন হঠাৎ করে। শুধু ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তারা আছে।”

দু’হাত মুঠো পাকিয়ে শূন্যে ছুড়লো অ্যালেক্স। “শিট! আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার!”

“মানে? আপনার কোনো যোগসাজশ আছে এই ঘটনায়?”

“দেখুন ইন্সপেক্টর সাহেব। কিছুটা ভূমিকা থাকলেও আমার কোনো দোষ নেই এ ব্যাপারে। একটা এক্সিডেন্ট ছিল ঘটনাটা। খুব ভালো হয় আপনারা দু’জন এখন চলে গেলে এখান থেকে।”

“দুঃখিত! এ কথা স্বীকার করার পরও আপনাকে কোনোভাবে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মকবুল, ওনাকে গ্রেফতার করো!”

মকবুল ভয়ে ভয়ে তাকালো রুদ্রের দিকে। রুদ্রের কঠিন মুখ দেখে অ্যালেক্সের দিকে এগিয়ে গেল সে ইতস্তত পায়ে।

মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটা ব্যাপার ঘটে গেল। অ্যালেক্স ঠোঁট গোল করে জোরে শিষ বাজালো। অমনি পেছনের ল্যাবরেটরির দরজাটা খুলে গেল দড়াম করে। দশ বারো জন অ্যাপ্রন পরা বিজ্ঞানী গোছের মানুষ প্রবেশ করলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো রুদ্র আর মকবুলের ওপর। বিজ্ঞানীদের চেহারাগুলো দেখে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো রুদ্র। প্রতিটি চেহারা অ্যালেক্সের নিজের। যেন ঘরময় অ্যালেক্সের অনেকগুলো প্রতিকৃতি হেঁটে বেড়াচ্ছে। হাতাহাতি শুরু হবার আগেই মাথার পেছনে ভারী কিছুর আঘাতে জ্ঞান হারালো রুদ্র।

যখন জ্ঞান ফিরলো, নিজেকে আবিষ্কার করলো একটা কাঠের চেয়ারের ওপর। চেয়ারের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা তার হাত। পাশের চেয়ারে একইভাবে বাঁধা আছে মকবুলও। আর সামনে জনা বিশেক অ্যালেক্স দাঁড়িয়ে আছে। সবাই একইরকম পোশাক পরা। বাদামী শার্ট আর সাদা অ্যাপ্রন। ঠিক কোন অ্যালেক্সের সঙ্গে তখন কথা বলেছিল, এখন আর বোঝার উপায় নেই।

অনেকজন অ্যালেক্সের মধ্যে একজন অ্যালেক্স বলে উঠলো, "আপনি একটু বেশি কৌতূহলী রুদ্র সাহেব। কৌতূহল কিন্তু বিপদের কারণ।"

রুদ্র গর্জে উঠলো। "আপনি দুজন পুলিশ অফিসারের গায়ে হাত তুলেছেন, এর পরিণতি কী হতে পারে কোনো ধারণা আছে আপনার?"

হো হো করে হেসে উঠলো সব ক'টা অ্যালেক্স। "আমার পরিণতি? নাকি আমাদের? এখানে ক'জন অ্যালেক্স ক্লাইভ দাঁড়িয়ে আছে, বলতে পারেন? কোনো অ্যালেক্সকে সাজা দেবেন আপনি?"

"এসব হচ্ছে কী! আপনারা কারা?"

"বেশ। এত কৌতূহল যখন আপনার, মেটাচ্ছি সব। শুনুন, আপনাকে বেশ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ মনে হয়। আপনি ইন্টার ডাইমেনশনাল ডোর সম্পর্কে জানেন?"

"মানে এক ডাইমেনশনের মধ্যে দিয়ে আরেক ডাইমেনশনে যাওয়া? প্যারালাল ওয়ার্ল্ড?"

"একদম ঠিক বলেছেন। ইন্টার ডাইমেনশনাল ডোর খুঁজে পাবার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটা ওয়র্মহোল। জানেন, প্রতি মুহূর্তে কত শত ওয়র্মহোল তৈরি হয় আর হারিয়ে যায়, অথচ টেরও পাই না আমরা, ওয়র্মহোলগুলো অনেক ক্ষুদ্র এবং অস্থায়ী বলে। ওয়র্মহোল কিন্তু সময় আর স্থানকে বাঁকিয়ে নিয়ে আসে একটা বিন্দুতে। একটা মানচিত্রকে দু'ভাঁজ করে মাঝখানে একটা ফুটো করে দিলে যেমনটা হয়, মানচিত্রের দু'টো দূরবর্তী স্থান একটা বিন্দুতে চলে আসে, ওয়র্মহোল অনেকটা তেমন। নেগেটিভ এনার্জি আর পজেটিভ এনার্জি মিলে তৈরি হয় এই ওয়র্মহোল। এখন যদি আপনাকে বলি, আমি আমার বাড়িতে কৃত্রিমভাবে এই ওয়র্মহোল বানাতে পারি, বিশ্বাস করবেন?"

"বিশ্বাস করা কঠিন। ওয়র্মহোল বানানোর জন্য নেগেটিভ এনার্জি দরকার হয়। সেটা কই পাবেন? বাস্তবে তো নেগেটিভ এনার্জি বা এক্সোটিক ম্যাটার পাওয়া সম্ভব নয়!"

"সবই সম্ভব যদি আপনার হাতে সে প্রযুক্তি থাকে। আর যেকোনো প্রযুক্তি তৈরি করা সম্ভব যদি আপনার হাতে থাকে ইনফিনিট এনার্জি সোর্স বা অসীম শক্তির উৎস, যা আমার হাতে আছে। খুলে বলি, কৃত্রিমভাবে ওয়র্মহোল তৈরি করার তাত্ত্বিক মডেলটা তৈরি করেছিলেন আমার এক শিক্ষক। তিনি তার গবেষণা পাবলিশ করার সুযোগ পাননি, এর আগেই মারা গেছেন। তাই আমি সেটা মেরে দিয়েছি। নিজের কাজে লাগাচ্ছি। আমি ওয়র্মহোল তৈরি করে, ইন্টার ডাইমেনশনাল ডোর তৈরি করে

আরেকটা প্যারালাল পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করি এবং সেখান থেকে আমার একটা প্রতিকৃতিকে নিয়ে আসি আমার পৃথিবীতে। এমন করার কারণ হলো, একা আমার পক্ষে থিওরি অব এভ্রিথিং আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তাই আমার সব ক'জন প্রতিকৃতি মিলে কাজটা করছি।"

অ্যালেক্সের কথা বিশ্বাস হলো না রুদ্রের, আবার অবিশ্বাসও হলো না। চোখের সামনেই সে এতজন অ্যালেক্সকে দেখতে পাচ্ছে, কিছু একটা অঘটন তো ঘটছেই এখানে! পাশে তাকালো সে। মকবুলের জ্ঞান ফেরেনি এখনো।

অ্যালেক্সকে সে জিজ্ঞেস করলো, "গ্রামের লোকগুলো উধাও হলো কেন?"

আগে যে অ্যালেক্স কথা বলেছিল, সেই আবার বলে উঠলো, "ওহ, এটা একটা ভালো প্রশ্ন! আপনি বাইরে লেডের পাতগুলো দেখেছেন? এগুলো দিয়ে কী করছি জানেন? শক্তি তৈরি করছি। আগেই বলেছি আমার হাতে অসীম এনার্জি সোর্স আছে। পৃথিবীতে অসীম এনার্জি বলতে কোনো উৎস থাকতে পারে কি? উত্তরটা হলো হ্যাঁ, পারে। গ্র্যাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণ হলো সেই শক্তি। গ্র্যাভিটি ব্যবহার করে অনায়াসে অসীম শক্তির উৎস তৈরি করা সম্ভব। এজন্য গ্র্যাভিটিকে প্রথমেই এলোমেলো করে দিতে হবে এবং সেই এলোমেলো গ্র্যাভিটিকে কাজে লাগাতে হবে শক্তি হিসেবে। আমি সেটাই করেছি। বাইরের লেডের পাতগুলোকে আপনি বলতে পারেন গ্র্যাভিটি ডিসটর্শন প্লেট। লেডের গায়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে আমি তৈরি করি গ্র্যাভিটি ডিসটর্শন ফিল্ড, যাতে করে গ্র্যাভিটি বিকৃত হয়ে যায়। সেই বিকৃত গ্র্যাভিটিকে আমি ব্যবহার করি শক্তি হিসেবে। লেড ব্যবহারের কারণ, লেডের পরমাণুগুলোর গঠন অনেক ঘন। গ্র্যাভিটি শুধুমাত্র তখনই এলোমেলো হয় যখন খুব ঘন পরমাণুওয়ালা বস্তু বা অনেক বৃহৎ আকৃতির কোনো বস্তু কাছাকাছি আসে, যেমন নিউট্রন স্টার। যাই হোক, তো যখন আমি এই গ্র্যাভিটিকে শক্তি হিসেবে কাজে লাগাচ্ছি, এটা খুবই সম্ভব যে এই এলাকার অনেক জায়গাতেই গ্র্যাভিটি কাজ করবে না। আর যদি তা কাজ না করে, তাহলে কী হবে? হয় পৃথিবীর সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে ছিটকে পড়বে মানুষ অথবা উড়তে শুরু করবে শূন্যে! কারণ তাদেরকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে রাখার মতো কোনো শক্তি নেই। গতকাল রাতে আমি একটা ইন্টার ডাইমেনশনাল ডোর তৈরি করেছিলাম। কাজেই যারা গতকাল উধাও হয়ে গেছে, তারা কোথায় আছে বুঝতে পারছেন তো? তারা ভেসে বেড়াচ্ছে কোথাও আকাশে বা উড়তে উড়তে অন্য কোথাও গ্র্যাভিটি পেয়ে সেখানের মাটিতে আছড়ে পড়ে থেঁতলে গেছে! যদিও এমন দুর্ঘটনা আগে ঘটেনি। কাল বোধহয় একটু বেশি ব্যবহার করা হয়েছে শক্তি!"

বলে অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে লাগলো সব ক'জন অ্যালেক্স। রুদ্রের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে গেছে। সে অ্যালেক্সদের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। একটু একটু ভয় পেতে শুরু করেছে সে এবার।

কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করলো, "এবার আমাদেরকে নিয়ে কী প্ল্যান আপনার?"

একজন অ্যালেক্স উত্তর দিলো, "আপনাদেরকে এই পৃথিবীতে রাখা যাবে না আর। না, ভয় পাবেন না, খুন করব না আপনাকে। অন্য ব্যবস্থা করব।"

বলে সেই অ্যালেক্স অন্য অ্যালেক্সদের দিকে তাকালো। সবাই মাথা দোলালো একমত হয়ে। কোনো ব্যাপারে একমত হয়েছে তারা, বোঝা গেল একটু পরই। নেতা গোছের অ্যালেক্সের পকেট থেকে একটা রিমোটের মতো বস্তু বেরিয়ে এলো। সুইচ টিপে ধরলো সে রিমোটের। প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা গেল সাথে সাথে বাইরে থেকে। লেডের পাতগুলো এক্টিভেট করা হয়েছে কি?

সব ক'জন অ্যালেক্স পিলার, রেলিং বা কিছু একটা আঁকড়ে ধরলো। কেন? উত্তরটা পেল রুদ্র। নিজের পায়ের নিচে তাকিয়ে গা'টা অসার হয়ে এলো তার। পায়ের নিচে মাটি নেই এখন। শূন্যে ভাসছে সে। আর ল্যাবের দরজাটা যেখানে, সেখানে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। তার মধ্যে উঁকি দিলো একটি গোলাকার টানেলের মতো বস্তু। টানেলের ওপাশের চিত্র দেখে অবাক হলো রুদ্র। একদল অ্যালেক্স দাঁড়িয়ে আছে টানেলের ওপাশে, কোনো এক প্যারালাল ওয়ার্ল্ডে। তাদের মাঝখানে, চেয়ারে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে রুদ্র আর মকবুল।

হঠাৎ ওর চেয়ারের পেছনে কেউ একজন ধাক্কা দিলো। পেছনে তাকিয়ে একজন অ্যালেক্সকে দেখতে পেল সে। গ্র্যাভিটিহীন ঘরে সামান্য ধাক্কাতেই প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যেতে লাগলো সে টানেলের দিকে। শরীর মোচড়া-মোচড়ি করেও নিজেকে থামাতে পারলো না। সোজা গিয়ে টানেলের ওপাশের জগতে গিয়ে পড়লো। পাশে দেখতে পেল মকবুলকেও।

আতঙ্কের শীতল স্রোত বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড দিয়ে। তবে নিজের আতঙ্ক ছাপিয়ে একটা চিৎকার মনোযোগ কাড়লো ওর। সব ক'জন অ্যালেক্স "না না" বলে চেঁচাচ্ছে একসঙ্গে। কেন? কী হয়েছে?

রুদ্র বুঝলো, টানেলের এপাশ থেকে যখন রুদ্র আর মকবুলকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ওপাশে, ঠিক একইভাবে ওপাশের প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের রুদ্র-মকবুলকেও টানেলের এপাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে! এবং এর পরপরই হঠাৎ দুম করে বন্ধ হয়ে গেল টানেলটা, ভোজবাজির মতো গায়েব হয়ে গেল।

প্যারালাল পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যালেক্সের দলটাকে দেখে দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল রুদ্রের।

কিছুক্ষণ

মুহাম্মদ মারুফ আল-আমিন

"আমাকে জানালার পাশের সিটটা দেওয়া যাবে?"

আমি বই পড়ছিলাম। মাথা তুলে দেখলাম মেয়েটিকে। আমাকে আন্তরিক ভঙ্গিতে প্রশ্নটি করে এখনও জোর করে মুখে এক টুকরো হাসি ধরে রেখেছে মেয়েটি। আমি বললাম, "অবশ্যই দেওয়া যাবে। সুন্দরী মেয়েদের জন্য জানালার পাশের সিট ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তাই? তা এই নিয়ম বুঝি এখন বানালেন?" মেয়েটি লাগেজ টেনে নিয়ে জানালার পাশের সিটে বসে পড়লো।

আমি বললাম, "হ্যাঁ, সুন্দরী মেয়েদের জন্য নতুন নতুন নিয়ম বানানোরও নিয়ম আছে।"

এবারে মেয়েটি হেসে ফেলল। ট্রেনের ঝকঝক শব্দে সেই হাসির শব্দ মৃদু শোনালো। মেয়েটি লাজুক ভঙ্গিতে বলল, "দেখুন নিয়ম বানান আর যাই করুন- ফোন নাম্বার, ফেইসবুক আইডি এইসব চাওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

"না ওসবে আমার আগ্রহ নেই। তাছাড়া সুন্দরী মেয়েদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠও হতে নেই। তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়।"

"কিন্তু আপনি তো আমার পাশের সিটেই বসে আছেন। দূরত্ব থাকছে কোথায়?"

"পাশে বসে আছি, কিন্তু, সহস্র মাইল ব্যবধান আছে, ম্যাম।"

হেসে বললাম। আমাকে বেশিক্ষণ মেয়েটির পাশে বসতে হলো না। পরের স্টেশনে এক লোক নেমে যাওয়াতে তার সিটে আমি বসে পড়লাম। এখন আমরা মুখোমুখি বসে আছি। দুইজনই জানালার পাশে। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি বলল, "আচ্ছা আপনার এমনটা কেন মনে হলো যে সুন্দরী মেয়েদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এটাও কি আপনার বানানো কোনো নিয়ম?"

আমি বললাম, "সুন্দরের খুব বেশি কাছে যেতে নেই। একবার কাছ থেকে সৌন্দর্য দেখে ফেললে দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে।"

"তাই নাকি? এমন তো শুনিনি কখনও।"

"তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। দূর থেকে যা সুন্দর দেখায়, কাছে চলে গেলে সেই সৌন্দর্য অনেক সময় চোখে পড়ে না। দূর থেকে যা খুব বেশি আকষর্ণীয় কাছ থেকে দেখলে তাই খুব সাদামাটা।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি দূর থেকে সুন্দর। কাছ থেকে দেখতে পচা?"

"আমি সেটা কখন বললাম!"

"এই যে মিস্টার, আপনি বই পড়ছিলেন পড়ুন। আমার সাথে গল্প জমানোর চেষ্টা করছেন আপনি। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছেন। আগেই বলে দিচ্ছি ভুলেও আমার সাথে প্রেম করার চেষ্টা করবেন না। একদমই না।"

"দেখুন আপনি ভুল পথে ভাবনা এগিয়ে নিচ্ছেন। আমার মোটেও এরকম ইচ্ছে নেই। তাছাড়া আমি সুন্দরী কোনো মেয়ের প্রেমে পড়তে চাই না। যদি কখনও প্রেম করি অল্প সুন্দরী মেয়ে বেছে নেবো।"

"তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং তো। এরকম ইচ্ছের কারণ?"

"কারণ খুব সুন্দরী কারও প্রেমে একবার পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারবো না। নিচে পড়েই থাকবো।"

এই সামান্য কথায় মেয়েটি মনে হচ্ছে অনেক বেশি মজা পেল। শব্দ করে হাসছে । হাসিটা অন্যরকম। শিশুদের হাসির মতো নির্মল যা আশেপাশের সবকিছুতেই মুগ্ধতা ছড়ায়। সেই হাসি বড়ো বেশি সংক্রামক। আমাকেও হাসতে হলো। আমি মেনে নিতে বাধ্য হলাম মেয়েটির হাসি সুন্দর। অল্প সুন্দর না। মন ভালো করে দেওয়ার মতো সুন্দর। যেই হাসি এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ সহ্য করা কঠিন ব্যাপার। এরকম হাসি দেখলে শুধু যে বুকের বা'পাশে চিনচিন ব্যথা করে তা না। সেই ব্যথা অনায়াসেই বুকের ডান পাশ অবধি চলে আসে।

ধীরে ধীরে গল্প বেশ ভালোই জমে উঠলো। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো সেই হাসি। মেয়েটি একটু পর পর হাসছে আর আমাকে টেনশনে ফেলে দিচ্ছে। কারণ যখনই মেয়েটা হাসছে আমার সব

তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী নিয়ে কথা বলছিলাম মনে থাকছে না। ভাবনায় ছেদ পড়লে যা হয়। ভালো সমস্যায় পড়া গেল।

মেয়েটা বলল, "তা আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

"এখনও ঠিক করিনি। কোনো একটা স্টেশন পছন্দ হলে নেমে যাবো।"

"আপনি এমনভাবে কথা বলছেন মনে হচ্ছে আপনি মস্ত বড়ো একজন কবি-সাহিত্যিক।"

"মস্ত বড়ো কিনা জানি না। কিন্তু আমি লেখালেখি করি।"

"তাই? আপনাকে তো চিনি না। নাম কী আপনার?"

"হুমায়ূন আহমেদ।"

"আজব! মিথ্যা বলছেন কেন? আপনার নাম হুমায়ূন আহমেদ হতে যাবে কেন? উনি কত বড়ো একজন লেখক!"

"হ্যাঁ, উনি অনেক বড়ো একজন লেখক। তাই বলে কি আর কারও নাম হুমায়ূন আহমেদ হতে পারে না?"

"আপনার নাম সত্যি হুমায়ূন আহমেদ?"

"হ্যাঁ, আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমার সাথে ভোটার আইডি কার্ড আছে। আপনি চাইলে দেখাতে পারি।"

"না না থাক। দেখাতে হবে না। আ'ম সরি।"

"আমার মা হুমায়ূন স্যারের লেখা খুবই পছন্দ করেন। তাই আমার নামও উনার নামে রেখেছেন।"

এমন সময় হঠাৎ দমকা বাতাস ছুটে এলো। বসন্তের মাতাল করা বাতাস নয়। বর্ষার ভিজে বাতাস। মেয়েটার একপাশের চুল বাতাসে উড়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

অন্যরকম একটি অবয়ব। ইচ্ছে করছে হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিতে। সেটি সম্ভব না। আমরা অসম্ভবের জগতে বাস করি না। আমি বললাম, "বাতাসে কারো টিপ খুলে যায় দেখিনি। আপনার কপালের টিপ কিন্তু এক পাশে সরে গেছে।"

মেয়েটা টিপ দেখার জন্য কপালে হাত দিয়েছে। পুরো কপাল হাতড়ে টিপ খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি হেসে ফেললাম।

মেয়েটা মিছেমিছি রাগের ভান করে বলল, "আপনি তো ভালোই পাজি। আমি আজ টিপ-ই পরিনি। কিন্তু এমনভাবে বললেন বিশ্বাস করে ফেললাম।"

এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো। আকাশে মিষ্টি রোদ ছিল। হঠাৎ করে এমনভাবে বৃষ্টি নেমে যাবে বোঝা যায়নি। প্রকৃতির এমন খেয়ালিপনা দেখে মনে হলো— আমাদের গল্প করার সময়টাকে স্মরণীয় করে রাখতেই যেন এই আয়োজন। আমি বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি। আজকের বৃষ্টিটা অন্যরকম। ভিজতে ইচ্ছে করছে।

"চা খাবেন? ট্রেনে উঠলেই আমার চায়ের নেশা হয়। তাই ফ্লাস্কে চা নিয়েই ট্রেনে উঠি।" মেয়েটার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

বললাম, "হ্যাঁ খাব। চা আমি পারত পক্ষে খাই না। তবে ওই যে নিয়ম আছে সুন্দরী কেউ চায়ের অফার করলে না করতে নেই।"

"হয়েছে। আপনি যে লেখক আর বোঝাতে হবে না। ক'চামচ চিনি খান আপনি?"

“চিনি খাই না।”

“একটুও না? এভাবে ভালো লাগবে?”

“এক কাজ করুন, চিনির বদলে আমার চায়ে দুই ফোটা বৃষ্টির জল দিয়ে দিন। আমি এভাবেই চা খাই।”

“সত্যি? দিবো?”

“সত্যি।”

মেয়েটি আমার কাপে বৃষ্টির জল দিয়ে দিল। সাথে নিজের কাপেও নিল।

“আপনার দেখাদেখি আমিও খাচ্ছি রেইন টি। কি অদ্ভুত।”

আমি কিছু বললাম না। নিশ্চুপ চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি।

মেয়েটা বলল, “আচ্ছা শীতের সময় তো বৃষ্টি হয় না। তখন চা কীভাবে খান?”

“তখন তো আরও ভালো। দুই ফোঁটা বৃষ্টির বদলে এক ফোঁটা শিশির দিলেই হয়। মনে হয় পৃথিবীতে এসেছি শীতের সকালে শিশির ছোঁয়া চা খাওয়ার জন্য।”

মেয়েটা কিছুক্ষণ কথা বলল না। চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে চোখ পড়তেই আমি বললাম, “কী হলো?”

মেয়েটা দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, “আপনি কেমন মানুষ বলুন তো। আমি আপনার নাম জানলাম। অথচ আপনি একবারও আমার নাম জানতে চাইলেন না।”

“ওহ হ্যাঁ। আপনার নাম জানা হয়নি। কী নাম আপনার?”

“তিয়াশা। সুন্দর না নামটা?”

“হ্যাঁ, অনেক সুন্দর।”

“আচ্ছা লেখক সাহেব, আপনি কোথায় যাচ্ছেন বললেন না তো?”

“ওই যে বললাম তো, কোনো একটা স্টেশন পছন্দ হলেই নেমে যাব।”

“এটা কোনো কথা। মিথ্যা বলছেন আপনি।”

“নাহ তিশা, আমি মিথ্যা বলি না।”

“এই যে মিস্টার, আমার নাম তিশা না,তিয়াশা।”

“সরি তিয়াশা।”

“আচ্ছা আপনি হঠাৎ এমন চুপচাপ হয়ে গেলেন যে? কী হয়েছে?”

“কই না তো। কথা বলছি তো। তাছাড়া সুন্দরী মেয়েদের সাথে খুব বেশি গল্প করতেও নেই।”

“ইশ, আপনার এই বোরিং ডায়ালগ বাদ দিন, প্লিজ। আচ্ছা আপনার গার্লফ্রেন্ড আছে?”

“হঠাৎ এই প্রশ্ন?”

“আছে কিনা বলুন।”

“নাহ। নেই।”

“হুম, বুঝলাম। আপনি কিন্তু আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবেন না যে আমার বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা। আপনি জিজ্ঞেস করলেও আমি কিন্তু বলবো না।”

“হাহাহা, আচ্ছা ঠিক আছে আমি জানতে চাচ্ছি না।”

মেয়েটি হয়তো ভেবেছিল আমি জিজ্ঞেস করবো তার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা। আমি জিজ্ঞেস করছি না দেখে মনে হলো কিছুটা মন খারাপ হয়ে গেছে।

এমন সময় আমি ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা বলল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

আমি বললাম, "নেমে যাব। এই স্টেশনটা পছন্দ হয়েছে।"

"বৃষ্টি হচ্ছে তো। ভিজে যাবেন। এখানে না নেমে অন্য কোনো স্টেশনে নামলে হয় না?"

"জি না, ম্যাম, হয় না।" মুচকি হেসে বললাম।

আর কোনো কথা বললাম না। উঠে চলে এলাম। মেয়েটা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "ভালো থাকবেন, আবার হয়তো দেখা হবে"–এই জাতীয় কোনো কথা হয়তো আশা করেছিল সে। মেয়েটাকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে আমি ট্রেন থেকে নেমে গেলাম। বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। আমার আসলে বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছিল অনেক আগে থেকেই। নামার সাথে সাথেই ভিজে গেলাম। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো একটু একটু করে আমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। প্রকৃতির আহবানে আমি নেমে গেলাম ট্রেন থেকে কিন্তু অদৃশ্য কোনো শক্তি যেন আমার হাত ধরে টানছে ট্রেনে ফিরে যাওয়ার জন্য। কানের কাছে কে যেন বলছে মেয়েটার সাথে আরেক কাপ বৃষ্টির জল মেশানো চা খাওয়ার জন্য। সেই অদৃশ্য আকর্ষণ উপেক্ষা করেই আমাকে নামতে হলো। কোন দিকে যাব ঠিক করতে পারছি না। মেয়েটা জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই বয়সী মেয়েরা খুব বেশি জেদী হয়। মেয়েটা আমাকে পেছন থেকে ডাকবে না। নিজের আবেগের কাছে হেরে যাবে না কখনোই। মনে মনে হয়তো আমাকে খুঁজবে কিন্তু পাবে না। কারণ আমি পরিচয় দেইনি। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে সাথে আর্দ্র বাতাস। আমি চলে আসবো এমন সময় আমি অবাক হয়ে মেয়েটার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বৃষ্টি হচ্ছে এজন্য মেয়েটা জোর গলায় বলল, "এই যে হুমায়ূন সাহেব। আপনি আমাকে আসল নামটা বলেননি, তাই না?"

আমি ফিরে তাকালাম। এক টুকরো হাসি ছুড়ে দিলাম। সরি বলা টাইপ হাসি। কোনো জবাব দিলাম না। ফিরে যাওয়ার সাহস আমার নেই। জগতটা রহস্যময়। জগতের সব রহস্যের ব্যাখ্যা থাকে না। ব্যাখ্যা থাকা উচিতও না। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একটু হলেও ভাববে। আমি না হয় একটুখানি রহস্য হয়েই থাকলাম। সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেলে প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট হবে। সেই অধিকার আমার নেই।

বৃষ্টির মধ্যে সামনে এগুচ্ছি। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে। বুকের মধ্যে এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে যেই অনুভূতির সাথে আমার পরিচয় নেই। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমার বিস্ময় সীমাকে অতিক্রম করে আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো ডাকলো মেয়েটা। আমার সব হিসেব নিকেশ এলোমেলো হয়ে গেল মুহূর্তেই। এবারে আমাকে মেয়েটার কাছে ফিরে যেতে হবে।

কেন যেতে হবে?

কারণ মেয়েরা দ্বিতীয়বার ডাকলে সাড়া দেওয়ার নিয়ম আছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

হাকিম মাস্টার
ও
একটি লাল শাড়ি
মুর্তজা সাদ

হাকিম মাস্টার ভীতু ধরনের লোক।

গ্রামের কেউ আজ নাগাদ তাকে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখেনি, কারো সাথে ঝগড়া বাঁধাতে দেখেনি। একসময় গ্রামের স্কুলে বাংলা পড়াতো, মিলিটারি এ অঞ্চলে ঢুকবার পর উর্দু পড়ায়। সুর করে উর্দু শেখায় বাচ্চাকাচ্চা ধরে ধরে, উচ্চারণ ভুল করলে শাস্তি দেয় ওদের। নীল ডাউন করিয়ে রাখে হাতে গুণে দশ মিনিট। কমান্ডার ওতে খুশি হয়। তাকে আপন করে জড়িয়ে ধরে। মুক্তিসেনা নিধনে সঙ্গী করে নেয় নিঃসংকোচে।

মাস্টারের বয়স ত্রিশের কোটায়। তেলে লেপ্টে থাকে তার কালো চুল। কানের কাছে ঐ চুলে আজকাল পাক ধরেছে। পাক ঢাকতে নতুন বউ ওতে মেহেদী লাগায়। মেহেদী লাগিয়ে ধুয়ে দেয় পরম আদরে। তখন দুনিয়াটাকে মনে হয় জান্নাতুল ফেরদৌস।

গত শীতে বিয়ে করেছে মাস্টার। দক্ষিণ পাড়ার কিশোরীকে। তার ঠোঁটজোড়া লাল টুকটুকে, মাথাভর্তি কালো চুল নেমে গিয়েছে সরু কোমর পর্যন্ত। গায়ে জড়ানো জীর্ণ শাড়িতে ওকে লাগে হুরপরী। অবশ্য গণ্ডগোলের আগে হাকিম মাস্টার তাকে নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছিল গঞ্জ থেকে। ওই শাড়ির রঙ লাল। লাল টুকটুকে ঠোঁটের সাথে মিলিয়ে লাল শাড়ি। অথচ ওই শাড়ি একদিনও ধরে দেখেনি বউ। ভাজ নষ্ট হবার ভয়ে সযত্নে ঢুকিয়ে রেখেছিল ভাঙা আলমারিতে। তারপর অনেকদিন পেরিয়েছে, শান্ত দেশটা অশান্ত হয়েছে, মিলিটারি ঢুকেছে গ্রামে। অথচ কিশোরী বউটা আজ নাগাদ খুলে দেখেনি ওই লাল শাড়ি। কাঁধে ফেলে দাঁড়ায়নি ভাঙা আয়নাটার সামনে। হাকিম মাস্টারের এহেন অবহেলায় দুঃখ হয়, অভিমান হয় মনে। সেই অভিমান নিয়ে শার্টের বোতাম লাগায় নীরবে। লেপ্টে বসে থাকা চুল আঁচড়ায় সময় নিয়ে। কিশোরী মেয়েটা ওসব বুঝে। হাসে খিলখিল করে। তখন ওর কণ্ঠ নদীর কলকল করে বইতে থাকা অশান্ত জলের প্রাণোচ্ছল ধ্বনির মতোন কানে বাজে। কিশোরী ওর ওপর এলিয়ে দেয় ঘন কালো চুল। সেই চুলে পথভ্রষ্ট হয় মাস্টার, অজানা এক মিষ্টি গন্ধ ওকে করে উন্মাদ। অবহেলায় ঐ চুলের গোছা সরিয়ে মাস্টার হাঁটা ধরে ঘরের সদর দরজার দিকে। কিশোরী তখন কানের কাছে ফিসফিসিয়ে ওঠে। বলে, “দ্রুত ফিরো আজকা মাস্টার। লাল টুকটুকা শাড়ি পইরা আবার নতুন বউ সাজুম। এইবার দেইখো মনের সুখে।”

মাস্টার ওকে পাত্তা দেয় না। ধড়াম ধড়াম পা ফেলে বেরিয়ে যায়। মনের মধ্যে তখন গোপনে ঝড় বইছে। সেই ঝড় ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে অনুভূতির শহর। অথচ সব অনুভূতি লুকিয়ে ও শান্ত থাকে।

পরিকল্পনা আঁটে মাস্টার। ভাবে, দুপুরের মাঝে কাজ খতম হলে, আজ বিকালের মাঝে ঘরে পৌছাবে ও। ছনের তালপাতার ছাউনী দেওয়া ঘরে তখন অপেক্ষা করবে ওর লাল টুকটুকে বউটা।

সদর দরজাটায় দাঁড়িয়ে থাকবে ও, অস্থিরচিত্তে হেঁটে যাবে এ মাথা থেকে ও মাথা। দিনের সূর্যটা যখন লাল হয়ে যাবে, লাল শাড়িতে ওকে তখন দেখাবে দেবীর মতোন। মাস্টারের তখন হবে দেবী দর্শন।

ভাবে মাস্টার। ভাবতে ভাবতে কমান্ডারের সাথে দ্রুত পা মেলায় ও। পা ফেলে নতুন গন্তব্যের দিকে। গত কয়েকদিন আগে খবর পেয়েছে এ গ্রামে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে। আজ ওদের খেল খতম করা হবে। কমান্ডার মাস্টারকে সাথে এনেছে দিক চেনানোর কাজে।

এলাকায় বন্দুক হাতে চষে বেড়ায় মিলিটারিরা। অথচ কোথাও কেউ নেই। নেই কোনো পশুপাখিও। শূন্য গোয়াল ঘরটায় সতেজ গোবর জানান দেয় সকালবেলাও এখানে লোকজন ছিল। হয়তো ছিল নিষ্পাপ শিশুদের অনর্থক কোলাহলো। অথচ এখন কেউ নেই।

মিলিটারিরা ঘুরে বেড়ায়। এ মাথা থেকে ও মাথা দৌড়ায় পাগলের মতো। তখন হাতের কেরোসিনের বোতলগুলো শব্দ করে দোলে। ঐ শব্দ তখন ভূতুড়ে শোনায়। হাকিম মাস্টার তখন দৌড়ে যায়। দৌড়ে গিয়ে কোনো এক উঠান থেকে লোহার চেয়ার এনে পাতে কমান্ডারের ঠিক সামনে। কমান্ডার ওতে বসে। মাস্টার পকেট থেকে সিগারেট বের করে। কমান্ডারের মুখে ঠেসে ওতে আগুন ধরায়। তারপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে তার পাশে।

কমান্ডার ধোঁয়া ছাড়ে। সময় নিয়ে সিগারেট টানে। মাঝেমধ্যে খুকখুক কাশে। থুথু ফেলে কাদামাটিতে। ঠিক তখন নিজের ভাগ্যকে নিজে গাল দিতে থাকে মাস্টার। গাল দেয় গ্রামের গাদ্দার মানুষগুলোকে। ওরা না পালালে আজ বাড়ি ফিরতে বিলম্ব হতো না। ওর মনে তখনো লাল টুকটুকে বউ দেখবার স্বপ্ন। বউয়ের বড়ো কপালের লাল টিপে চুমু এঁকে দেওয়ার ফন্দি আটে ও।

মিলিটারিরা ফিরে আসে কমান্ডারের সামনে। দাঁড়িয়ে থাকে কাকতাড়ুয়ার মতো। হাকিম মাস্টারও দাঁড়ায় সটান হয়ে। তখন ওর বুক কেঁপে ওঠে, ধুকবুক করে ওটা। স্বপ্ন উবে যায় অজানা কোনো ভয়ে। মেহেদি লাগানো লালচে চুলের ধারে টের পায় নোনা জলের অস্তিত্ব।

কমান্ডার কিছু বলে না। সিগারেট শেষ করে হাঁটা ধরে। স্কুলঘরে ওরা ঘাঁটি গেড়েছে। সেই ঘাঁটির পথ ধরে নীরবে। হাকিম মাস্টার ওদের সাথে ফিরে আসে ঘাঁটিতে। দুপুরের খাবারের এন্তেজাম করে ঠিক সময়ে। হাসের মাংস, ডাল আর নানা পদের সবজি। ওরা ঢেঁকুর তুলে খায়, হাত চেটে খেয়ে বিশ্রাম করে। মাস্টার নিঃশব্দে বসে থাকে স্কুলের পুরোনো বটগাছটার নিচে। সারাদিনের অভুক্ত পেটে ওর মাথা ঝিমঝিম করে। ঝাপসা হয়ে আসে ওর চোখ। সেই চোখে বাড়ির দিকে তাকায় ও। ঝাপসা একটা বিন্দু হয়ে ঠেকে ওটা।

স্কুলঘরে মাস্টারের ডাক পড়ে ঘণ্টাখানেক পর। কমান্ডারের বিশ্রাম তখন শেষ হয়েছে। হেলানো চেয়ারে সিগারেট ধরিয়ে টান দেয় কয়েকটা। তারপর বাংলায় বলে ওঠে, "পরিকল্পনার কথা মিলিটারির বাইরে তুমি ছাড়া তো কেউ জানে না। তাই না মাস্টার?"

থতমতো খায় মাস্টার। কমান্ডারের উর্দু টানে বাংলা বলা শুনে বুকে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দেয় কেউ। কাঁপা কণ্ঠে ও বলে ওঠে, "জি, স্যার। আমি জানি শুধু।"

বিরতি দেয় কমান্ডার। সিগারেটে টান দেয় খুব ধীরে ধীরে। কাল বিলম্ব করার চেষ্টা করে আরো কিছুক্ষণ। তারপর বলে, "তোমার বাড়িতে তো বউ আছে, তাই না মাস্টার?"

মাথা নাড়ে ও। নীরবে নেয় গভীর শ্বাস।

কমান্ডার ওর দিকে ফিরে তাকায়। তারপর ধোঁয়া ছাড়ে ঠিক ওর মুখে। বলে, "মাস্টার, ওর বয়স কত?"

কেঁদে ওঠে মাস্টার। চোখ দিয়ে জল নেমে আসে ঝর্ণার মতো। তখন বাচ্চাদের মতো করে চোখ মোছে। কমান্ডারের পায়ের ওপর ঢলে পড়ে নির্লজ্জের মতো। ভীতু মানুষটা আঁকড়ে ধরে কমান্ডারের লোহার মতো নির্জীব পা। চিৎকার করে ওঠে ও। "স্যার, আমি নির্দোষ বিশ্বাস করেন—"

কমান্ডার কিছু বলে না। চোখ বন্ধ করে নতুন সিগারেট ধরায়। ততক্ষণে পশ্চিমের সূর্যে লাল ধরেছে। চাঁদটা দেখা দিয়েছে অস্পষ্টভাবে। হাকিম মাস্টারকে বেঁধে ফেলা হলো বৃদ্ধ বটগাছটার সাথে। ওর ভীরু চিৎকার ছাপিয়ে কানে এলো এক অসহায় কিশোরীর আর্তনাদ। কিশোরীর পরনে লাল শাড়ি, কপালে লাল টিপ, লাল ঠোঁটজোড়াতে আঁচড় কেটেছে কোনো নিরীহ শিল্পী। ওর চোখজোড়া সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ। টেনে হিঁচড়ে ওকে নেওয়া হলো স্কুলঘরের কোনো এক কক্ষে। উঠে গেল বর্বর কমান্ডারটাও। যাওয়ার আগে হাকিম মাস্টারের দিকে তাকিয়ে কেবল একটি শব্দই বললো।

"গাদ্দার।"

এর কিছু পরে গ্রামের আকাশে সন্ধ্যা নামে। আঁধার চিড়ে শোনা যায় কিশোরীর অসহায় আর্তনাদ। ভীরু মাস্টারকে সাঁকো বানিয়ে চলতে থাকে সারি সারি লাল পিঁপড়া। ওদের কামড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে কুঁকড়ে ওঠে মাস্টার। ওর চোখে তখন ভাসতে কিশোরী বউয়ের নিরীহ মুখটা।

গুচ্ছকবিতা

লুনা লাবিব

এক.

আমার বলার ভাষা গিয়েছিল ফুরিয়ে আর তোমার শোনার সময়! তাই আজ পাশাপাশি দুইজন, শুধু টিকটিক করে চলে দেওয়াল ঘড়িটা!

দুই.

মুখোমুখি দুইজন চুপচাপ
কথা হয় চোখে চোখে
মন ঝরে শিশিরে টুপটাপ।

তিন.

-ওমা, বাইরে কি সুন্দর রিমঝিমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে!
-ও কিছু না, আমার হৃদয় ভাঙার শব্দ! তুমি ঘুমাও।
শুনেছি, সে রাতে সবাই ভালো ঘুমিয়েছিল!

চার.

ভুল করে মৃত্যুকেও কাছে টানতে চেয়েছিলাম ! কি কপাল দেখো, সেও আমাকে উপহাস করে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এখন তাই, "ক্লিনিক্যালি ডেড" হয়ে আছি!

কার্ডিফের দিন আর যে স্মৃতি বুকপাঁজরের ঘুম

শেখ রানা

(১)

জানালা দিয়ে তাকালেই একটা সি-গাল চোখে পড়ে। খুব কাছাকাছি দূরত্বে চিমনীর ওপর ধ্যানী হয়ে বসে থাকে। মাসখানেক হয় দেখছি পাখিটাকে।

(২)

এই অনিত্য জীবনে বই পড়ছি। একটু একটু করে লেখায় ফিরছি। আকবর আলী খান'র বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্যে; একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, শাহাদুজ্জামান'র আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসিলাম'র ইতিহাসের রূপকার তাজউদ্দীন আহমেদ আর গুলজার'র পান্তাভাতে। সবগুলো সুখপাঠ্য।

হোসে মার্তি আর সাইমন বলিভিয়ার কথা জানলাম। যেসব বিপ্লবীরা পর্দার অন্তরালে থেকে গেছেন, তাদের নিয়েই আমার আগ্রহ বেশী। যে কারণে তাজউদ্দীন আমার সারাজীবনের নেতা, সে কারণেই হোসে মার্তি আর সাইমন বলিভারকে নিয়ে আগ্রহ জন্মালো অপার।

(৩)

একটা পুরো মাস চলে গেছে। কোথায় গেছে?

প্রশ্ন ধরে রেখেই আমি সিদ্ধান্তে আসি, এক মাস আমার জীবনে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সেই পরিবর্তনের জোয়ার-ভাটায় আমি ভেসে ভেসে কতদূর চলে গেলাম ঠিক ঠাহর করতে পারি না। চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশও সেই অপারগতায় যোগান দেয় নীরবতা পাঠিয়ে। মনের দিকে ঝুঁকে আমি কেবল মৃত্যুদিন দেখি, প্রতিদিন।

এখন পর্যন্ত সরকারি হিসেবেই যুক্তরাজ্যে আঠারো হাজারের বেশী মানুষ মারা গেছেন। সেই তুলনায় ওয়েলসে মৃত্যুহার কম।

এটুকু লিখেই মনে হলো, আমিও মৃত্যু গণনা করছি তুলনামুলক সংখ্যা বিচারে!

জীবন তুমি মৃত্যু সমান...

(৪)

আব্বার সাথে কত স্মৃতি আমার! ছোটোবেলার, বড়োবেলার।

আব্বাকে কেন যেন ভীষণ ভয় পেতাম, অথচ আব্বা আদতে আমোদপ্রিয় মানুষ ছিলেন। হাইকোর্টের এক বিকেলে আমি, ছোটো রানা আর টগর ফুটবলে খেলছিলাম। আব্বা কোট-টাই পরেই আমাদের সাথে ফুটবল খেলতে নেমে গেলেন। রীতিমতো দৌড়-ঝাঁপ করে খেলা যাকে বলে!

শীতকাল এলেই সি অ্যান্ড বি অফিসের সামনে বিপুল বিক্রম এবং সশব্দে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। সে এক জমজমাট অবস্থা। পিডব্লিউডি-র কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার আর হাইকোর্টের খেলোয়াড়রা এক জোট হয়ে ধুন্ধুমার খেলা হতো তখন।

ঐ সময়ে আব্বা বিশাল বপু ছিলেন। আমি ছিলাম রোগে ভোগা দুবলা-পাতলা শিশু। মাঝে মাঝেই আব্বার সহকর্মীরা সেই নিয়ে রসিকতা করতেন। আব্বাও হাসতেন।

(৫)

আব্বা একজন ভালো পুরপ্রকৌশলী ছিলেন। এ কারণেই বোধহয় চাইতেন আমিও প্রকৌশলী হবো। সেই সময়ের টানাপোড়েন এড়িয়ে অবশেষে মেনেও নিয়েছিলেন আমার গীতিকার জীবনের পথচলা। আমার বইগুলো নিয়ে একটা চাপা আনন্দও দৃশ্যমান হতো মাঝে মাঝে।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল কোনো একদিন আমার লেখালেখি নিয়ে আব্বা খোঁজ করবেন, খবর নিবেন। সেই ইচ্ছে আর কখনো পুরণ হবে না বলে যখন প্রায় ধরে নিয়েছিলাম, তখন একদিন ফোনে কথা বললেন আমার সাথে, বছরখানেক আগে। আমার নতুন লেখা, নতুন বই নিয়ে প্রশ্ন করলেন। বইমেলায় নতুন কী বই আসবে জানতে চাইলেন। আমি তখন অ্যামাজনে ফুল টাইম কাজ করি। এত কাজ না করে আমার যে লেখালেখিতে আরো সময় দেওয়া উচিত তাও বললেন।

আব্বার সাথে কথা শেষ করে আমি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। টের পাচ্ছিলাম আমার চোখ ভিজে উঠছে, মন আর্দ্র হচ্ছে ধীরে। সেই অনুভূতিটা এত অপার্থিব ছিল।

একইসাথে আনন্দ আর বেদনার অনুভূতি কেবল মানুষই ধারণ করতে পারে।

(৬)

পার্থিবতায় বসবাস করে আমি কেবল অপার্থিবতার সন্ধান করে গেলাম। দু'দণ্ড জিরিয়ে পার্থিবতায় ফিরে আসবো সেই ফুরসত আমার রইলো না আর।

অন্তরালের দিনে
তেইশ এপ্রিল, ২০২০
কার্ডিফ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

অবছায়া নিয়তি
জাহিদুল ইসলাম সবুজ

দুর্বল, ক্লান্ত অবসরে যাওয়া ইকবাল সাহেব বাড়ির দক্ষিণ জানালার পাশে বসে আছে। কানে বাজছে রবীন্দ্রনাথের গান,

এই আকাশে আমার মুক্তি, ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে

চোখে ভেসে উঠছে পূর্বজীবনের যতসব স্মৃতি। ন্যাংটোকালের ক্লান্ত দুপুরে পুকুর ঝাঁপাঝাপি থেকে শুরু করে যৌবনের খাট কাঁপা-কাঁপি সব। সব তাও স্পষ্ট। যেন নেটফ্লিক্সের হাই রেজুলেশনে দেখা কোনো মানুষের স্পষ্ট বায়োপিক সিনেমা যাকে বলে।

তাঁর জীবন সিনেমার একটা জায়গায় হঠাৎ তিনি পজ করে বারবার থামিয়ে থামিয়ে অল্প ছেড়ে দেখতে থাকেন।

এই অংশটায় একটা প্রচুর থ্রিল আর প্রচুর আনন্দ পাচ্ছেন। আনন্দের পরিমাপ কীসের সাথে তুলনা করা যায় বুঝতে পারছেন না। প্রথম জীবনের পর্ন দেখার মতো উত্তেজনা নাকি প্লেবয় ম্যাগাজিন পড়া বা দেখার উত্তেজনা? মিলানো যাচ্ছে না!

আহ! কী জীবন যায় আর কী জীবন আসে মানুষের। মানুষের ঝকঝকে এইচডি টিভি স্ক্রিন বয়সের ভারে সাদাকালো টেলিভিশনের ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোটার জীবনে নিয়ে যায়।

দেখতে পান প্রথম বর্ষ, ইউনিভার্সিটি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যেন রাজনীতির আখড়া। বেশিরভাগই থাকে সুবিধা পার্টি। সরকারদলীয় ঘেঁষা রাজনীতিতে। আর বিরোধীরা যেন সবসময় সরকার নামিয়ে দেশকে উদ্ধার করবে। আর যত হাঙ্গামা-দাঙ্গামা করে বেড়াবে। এর মাঝে হঠাৎ এতকিছুর পর তাঁর চোখে পড়ে অর্পার ছাত্র ইউনিয়নে। কত ভদ্র। বইটই পড়ে। সমতার কথা বলে। সুন্দরই তো ব্যাপারগুলো। যোগ দেয় ছাত্র ইউনিয়নে।

আসলে এই শেষ জীবনেও এসে নায়ক মারুফের মতো অংক মেলাতে পারেন না ইকবাল সাহেব। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের এই রোমান্টিক নীতির জন্য ছাত্র ইউনিয়ন করেছিলেন নাকি শুধু অর্পার জন্য। যে মেয়েটির হাসিতে ঝর্ণার শব্দ হয়। হাসি যতটা না তার চেয়ে কি তার সমাজ নিয়ে ভাবা এক ভালোমানুষির প্রেমে পড়ে এই ছাত্র ইউনিয়নে আসা মেলাতে পারেন না। কী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর!

কিছু স্পষ্ট না আজ এবং কোনোদিন। অর্পা প্রথম বর্ষ, ইকবাল সাহেবও প্রথম বর্ষ। কেমন জানি সমাজবেদীর এক সাংঘর্ষিক জুটি! এমনই মনে হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু প্রেমগুলো তো আর সমাজের কাঠামো মেনে আসে না। কিংবা কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে আসে না। তাই সাহস করে ইকবাল সাহেব অর্পাকে বলেই দিয়েছিলেন যে, তোমাকে ভালোবাসি। কিংবা তোমার জন্য নীলচে

তারার একটুখানি আলো। বা যত ভুগিচুগি করে পটানো যায় একটি মেয়েকে। এতকিছু বলারও দরকার ছিল না। অর্পা আগে থেকেই তার হাবভাব টের পেয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিল না।

অর্পা বিপ্লবী মেয়ে। পুতুপুতু মেয়েদের মতো প্রথমে নিমরাজি তারপর পূর্ণ রাজি হবে এমন মেয়ে সে না। মুখের ওপর দ্রুতই বলে দিলো, "দেখ ইকবাল এটা তো সম্ভবই; তুই ভালো ছেলে আর আমাদের সব মিলেও যায়। প্রেম আমরা করতেই পারি।"

এমন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি দেখে হতভম্ব হওয়াটাও অস্বাভাবিক না যে কারো জন্যেই। তারপর কী তুমুল প্রেম। নগরের সব ধুলোরাও যেন জেনে যাচ্ছে এইদিক দিয়ে দুইজন প্রেমিক-প্রেমিকা যাচ্ছে। ধুলোদের প্রভু বলছে সাবধানে ওড়ো। ওদেরকে যেতে দাও ভালোভাবে। প্রণাম করো তাদের। কুমিল্লা-শেরপুর কত কত দূর। রাস্তা আর ঠিকানাটাই যতদূরে। দুটি মানুষ যেন কত হাজার বছরের পরিচিত। ইকবাল সাহেব প্রায় রাতেই ভাবতেন আর অবাক হতেন ভেবে, ঢাকা শহরে এসে একটা মেয়ে আমার হয়ে গেল। কী সুন্দর একটা ব্যাপার! খুব মুগ্ধতা কাজ করতো। ইচ্ছে হতো একা একা নাচানাচি করতে। মেসে বড়ো ভাইদের সাথে থাকার কারণে কন্ট্রোল করত সেই নাচানাচি।

ঝড় তবু আসেই। ঝড়ের পরে আছড়ে পড়া ঘাড় নাক ভাঙা জীবনটাই যেন মানুষের আসল জীবন।

এই সুন্দর ইকবাল-অর্পা নামের গোছানো বাগানেও একদিন বয়ে যায় তুমুল এক ঘূর্নিঝড়। একদম ২৩০ কি.মি. বেগে যেন। দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে যায় সবকিছু।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস আরও আগেই ছিল। যেটা ইকবাল সাহেবের নেটওয়ার্কের আওতায় ছিল না। কোনো সিগনাল তাই পাননি। অর্পার ছোটোবেলা থেকেই পছন্দ তারই গ্রামের চাচাতো ভাই শুদ্ধকে। যেটা মজা করে তাঁর সাথে বলেও ছিল। মানে সিরিয়াস কিছু না এমন করে।

একদিন হঠাৎ ইকবাল-অর্পার হাঁটাপথ থেকে একটা ছেলে অর্পাকে ডেকে নেয়, শুদ্ধ। এরপর কীভাবে কী হলো কিচ্ছু জানতে পারেননি ইকবাল সাহেব।

ওইদিনই থেকেই অপরিচিত হয়ে যায় দুজন। যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেছে তাদের জীবন। যেন ঘুম ভেঙে গেছে যা দেখেছিলে সব মিথ্যে, শুধু স্বপ্ন মাত্র। এত পরিচিতি মানুষ হঠাৎ অপরিচিত হয়ে যায় চিন্তা করা যাচ্ছে না একদম।

যোগাযোগ নিভে গেল একেবারেই। স্বাদের ছাত্র ইউনিয়নের মিটিংয়েও দেখা যাচ্ছে না আর। ফোনে এমনকি স্বপ্নের ইউনিভার্সিটিও ছেড়ে দিয়েছে। তবে কি অর্পা নামের কোনো মেয়েই ছিল না? কোন ঘোরে ছিলেন ইকবাল সাহেব বুঝতেই পারেন না।

অল্প বয়স আর নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অর্পাদের বাড়িতে যাওয়ার সাহসও অর্জন করতে পারেনি।

ছাত্র ইউনিয়নের কিছু মিউচুয়াল বন্ধু ছাড়া আর কেউ ছিলও না। ছাত্র ইউনিয়নের ওই বন্ধুদেরকেও লজ্জায় আর বলা যায় না অর্পার কথা। যদি অর্পা বলে সত্যি সত্যি কেউ না থেকে থাকে তাহলে পাগল বলে অনেকে হাসাহাসি করতে পারে। কিংবা কোনো মানসিক ডাক্তারের নম্বর ধরিয়ে দিতে পারে। মানসিক ডাক্তার দেখানো তার জন্য খারাপ কিছু না। কিন্তু কেউ জানতে পারলে পাগল ভাববে তাই সব একা সইয়ে গেছেন।

মাঝেমধ্যে তাঁর অবশ্য মনেই হতো যে অর্পা বলে আসলে কেউ নেই। থাকলে দলেও তো উঠতো অর্পার কথা। অর্পার হারিয়ে যাওয়ার কথা। একটিভ মেয়েটা হঠাৎ ইনএক্টিভ হয়ে যাওয়ার

কথা। পরক্ষণেই আবার মনে হতো অর্পা তো দল না। এক অর্পা যাবে লক্ষ অর্পা আসবে। কারও জন্য দলের মাথাব্যথা থাকার কথাই না।

বহুদিন পর আবার হঠাৎ দেখতে পেল এক বান্ধবী একটা মেয়ের গায়ে হলুদের ছবি দিয়েছে। তাও আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে। যুবক বয়সে সোশ্যাল মিডিয়া কি তা না জানলেও বয়সকালে একা সময় কাটানোর জন্য এর জুড়ি নেই। সেই ছবিতে প্রচুর আধুনিক মেকাপের কারণে অর্পাকে চেনাই যায়নি। তবে ক্যাপশন দেখে বোঝা গেলো, হ্যাঁ, এটাই তো অর্পার নাম; চিরচেনা সেই অর্পার নাম। কিন্তু সেই বান্ধবীকেও কিছু বলা যাচ্ছিল না কারণ তার বাস্তবতাকে আবার ওই বান্ধবী কোনো হাস্যকর স্বপ্ন ভেবে যদি হাসাহাসি করে।

তখন থেকেই মৃত্যু বিষয়টা তাঁর চারপাশে দিগ্বিদিক ঘুরতে থাকে। মৃত্যুকে আর ছুঁতে পারে না। বেশ কয়েকবারই চেষ্টা করেছিলেন সুইসাইড করতে। সাহসে কুলোয়নি। বারবার এই বেঁচে যাওয়াটা তাঁর কাছে আত্মহত্যার নামান্তরই। একজন মানুষ জীবনযন্ত্রনা সহ্য করতে পারছে না। মরতেও পারছে না। এরচেয়ে করুণ দুঃখের বিষয় কী হতে পারে ইকবাল সাহেব বোঝে না। এই এক করুণ জীবনে মৃত্যু ছাড়া তার কোনো ভালো ডেস্টিনেশন আছে বলেই বিশ্বাস হয় না।

তবু জীবন চলেই যায়। এই নিয়ম। জীবন চলতেই থাকে। জীবনের সব নিয়ম পালন করে ক্লান্ত পয়ষট্টি বছরের ইকবাল সাহেব। যার সকাল হলে সারা শরীর ব্যথা। দুপুরে দাঁত ব্যথা তো বিকেলে মাথা ব্যথা। আর মনের সব ব্যথা তো আছেই। এই নিয়েই কাটছে।

কখনও কখনও মনে হয় জীবনটা তো তার না আসলে রোগশোকের একটা বাহন তথা রোগেদেরই এই জীবন। অনেক কানাকড়ি দিয়ে যেন তারা কিনে নিয়েছে। তাই ইচ্ছেমতো সিন্দাবাদের ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে ইচ্ছেমতো ব্যথা পাওয়ার হুকুম করছে, ওষুধ খাওয়ার হুকুম করছে।

ক্লান্ত এই জীবন নিয়ে তাই মাঝেমধ্যেই ইকবাল সাহেব রাস্তায় একটা সাইনবোর্ড নিয়ে দাঁড়ায়। যেখানে লেখা, "আমি একটা গাছ, পাখিরা আসো বাসা বাঁধো প্লিজ।"

পাখিরা আসে না ব্যর্থ হয়ে একটা সন্ধ্যা নিয়ে তিনি ঘরে ফিরেন। মানুষ তাঁকে দেখে শুধু হাসেন। কিন্তু তিনি হাসির তোয়াক্কা না করে সবাইকে বলেন আসো গাছ হই। মানুষ জীবন ছেড়ে চলো সবাই গাছ হয়ে যাই।

পরিশিষ্ট

অনেকের জানতে ইচ্ছে হতে পারে ইকবাল সাহেব কি নতুন করে আর ঘর বাঁধেননি? করেননি সংসার?

হ্যাঁ, সংসার তিনি করেছিলেন কিন্তু সংসারই তাঁকে করলো না। বিয়ে করে দুইটা সন্তানের জনকও হয়েছিলেন। তাদের ভবিষ্যত সুন্দরও দেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখেনি কেউ।

গ্রামের এক অনাথ তেরো বছরের মেয়ে তাঁকে দেখাশোনা করেন। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার গল্পে যেরকম সেরকম।

সবকিছুর পর তাই শুধু একই গান বাজে তাঁর কানে। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের,

তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার,
তাই জনম গেল শান্তি পেলেম নারে...

খুনি
নির্মাল্য সেনগুপ্ত

আমার প্রাক্তন প্রেমিকার মা আমাকে দেখলেই রেগে যেতেন। বলতেন, এই ছেলেটার মধ্যে একটা ক্রিমিনাল-ক্রিমিনাল ছাপ আছে। চোয়াল দেখেই বোঝা যায় অপরাধী। প্রাক্তন প্রেমিকার বাবা বলতেন, "ও চাইলেই খুন করে ফেলতে পারে কাউকে।"

তারা ভুল বলতেন না। আমি জন্মানোর সেই কিছুদিন পর থেকেই পরিবারের দুজন সদস্যকে খুন করার কথা ভেবে চলেছি। একজন আমার বাবা, অন্যজন দাদু।

বোধ হওয়ার পর থেকেই ওই শশ্রুগুম্ফধারী ভদ্রলোককে আমার মোটেই পোষায়নি। হাতে-পায়ে প্রচণ্ড শক্তি, মায়ের সাথে ঝগড়া করে, প্রচণ্ড জোরে চেঁচায়, একগাদা ভাত খায় আর ঘুমের সময় নাক ডাকে। মাঝে মাঝে আমাকে কাঁধের ওপর তুলে রাস্তায় ঘুরতে বেরোলে মন্দ লাগতো না যদিও, কিন্তু সেই একমাত্র ভালোলাগার বিষয়টাতেও প্রায়ই ফাঁকি দিতো লোকটা। এই লোকটি কেন আমার বাড়িতে থাকছে এবং কেন আমার আর মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আমি বুঝতামই না। কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতা তখনও আসেনি গলায়, অগত্যা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এরপর যেই আমার বয়স আরেকটু বাড়লো, আমি বুঝতে পারলাম, আই ওয়াজ ড্যাম রাইট। লোকটা প্রচণ্ড খারাপ। আমার ওপর অত্যাচার প্রথম শুরু হলো যখন সেটা হচ্ছে ১৯৯৩ সাল। ভোর ছটায় ঘুম থেকে তুলে একটা জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে আমার মতোই আরও প্রচুর ভিক্টিম এবং এই লোকটার মতোনই অনেকগুলো খারাপ লোক অত্যাচার করছে। সে কী কষ্টকর! গাদাগাদা বই এনে পড়াচ্ছে, না পারলে মার-ধোর করছে। কয়েকটা মায়ের মতোন নরম জিনিস ছিল, ভেবেছিলাম এরা আমার ক্যাম্পের হবে। ও হরি, এগুলোও সঙ্গদোষে নষ্ট হয়েছে দেখি! এরাও একই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এতেই শেষ নেই! সেখান থেকে বিকেলবেলা ফেরার পর রাত হতেই ওই ভদ্রলোক আবার একপ্রস্থ অত্যাচার শুরু করে দিল। ভীষণ বিরক্ত হচ্ছিলাম। আমি আবার কাঁদি-টাদি না। ভ্রূকুঞ্চিত করে সহ্য করি সব। দেখি কত নিচে নামতে পারে।

আমি প্রথমে যেই বাড়িতে থাকতাম, তার পিছনে ছিল একটা খাল। নোংরা জলে ভর্তি, অজস্র পোকা-মাকড়। এই লোকটা আমাকে অনেকবার তখন থ্রেট দিয়েছে পড়াশুনা না করলে আর যা যা করতে বারণ করা হয়েছে সেগুলো করলে ওই খালে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি পাত্তা দিইনি। এরপর যখন নতুন আরেকটা বাড়িতে এলাম, দেখি ঘরের পিছনদিকেই একটা মরে যাওয়া পুকুর। প্রচুর

গাছপালা আর জঙ্গলে ভরা। বিভিন্ন রঙের পাখি এসে বসে থাকে গাছের ডালে। অজস্র বিষধর সাপ কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায়, কচুরিপানার ওপর মেঘের ছায়া পড়ে, আর একদম মধ্যিখানে কিছুটা জল এখনও থেকে গেছে। সন্ধের সময় লাল রঙের সূর্যের অবয়ব সেই জলে প্রতিফলিত হলে অবিকল ডিমের পোচের মতো দেখায়।

এই সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মজে গিয়ে যেই আমি, বড়ো হয়ে কবি-টবি হওয়া যায় কিনা ভাবছি, অমনি ওই ভদ্রলোক এলেন এবং ফতোয়া জারি করলেন যে খালটা ক্যানসেল হয়েছিল বেশ কিছুটা দূর বলে। পুকুরটা ঘরের পিছনেই। একটা দরজা খোলার অপেক্ষা। কিছু করেছি কি সেখানে ফেলে দেবে আমায় এবং এবার তিনি পুরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেন জীবনে আর কিছু কাজ নেই, আমাকে পুকুর-খাল এসবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া।

এত দূর অবধি ঠিক ছিল, বাড়াবাড়িটা হলো সেদিন।

আমি দোতলার একটা ছেলেকে কোনো এক লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিতে মার-ধোর করেছি। অতি সামান্য ব্যাপার, ইগনোর করাই যেত। কিন্তু তিনি মানলেন না। দরজাটা খুলে আমাকে হাফ বাইরে ছুঁড়ে শেষ মুহূর্তে টেনে নিয়ে এসে বললেন, “এবারের মতোন ছেড়ে দিলাম। আর যদি কখনও দেখেছি...” ততক্ষণে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে প্রায়।

কিন্তু আরও দু-তিনবার সেম জিনিস করার পর আমি বুঝলাম, নাহ্, এ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। কিছু একটা স্টেপ নিতেই হবে।

তখনই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করে ফেললাম, আর দেরি নয়, লোকটাকে আমার খুন করতে হবে, যেমন করেই হোক। নইলে আমার প্রাণ-সংশয় হতে পারে। কোনোদিন হাত থেকে স্লিপ করে গেলেই তো আমার হয়ে গেল। বরং একই পদ্ধতি আমি অ্যাপ্লাই করি। ওকেই ফেলে দিই পুকুরে।

সেদিন শনিবার। ভদ্রলোক কোত্থেকে যেন চড়ে এসে ফিরেছে। আমি পাথরের মতো মুখ করে গেলাম সামনে। বললাম, “একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, ওইখানে। দেখবে চলো।”

সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কোথায়? পুকুরে? কেন গেছিলি ওখানে? দেবো ফেলে হ্যাঁ? দেবো?”

আমি হাত দেখিয়ে বললাম, “না, আগে দেখো জিনিসটা। তারপর ডিসিশন নিও।”

আমার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর ওকে ভাবালো। বলল, “চল দেখি...”

আমি দরজার কাছে গেলাম। বুক দুরুদুরু করছে। ঠাকুর, আমি পারব তো? আমায় সফল কোরো ঠাকুর। না পারলে যে আমি শেষ। প্রতিশোধ নিতে ওই ষণ্ডা ভদ্রলোক এক মুহূর্তও অপেক্ষা করবে না।

দরজাটা খুলে মাঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, “ওই দ্যাখো? দেখতে পারছ?”

সে উঁকি মেরে প্রাণপণ দেখার চেষ্টা করছে কোথায় কী? আমি আস্তে করে পিছিয়ে এলাম আর গায়ে যত জোর আছে তা দিয়ে দিলাম এক ধাক্কা।

সেদিনই বুঝে গেছিলাম ভগবান নেই। লোকটা এক চুলও নড়ল না, বরং ঘুরে বলল, “এই কোথায় কী? আর তুই আমার পিছনে কী করছিস হ্যাঁ?”

কিছুক্ষণ পরই তার টনক নড়ল। ছবির মতো বুঝে গেল কী হতে চলেছিল। “ওহ, তুই আমাকে ফেলে দিতে চাইছিলি? কী সর্বনাশ!” বলে আমায় কোলে তুলে নিল।

আমি জানি আমি নেই আর। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে। আমার জীবনের ভ্যালিডিটি এইটুকুই ছিল। এবার বিদায় নেওয়ার পালা।

কিন্তু লোকটা আমায় ফেলল না। অবাক করে সেই প্রথমবার আমার গালে দুটো চুমু খেয়ে আদর করে, মাকে ডাকতে শুরু করল, “এই দ্যাখো তোমার ছেলে আমায় ফেলে দিতে চাইছে পুকুরে...” এই বলে খুব হাসতে থাকল আর আদর করতে থাকল। সে হাসছে। মা হাসছে। আমার চোয়াল শক্ত হওয়া শুরু সেদিন থেকেই। এর থেকে ফেলে দিলে বোধহয় ভালো ছিল। এই অপমান জাস্ট সহ্য হচ্ছে না।

তবে লোকটাকে আমার অল্প অল্প ভালো লাগতে শুরু করেছিল তারপর থেকেই। এরকমই হয় বোধহয়। খুনের ভিক্টিম কোনোভাবে বেঁচে গেলে তার প্রতি একটা মায়া পড়ে যায়। কিছুদিন পর একদিন আমার কোনো একটা ‘করতে নেই’ এমন কাজে লোকটা রেগে গেল আবার। কিন্তু সেদিন আমাকে পুকুরে ফেলতে চাইল না। বলল, “তুই এমন করিস তো, যা আমিই চলে যাচ্ছি পুকুরে। আর আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই।” এই বলে দরজার দিকে এগোলো। সেই প্রথম আমার দৃঢ়, ঠাণ্ডা মুখ, শক্ত চোয়াল, পাথরের মতো দৃষ্টি এবং কুঞ্চিত ভ্রু হঠাৎ বদলে গেল এক নিমেষে।

আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার পেটে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বললাম, “না তুমি যাবে না... অ্যাঁআঁআঁআআ...বাবা-আ-আ-আ... আমি আর করব না এরকম... যাবে না-আ-আ-আ...”

আমার খুনেপণা বন্ধ হয়ে গেছিল সেই সময়। কিন্তু কথায় আছে না? যে যার জন্য জন্মায় তাকে তাই করতে হয়? আমার দ্বিতীয় ভিক্টিমের আগমন তখনই ঘটল। আমার দাদু বা ঠাকুরদা!

প্রথম প্রথম এই পক্ককেশধারীকে আমার বেশ ভালো লাগত। এ যে অমন জল্লাদের বাপ হতে পারে ধারণাই হয়নি। বরং এর যে আরেকখানা ছেলে আছে সেটা পুরোই মাইডিয়ার লোক। দেখলেই কিছু না কিছু কিনে দিচ্ছে বা খাওয়াচ্ছে, গল্প শোনাচ্ছে, ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে, সিনেমা দেখাচ্ছে, পুরো ফাটাফাটি।

কিন্তু যেই আমি আরেকটু বড়ো হলাম, এই বয়স্ক ভদ্রলোক নিজের রঙ দেখানো শুরু করলো। বাবা তাঁকে বলল, “আমার দ্বারা এমন বিচ্ছু সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। একফোঁটা পড়াশুনা করে না, একটাও কথা শোনে না, তুমি দ্যাখো যদি পারো, নয়তো এ উচ্ছন্নে যাবে।”

ব্যস, বুঝলাম তারপর, এ শালা রক্তের দোষ। আর এ আরও বেশি অত্যাচারী। কংস, শকুনি, অশ্বত্থামা, অমরেশ পুরি, তাবড়ো তাবড়ো ভিলেইনকে এ এক থাপ্পড়ে সোজা করে দিতে পারে। কে বলবে এত বয়স হয়েছে। রোজ আসছে, গাদা-গাদা অঙ্ক করাচ্ছে, ধপাধপ মেরে শুইয়ে দিচ্ছে। শেষে এক টাকা হাতে দিয়ে 'লজেন্স খেও' বলে চলে যাচ্ছে। প্রথমে রাগে ভেবেছিলাম টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেই। তারপর ভাবলাম নাহ্, এতটা লস ধর্মে আটকাবে। লজেন্সটা খেয়েই নিলাম।

সে যাই হোক, এমন চলতেই থাকছে। আর বাড়ির ভদ্রলোক তো আর বদলে যায়নি পুরো। সে না হয় আমি ক্ষমা-ঘেন্না করে দিয়েছি মায়ায় পড়ে, পুকুরে আর ফেলতে-টেলতেও চায় না, কিন্তু সেও হাতের সুখ করে নেয় মাঝে মধ্যেই। আর দিনকে দিন মা-টাও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে এদের সাথে মিশে। সবাই মিলে এমন আমার পিছনে পড়েছে কেন বুঝতেই পারছি না। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে! তখনই ঠিক করলাম এদের একটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তবেই বাকি দুটো ভয় পেয়ে থামবে।

মনে মনে বললাম, “দাদু, দিন গোনা শুরু করো। তোমার মৃত্যু আমার হাতেই হবে...”

প্রথমেই আমার ‘হাতের পাঁচ’ পুকুর দিয়ে ট্রাই করলাম। একই পদ্ধতি। বাবা না হয় শক্তিশালী, দাদু তো নয়। লাঠি নিয়ে হাঁটে। মাঝে মাঝেই 'গেছি গেছি' করে কঁকিয়ে ওঠে। আর আমিও বড়ো হয়েছি। ব্যস, শুধু নিয়ে যাও দরজায়। তারপর এক ধাক্কা...

কিন্তু যতটা সোজা হবে ভেবেছিলাম, হলো না। লোকটা প্রচণ্ড ধূর্ত। অমন কঠিন কঠিন অঙ্ক কষে ফেলা দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল। সে প্রথমেই নাকচ করে দিল পুকুরে কিছু দেখার থেকে। বলল, “না, না, আমি যেতে পারবো না, ওসব বাদ দাও, এখানে বসো, ঐকিক নিয়মটা শেখাই।”

এরপর আমি অন্য পথ ভাবলাম। মা বলত, উকুনের ওষুধ খুব বিষাক্ত। পেটে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু। আমি ঠিক করলাম দাদুকে সেটা জলে গুলে খাইয়ে দেবো। এবার তো আর বাঁচতে পারবে না...

লোকটা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝে ফেলেছিল। যা ধূর্ত লোক! বুঝতেই পারে। সে চালু করল ঘুষ দেওয়া। আমার সাথে পরিচয় করালো এক ম্যাজিকাল জিনিসের।

গল্পের বই। অবাক হয়ে গেলাম আমি! ছাপার অক্ষরে কঠিন কঠিন অঙ্ক, ইতিহাস ছাড়া যে এমন মজার জিনিস থাকতে পারে কল্পনাই করতে পারিনি! সেখানে প্রচুর খুনি, গোয়েন্দা, চোর, ডাকাত, পুলিশ সব কিলবিল করছে। পুরো মজে গেলাম সেই নেশায়। আর ঠিক করলাম, নাহ্, এ বাঁচুক, প্রচুর দিন বাঁচুক, যেন কোনোদিন না মরে। আর দিয়ে যাক আমাকে এমন সমস্ত সম্পদ। আমি অঙ্ক করব, মা বাবার কথা শুনব, কাউকে পিটাবো না, শুধু এই রস থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত করা না হয়...

তারপর? তারপর আর কী... আমার আর কাউকে খুন করা হলো না। এখন খুন করার মতো লোক প্রচুর। কিন্তু তাদের দেখে আমার চোয়াল শক্ত হলেই আমি বইয়ের তাক থেকে পেড়ে আনি একটা গল্পের বই। ব্যস, সব ঠিক হয়ে যায়।

আমার কথা কিন্তু খণ্ডায়নি। আমার ম্যাজিক-বুড়ো গত বছর আমার হাতেই মারা গেছে। অনেকবার বললাম, “দাদু যেও না, কে দেবে আমায় গল্পের বই, বলো? যেও না, প্লিজ। কে করাবে আমাকে অঙ্ক?” শুনলোই না কথা।

সবাইকে চলে যেতে হয়। আমার বাড়ির ওই অত্যাচারী, শশ্রুগুম্ফধারী, ষণ্ডা ভদ্রলোকও আস্তে আস্তে নরম হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। চুল পাকছে, অযথা টেনশন করা শুরু করেছে, প্রেশার হচ্ছে। আমি অপেক্ষায় আছি সেদিনের, যেদিন আরেকটা প্রজন্ম চোয়াল শক্ত করে প্ল্যান করবে তাকে পুকুরে ফেলে দেওয়ার, আর শেষ মুহূর্তে নিজেই দরজায় দাঁড়িয়ে তার পেটে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলবে, “না-আ-আ-আ যাবে না-আ-আ-আ-আ-আ-আ...”

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

আম্মা

আতিক খান

আমার বিয়ের কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর দেনমোহরের অংক নিয়ে ঝামেলা হওয়াতে ভেঙে গিয়েছিল। বান্ধবীদের কারো কারো ক্ষেত্রে এরকম হতে শুনেছি কিন্তু কল্পনায়ও ভাবিনি আমার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটতে পারে। সপ্তাহ দুয়েক আগে প্রথমবার দেখা হবার পর থেকে শাহেদের সাথে আমার মোবাইলে নিয়মিত কথা হতো। দুই পরিবারের কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু সম্পর্কটা ভাঙার আগে কেউ আমার মতামত জানার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

মোবাইলের অ্যাড্রেস বুক খুলে শাহেদ নামটার দিকে তাকিয়ে আছি। আঙুলের একটা চাপ দিলেই শাহেদ নামটা অ্যাড্রেস বুক হতে মুছে যাবে। আসলেই কি যাবে? প্রেমে পড়ার জন্য যথেষ্ট সময় হয়তো নয় কিন্তু ভালো লাগার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। বিয়ের পর কোথায় বেড়াতে যাবো সেই পরিকল্পনাও হয়ে গিয়েছিল। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি দেনমোহর নিয়ে ঝামেলা বাধবে।

আব্বু আম্মুকে কিছু বলতেও পারছি না। আমার বড়ো বোনের বিয়ে হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা দেনমোহরে। আব্বু আমার জন্য ২০ লাখ টাকা প্রস্তাব করেছিলেন। শাহেদের বাবা মা নাকি ৬ লাখ বলেছেন। এত কম অংক শুনে আমার মামা খালা, ফুপুরা সবাই ভেটো দিয়েছেন। এই বিয়ে হবে না ব্যস। বড়ো আপু এসে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়ে গেল, আমাকে জিজ্ঞেসও করল না। এই সমাজে মেয়েদের মতামতের কোনো মূল্য নেই।

মোবাইলটা বাজছে। একটা অপরিচিত নাম্বার। সাধারণত ধরি না, আজ কি মনে করে ধরলাম। একজন ভদ্রমহিলার গলা ভেসে এলো, "হ্যালো, কে, দিনা?"

"জি, আপনি..."

"আমি শাহেদের মা, তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাইছিলাম।"

"জি বলেন, শুনছি...।"

"শাহেদ তো সহজে কাউকে পছন্দ করে না। তিন-চারটা প্রস্তাব মানা করার পর তোমাকে পছন্দ করেছে। আসলে আমারও তোমাকে খুব ভালো লেগেছে মা। সমস্যা হয়েছে দেনমোহর নিয়ে, তুমি কিছু শুনেছ?"

"জি আন্টি। আপুর দেনমোহর ১৫ লাখ তো, আব্বুরা বলছে অন্তত ২০ লাখ হতে হবে। এটা মুরুব্বিদের ব্যাপার, আমি আর কিছু জানি না।"

"আচ্ছা, শুনো। তবুও তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি যেহেতু তোমার জীবনের ব্যাপার আর এই আর্থিক নিরাপত্তাটাও তোমার। এই যে ইদানিং সবার খুব উঁচু অংকে দেনমোহর ফিক্স হয়, এই টাকাগুলো কি আদায় হয়? বিয়ের আগে কি টাকাটা দেয়? অনেকে এমনকি বিয়ের পরেও দেয় না। অনেকে ডিভোর্স মামলা করেও এই উঁচু দেনমোহর আদায় করতে পারেনি, ঠিক না?"

"আমার ঠিক জানা নেই আন্টি, তবে শুনিনি পেতে।"

"শাহেদের বেতন হলো ৬০ হাজার মতো। ২০ লাখ টাকা হলো ওর ৩ বছরের বেতন। এত টাকা ও চুরি না করলে কোথা থেকে পাবে? বয়স তো মাত্র ত্রিশ, চাকুরিতে ঢুকেছে বছর তিনেক হলো। নিজের টাকায় বিয়ে করতে চায় তাই এতদিন টাকা জমিয়েছে। শুরুতে বেতনও কম ছিল। ও

দেনমোহর পরিশোধ করবে বলে ৬ লাখ টাকা আলাদা করে রেখেছে, বাসর রাতে বউকে চেক দিয়ে দিবে। আমাদের কোনো দাবী দাওয়া নেই মা। শাহেদ নিজের বেডরুম ফার্নিচারও কিনে ফেলেছে, ও শ্বশুরবাড়ি হতে কিছু নেবে না। বরযাত্রীও বেশি আসবে না, তাই তোমার আব্বুরও বেশি কষ্ট হবে না। তুমি নিশ্চয়ই চাও না, বিয়ে করে শাহেদ বিশাল একটা চাপ বা ঋণের মধ্যে পড়ে যাক? আর শাহেদের সম্ভবত প্ল্যান আছে আগামী বছর তোমাকে নিয়ে হজ্ব করার। দেনমোহর হতে তোমার খরচ তুমি বহন করবে, অর্থাৎ নিজের টাকায় হজ্ব করে আসবে। বাকিটুকু তোমার সেভিংস। হ্যালো দিনা, শুনছো? তোমাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে তাই এতকিছু শেয়ার করলাম। তোমার মামা ফোন করে মানা করে দেওয়ার পরও কথাগুলো বললাম। ভালো থেকো। নিজের যত্ন নিও।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভদ্রমহিলার কথা শুনছিলাম। কি সুন্দর প্ল্যান।

আধঘণ্টা প্রায় অবশ হয়ে বসে রইলাম। মন স্থির করতে দশ মিনিট সময় লাগল। ড্রইং রুমে আব্বু, আম্মু, মামা, মামী, আপুসহ দশ বারোজন আড্ডা দিচ্ছেন। সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার একটুও গলা কাঁপল না।

"আব্বু, আমি শাহেদকে বিয়ে করব। ৬ লাখ দেনমোহরে আমার আপত্তি নেই। তোমরা ব্যবস্থা করো।"

সবাই হা করে তাকিয়ে আছে। আমাকে কেউ কখনো এভাবে কথা বলতে দেখেনি। কেউ ভাবেনি, দিনা নিজের বিয়ের কথা নিজেই বলতে পারে। আমি আর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রুমে চলে এলাম। অল্প করে আম্মুর গলা শুনলাম, বলছে *নির্লজ্জ মেয়ে!*

এর ঠিক তিন সপ্তাহ পর শাহেদের সাথে আমার বিয়েটা হয়ে গেল। পরে শুনেছি, অন্যদের বাধার মুখে আব্বু আমার পক্ষ নিয়েছিলেন। বলেছেন, "আমার এই মেয়েটা কখনো কিছু চায় না। ওর এই ইচ্ছাটা আমি চাই না অপূর্ণ থাকুক। পরে অন্য সম্পর্কে কষ্ট পেলে সারাজীবন দোষারোপ করতে পারে। তাছাড়া ছেলেপক্ষের কোনো দাবী দাওয়া নেই, শাহেদকেও যথেষ্ট ভালো লেগেছে সবার। শুধু দেনমোহরের জন্য ভেঙে দেওয়া ঠিক হবে না, যখন ওরা পুরো দেনমোহর অগ্রিম পরিশোধ করবে বলছে।"

এরমধ্যে আমার হবু শাশুড়ি বেশ কবার কল দিয়েছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন। আমি আন্টি ডেকে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

বিয়ের দিন আমাকে শাহেদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় হঠাৎ কোথা থেকে প্রচণ্ড আবেগ ভর করেছিল। অশ্রুতে মুখের মেকাপ লেপ্টে গিয়েছিল। আম্মুকে জড়িয়ে ধরে ছাড়তে চাইনি একদম। আমি আম্মুর আদরের ছোটো মেয়ে, কখনো আম্মুকে ছাড়া থাকিনি। এখন হতে কীভাবে থাকব তাও জানি না। শুধু মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে, কে যে এই অদ্ভুত নিয়ম করেছে। উল্টোটাও তো হতে পারত। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে প্রতিদিনই একবার করে বাসায় চলে আসব।

বিয়ের পরদিন, আমার শাশুড়ি ডেকে বললেন, "দেখো দিনা, আমি চাই না আমাদের সম্পর্ক গতানুগতিক বউ শাশুড়ি টাইপ হোক। এই বাসায় মানুষ মাত্র চারজন। তোমার শ্বশুর, আমি, তোমার ননদ মিলি আর শাহেদ। আমি তোমাকে বাকি তিনজনের দুর্বলতাগুলো শিখিয়ে দেবো। ওগুলো একটু যত্ন নিয়ে ফলো করলে কয়েক মাসে দেখবে তুমি সবার খুব প্রিয় হয়ে গিয়েছ, পারবে না?"

"জি আন্টি।"

উনি অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাসলেন, "আন্টি ডাকতে পারো, সমস্যা নেই। আম্মা ডাক মন হতে না এলে অপরিচিত কাউকে জোর করে ডাকার দরকার নেই।"

শুরুর কয়েকদিন, মেহমান আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের ভীড়ে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। আর প্রতি সপ্তাহজুড়ে অন্তত তিনটা দাওয়াত। বাবার বাড়ির দূরত্ব মাত্র আধঘণ্টার, প্রতি সপ্তাহেই অন্তত দুবার মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে থাকতাম।

ফেসবুকে শাশুড়িদের নিয়ে ভয়াবহ সব গল্প আর অভিজ্ঞতা পড়েছি। কয়েকটা পড়ে তো আতংকে আমার হাত-পা কাঁপত। না জানি কপালে কি দুর্দশা লেখা আছে। আমার শাশুড়ির কয়েকটা দিক আমার খুব ভালো লেগেছে। গল্পেগুলোর সাথে উনার কোনো মিল নেই। উনি আমাদের রুমে কখনো নক না করে আসেন না। আর ছুটির দিনে দুপুরে যখন শাহেদকে জড়িয়ে ধরে একটু ঘুমাই, উনি কখনো নক করেন না। বিকেলে আমরা বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

আমাকে কিছু বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছেন। শ্বশুর কিরকম চা-বিস্কিট পছন্দ করেন, সকাল দশটার পর পত্রিকা পড়ার সময় মনোযোগ দিয়ে উনার রাজনৈতিক এনালিসিস শুনে কীভাবে মাথা নাড়তে হবে বাধ্য ছাত্রীর মতো, মাথায় কাপড় দিয়ে সামনে গেলে আদর বেশি পাবো, মিলির জামা কাপড় স্ত্রি করে পরার অভ্যাস, ছুটির দিন সকালে মশলা দিয়ে চা খেতে ভালোবাসে, পাশের মার্কেটে ফুড কোর্টে গিয়ে দই ফুচকা খাওয়া প্রিয় আউটিং আর প্রিয় শপিং হলো পার্স কেনা। মিলির সংগ্রহে অন্তত ৪৭টা পার্স আছে বিভিন্ন রঙ আর ডিজাইনের। আর শাহেদ নিজে অগোছালো হলেও চারপাশে সবকিছু গোছালো দেখতে ভালোবাসে। এই কাজটা এতদিন আমার শাশুড়ি করে এসেছেন। সপ্তাহে দুইদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া অভ্যাস। এই আড্ডা নিয়ে বিরক্ত করা কিংবা মানা করা যাবে না। নিজ হতে ছেড়ে দিলে ভিন্ন কথা।

শুধু মাথা নেড়ে বললেন, "শাহেদের সিগারেট খাওয়া আমি ছাড়াতে পারিনি। তুমি দেখো পারো কিনা। তবে শুরুতেই এটা নিয়ে ঝামেলা বাধিও না। সময় নিয়ে সম্পর্ক আরো মজবুত হলে তারপর।"

বললাম, "আন্টি অন্যদেরগুলো তো শুনলাম। আপনার দুর্বলতা কী?"

আন্টি হেসে উড়িয়ে দিলেন, "পারলে তুমি খুঁজে বের করো। দেখি কেমন মেয়ে তুমি।"

রান্নাঘরের আশপাশে ঘুরাঘুরি করতে দেখে একদিন বললেন, "দেখো মা, আমি জানি তোমার পছন্দের কিছু রান্না করতে ইচ্ছা করে। আমি কিন্তু তোমাদের বাসার রান্না খেয়েছি। হলুদ, মরিচ বেশি দেয়, একটু ঝাল। আমাদের বাসার স্টাইল কিন্তু আলাদা। শাহেদ আর ওর বাবা খেতে পারবেন না। তুমি আপাতত চা নাস্তা বানাও, কয়েক মাসে বাসার রান্নার স্বাদ বুঝে গেলে তখন করতে পারবে।"

শাহেদ অফিসে গেলে সময় কাটে না। ছাদ হতে আসা বাসার কাপড়গুলো ভাঁজ করে রাখতে দেখে আন্টি বললেন, "এগুলো করার জন্য মানুষ আছে। তোমার হাতে এখন সময় আছে। মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে যাও, একবার মা হয়ে গেলে আর মেয়েদের নিজের জন্য সময় থাকে না, তখন শুধুই অন্যদের জন্য বাঁচতে ইচ্ছা করে। পড়ালেখাটা একটানে শেষ করে ফেলো। এই ভুলটা আমি করেছিলাম, মাস্টার্স আর করা হয়নি। পড়া শেষ করে কিছুদিন জব এক্সপেরিয়েন্সও নিতে পারো। মেয়েদের পায়ের নিচে মাটি শক্ত হওয়া জরুরি। এই যে দেখো আমি পরনির্ভরশীল, উপার্জনের কোনো ক্ষমতা নেই। তবে আমি যতদিন শক্ত আছি ঘরের দায়িত্ব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। নাতি-নাতনিও বড়ো করতে পারব, তোমার মায়ের হেল্প লাগবে না। ও মা, নাতি-নাতনির কথা শুনে মেয়ের গাল দেখি লাল নীল বেগুনি হয়ে যাচ্ছে হিহিহি। আরে এক্ষুণি নিতে হবে বলিনি তো...।"

লজ্জা পেয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। আন্টি কিন্তু মুখে বলেই ভুলে যাননি, সত্যিই মাস্টার্স ভর্তির ফর্ম আনিয়ে শাহেদকে দিয়ে জমাও করিয়ে দিলেন। নাহ, এই মহিলা ছাড়ার পাত্র না একেবারেই। বছরখানেক বিয়ের আনন্দে কাটাবো ভেবেছিলাম। বেড়াবো, ঘুরব, হইচই করব। বিয়ের মাত্র পাঁচ

মাস পেরিয়েছে আর নতুন সেমিস্টারে ক্লাস শুরু হবে এক মাস পরেই। আবার বই নিয়ে বসতে হবে ভাবলেই গায়ে জ্বর আসছে।

ইদানীং ভাবলে অবাক লাগে, আম্মুর কাছে যাওয়া অনেক কমে গেছে। শুরুর দিকে সপ্তাহে দুবার, কমতে কমতে এখন মাসে দুবারও যাওয়া হয় না। কথাবার্তা ফোনেই সেরে নেই। প্রতিদিনই আম্মুর কল আসে তবে আমাদের সংসার নিয়ে কিছুই জানতে চান না। বলেছেন, এদিকের কথা ওদিকে আর ওদিকের কথা এদিকে যাতে না করি। আমার মাঝে মাঝে বলার জন্য পেট ফুলে যায় কিন্তু কিছু একটা বলতে চাইলেই আম্মু থামিয়ে দেন। বলেন, "বড়ো হয়েছো, এবার তুমি ম্যানেজ করো। বিয়ের আগে অনেক শিখিয়েছি।" আমাকে বাধ্য হয়ে অনেক কিছু আন্টির কাছে জানতে চাইতে হয়।

মাঝে অবশ্য দুই-তিনবার উনার সাথে তর্ক বেঁধে গিয়েছিল। রাগ করে আম্মুর কাছে চলে গিয়েছিলাম। আম্মু ঘণ্টাখানেক পাশে বসিয়ে আদর করে দিয়ে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। ক'দিন থাকতে চাইলেও পাত্তা দেননি। শাহেদ ফ্রি থাকলে এসে নিয়ে গেছে আর ব্যস্ত থাকলে আব্বু এসে নামিয়ে দিয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় লজ্জা লাগছিল কিন্তু আন্টির আচরণে ভুলে যেতেও সময় লাগেনি।

দুপুরে আমরা কেউ ঘুমাই না। আন্টি একটা টার্কিশ সিরিয়াল দেখেন। দেখতে দেখতে আমিও সেই সিরিয়ালের ভক্ত হয়ে গেলাম। বেডরুমে টিভি থাকলেও আন্টির সাথে ড্রইংরুমে বসেই দেখি। অনেক বিষয়ে তখন আন্টির সাথে আলাপ হয়। পরিবার, সমাজ, সম্পর্ক নিয়ে উনার অভিজ্ঞতা আর ব্যাখ্যা আমাকে মুগ্ধ করে।

ক'দিনের জন্য আমাদের বাসায় গিয়েছিলাম, আব্বুর প্রেশারটা বেড়েছে। শাহেদ এসে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে, থাকেনি। সেদিন রাতে ফোনে বলল, আন্টির বেশ জ্বর। সমস্যা নেই, প্যারাসিটামল দিয়েছে ঠিক হয়ে যাবে। পরদিন রাত এগারোটার দিকে জানালো, আন্টির ডেঙ্গু ধরা পড়েছে। ক্লিনিকে ভর্তি করেছে, শরীর বেশ দুর্বল। প্লাটিলেট এক লাখের নিচে চলে এসে এসেছে, আরো নামলে হয়তো লাইফ সাপোর্ট আছে এমন হসপিটালে ট্রান্সফার করাতে হবে।

আমার বুকটা মুচড়ে উঠল। আব্বু পাশেই ছিলেন। কথাবার্তা উনার কানেও গেছে কিছুটা। আমার মুখভঙ্গি দেখেই আব্বু উঠে গায়ে শার্ট চড়ালেন।

"চলো মামনি, তোমাকে হসপিটালে নামিয়ে দিয়ে আসি।"

আমাকে ব্যাগসহ নামিয়ে আব্বু আর দাঁড়ালেন না। বললেন, "তোমার আম্মুকে নিয়ে সকালে আসব। শরীর বেশি ভালো নেই।"

কেবিনে ঢুকে ব্যাগ রেখে শাহেদের পাশে বসলাম। এর আগে এতরাতে কখনো হাসপাতালে আসিনি। কারো জন্য রাত জাগিনি। আব্বু আম্মু হাসপাতালে ভর্তি থাকলে খালা, আপু আর অন্যরা সামলেছে। আমি দিনে ডিউটি করে বাসায় চলে যেতাম। শাহেদের হাত ধরে মিনতি করে বললাম,

"তোমার অফিস আছে সকালে। রাতে আমি থাকব আন্টির পাশে। তুমি এখন যাও। সকালে অফিসে যাবার সময় নাস্তা আর আমার কিছু কাপড় নামিয়ে দিও। মিলি প্যাক করে দিবে, ওকে বুঝিয়ে বলব কল করে।"

আন্টি ঘুমাচ্ছেন। সাদা চাদরে শরীরটা গলা পর্যন্ত আবৃত। উনার ডান হাত ধরে পাশে চেয়ার টেনে বসলাম। অন্য হাতে স্যালাইন চলছে।

বিয়ের দিন হতে সব স্মৃতি মনে পড়ছে। কীভাবে মায়ের মতো আগলে রেখেছেন শুরু হতেই। নতুন সংসার কিছুই জানতাম না, কিছুই বুঝতাম না। উনার বুদ্ধি পরামর্শ মতো চলে আমি এখন

শাহেদের প্রিয় ওয়াইফ, মিলির প্রিয় ভাবী আর শ্বশুরের প্রিয় বৌমা। মনে হতে লাগল এই ভদ্রমহিলা ছাড়া এই সংসারে আমি চোখে পুরোই অন্ধকার দেখব। উনাকে আমার আরো বহুবছর পাশে দরকার, আমার অভিভাবক হয়ে, মা হয়ে ছায়া দেওয়ার জন্য।

কখন আমার কপোল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছে টের পাইনি। ফোঁটায় ফোঁটায় সেগুলো আন্টির হাতের ওপর পড়ছিল। আমি কখনো ভাবিনি, এত অল্প পরিচয়ে মাত্র কয়েক মাসে, রক্তের সম্পর্ক নেই এমন কোনো মহিলা আমার অস্তিত্ব, পরিচয় আর আবেগকে এমনভাবে ছাপিয়ে যাবেন।

উনি কখন চোখ খুলেছেন তাও দেখিনি। মৃদু হাসলেন আমাকে দেখে, “কি রে মা, কাঁদছ কেন...”

“আম্মা, আপনি আমাদের ফেলে এত তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন না। আমি আপনাকে কোথাও যেতে দেবো না।”

“আমি কোথাও যাবো না রে পাগলী মেয়ে। আরো অনেক বছর এই মেয়েটার সেবা নেওয়া বাকি। আমার দুর্বলতা জিজ্ঞেস করেছিলে না? তোমরাই আমার দুর্বলতা। তুমি কি খেয়াল করেছ তুমি আজ প্রথম আমাকে "আম্মা" ডেকেছ। এইদিনটার জন্য আমার অনেক অপেক্ষা ছিল। ডেঙ্গুটা দেখি শাপে বর হলো।”

অশ্রুসিক্ত চোখে হেসে ফেললাম, “নিয়েন সেবা দেখি কত বছর পারেন।”

চারদিন পর আম্মা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন, ব্যাগ গুছিয়ে একসাথে আম্মাকে নিয়েই বাসায় ফিরলাম।

শূন্য

সঞ্জয় সরকার

সদ্য গ্রাজুয়েট হওয়া কোনো ছেলের জন্য গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নাই। কানের চারপাশে চব্বিশ ঘণ্টা রেকর্ড বাজতে থাকে, “পড়ালেখা তো শেষ। চাকরির আর কতদিন?”

কিছু বুঝুক না বুঝুক, সবার ওই একই প্রশ্ন, চাকরির আর কতদিন। চতুর্থ বর্ষ থেকে সজল বাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। ভার্সিটির হলে থাকে। মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠায়।

অনেকদিন পর সজল বাড়িতে এসেছে। তার মাস্টার্স শেষ প্রায় বছরখানেক হলো। চাকরির পরীক্ষা দিয়েছে কয়েকটা। কোনোটাতে প্রিলি টপকাতে পারেনি। এতদিন বাবা চাকরির ব্যাপারে কিছু বলেনি। ছেলে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে। নিশ্চয়ই বড়ো কোনো চাকরির জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ছেলের এ ব্যাপারে কোনো কথা নেই। এবার ছেলেকে দুইবার জিজ্ঞেস করেছে। সজল কেমন জানি বিষয়টা এড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করা মাত্র খাওয়া ছেড়ে উঠে চলে যায়।

আজ সজলের বাবা একটু জোরাজুরি করলো। সজল রাতে খেতে বসেছে। "সজল, বাবা, তোর কিছু হইছে? পড়ালেখা শেষ করলি অনেকদিন। কোনো চাকরি-বাকরির খোঁজ নাই। কিছু হইছে বাবা? হইলে বল।"

সজল চুপ। মাথা নিচু করে প্লেটে ভাত মেখে যাচ্ছে। সজলের মা মুখ খুললেন। "সজল, বাবা আমার, কিছু হইছে? বল আমাদেরকে। মা-বাবাকে না বললে কাকে বলবি বল।"

সজলের বাবা-মা বুঝতে পারেনি ছেলেটা ভেতরে ভেতরে এভাবে পুড়ছে। "কী বলব তোমাদের বলো। কী বলবো? এটা বলবো যে তোমাদের ছেলে লাস্ট তিনটা বছর কোনো পড়ালেখা করে নাই? একটা মেয়ের পেছন পেছন কুত্তার মতো দৌড়াইছে? কী করব বলো আমাকে। এই মেয়ের জন্য কেন আমার এতো ভালোবাসা নিজেই বুঝি না। লাস্ট তিনটা বছর আমি ওর পেছনেই দৌঁড়াইছি। স্কুল-কলেজে ফার্স্ট হওয়া, তোমাদের গ্রামের গর্ব ছেলেটা একজন মেয়ের জন্য বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে শুনতে ভালো লাগবে তোমাদের? মা, তোমাদের এই গরিবী সংসার আমার আর ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে। সবকিছু বিষ বিষ লাগে আমার। সরো তো আমার সামনে থেকে।"

পরিস্থিতির কিছুই যেন মাথায় ঢোকে না সজলের বাবা-মার। ঢাকায় থেকে কল দিলে ছেলেটা কত হেসে হেসে কথা বলে। টিউশনি করে নিয়মিত টাকা পাঠায়। ছোটো ভাইটাকে পড়ালেখা নিয়ে কত বুদ্ধি পরামর্শ দেয়। সেই ছেলেটার মনে এত কষ্ট আর ক্ষোভ? কোনোদিন তাঁরা জানতেও পারলো না? এ কেমন অভিনয় তাদের সজলের!

২

কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙলো সজলের। সকাল হয়েছে কিনা বুঝতে পারলো না। দরজা খুলে বাইরে তাকালো। না। সকাল হয়নি এখনো। আবছা অন্ধকার। কান্নার শব্দ আসছে বাড়ির পেছন থেকে। তার মা বড়ো সন্তানের শ্মশানে মাথা ঠুকে কান্না করছে। সজলকে দেখে মড়া কান্না জুড়ে দিল। "আর যাই করিস বাপ, তোর বড়ো ভাই, আমার বড়ো বাপধনটার মতো আত্মহত্যা করিস না বাপ। লাগবে না আমাদের চাকরি। যতদিন লাগে বসে থাক। তারপর চাকরি করিস। তোর দাদার মতো কিছু করিস না বাপ।" কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কাজল কিছুই বুঝতে পারে না।

শুধু কাজল না। প্রথমে সজলও কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। তারা এতদিন জানতো তাদের দাদা বুয়েটে পড়তো। বাড়িতে আসার পথে বাস দুর্ঘটনায় মারা যায়। অথচ আজ মা বলছে সে আত্মহত্যা করেছিল!

বিষয়গুলো ধীরে ধীরে পরিস্কার হয় সজলের কাছে। পাশের বাড়ির সোমা বৌদির কাহিনি তাহলে এই। এই কারণে তিনি আমাদের দুই ভাইকে নিজের ভাইয়ের মতো আদর করে? মায়ের জ্বর দূরে থাক, কপাল একটুখানি গরম হলে ডাক্তার-বৈদ্য নিয়ে সোমা বৌদির হইচই ফেলে দেওয়ার রহস্য তাহলে এই? বিকালবেলা আমগাছের তলে মায়ের মাথায় তেল দিতে দিতে বৌদি যে ছেলের প্রেমের গল্প পাড়ে, সে-ই কি তাহলে তাদের দাদা? হায়! এতকিছু তাদের চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। অথচ তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেনি।

ভার্সিটির রূপসী তরুণী এই সোমা বৌদির প্রেমে পড়ে সজলের দাদা। সোমা সসম্মানে প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। আবার প্রস্তাব আসে। আবার বাতিল। এভাবে চলতে থাকল। একদিন আবেগী ছেলেটা আত্মহত্যা করে বসে! সোমা পরিবারের ঠিক করা কানাডার ছেলের বিয়ে প্রস্তাবে রাজি হলেও বিয়ে করলো সজলদের পাশের বাড়ির মা-বাবাহীন শংকরকে!

৩

এক সপ্তাহ বাড়িতে থাকা হলো। আজ ঢাকায় চলে যাবে সজল। পরিবেশ থমথমে। সোমা বৌদির সাথে বিদায় পর্ব সারতে গেল। “বৌদি।” এক ডাক দিয়ে থেমে গেল। আজ গলাটা কেমন করছে যেন। বৌদি ঘরের বাইরে বের হলো। “ভালো মতো যাও, সজল,” বলে কিছুটা থামলো।

“আই হেইট ইউর দাদা, সজল!” বলেই কান্না করতে করতে ঘরে ঢুকে গেল। হায় জীবন! ঘৃণায় ভালোবাসার এই জীবন!

বাবা আর ছোটো ভাই সজলকে বাসে তুলে দিতে এসেছে। সেই রাতের ঘটনার পর বাবা চুপচাপ। সজল বাবার পা ছুঁয়ে নমস্কার করে বাসে উঠলো। সাথে সাথে বাবাও উঠলো। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললো, “বাবা রে, আমি অশিক্ষিত মানুষ। অত কিছু বুঝি না। তবে ‘মেয়ের পেছন পেছন দৌঁড়াইছি’ বলে নিজেকে ছোটো ভাবিস না রে বাপ। যেখানে বেশি ভালোবাসা, সেখানে বেশি কষ্ট রে বাপ। তুই আরেকবার মেয়েটার কাছে যা।”

৪

ঢাকায় এসে ফের রুটিনবাঁধা জীবন শুরু। শুক্রবার চাকরির পরীক্ষা থাকে। দেয়। কোনো কাজ হয় না। এভাবে চলে যেতে থাকে প্রতিটি শুক্রবার।

একদিন লাজ-লজ্জা, মান-সম্মানের তোয়াক্কা না করে সজল আবার গেল লাবণ্যের কাছে। টিএসসির সবুজ মাঠে পাশাপাশি দুজন। সজল মুখোমুখি হয়ে লাবণ্যের হাত ধরলো। “লাবণ্য, শুনতে বাচ্চামি লাগবে। তবু বলছি। তোকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। তোর হাত দুটো লাগবে আমার। অনেক তো হলো। তিন-তিনটা বছর। এর মাঝে আমি অন্য রিলেশনে জড়াইতে চাইছি। পারি নাই। সবার মাঝে আমি তোর ছায়া খুঁজি। আমি জানি না কিছু লাবণ্য। আমি প্রতিদিন সকালে উঠে তোর মুখটা দেখতে চাই। সকালে তোর ঘুমন্ত মায়াবী মুখটা দেখলে আমার আর কিছু লাগবে না। মাঝরাতে অসহায় লাগলে আমি শুধু তোকে জড়িয়ে ধরতে চাই। আচ্ছা, শোন, দরকার হলে আমার বউ হওয়ার পর তুই অন্য কারও সাথে প্রেম করিস। যা ইচ্ছা করিস। তবু প্রতিদিন সকালে উঠে আমি তোর মুখটা দেখতে চাই লাবণ্য।”

শেষ কথায় হেসে ওঠে লাবণ্য।

তারপর সজলের দিকে না তাকিয়ে বলে, “আমার শাড়ি খুব প্রিয়।”

“তো?”

“প্রতি মাসে একটা করে শাড়ি চাই।”

“ও মাই গড! তার মানে তুই রাজি? ও খোদা, আমি এখন কী করি। খুশিতে দেখছি আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে! ও মোর খোদা! আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ!”

আক্ষরিক অর্থেই টিএসসির ভরা মজলিশে নাচানাচি শুরু করে সজল। যে কারণে তার নাচ থামে, সেটা আরও বেশি নাচানাচির কারণ। মোবাইল ভাইব্রেট করছে। কল রিসিভ করে জানতে পারলো, তার চাকরি হয়ে গেছে। সজল নিজেও ভাবতে পারছে না বিষয়টা। এত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান তার মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত সিজিপিএধারীকে কেমনে চাকরি দিল কে জানে!

আজকের মতো খুশি মন নিয়ে কখনো বাড়িতে যায়নি সজল। ট্রেনের এসি কামরায় সিট নিয়েছে। একসাথে কত স্বপ্ন পূরণের আনন্দ!

বাড়িতে পৌঁছে মাকে কোলে নিয়ে সেরকম নাচানাচি। এক জীবনের সব চাওয়া বুঝি পূরণ হয়ে গেল। আনন্দের কোনো সীমা নেই।

কিছুদিন পর জানা গেল, সজল করোনা পজিটিভ।

আমায় জড়িয়ে নিও মধ্যরাতে

অভিষেক দেবনাথ অভ্র

আকাশে মধ্যরাত।

ইদানিং আমার রাতে ঘুমানো হয় না। সারারাত কেটে যায় জেগে জেগে। ফোনের ওপাশ থেকে পদ্য ফিশফিশ করে কথা বলে। আমিও অন্ধকারে চুপচাপ বসে বসে ওর কথা শুনি। মশার কামড় খাই। কয়েল জ্বালানোর পরও মশারা ঘুমোয় না। কয়েলের গন্ধে আমার কাশি কাশি লাগে। ঘুম ঘুম লাগে। অথচ মশারা দিব্যি বনবন করে কানের আশেপাশে উড়ে বেড়ায়। রক্ত খায়। দূর থেকে একটা বাতাস এসে জানালার পর্দা ঠেলে আমার গায়ে এসেও লাগে। সে বাতাসে আমার ঘামিয়ে থাকা গায়ে কেমন যেন শীত শীত লেগে ওঠে কয়েক মুহূর্ত।

ফোনের ওপাশ থেকে পদ্য মিহি কণ্ঠে কথা বলে। ওর স্বাভাবিক কণ্ঠ এতটা মিহি না। মেয়েরা যখন মনে মনে প্রেমিকা হয়ে যেতে শুরু করে, তখন ওরা ঠিক নিজেরাও বুঝতে পারে না পরিবর্তনগুলো। খুব মিহি কণ্ঠস্বরে আদর করে কথা বলা, নিশ্বাসের শব্দেও যত্ন নেওয়া, ভালোবাসার মানুষটাকে আগলে রাখা... এসব পরিবর্তন একটা মেয়ে কখনো-ই ধরতে পারে না। ধরতে পারে হয়তো কেবল আমার মতোন সূক্ষ্মদর্শী প্রেমিকেরাই।

আমি কি পদ্যের প্রেমিক?

হয়তো হয়ে উঠছি, এখনও হওয়া কিছুটা বাকি!

কিংবা সদ্য প্রেমিক হয়ে বসেছি!

মধ্যরাতের মশারা সারা গায়ে কামড়ে চলেছে অবিরত। আমি ওদেরকে সরিয়ে দিচ্ছি না। বাতাসের ধাক্কায় জানালার পর্দা প্রতিবার অল্প করে উঠে এলেই বাইরের চাঁদের আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়ে ওঠে ক্ষণকাল। তারপর আবার পর্দা নামতেই আমার রাজ্য আঁধার।

এ আঁধার রাজ্যে গিটার কোলে নিয়ে কানে হেডফোন গুঁজে আমি ওপ্রান্ত থেকে আসা নিশ্বাসের শব্দ শুনছি। কোলে নেওয়া গিটারটায় খুব মৃদু প্লাকিং করে যেন সে নিশ্বাসের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড আবহ তৈরি করে নিচ্ছি। নিশ্বাসের গভীর নির্জনতা কাটিয়ে পদ্য চাপা স্বরে কথা বললো, “আজ গান শোনাবেন না?”

“উঁহু। আজ তোমার কথা শুনবো।”

“কিন্তু আজকে যে বাবা আছে। কথা বললে যদি শুনে ফেলে?”

“শুনলে কী হবে?”

“কিছু হবে না। প্রশ্ন করবে।”

“কেমন প্রশ্ন করবে?”

“কার সাথে কথা বলি জিজ্ঞেস করবে। আমি এখন আপনার কথা বলতে পারবো না।”

পদ্য আর আমি দু'জনেই কিছু মুহূর্ত চুপ করে থাকি। আমাদের কথোপকথনে এই নীরবতাই হয়তো সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত। আমরা যেন নীরবতার মধ্যেই কথা বলি। একে অন্যের নিশ্বাসের শব্দের অর্থ খুঁজে নিই।

রাত খুব গভীরে এগিয়ে চলছে। আমি নামহীন একটা সুর বারবার বাজিয়ে চলেছি আনমনে। জানালার পর্দা সরে বাতাস আসে, আলো আসে। পর্দা নেমে আলো চলে যায়, বাতাসের চলাচল থেমে যায়। রাত বাড়তে বাড়তে মশাদের উৎপাতও বাড়তে থাকে। দূরে মহাসড়কে একটা ট্রাক চলে যায় দগদগ শব্দ করে। মধ্যরাতের নীরবতাকে সে ট্রাকের চেয়েও বেশি নষ্ট করে বসে অনেক দূরে অনবরত বাঁশি বাজাতে থাকা কোনো নাইটগার্ড। পদ্য ফিশফিশ করে বলে, “আপনার ভয় করে না?”

আমি হেসে বলি, “ভয় কেন করবে?”

পদ্য শঙ্কিত কণ্ঠে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। তবুও কথাটা উত্তরহীন না রেখে বলে, “এমনিই বলেছি।”

আমি হাসতে হাসতে জবাব দিই, “তোমার ভয় করছে? করলে আমায় জড়িয়ে ধরতে পারো।”

আমি ভেবেছিলাম পদ্য মুখ চেপে ধরে খিলখিল করে হাসবে। কিন্তু না, ওর শ্বাস খুব গভীর হয়ে গেল। গভীর নিশ্বাসের প্রবল ধাক্কা ঠেলে ও বললো, “আপনি জড়িয়ে ধরলে আমি হয়তো কেঁদেই ফেলবো।”

“তবে যে গতরাতে বলেছিলাম তোমার ঠোঁট ভিজিয়ে চুমু খাবো?”

“উঁহু। আপনি তা বলেননি। আপনি যা বলেছেন তা আমার খুব প্রিয় হয়ে গেছে। আমি সে কথাগুলো যতবার ভেবেছি আমার সবটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। আমি একটা শব্দও ভুলিনি।”

“তবে বলো আমি কী বলেছি?”

“না। বলতে পারবো না।”

“তবে লিখে পাঠাও!”

রাত এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশের দূর প্রান্তে শিপ-ইয়ার্ডের লালচে আলো। একটা দীর্ঘ বাতাস জানালার পর্দা উচিয়ে তা দেখালো। চাঁদটাও লালচে হয়ে আছে। পশ্চিম আকাশের অনেকটা শেষ প্রান্তে। কোথাও একটা বিড়ালছানা ম্যাও ম্যাও করে কেঁদে আবার থেমে যায়। মানবশিশুও হতে পারে। পার্থক্য ধরা কঠিন। আমার কানে গুঁজে থাকা হেডফোনের ওপ্রান্তে পদ্য উঠে গিয়ে টেবিলে বসেছে। কাগজে কিছু একটা লিখছে।

সে লেখা কাগজের ছবি এলো একটু পর,

তুমি বলেছিলে, আমার দু'গাল ছুঁয়ে দিয়ে
জোর করেই ঠোঁট ভেজাবে,
আমার ওষ্ঠে কেমন নাকি মায়া আছে
তোমার তাতে ঘুম পেয়ে যায়,
আচ্ছন্নতায়!

তুমি বলেছিলে, রাত্তিবেলায় খুব জড়িয়ে চুলের ঘ্রাণে নাক ডোবাবে।
ভেবেই আমার গা ঝিমঝিম, তপ্ত শ্বাসে শরীর জুড়ে বৃষ্টি নাচে, মন কেঁপে যায়
ভীষণ জ্বরে!
আচ্ছা শোনো,
আমি নাহয় থাকবো জেগে!
আমার হৃদয়কম্প তোমায় ঘুমোতে দেবে?

পদ্যের নিশ্বাসের শব্দ কানে নিয়ে আমি এ লেখা পড়ে চুপটি করে আছি। আমার চোখে কেন যেন জল এসে যাচ্ছে। খুব ভালোলাগায় মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলে মন মাতাল হয়ে যায়। নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুখ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো নেশা।

আমি নীরবতা ভেঙে কথা বললাম, "শুনছো?"

"হুউউম..."

আমি বলতে লাগলাম,

"পদ্য,

আমি তোমার কবিতা পড়ে কবিতাতেই তোমায় জবার দিতে চেয়েছিলাম, অথচ আমার মধ্যে ছন্দ কাব্য সব কোথায় যেন লোপ পেয়ে গেল!

তোমার কবিতার প্রতিটা শব্দে, প্রতিটা বাক্যে আমার ভালোবেসে বলা, কিংবা না বলা, অথবা মনে মনে বলা কথাগুলো ছিল, অনুভূতিগুলো ছিল। আমার অনুভূতি পড়ে আমার নিজেরই অমন শীত শীত লেগে উঠলো কেন?

এটা কি শীত শীত লাগা? ভালো লাগা আর শীত শীত লাগার মধ্যে কোনো মিল তো নেই! আমার কি অনুভূতিগুলো সব অদ্ভুতভাবে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে?

আমার এতসব ভাবতে ইচ্ছে করছে না। আমি তোমায় জড়িয়ে ধরে তোমার ঘাড়ে নাক গুঁজে রাখবো। তোমার চুল আমার চোখ ঢেকে রাখবে। তোমার ঘাড় বেয়ে নেমে বয়ে যাওয়া রক্তনালী আমার ঠোঁটে জানান দেবে তোমার হৃদপিন্ড খুব দ্রুত চলছে।

আমার বুকে ছুঁয়ে থাকা তোমার বুক ধুক ধুক করে আমার বুকে কড়া নাড়বে। বলবে, 'আসতে পারি?'

মধ্যরাত্রির নীরবতা পেরিয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত। ওপাশে চুপচাপ শুয়ে আছে পদ্য। ও কিছু বলছে না। মশার পরিমাণ একটু কমে এসেছে। কয়েল যতক্ষণ জ্বলেছে মশারাও জ্বালিয়েছে। এখন কয়েল জ্বলে ফুরিয়ে গেছে, মশাদেরও হয়তো আর রক্ত খেতে ভালো লাগছে না! গিটারটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে, এসে শুয়ে পড়লাম। পদ্য ওপ্রান্ত থেকে বললো, "আপনি ঘুমিয়ে যাবেন? আমি ঘুমাবো?"

"আমি না ঘুমানো অবধি তুমি ঘুমাবে না।"

"আপনি আমার সব ঘুম কেড়ে নিয়ে ঘুমাবেন?"

"তোমাকে জাগিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ার দায় দিও, অসুবিধে নেই।"

"আমি কী করে ঘুমাবো?"

"আমায় জড়িয়ে!"

প্যারোডি

দু'দুটো ঘর

খাদিমুল মুরছালীন রিয়াদ

শুধু দুটো ঘর, সম্বল ছিল মোর, আর সব গেছে ঋণে,
বাবু বলিল, বুঝেছ সোনা, একটা আইফোন লইব কিনে।
কহিলাম আমি, তুমি রাজকন্যা, ফোনের অন্ত নাই,
চেয়ে দেখো মোর, আছে বড়োজোর ভাঙা হুওয়াই।
শুনি সোনা কহে, বাবু, বান্ধবী কিনেছে একখানা,
পেলে নতুন আইফোন, সে ও আমি, সমান হইব টানা।
কিনে দিতেই হবে? কহিলাম আমি করিয়া আর্তনাদ,
সজল চক্ষে, বেঁচব কোনো দুঃখে মাথার উপরের ছাদ।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
আইফোন কেনার তরে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল সোনা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিল শেষে ক্রুর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'
পরে মাস-দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে-
করিল কেস, করেছি তার শেষ, রুমডেট নামক রথে।
মেয়েরা হায়, সবাই বেশী চায়, যদিও থাকে ভূরি ভূরি,
গফের হস্ত করে সমস্থ বফের ধন চুরি।
হইয়া নিঃস, ঘুরিয়া বিশ্ব, কাটিল বছর বিশ,
মন আনচান, যদি ফিরিতে পারিতাম, স্বগৃহে ইশ!
এতকাল পরে, শীতের শেষ প্রহরে, দেখিলাম স্বগৃহ,
ফুরিয়েছে তাবৎ, শান-শওকত, আমি আজ বড়ো নিরীহ!
মাগিলাম ঠাঁই, রাত্রিযাপন করতে চাই, শীত করেছে কাবু,
ওদিকে আপনমনে, সাধের আইফোনে, সেলফি তুলছিল বাবু!
হইয়া ক্ষিপ্ত, গজগজে লিপ্ত, বলিল গিয়া দাসী,
আশ্রয় চায়, এই জায়গায়, গেঁয়ো এক পরবাসী।
শুনে বিবরণ, ক্রোধে বাবু কন, এ তো সাধুবেশী চোর,
মম আইফোন নিয়ে, যাবে পালিয়ে, হইবার আগে ভোর!
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি বাবু সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

[কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘে জমি' কবিতা অবলম্বনে রচিত]

দোষী

শাহ বখতিহার

দেশের এক উত্তাল সময়ে চার বছরের কন্যা শিশুকে রেখে আমার বউ মারা গেল। আমি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ত্রিশোর্ধ যুবক, বেশ ঘটা করেই বউ মরার শোক পালন করলাম। জমকালো শোক পালন যাকে বলে, আত্মীয়স্বজনেরা একেবারে অভিভূত হয়ে গেল।

বউ থাকতে আমি নিজের কন্যাকে শুধু ভালোবেসেছি, যত্ন তেমন নিয়েছি বলে মনে পড়ে না। এই ব্যাপারটা আমি ঘরোয়া কাজের ভেতরই ফেলেছিলাম, আর ঘরোয়া কাজগুলো অবিসংবাদিতভাবে আমার বউকেই করতে হতো। আমার মা, মোসাম্মৎ জামেলা খাতুন, গত বছরে যিনি প্রয়াত হয়েছেন তিনি বছর ছয়েক আগে এক অশুভক্ষণে সুমাকে পছন্দ করেছিলেন। স্বল্পশিক্ষিত, সুন্দরী-রসবতী, গ্রাম্য সহজ-সরল কমবয়সী নারী, আমার মতো অবস্থানের কারোর জন্য একেবারেই সাদামাটা ব্যক্তিত্ব। বিয়েতে আমার একদমই মত ছিল না। না থাকাটাই স্বাভাবিক। যে মেয়ে ঠিক করে নিজের নামই বলতে পারে না তাকে একজন শিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমী যুবা পুরুষ কী করে মেনে নেবে! ও সুমার জায়গায় সবসময় বলতো, “চোমা।”

আমি শুনতাম আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। এই জীবনে যতবারই আমি মায়ের কথা শুনেছি ততবারই উপকৃত হয়েছি, শুধু এই বিয়েটাই সম্ভবত ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু বিয়ের পর বউকে তো ফেলে দেওয়া যায় না। তার ওপর গ্রামের মেয়ে, একবার ডিভোর্সি তকমা জুটে গেলে হয়রানির চূড়ান্ত হবে, চরিত্রে মিথ্যে দাগও সত্য হিসেবে সেঁটে যেতে পারে, এই চিন্তায় ডিভোর্সের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিলাম।

সুমা বুঝতো ও আমার যোগ্য নয়। তাই সমতায় থেকে স্বামী-স্ত্রী ধরনের ভালোবাসাবাসির চেষ্টা ও কখনই করেনি। বাড়িতে থাকতো, কাজের মেয়ের সাথে মিলেমিশে ঘরের কাজ করতো, রাতে আমার সাথে শুতে আসতো। পছন্দের মাঝে শুধু ওর শরীরটুকুই আমার পছন্দের ছিল। সঙ্গম চলতো মধ্যরাত পর্যন্ত। তারপর যথারীতি বাথরুম হয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়তাম। এভাবেই চলছিল দিন।

প্রথম বছরে আমরা কোনো সন্তান নেইনি। দ্বিতীয় বছরেও না। সুমার বয়স অত্যন্ত কম ছিল, মোটে উনিশ কী বিশ, আমার ভয় ছিল উল্টাপল্টা কিছু হয়ে যাওয়ার। এছাড়া বঙ্গদেশীয় ললনারা প্রেগনেন্সির সময় এবং পরে অনিচ্ছাতেই হোক আর সুযোগের অভাবেই হোক, বাড়তি কায়িক শ্রম করতে চায় না, শরীর নষ্ট করে ফেলে। আমি অত তাড়াতাড়ি বউয়ের মাঝের নিজের একমাত্র পছন্দের উপাদানটি নষ্ট করতে চাইনি। কিন্তু আমার অশিক্ষিত বউ এই ব্যাপারটি বুঝতে পারলো না। মায়ের প্ররোচনাতেই হোক আর নিজের বুদ্ধিতেই হোক, তার মনে হলো আমি নিশ্চয় বাইরের কোনো নারীকে বিয়ে করার কথা ভাবছি। নাহলে সন্তান নিচ্ছি না কেন? এত বছর হয়ে গেল, সমস্যাটা কী? আর সমস্যা থাকলে সমস্যার সমাধান কী?

আমার বউ সমাধান বের করলো। এক রাতে সে কনডম খুলে পেট বাঁধিয়ে ফেলল। উত্তেজনার শিখরে থাকায় আমি ব্যাপারটা আবছায়াভাবে খেয়াল করলেও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। মাস

পাঁচেক পরে যখন আমি বউয়ের অল্পস্বল্প ফোলা পেট লক্ষ্য করলাম ততদিনে দেরি হয়ে গেছে। গর্ভপাত করানোরও আর সুযোগ নেই। আর তা যদি করাতামও তবুও যেই লাউ সেই কদুই হতো। লাভের লাভ কিছুই হতো না।

আমি রাগ দেখাতে পারিনি। ব্যক্তিত্বহীন মানুষদের সাথে রাগ দেখানোটা অর্থহীন। আমি শুধু শান্ত ভঙ্গিতে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলাম, "বাচ্চা যখন আসছেই তখন আর কী করার! ভারী কাজ বাদ দাও আর ছাদে যেয়ে টুকটাক হেঁটো।"

চাবি দেওয়া পুতুলের মতো সুমা মাস দেড়েক আমার কথা শুনলো। তারপর এলেন আমার মা। সে এসে প্রথমেই বউয়ের ছাদে যাওয়া বন্ধ করলেন। পোয়াতি অবস্থায় নানান জিনিস নানান নজরে তাকায়, খারাপ বাতাস গায়ে লাগতে চায় ইত্যাদি নিয়ে চিন্তিত হওয়ায় পুত্রবধুর ছাদে যাওয়া তিনি রোধ করলেন। দ্বিতীয়ত তিনি যা করলেন তা আরও ভয়াবহ। কাজের মেয়েকে বিদায় করে ওর কাজগুলো নিজে করতে চাইলেন এবং বার্ধক্যজনিত কারণে দু-চারদিনেই সেই চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে আগের জীবনে ফিরে এলেন। এদিকে পাছে কাজগুলো আটকে থাকে সেই আশঙ্কায় এত বড়ো পেট নিয়ে আদর্শ বাঙালি গৃহিণীর মতো আমার বউ বাসার সমস্ত কাজ একা একা করতে থাকলো। আমি এই ব্যাপার সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। জানলাম সেদিন যেদিন বউয়ের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা উঠলো। অ্যাম্বুলেন্স এলো। আমি মাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে শুনলাম, বউয়ের আর্লি ডেলিভারি করতে হবে, অবস্থা বেশি ভালো নয়। আমাকে কাগজ পত্রে সাইন করতে হবে। আমি গেলাম স্বাক্ষর দিতে। সেখানে এক মহিলা গাইনোকোলজিস্ট একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার চরিত্রের তুলোধুনো করলেন। কী করে গর্ভবতী একজন নারীর পেটের ওপর এত প্রেশার পড়তে পারে তা নিয়ে কম করে হলেও তিনি আমাকে পঞ্চাশটি খোঁচামারা কথা বললেন। আমি হতবিহ্বল হয়ে ভাবতে শুরু করলাম, "আসলেও তো! কী করে!"

বাচ্চা হলো। বাচ্চার মাও কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলো। আমি তার লোহার ট্রাংক ঠেলে সরানোর কীর্তিসহ আরও নানান কীর্তির কথা জানলাম। শুনে শুনে থমথমে রাগে ভেতরে ভেতরে প্রায় ফেটে পড়লাম। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসবের অর্থ কী আম্মা?"

মা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভঙ্গিতে পান মুখে দিতে দিতে বললেন, "ঐ বাচ্চা বিয়ানোর সময় ওমন একটু হয়ই বাপজান। তারপর আবার প্রথম সন্তান তার জন্যে... তুই জন্মের সময় কী হইসিল আমার এখনো মনে আসে। তোর দাদী তো..."

আমি চোয়াল শক্ত করে মায়ের কথা শুনতে থাকলাম। অশিক্ষিত মানুষের সাথে যুক্তিতর্ক করা যায় না। আর শ্রদ্ধার মানুষের সাথে যুক্তি দেখানোটাও কঠিন। ভারী কাজ করানো নিয়ে প্রশ্ন করলে হয়তো "কেন আমরা মনে হয় করি নাই..." জাতীয় কথা বলতে শুরু করতেন। তিনি যেই পরিবেশে জীবন কাটিয়েছেন তাতে এই কথা বলার জন্য আলাদা করে আসলে দোষ দেওয়াও যায় না। তাকে কে বোঝাবে, নিজে কষ্ট করেছেন দেখে যে অন্যকেও কষ্ট করাতে হবে, এটা একেবারেই একটা স্বার্থপরের মতো মাথার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ভ্রান্ত ধারণা। এই ধারণার ভিত্তি সেই গত শতকেই মিটে গেছে।

মাকে বোঝানো সম্ভব হলো না। তিনি চলে গেলেন। সুমার স্বাস্থ্যও অনেকটা ছেড়ে দিল। এদিকে প্রায় দেড় মাস আগে হওয়া মেয়েটার জন্য আমাকে বাড়িতে নার্স রাখতে হলো। তার অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না। খুবই কান্নাকাটি করতো। সময়ে সময়ে তো আমার মনে হতো মেয়েটা বোধহয় বাঁচবে না। কিন্তু মেয়ের প্রাণ তার মায়ের মতো ছিল না। সে ঠিক এখনও টিকে আছে, মরে গেছে তার মা, আমার বউ, সুমা।

যে বছর আমাদের কন্যা সন্তানটি জন্মালো তার পরের বছর আবারও সুমা গর্ভবতী হলো। আমি ভেবে পেলাম না এবারে সে কী ভেবে বাচ্চাটাকে পেটে ধরেছে! এবারে আমি আগের মতো নিজের বিরক্তি চাপার তেমন চেষ্টা করলাম না, বউয়ের মাতৃত্বকালীন যত্নের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থাও নিলাম না। নেওয়ার কোনো যুক্তিও ছিল না। এক ভুল দুইবার মাফ করা যায় না। আর তাও যদি আমি ওকে ভালোবেসে বিয়ে করতাম, আমি তো ওকে ভালোও বাসতাম না। ফলাফলস্বরূপ দ্বিতীয় সন্তান ডেলিভারির দিন মৃত হিসেবে বের হলো। দুই দুইবার সিজার হয়ে যাওয়ায় ডক্টর আমাকে আর কোনো বাচ্চা না নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি বাড়িতে এসে সেই পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। সত্যি বলতে দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যুতে আমার তেমন খারাপ লাগার মতো কিছু ছিল না। যে সন্তান আমি চাইনি তার জন্যে খারাপ লাগানো উচিত এমন আমার কখনও মনে হয়নি। সামনে যে হবে এমনও মনে হচ্ছে না।

একটা বছর মোটামুটি পরিকল্পনা মাফিক চলল। এরপর আমরা এক রোজার ইদে বাড়ি গেলাম এবং ফিরে এসেই মাস দুয়েকের ভেতর শুনতে পেলাম, সুমা আবারও গর্ভবতী হয়েছে।

এবারে যথেষ্ট যত্নের ব্যবস্থা করলাম।

মাস ঘুরে ঘুরে বছর পাল্টালো। মাও ঢাকায় এলেন। তারপর এলো ডেলিভারির ডেট। অটিতে শুয়ে সুমা পেটের বাচ্চাসহ ওপারে চলে গেল। অটির দরজার এপারে আমার মা খবরটা শুনতে পেয়ে আহাজারি করতে করতে বললেন, "অমুকের বউয়েরও একি অবস্থা ছিল, ডাক্তারে পেটে চাপ দিয়া মাইরা ফেলাইসে...।"

আমি যথারীতি দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলাম।

অশিক্ষিত মানুষের সাথে তর্ক করে আনন্দ আছে। কিন্তু যুক্তিতর্ক করে কোনো আনন্দ নেই।

গল্পটা সেই সময়ের

আলিম আল রাজি

আম্মা-ফুপুদের আলোচনা বেশিক্ষণ শোনার অধিকার আমাদের ছিল না। ৫/৭ মিনিট কথা বলার পরেই তারা চলে যেতেন কালাম-সোনিয়া প্রসঙ্গে।

আম্মা গলা নিচু করে ফুপুকে জিজ্ঞেস করতেন, "জানো নাকি, কালামের সাথে তো সোনিয়ার লাইন।"

"কী বলেন ভাবি! সোনিয়ার সাথে তো আমার পরশুদিনও দেখা হলো। আমাকে তো কিচ্ছু বললো না।"

"বলবে কেন? কত কাহিনি যে করেছে!"

আলোচনার এই পর্যায়ে আম্মা আমাদেরকে ইশারা দিতেন, "যাও, বাইরে থেকে খেলাধূলা করে আসো।"

অর্থ পরিষ্কার– আমরা এখন বড়োদের আলোচনা করবো। তুমি ফুটো।

আমরা খেলতে যাওয়ার পরম আরাধ্য অনুমতি পেয়েও তখন খেলতে যেতাম না। আলোচনার আশেপাশেই ঘুরঘুর করতাম। কালাম ভাই এবং সোনিয়া আপার 'লাইন'-এর সর্বশেষ অবস্থা কিছুটা জানার চেষ্টা করতাম।

...অবশ্য আমরা আগে থেকেই জানতাম। একদম গল্পের শুরু থেকেই সব জানতাম।

সোনিয়ারা ভীষণ নিষ্ঠুর ছিল। কালাম ভাইরা সব ভয়কে জয় করে সোনিয়াদের বই-এর ভেতরে প্রেমের চিঠি রেখে আসতেন। নিষ্ঠুর সোনিয়ারা সেই চিঠি নিয়ে যেত হেড স্যারের রুমে। হেড স্যার ডেকে পাঠাতেন কালাম ভাইকে।

হেড স্যারের রুমে কী হতো আমরা জানতে পারতাম না। তবে দেখতাম, ঐদিনের পর থেকে কালাম ভাইরা অনেক নীরব হয়ে যেতেন।

কালাম ভাইরা নীরবতা ভাঙতেন মাস দু-এক পরে। তাদেরকে দেখা যেত স্কুল থেকে দূরের রাস্তায়। এই রাস্তা ধরেই সোনিয়ারা প্রতিদিন স্কুলে আসে। কালাম ভাইরা সেখানে লিখে রাখতেন K+S. সোনিয়ারা সেটা দেখতো। দেখে চোখ সরু করে মুখে রহস্যময় হাসি নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কালাম ভাইয়ের দিকে তাকাতো। কালাম ভাইয়েরা যা বুঝার বুঝে নিতেন।

পরের সপ্তাহে কালাম ভাই এবং সোনিয়া আপাকে একসাথে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা যেতো কমন রুমের পেছনে অথবা স্কুলের পেছনের শতবর্ষী বট গাছটার আড়ালে।

দর্শক হয়ে থাকা আমরা ধীরে ধীরে গল্পের চরিত্র হয়ে উঠতাম। কালাম ভাই আমাদের হাতে চিঠির খাম আর ছোট্ট একটা লাল বাক্স দিয়ে বলতেন, 'এটা সোনিয়া আপাকে দিবি। কেউ যাতে না জানে। আর সাবধান, ভুলেও বাক্স আর খাম খুলিস না।'

একটু আড়ালে গিয়েই আমরা বাক্স আর খাম খুলে ফেলতাম। লাল বাক্সে থাকতো কাজল। হলুদ খামে থাকতো চিঠি। আমরা চিঠিও পড়তাম – 'প্রিয় সোনিয়া...'

সোনিয়া আপাও আমাদেরকে খাম দিতেন। সে খামও আমরা খুলে ফেলতাম। ভিতরে গোল গোল অক্ষরে লেখা থাকতো – 'ওগো কালাম, আসসালামুআলাইকুম...।'

ঘটনা আগাতো। আম্মা এবং ফুপুর আলোচনায় নতুন নতুন গল্প জন্ম নিতো–

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ সোনিয়া কী করছে জানো নাকি?"

"না তো!"

"সারা দুনিয়ার মানুষ জানে আর তুমি জানো না?"

"বলেন তো... শুনি।"

আম্মা আমাদেরকে আবারও বাইরে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। যথারীতি এসব আলোচনায় আমরা অবাঞ্ছিত।

হ্যাঁ, সবাই জেনে যেত। জানতেন সেই হেডস্যারও। আবার তার রুমে ডাক পড়তো কালাম ভাইয়ের। রুমে এবার নতুন দুই চরিত্র। সোনিয়া আপার বাবা এবং চাচা।

ভেতরে কী হতো আমরা জানতে পারতাম না। কিছুক্ষণ পর দেখতাম কালাম ভাই বের হচ্ছেন। তার মাথা নিচু। হাঁটায় হাজার বছরের ক্লান্তি।

কিছুদিন পর আম্মা এবং ফুপুর আলোচনা থেকে আমরা জানতাম সোনিয়া আপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

"জানো নাকি? সোনিয়ার তো বিয়ে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, জামাই কুয়েত থাকে। সোনিয়াকে ১৩ ভরি স্বর্ণ দিয়েছে। আগামী শুক্রবার বিয়ে।"

এই আলোচনায় অবশ্য আমরা অবাঞ্ছিত ছিলাম না। বিয়ের খবর শুনে আমরা আনন্দিত হতাম। বিয়ে মানেই তো আনন্দ!

বিয়ের দিন দল বেধে খেতে যেতাম। সবাই যেত। বিয়ে বাড়িতে অনেক ভীড় হতো। সেসব ভীড়ে কালাম ভাইদেরকে কখনো দেখা যেত না। তারা মনে হয় ব্যস্ত থাকতেন।

...অনেক চন্দ্রভূক অমবস্যা কেটে গেছে।

গ্রামে গেলে কালাম ভাইদের সাথে দেখা হয়। সুখের সংসার। দুটো ছেলে, একটা মেয়ে।

মাঝে মাঝে দেখা হয় সোনিয়া আপাদের সাথেও। দেখা হলে বলেন, 'সেদিনের ছেলে তুমি। বড়ো হয়ে গেলা। বিয়েশাদী করবা কবে?'

তাদের সাথে দেখা হলে আমার আরেক জন্মের কথা মনে পড়ে। সে জন্মে একটা স্কুল ছিল, একটা বটগাছ ছিল, বটগাছের পাশেই ইটের একটা দেওয়াল ছিল, সে দেওয়ালের পাশে রাগী হেডস্যার পানের পিক ফেলতেন।

কালাম ভাই বা সোনিয়া আপাদেরও সেই জন্মের কথা মনে পড়ে কিনা কে জানে!

এমন দিনে তারে বলা যায়...

শরীফ মজুমদার

সেই শৈশবকালে যখন পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবির একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলাম তখন কত সাধ ছিল পুস্তক হস্তগত কাহারও সহিত হেড টু হেড একটা বিষম ধাক্কা খাইব, তারপর উহার হস্তগত তাবৎ পুস্তক ধাম করিয়া প্রপাৎ ধরনীতল হইবে।

“ওহ, সরি সরি,” বলিয়া যেই না পুস্তকগুলি উঠাইতে যাইব অমনি উহার ললাটের সহিত আমার ললাটের ঠোকাঠুকি হইবে, তাহার পর হইবে দৃষ্টিবিনিময়! অতঃপর আমরা, সে আর আমি 'দুজন দুজনার কত যে আপন' হইয়া যাইব! কিন্তু আমার দীর্ঘ বিদ্যালয় জীবন কাটিল নিঃসঙ্গ, একাকী, ধাক্কাবিহীন!

অবশ্য উহাতে আমি বিন্দুমাত্র দমিবার পাত্র নই। না খাইলাম ধাক্কা, অপরাপর কোনো ফন্দিফিকির তো আলবৎ রহিয়াছে। তদ্দিনে বাংলা ছায়াছবিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে। আর বিপ্লব আসিয়াছে আমার মনে- মগজেও! এখন তখন আমার দুই চক্ষুব্যাপীয়া স্বপন নামে- বখাটেরা এক সুন্দরী রমণীকে টিজ করিতেছে, আর আমি ইয়া ঢিশুম ঢিশুম করিয়া সব কটাকে ব্যাপক ঠেঙাইয়া একাকার করিয়া সুন্দরী রমণীর চোখে হিরো বনিয়া গিয়াছি। অতঃপর আমরা, আমি আর সে ‘দুজন দুজনার কত যে আপন’ হইয়া যাইব! কিন্তু আঁখির স্বপন আঁখিতেই রহিয়া গেল। উহার হেতু এই যে মনে-মগজে থাকিলেও, আমার বাইসেপস ট্রাইসেপস এ বৈপ্লবিক কিছু মজুদ ছিল না!দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা হিসাব করিয়া একটা সুপারি পাতার সেপাই বলা চলে!

কিন্তু, "সবার জীবনে প্রেম আসে, তাই তো সবাই ভালোবাসে" বাংলা সিনেমার এই অমোঘ বাণী মোতাবেক খানিকটা বিলম্বে হইলেও আমারও ঘটনা ঘটিয়া যায়। ঘটনা সবিস্তারে এই - নতুন বাসায় উঠিবার সপ্তাহখানেক পর এক প্রত্যুষে পার্শ্বদ্বার প্রতিবেশী আন্টি আসিয়া 'টিডিং' করিয়া দোরঘণ্টি বাজাইয়া গ্যাস সিলিণ্ডার কী করিয়া সংযোগ করিতে হয় - এই উপায় আমার জানা আছে কিনা জানিতে চাহিলেন এবং থাকিলে কৃপা করিয়া একটু কর্মটা সাধন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রাতরাশের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আসিবার সলজ্জ অনুরোধ রাখিলেন। উল্লেখ্য, আমাদিগের ভবনটা নতুন নির্মিত হইয়াছে। বাড়ীওয়ালার কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ উৎকোচ প্রদান সত্ত্বেও এখন অব্দি গ্যাসের সংযোগ আসিয়া পৌঁছায় নাই এবং নিকট ভবিষ্যতে উহার আসিবার কোনোপ্রকার সম্ভাবনাও নাই।

যাহা হউক, আমার সদয় চিত্ত। তৎক্ষণাৎ আন্টির সহিত গেলাম। দেখি, এক পেটমোটা টাক্কু বেলমাথা ফর্সা ভদ্রলোক সিলিণ্ডার লইয়া হাপিত্যেশ করিয়া মরিতেছেন। ঠাহর করিলাম ইহাই আংকেল হইবেন।তাহার পার্শ্বে মাথায় বিশাল ঘোমটা টানা এক তরুণী মূর্তি দণ্ডায়মান। আমি দুইজনকে পাশ কাটাইয়া দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে গিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিলাম। সিলিণ্ডারের সংযোগ দেওয়া এহেন সহজ কম্ম জানিয়া উহারা তিনজনই; বিশেষ করিয়া পেটমোটা আংকেল যারপরনাই বিব্রত ও লজ্জিত হইলেন। 'ধন্যবাদ' লইয়া আসিবার কালেই ঘটনা ঘটিয়া গেল।মাতাজীর আড়ে আড়ে কন্যা যখন ঈষৎ দৃষ্টি মেলিয়া লুঙ্গি স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরিহিত বান্দাকে দেখিয়া ফিচিক করিয়া একখানা কৌতূকের মুচকি হাসি মারিল, তখনই হৃদয়ে বান ডাকিল। অন্তরের অন্তস্থল হইতে উচ্চারিত হইল, "পাইলাম! আমি ইহাকে পাইলাম!" এইভাবে উচ্চারিত হইবার কারণও ছিল। ইন্টারের বাংলা পুস্তকে যে হৈমন্তীর চিত্র কল্পনা করিয়াছি, এ যেন সেই হৈমন্তী! এখন আর কি। শুধুই রিলেশনশীপ স্ট্যাটাস যাচাই করিবার বাকী।

সেও দিন কয়েকের ব্যাবধানেই হইয়া গেল। এবং উহা বিধাতার প্রত্যক্ষ মদদেই বলা চলে। কারণ পরিচয়ের পক্ষকাল বাদেই অধমের গৃহশিক্ষকতার খ্যাতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত হইয়া ইন্টার পড়ুয়া কন্যার মাতা কন্যার যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত অধমকে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সাদামাটা স্ক্রিপ্ট। কোনো ইন্দ্রজাল নাই, ভানুমতীর খেল নাই! হৃদয়ে দ্বিতীয়বার বান ডাকিল। প্রথমে রুটিন মাফিক 'আমার তো এখন একদমই টাইম নাই আন্টি' কহিয়া গাঁইগুই করিলেও কন্যার মাতার বারংবার 'পীড়াপিড়ীতে' প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলাম।

তরুণীর নাম মনিকা জামান। বাসায় তাহাকে কেহ মনি ডাকে, কেহ বা মন। আউটস্ট্যাণ্ডিং ছাত্রী সে না। তবে উহাকে মেধাবী বা ভালো ছাত্রীর তকমা দিলে অত্যুক্তি হইবে না মোটেও। কোনো জিনিসে একবারে উহার মন ভরে না। বারংবারে বিভিন্নভাবে বুঝাইতে হয়। প্রথম প্রথম ছাত্রী-শিক্ষক উভয়পক্ষই বেশ জড়োসড়ো হইয়া থাকিতাম। উহার চোখের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে চোখাচোখি হইলেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিত। যেন এইমাত্র কোনো ফৌজদারি অপরাধ সংগঠিত হইয়াছে। হাকিম এখনই 'অর্ডার অর্ডার' করিয়া ইহার দণ্ডবিধান করিবেন। তবে জড়তা কাটিতে মাসাধিকের বেশি কাল ব্যয় হইল না। সে এমনই যে ছাত্রীর প্রতি সম্বোধন 'তুই' তে নামিয়া আসিল। আর নামও হইল তথৈবচ, 'মন'! শিক্ষক-ছাত্রীতে পড়ানো-পড়া যত না হইত, আউট অব সিলেবাস আলোচনা হইত বিস্তর। উঠতি বয়সী বালিকাদের ন্যাকামি, বালকদের নষ্টামি-ছ্যাবলামি, শিল্প, সাহিত্য, জীবনবোধ, হলিউড, বলিউড, বাঙ্গাল মন্ত্রী, এমপি - হেন বিষয় নেই যাহা আউট অব সিলেবাসের সিলেবাসে ছিল না। উহাতে মাঝে-মধ্যে মতের অমিল হেতু তর্ক হইত, ঝগড়া হইত,

মান-অভিমানও হইত। আর এতে করিয়া সর্বনাশটা হইয়াছে আরও বেশি। সর্বনাশ কী তাহা বিস্তারিত বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সর্বনাশটা একপক্ষীয় না উভয়পক্ষীয় উহার পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণাদী ছিল না। কিংবা দুইটার পক্ষেই যথেষ্ঠ শক্ত তথ্য-প্রমাণ মজুদ ছিল।

আমি সংস্কারমনা। শিক্ষক হইয়া ছাত্রীর সহিত উল্টাপাল্টা করিব এ হীন মানসিকতা কোনোকালেই ছিল না। আর আত্মসম্মানবোধও ছিল টনটনে। তাই আমাদের কোনোকালেই; এমন কি ঘোরতর অনিচ্ছাতেও আঙ্গুলের স্পর্শ হয় নাই। টেবিলের নিচে পা'রাও এই সংস্কার মানিয়া চলিত। শিক্ষক হিসাবে দুর্নাম হইবে হেন কাজ হইতে আমি সহস্র হস্ত তফাতে থাকিতাম। তাই পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় নিয়ে আলাপ সালাপ হইলেও উহা পোষাইবার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিতাম। উহাতে মনিকার মাতা-পিতা দুইজনেরই সুদৃষ্টি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি।

এমনিভাবে কেমন করিয়া যে চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে উহা পঞ্জিকা ভিন্ন কেহ বলিতে পারে না। কলেজ পড়ুয়া তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরতা হইয়াছে। পড়াশোনার পাট চুকাইয়া আমিও একখানা প্রেস্টিজিয়াস চাকুরী জুটাইয়াছি। তবে 'মন' কে এখনও মাঝেসাজে পড়া দেখাইয়া দেওয়ার ডাক পড়ে। ইহাও ভাগ্যবিধাতার আরেকখানা প্রত্যক্ষ মদদ। মণিকা আমারই সাবজেক্টে স্নাতক করিতেছে! এই ক'বৎসরে কতকিছু বদলাইয়া গিয়াছে। কত মন্ত্রী কত আউল ফাউল কথা বলিয়া হাজার হাজার ট্রলের শিকার হইয়াছেন। কত জন কত ভাবে ভাইরাল হইয়াছে। শুধু মন আগের মতোই সিঙ্গেল আছে। প্রতিরাত্রেই উহার প্রোফাইলে গিয়া রিলেশনশীপ স্ট্যাটাস নিরীক্ষা করা নিত্যকার রুটিন হইয়া গিয়াছে আমার। আর একখানা বস্তু নিরবে নিভৃতে বাড়িয়া উঠিয়াছে – সর্বনাশ। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া উহা এখন মহাসর্বনাশে পরিণত হইয়াছে।

এমনই একদিন এই পৃথিবীতে করোনা নামক এক ভয়াবহ মহামারী আসিল। মানুষ আক্রান্ত হইল লাখে লাখে, মরিতে লাগিল এন্তার। অচিরেই সেই ঢেউ পৌঁছাইল বঙ্গদেশে। দিন দিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল লাফাইয়া। গলায় একটু কিছু হইলেই ভয় হয়। গা একটু গরম হইলেই বক্ষ্যে কাঁপন ধরিয়া যায়। ঘরবন্দী থাকিতে থাকিতে সবাই হাঁপাইয়া উঠিল। কী অস্থির, অসহায়, ভয়ংকর এক কাল! সেই সাথে আমার বুকের ভার আরও বাড়িয়াছে। এখন প্রতি মুহূর্তেই হিয়ার মাঝে কেবলই 'মন' বাজে। মাঝরাত্রিতে প্রায়ই নিদ্রা ছুটিয়া যায়। বিধাতাকে শাপ-শাপান্ত করি। অভিমান করি। কেন 'মায়া' নামক এই আজব জিনিসটা মানুষের মনবন্দী করিয়া দিতে হইবে তাঁহার! যদি করোনা হয়? যদি মরে যাই? আমি মনস্থির করি। বুকের ভার নামাইব এইবার। একটা এসপার ওসপার করিবই।

দুইদিন বাদে মনিকাদের বাসায় ডাক পড়িল। কোয়ারেন্টাইনের এই অবসরে পাঠ যতটুক সম্ভব আগাইয়া রাখিতে চায়। আমাকে এখন রোজ যাইতে হইবে। আমি প্রস্তুতি নিলাম। হুমায়ূন পড়িলাম। শীর্ষেন্দু পড়িলাম। জীবনানন্দ, কিটস, কোলারিজ আওড়াইলাম। হারুকি মুরাকামি গিলিলাম। রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া বুকের বল বাড়াইলাম।

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর করোনায়

এইবার হয় এসপার নয় ওসপার।

মনের পড়ার ঘরের বাইরে একখানা বারান্দা আছে। এতবড়ো যে উহাকে দুই চিলতেও বলা যাইবে অনায়াসে। মনিকা উহাতে নানাজাতের ফুলের গাছ লাগাইয়াছে। পৃথিবীতে মনের ছয়টা জিনিসের প্রতি দুর্লঙ্ঘ আকর্ষণ – বৃষ্টি, জোছনা, ফুল, বই, চা আর রঙ-বেরঙের হিজাব। আমাকে দিয়া একখানা পিটুনিয়া আর নয়নতারার চারা আনাইয়াছিল। উহারা বেশ বাড়িয়া ফুলবান হইয়া অনেকখানি শোভা বাড়াইতেছে বাগানের! কতদিন এইখান হইতে জোছনা, বৃষ্টি দেখিবার বিলাস করিয়াছি। কত পরিচিত বারান্দা। অথচ আজ চাহিতেই বুকটা কাঁপিয়া উঠিতেছে!

"ভাইয়া!"

মনিকার ডাকে সম্বিৎ ফিরিল। অদ্ভুত দৃষ্টি মেলিয়া সে আমার দিকে চাহিয়া আছে।

"আপনার কিছু হয়েছে নাকি? শরীর খারাপ?"

মেয়েটার জিজ্ঞাসায় কেমন মায়া! আহা! আমি বুকের কাঁপন উপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "না, তেমন কিছু না।"

"শরীর খারাপ থাকলে আজ না পড়ি? আপনার চোখ কেমন লাল লাল দেখাইতেছে।"

"ঘুম হয় নাই রাতে।"

"ইনসমনিয়া না প্যারাসমনিয়া?"

আমি হাসলাম। মনিকাকে "ইনসমনিয়া", "প্যারাসমনিয়া" শব্দগুলি আমিই শিখাইয়াছি।

খানিকটা কৌতূকের স্বরে ও আবার জিজ্ঞাসা করিল "জ্বর টর হয় নাই তো আবার? বা গলাব্যাথা? থাকলে তিনফুট দূরে থাকেন প্লিজ।"

তিন ফুট! অথচ আমার মনে হয় আমি মায়াবতী এই কন্যার চাইতে আলোকবর্ষ তফাতে! যেন উহার নৈকট্য পাওয়া এক মেরুদূর স্বপ্ন, শতবর্ষের সাধনা। নিজের সাথে শেষবার বোঝাপড়া করিয়া নিলাম। আর পিছু হটিবার উপায় নাই। সোজা হইয়া মনিকার দিকে নাটা নাটা চোখে তাকাইয়া বলিলাম, "মন, আমি এখন একটা কথা বলব। চার বছর ধরে এই কথাটা বুকে রাখতে রাখতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। কত কত রাত এই কথাটার কারণে আমার নির্ঘুম কেটেছে! আমি আর এই কথাটার ভার বইতে পারছি না। তুই খালি শুনবি। তারপর তো তোরই বিবেচনা। চাইলে শুনেই ভুলে যেতে পারিস। যেন এমন কথা তুই কখনো শুনিসইনি। মনে করবি কেউ একটা পাগলের প্রলাপ বকতেছে। ওতে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই।"

মনিকা যেন কাঁপিয়া উঠিল! বারান্দার অর্কিডে দৃষ্টি ফেলিল। ক্ষণকাল পরে চোখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁপা স্বরে বলিল, "বলেন..."

আমি আমার সমস্ত সংস্কার, লজ্জার মাথা খাইয়া, হাত-পা, বুক, গলার সমস্ত কাঁপন উপেক্ষা করিয়া, মনিকার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "মন, আমার 'অ্যাকিউট সেন্স অব ইউ-মার' রোগ হয়েছে। তুমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রয়োজন! তুই কি চার মিনিট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবি?"

এই প্রথমবার মনিকা আমার কথা পুরোপুরি বুঝিতে পারিল। কহিল না, "একটু আরেকবার বলবেন প্লিজ?" হতবিহবল হইয়া চোখ বড়ো বড়ো করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল! তাকাইয়াই রহিল!

বাহিরে বিশাল আকাশটাতে ছাইরঙা মেঘ জমিয়া আছে। আমি প্রবলভাবে আকাঙ্খা করিতেছি এখনই চরাচর ভাসাইয়া ঝুম বৃষ্টি নামুক। আর মনিকা নামক এই মায়াবতী চারি মিনিট কাল আমার পানে অপলক চাহিয়া থাকুক। কোথায় জানি পড়িয়াছি , চারি মিনিট কাল দুইজনের মধ্যে অপলক দৃষ্টিবিনিময় হইলে উহাদের মধ্যে ভাব হওয়া আবশ্যক!

ভুলে যাবো–যাই ?

সানোয়ার রাসেল

নক্ষত্র সাক্ষী আছে—
ভুলিনি তো খিলপাড়া গ্রাম
নক্ষত্র সাক্ষী আছে—
বুকে জমা প্রিয় সব নাম
নক্ষত্র সাক্ষী আছে—
এই সব নক্ষত্রের তলে
আমার কিশোর আমি
কাটিয়েছি কত সুখী রাত ঝলমলে

মাঠেরা সাক্ষী আছে—
ভুলিনি তো মাসুমের বাড়ি
মাঠেরা সাক্ষী আছে—
আকাশকুসুম নিয়ে রাত্রিগুজারি
মাঠেরা সাক্ষী আছে—
গলা ছেড়ে গেয়ে যাওয়া গান
ভুলিনি কিছুই আজও
সব কিছু জমা করে রেখেছে পরান
গোপাট সাক্ষী আছে—
ভুলিনি তো রুমাদের ভেড়া
গোপাট সাক্ষী আছে—
চোখে ভাসে মরিচ ক্ষেতেরা
গোপাট সাক্ষী আছে—
যুগের আটির পরে কদমের গাছে
ভুলিনি, সবাই আছে
কদম কি আজও ফুটিয়াছে?—

এখনও গভীর রাতে
এই মন উচাটন হয় কার তরে?—
সে কি তবে না দেখা স্টেশন—আমনুরা
ধীরে ধীরে ভুলে যাবো
একদিন কারও প্রেমিকার নাম
ছিল জাহানারা—

জিলাপির মুখ

ফজলে খোদা রায়হান

অনার্সে পড়া ছোটো বোনকে স্মার্টফোন কিনে দেওয়ার পর থেকে ইউটিউব দেখে দেখে রূপচর্চার পাশাপাশি তার ও আম্মার বাসায় স্বাভাবিক রান্না থেকে অস্বাভাবিক রান্নার দিকে ঝোঁক বেড়েছে খুব।

তাছাড়া বিকালে বাসায় বানানো রেগুলার নাস্তা ছাড়াও আম্মা আর ছোটো বোন ইউটিউব দেখে দেখে বাসায় বিভিন্ন বস্তু বানিয়ে আব্বা, ছোটো ভাই ও আমার ওপর দিয়ে টেস্ট চালায়! যেমন একদিন ইউটিউব থেকে জিলাপি বানানো শিখে নাস্তার টেবিলে আব্বার প্লেটে আম্মা আর বোন তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় জীবনে প্রথম বানানো জিলাপি দিলে আব্বা টেবিল ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "সাপ! সাপ!"

আব্বার কথা শুনে আমি আর ছোটো ভাই ফ্লোর থেকে চেয়ারের ওপরে পা উঠালে আব্বা বললেন, "নিচে না রে প্লেটে! প্লেটে!"

আম্মা বললেন, "সাপ? কই সাপ? মাথা ঘুরায় তোমার? কী বলো এইসব!"

"সাপ না তো এগুলা কী?"

"জিলাপি! জিলাপি চেনো না?"

"জিলাপি তো এরা এমন সাপের মতোন ফণা তুলে আছে কেন? এই জিলাপির সমস্যা কী? আর জিলাপি তো আড়াই প্যাঁচের হয় এই জিলাপির জীবনে তো দেখি কোনো প্যাঁচ বাকি নাই!"

"আবোল-তাবোল অপমানজনক কথা বলবা না। প্লাস্টিকে ভরে প্যাঁচ দিয়েছি তাই শেষের প্যাঁচে মাথা একটু বের হয়ে ফুলে আছে। আর জিলাপির প্যাঁচটাই মুখ্য না, স্বাদটাই আসল। স্বাদ কেমন দেখো।"

আব্বা জিলাপি হাতে নিয়া ভাঙার চেষ্টা করে না পেরে আম্মাকে বললেন, "একটা হাতুড়ি নিয়া আসো জিলাপি ভাঙার জন্য! এই জিলাপি দাঁত দিয়ে ভাঙতে গেলে মাড়িসহ দাঁত উঠে আসবে জিলাপির সাথে তবুও জিলাপি ভাঙবে না! আর তোমার সাথে কারো শত্রুতা আছে? থাকলে তার কপাল বরাবর এই বস্তু মারলে সে শেষ হয়ে যাবে! জাস্ট ফিনিশ হয়ে যাবে! এক কাজ করো দুই-তিনটা জিলাপি দাও বাড়িওয়ালার মাথায় মেরে আসি। ব্যাটা আজকাল ঠিক মতোন পানি ছাড়ে না! তা ছাড়া তোমার এই জিলাপি যুদ্ধক্ষেত্রেও ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য! প্রতিপক্ষের ঘাঁটি বরাবর এই বস্তু ঠিক মতোন মারতে পারলে মনে করো দুই হাতে কান ধরে সারেন্ডার করবে

প্রতিপক্ষ। ইউরেকা! ইউরেকা! আমি তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারণাস্ত্রের বদলে জিলাপিস্ত্র আবিষ্কার করে ফেললাম! আগে বলতো বোমার বদলে ফুলো ছুঁড়ো এখন বলবে জিলাপি ছুঁড়তে!"

আব্বার অপমানসূচক কথা শুনে আম্মা বললেন, "থাক তোমার আর আমার বানানো জিলাপি খাওয়া লাগবে না। ঘরে বানানো জিনিসে আর স্বাদ কই পাবা? রাস্তার ধারে ধুলাবালি দিয়ে পরের হাতে বানানো খাবারই তোমার দরকার! কথায় আছে না, নিজের ঘরের পিঠা দাঁতে লাগে তিতা, পরের ঘরের পিঠা দাঁতে লাগে মিঠা!"

আম্মা আব্বাকে দিয়ে জিলাপি পরীক্ষা করাতে ব্যর্থ হয়ে তার কনিষ্ঠ পুত্র আমার ক্লাস সেভেনে পড়া ছোটো ভাইকে জিলাপি দিলে ভাই আব্বার অবস্থা দেখে বলে, "আম্মু একটা তো সমস্যা হয়ে গেল!"

"কী সমস্যা?"

"আম্মু আমি তো একটা ডিসিশন নিয়েছি জীবনে আর কোনোদিন মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবো না। কক্ষনো না। গুণীজনরা ও বিজ্ঞান বলে মিষ্টি শরীর এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর! বিষ!"

"কখন নিয়েছিস এই ডিসিশন?"

"এই তো একটু আগেই আমার মধ্যে বোধ আসছে! কী করছি জীবনটার সাথে? মিষ্টি খেয়ে এভাবে নষ্ট করে দিব সমাজটাকে?"

"তুই মিষ্টি খাইলে সমাজ নষ্ট হবে?"

"হবেই তো! আমাকে সমাজের দরকার। সমাজের ভবিষ্যতের জন্য আজকের শিশুদের দরকার আর আমি যদি নিজেকে মিষ্টি খেয়ে শেষ করে দেই সমাজের কী হবে? ভেবে দেখেছ একবার?"

আম্মার জিলাপি টেস্টের শেষ গিনিপিগ হিসেবে আমার কাছে আম্মা জিলাপি নিয়ে আসতেই আব্বার জিলাপির রিভিউ শুনে চিৎকার দিয়ে আম্মাকে বলে বসলাম, "আম্মা কে জানি আমার সর্বনাশ করেছে! আমার মাথা ঘুরাচ্ছে! বমি আসতেছে! আমি কিছু খেতে স্বাদ পাই না আম্মা! আমার কোনো খাবারে রুচি নাই!"

আম্মা তার বড়ো ছেলের সর্বনাশে হাতে থাকা জিলাপির প্লেট মাটিতে ফেলে দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে চিৎকার দিয়ে, কে করল তোর এই সর্বনাশ জিজ্ঞেস না করে বললেন, "বাবা এ তো আনন্দের সংবাদ! খুশির সংবাদ! জিলাপি মুখের সংবাদ! হা কর বাবা, হা কর! জিলাপি মুখ কর! খুশির সংবাদে মিষ্টি মুখ না করলে চলে বোকা?"

আব্বা আর ছোটো ভাই, আম্মা আর বোনের যৌথ প্রচেষ্টায় বানানো জিলাপি খাওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারলেও আমি পারি নাই!

ঘরের দক্ষিণ মুখি জানালায় মুখ হা করে দাঁড়িয়ে থাকি। কারণ ছোটো বোন জিলাপিতে উজ্জল লাল রং আনার জন্য ফুড কালারের বদলে ভুলে মরিচের গুড়া দিয়ে দিয়েছিল!

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

কাল বৈশাখীর দোলে, বাচ্চা এলো কোলে

স্বর্ণাভ দে

আমি সিনিয়র সিটিজেন এর সিটে কখনও বসি না।

কোনো সিনিয়র সিটিজেন বাসে না উঠলেও দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু গতকাল ছিল ব্যতিক্রম। ছিল বাড়ি ফেরার তাড়া। সিনিয়র সিটিজেন সিট ছাড়া একটাও খালি নেই। সারাদিন অফিস করে খুব ক্লান্ত, তাই পরের বাসের জন্যে অপেক্ষা না করে বসেই পড়লাম। বয়স্ক মানুষ উঠলে সিট ছেড়ে দেব। ভাগ্য সহায়। সব কচি কচি লোকজন বাসে উঠছে। দাঁড়াচ্ছে। আমিও হাওয়া খেতে খেতে যাচ্ছি। একজন কাকীমা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে হাসলেন। আমিও হাসলাম (যতই হাসো, সিট আমি দেবো না)। অন্যদিকে মুখ ঘুরালাম, বাইরে হাওয়া দিচ্ছে ভালোই, বৃষ্টি হতে পারে। ব্যস, এরই মধ্যে টুক করে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমি ঘুমালে একটা স্বপ্ন মাস্ট। সমুদ্রের স্বপ্ন দেখছি। দেখছি আমি আর বাপ্পী লাহিড়ী খালি গায়ে মন্দারমনিতে গিয়ে বিচ ভলিবল খেলছি। মিঠুনের ছেলে মিমো সমুদ্রসৈকতে ডাব বিক্রি করছে। অদ্ভুত দৃশ্য। হঠাৎ করে দেখলাম বাপ্পী লাহিড়ী চর্বিসমেত ধুপ করে মাটিতে পড়লেন। তারপর দেখি উনি বাউন্স খাচ্ছেন। আমার চোখে ছিটকে আসছে বালি। বাপ্পী দা এখন গড়াচ্ছেন, গড়াতে গড়াতে সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছেন। চিৎকার করছেন, "স্বর্ণাভ, প্লিজ মুজকো বাঁচাও। হাম মুজিক বানায়েগা।" আমি ওনার সবচেয়ে বড়ো ফ্যান। দৌড়ে যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে, জলে ঝাঁপ মেরে কোলে করে তুলে আনছি বাপ্পী লাহিড়ীকে।

হঠাৎ করে ঘুম ভাঙলো, বাসে প্রচণ্ড হইচই। আমি পুরো ভিজে গেছি, আমার কোলে একটা ইয়া মোটকা বাচ্চা বসে। মাইরি! এত রিয়েলিস্টিক স্বপ্ন দেখলাম। বাপ্পী লাহিড়ী মুম্বাই থেকে উড়ে এসে আমার কোলে বসেছে? ঘুমের ঘোর কাটেনি। চারিদিকে খুব ঝড় উঠেছে। কোত্থেকে একটা ছায়া উড়ে এসে আমার সামনের ভদ্রলোকের মুখে লেগেছে। সামনের ভদ্রমহিলা আবার, "এটা আমার হবে" বলে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলেন। প্লাস্টিক, তেচোকা মাছ, কবীর সিনেমার পোস্টার- সব উড়ে এসে বাসের ভেতর ঢুকছে। সবাই এতটাই স্তম্ভিত যে জানালাও আটকাতে পারছে না। আমার কোলের বাচ্চাটাও তবে কি উড়ে এসেছে জানালা দিয়ে? কিন্তু এরকম বাপ্পী লাহিড়ীসম বাচ্চা উড়বে কীভাবে? তক্ষুণি মনে পড়লো সকালের সূর্যপ্রণামের কথা। আগেকার দিনে রাণীদের বাচ্চা না হলে, সূর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করলেই সে রাণীর কোলে বাচ্চা চলে আসতো। আমি রাণী নই, তবে আসরাণী তো বটে। ছেলেটার গাল টিপে বললাম, "তুমি কি আমার পুত্র?" ওমনি বাচ্চাটা চিৎকার করে বললো, "ও মাআআ! এই অচেনা বিটকেল লোকটা বলছে ও নাকি আমার বাবা।" কিছু চ্যাংড়া ছেলে পিছন থেকে "DNA টেস্ট, DNA টেস্ট" বলে চিৎকার করে উঠলো। এটা কোনো

সূর্যপ্রণামের বাচ্চা না। ওর মা জানালো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাচ্চাটা বায়না করছিল, আমি ঘুমোচ্ছি দেখে আমার কোলে বসিয়ে দিয়েছে।

আমার একটু সম্বিৎ ফিরেছে। ও মা! সামনের হাসি বিনিময় কাকীমার দিকে তাকাতেই দেখলাম, তিনি কাকীমা নন, তিনি ঠাকুমা। ঝড়ে সব মেকাপ ঝরে গেছে। আমি উঠে বললাম, "ঠাকুমা বসুন।" ওনার সামনে দাঁড়ালাম। চারদিকে লোক গিজ গিজ করছে! সামনে যাওয়ার উপায় নেই, বামপন্থী পরিবেশ (ফরোয়ার্ড ব্লক)।

লোকজনের এত চাপ সামলাতে পারছিলাম না। খুব চেষ্টা করছি, তবুও পারছি না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধাক্কা লাগছে সামনের ভদ্র মহিলার সাথে। ধাক্কা লাগছে, আর আমি সরি বলছি। তারপরই ঘটলো সেই ঘটনা, যেটা আমি কল্পনাও করিনি।

জোরে ধাক্কা লাগাতে ভদ্র মহিলা চিৎকার করে বললেন, "বে-শরম।"

আমি থ! নিজেকে জাস্টিফাই করতে বিড়বিড় করলুম, "ম্যাডাম খুব ভুল হয়ে গেছে, আমি এমন না, আমি ভদ্র ঘরের ছেলে। স্যরি..."

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে বললেন, "স্যরির কি আছে? আমি বলেছি বেশ আরাম।"

চমকে গেলাম। বাপ রে! কি অরাজক পরিবেশ। টিকিট কেটে সামনের দুটো লোককে চোক স্ল্যাম দিয়ে সরিয়ে বাসের গেটের সামনে গেলাম। বাস থেকে নেমে শান্তি পেলাম। সিগনালে আটকে ছিল বাসটা। ছেড়ে যাওয়ার আগে বাসের জানালা দিয়ে দেখি মোটকা বাচ্চাটার দুটো হাত। বলছে, "টা টা বাবা।"

রেসিজম

শাদমান জাহিন

১

জ্যামটা ইদানীং প্রচুর বেড়ে গেছে।

জ্যামে বসে সময় কাটানোর একটা ভালো উপায় হচ্ছে বই পড়া। যেহেতু আমাকে প্রায় প্রতিদিনই ঢাকার এমাথা-ওমাথা ক্রস করতে হয় তাই আমার ব্যাগে কোনো না কোনো বই থাকেই।

সেদিন পড়ছিলাম নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী। বেশ ডুবে গিয়েছিলাম বইটায়। হঠাৎ পাশ থেকে শুনি, এক লোক ভারী গলায় জিজ্ঞেস করছেন, "কার বই পড়েন? ম্যান্ডেলার?"

আমি মুখ তুলে তাকালাম। বইয়ে ডুবে থাকার কারণে পাশে কে বসেছে খেয়াল করিনি। ত্রিশোর্ধ্ব বয়স, স্বাস্থ্যবান। মুখে চাপ দাড়ি। গায়ের রং কালো।

উনি বলে চললেন, এই বিপ্লবী নেতা সারাজীবন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গেছেন। লাভ কী হয়েছে? রেসিজম ছিল, রেসিজম আছে, রেসিজম থাকবে। এটা শুধু আফ্রিকার না, যেকোনো দেশের যেকোনো কালো মানুষের মনের কথা।

আমি প্রতিবাদ করলাম। বললাম, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রেসিজমের বোধহয় তেমন ইমপ্যাক্ট নেই।

লোকটা আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, "কোনো দুনিয়ায় যে থাকেন ভাই। কালো মানুষের গল্প শুনতে চান? বই রাখেন, আমার গল্প শোনেন। মজা পাবেন।"

লোকটা শুরু করল, আমার নাম রাকিব। কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ সময় লোকে আমাকে "কালা রাকিব" বলেই ডেকেছে। পরিবার থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ভার্সিটি- এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমার গায়ের রঙ নিয়ে খোটা শুনতে হয়নি।

মানুষ আমাকে ডাক দিতো কাল্লু, কাউলা কিংবা নিগ্রো বলে। জিম্বাবুয়ের যখন খেলা চলতো তখন বন্ধু-বান্ধব বলতো আমার জাত ভাইদের নাকি খেলা চলে। মানুষজন এসে আমার মায়ের কানে কানে বলতো, রাকিব যে কালো, ওর কাছে তো কেউ মেয়ে বিয়ে দিবে না। এমনকি টিচাররা ক্লাসে পড়া জিজ্ঞেস করার সময় ডাক দিতো, এই কালো ছেলে... দাঁড়াও।

জগৎ নিষ্ঠুরভাবে সৌন্দর্যের পূজারী- এটা আমি ছোটোবেলাতেই বুঝে ফেলি। মানুষজন বলে, দেহের সৌন্দর্য প্রধান নয়, মনের সৌন্দর্যই আসল। এটা যে কি পরিমাণ ভুয়া কথা তা আমি টের পেয়েছি প্রেমের চেষ্টা করতে গিয়ে। যেই মেয়েকে একটু ভালো লাগতো, সেই-ই আমাকে রিজেক্ট করে দিতো। আরে... দেখতে ভালো না হইলে কে আমার মনের সৌন্দর্য খুঁজে বের করতে আসবে?

কলেজে উঠলাম। ততদিনে আমি আমার মনকে বুঝ দিয়ে ফেলেছি। কেউ কালা-টালা, অসুন্দর বললেও আমার আর তেমন গায়ে লাগে না। ক্লাসে আরেকজন রাকিব ছিল। টম ক্রুজের মতো ফর্সা আর হ্যান্ডসাম। ওর নাম দিল সবাই ধলা রাকিব। আর আমি কালা রাকিব। ধলা রাকিবের ওপর প্রতিদিন তিন-চারটা মেয়ে ক্রাশ খায়। আর কালা রাকিব? ফরেভার এলোন।

এইসময় বজ্রপাতের মতো আমার জীবনে একজনের আগমন ঘটল, নাম তার শায়লা। আমাদের জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে। হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের নায়িকাদের যেমন বিবরণ থাকে, তেমন সুন্দর। প্রথম দেখাতেই আমি ধপাস করে প্রেমে পড়ে গেলাম।

শায়লার সাথে কেউ সাহস করে কথা বলতে পারছিল না। লোকমুখে শোনা যেত, শায়লার তিন বড়োভাই আছে। তিনজনই বডি বিল্ডার। শায়লার সাথে কাউকে দেখলে নাকি হাড্ডি-গুড্ডি ভেঙে নদীতে ভাসিয়ে দেবে।

আর আমার কী ভাগ্য! ক্লাসে আসার এক সপ্তাহ পর শায়লা আমার কাছে এসে বলল, "রাকিব, শুনেছি তুমি খুব ভালো নোট তোলো। আমাকে কি তোমার বাংলা নোট খাতাটা একটু দিতে পারবে?"

আমি পারলে বলি- নোট খাতা কেন আমার জীবনটাই নিয়ে যাও! আর ওই প্রথম ক্লাসে কেউ আমাকে কালা রাকিব বাদে শুধু রাকিব ডেকেছিল। আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল প্রায়। আমি নোট খাতা দিলাম। ফোন নাম্বার বিনিময় হলো। তখন ফেসবুক ছিল না। তারপর ফোনে কথা বলা শুরু।

আমি রোজ রাত বারোটার পর ওকে ফোন দিতাম। ডিজুসের সারা রাত ফ্রি অফার চলতো। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতাম। আমার ফোন রাখতে মনই চাইতো না।

সে বড়ো সুখের সময় ছিল। জীবনের সেরা কয়েকটি দিন। কিন্তু নক্ষত্রেরও নাকি একদিন মরে যেতে হয়। আমার সুখের ঘোর শেষ হলো ক্লাসমেট খালেদের একটা কথায়, "শুনেছিস, ধলা রাকিব নাকি শায়লাকে প্রপোজ করবে!"

আমার মাথায় বাজ পড়লেও আমি এত অবাক হতাম না। দৌড়ে গেলাম ধলার কাছে।

"কোনো সাহসে তুই শায়লাকে প্রপোজ করবি?"

"কেন করব না?" নির্বিকারভাবে ধলা রাকিব বলল।

"জানিস না, আমি ওর সাথে কত কথা বলি। ওকে পছন্দ করি?"

"আমিও ওর সাথে সপ্তাহখানেক ধরে কথা বলছি। ও বলেছে তোদের মধ্যে কিছু হয় নাই।"

"হয় নাই, হবে! সময় কি শেষ?"

"ভাই বাদ দে তো, ওরে আমার ভাল্লাগছে। আর আমার যারে ভাল্লাগে আমি তারে নিয়া নিই।"

দুই ঘণ্টা ধলা রাকিবকে বোঝালাম। ভয় দেখালাম, বারণ করলাম, অনুনয় বিনয় করলাম। রাকিবের মন গলে না। শেষমেশ কেঁদে ফেললাম। আমার কান্না দেখে রাকিবের একটু দয়া হলো।

সে বলল, "ঠিক আছে। আমরা তাহলে শায়লাকেই ডিসাইড করতে দেই। সামনের আঠারো অক্টোবর ওর জন্মদিন। ঠিক রাত বারোটায় আমরা দুজনই ওকে প্রপোজ করব। শায়লা যাকে পছন্দ করবে, ও তার হবে। বাকি যে থাকবে, অন্য রাস্তা ধরবে। খেলা যখন হবে ফেয়ার গ্রাউন্ডেই হোক।"

আমি মেনে নিলাম। এইটুকুই অনেক পাওয়া। আমার মন বলছিল শায়লা অনেক সেন্সিবল মেয়ে, ও হয়তো আমার ভালোবাসাটুকু বুঝবে।

আঠারো অক্টোবর ঠিক এগারোটা উনষাট মিনিটে আমরা চোরের মতো দুজনে দুটো গোলাপ ফুল নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির পাঁচিল টপকালাম। পাইপ বেয়ে শায়লার ব্যালকনিতে উঠলাম। শায়লা আমাদের দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

আমরা কাঁপাকাঁপা গলায় বললাম, "হ্যাপি বার্থডে শায়লা। উই বোথ লাভ ইউ।"

২

বাস তখন খামারবাড়ি থেমে আছে। ভদ্রলোক বললেন, "কী ভাবছেন? শায়লা আমাকে চুজ করেছিল?"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। লোকটা মৃদু হেসে বলল, "ভাই রে, জীবন গল্প উপন্যাস না। শায়লা আমাকে পছন্দ করেনি। ওর বলা কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজে।"

শায়লা বলেছিল, "রাকিব, তোমার মতো ফ্রেশ মাইন্ড আর ওয়েল পার্সোনালিটির ছেলে আমি আর দেখিনি। তুমি অনেক ভালো মানুষ। কিন্তু কিন্তু... আমি তোমাকে নিয়ে ওভাবে কখনো ভাবিনি। তুমি আমার কাছে সবসময় একজন ভালো বন্ধুর মতো ছিলে এবং থাকবে। আমি বরং (ধলাকে দেখিয়ে) ওর সাথেই নতুন সম্পর্কে যেতে চাই।"

আমার হৃদয়টা তখন সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এমনকি আমি চিঁইই করে দুনিয়া কাঁপানো একটা শব্দ পর্যন্ত শুনলাম।

তারপর মনে হলো, ব্যাপার কী! হৃদয় ভাঙার শব্দ তো এতো জোরে হতে পারে না!

আসলে শায়লার বড়োভাই কথার আওয়াজ শুনে "কে ওখানে..." ডাক দিয়ে ছুটে এসেছে। পেছনে আরো দুই ভাই। মুহূর্তের মধ্যে বাড়িতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। চিৎকার-চেঁচামেচি। ধলা রাকিবের কলার ধরে লিভিং রুমে নিয়ে গেল তারা। সেখানে নিয়ে বেদম মার। বেগতিক দেখে শায়লাও আর ধলার পক্ষ নিল না। সম্পর্কের ব্যাপারটা অস্বীকার করে গেল।

ধলা রাকিবের বাপ-মাকে ডাকলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। বলে দিলেন, তাদের ছেলে যেন আর কখনো শায়লার ধারে কাছে না যায়। গেলে তিনি খুন করে ফেলবেন। রাকিবের বাবা-মা ওর কলেজ বদলে নিয়ে গেলেন। ধলা রাকিব আর কখনো শায়লার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি।

ধলা চলে যাওয়ার পর শায়লা বেশ একা হয়ে পড়ে। আমি ওর বন্ধুত্বের হাত কখনো ছাড়িনি। ও কলেজ থেকে ঢাকার এক ভার্সিটিতে পড়তে আসে, আমিও ওর সাথে আসি। ততদিনে ও বেশ স্বাধীন এবং ম্যাচিউরড হয়েছে। ফাইনালি আমি অনার্স চতুর্থ বর্ষে এসে ফ্রেন্ডজোন ভাঙতে পারি। পুনরায় প্রপোজ করি ওকে। ও এক্সেপ্ট করে। আল্লাহর ইচ্ছায়, নাও শি ইজ মাই ওয়াইফ।

৩

কন্ডাকটার ডাকছে, "ধানমন্ডি সাতাইশ। ধানমন্ডি সাতাইশ।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান। আমি একটু আমতা আমতা করছিলাম। তারপর বলেই ফেলি, "ভাই, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।"

লোকটা ফিরলেন। বললেন, "আমি বোধহয় আপনার প্রশ্নটা জানি। করেন।"

আমি বললাম, "ওই দিন রাতে শায়লা আপুর ভাইয়েরা আপনার ফ্রেন্ডকে ধরে মাইর দেয়। আপনাকে কিছু বলেনি কেন?"

লোকটা মুচকি হেসে বলল, "একেই বোধহয় নিয়তি বলে। শায়লার ব্যালকনিতে ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঐদিন জীবনে প্রথম আমি আমার গায়ের রং এর জন্য অ্যাডভান্টেজ পাই। ওরা আমাকে অন্ধকারে দেখতে পায়নি।"

প্রশ্নবোধক

আয়শা আহমেদ

তোমার সিঁথির রঙে আকাশ কেন রাঙে কুসুমিতা!
কেন তোমার অলক ছায়ে বেড়ে ওঠে মুগ্ধতার সাঁঝ?
যদি আকণ্ঠ তৃষ্ণা বাড়িয়ে যাবে অস্পৃশ্য দহনেই;
তবে কেন?
—কেন আকাশজোড়া এঁকে বেড়াও পদচিহ্ন!
কেন ভুলে যাও
আমার জানালায় নামা একফালি আকাশের ডাকনাম?
কেন ভুলে যাও, মানুষের বুকেও মেহেদিপাতায় সবুজ ফোটে?
আর সেইসব সবুজের বুকে, ঘুমিয়ে থাকে রক্তাক্ত দুপুর।
এখনো তুমি মেহেদি পরো কুসুমিতা!
সফেদ তালুতে পুষে রাখো মুছে আসা রক্তের দাগ?

আইফোন থ্রি

আমেনা বেগম ছোটন

সজিবের সাথে আমার দেখা হয়েছিল টিএসসিতে। আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছিল।

সদ্য বিদেশ ফেরত, হাতে আইফোন থ্রি। সময়টা ২০০৭। আমার দেখা কিপ্যাডবিহীন ফোন সেটাই প্রথম, আমি টেকনোলজির অত খবর রাখতাম না। একটা মাত্র বাটন দিয়ে কীভাবে ফোন চালায়, সেটাই বিস্ময় ছিল আমার কাছে।

সজিবের বিস্ময় ছিলাম আমি। পয়লা ফাল্গুনের উৎসব। বাসন্তী শাড়ি, হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি, খোপার ফুল অথবা তরুণী আমি- মুগ্ধ করেছিল তাকে। মুগ্ধতা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, আমার ফোন নম্বর যোগাড় করে ইনিয়ে বিনিয়ে জানাতে লাগল সে আমায় ভালোবাসে। তা বাসুক না। ওই পজিশনটা ভ্যাকেন্টই ছিল। শুভাকাঙ্ক্ষী বান্ধবীরা সতর্ক করল, *এসব ছেলেরা বিদেশ থেকে এসে পার্টটাইম গার্লফ্রেন্ড খুঁজে। ফাঁদে পা দিস না।* আমি দিলাম ও না। তবে ফোন করলে গল্প করতাম। ভক্তি বন্দনা পেয়ে নিজেকে দেবীই মনে হতো।

সজিবের মুগ্ধতা আর কাটল না। বিয়ে করার জন্য অস্থির হলো। এমন ভাব, যেন আমাকে বিয়ে করে গৃহদেবী প্রতিষ্ঠা করবে। ওহ, কি দামিই না ছিলাম আমি।

বাসায় ফরমাল প্রপোজাল এলো, টিপিক্যাল ফ্যামিলির মতো আমার পরিবার গাইগুই করল, তাদের ঢাকা ভার্সিটি পড়ুয়া মেয়ের জন্যে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিসিএস ক্যাডার চাই। বিদেশের ওসি ডিসির কাছে মেয়ে দেবে না। ভাববার বিষয় বটে। তবু পরিবারের দু'চারটা এরেঞ্জ ম্যারেজে দাম্পত্যকলহ দেখে মনে হলো, ভালোবাসার বিয়েটাই মনে হয় ভালো হবে। বায়োডাটার সাথে কি মনের মিল হয়?

বাবা মা মেনে নিলেন। মোটামুটি সমারোহে বিয়েও হলো। বিদেশ এলাম। দু'বছর পার হয়ে গেছে এই করতে করতে। এখানকার মার্কেটে স্যামসাং গ্যালাক্সি এসেছিল তখন, আগ্রহ করে কিনে ফেলল সজিব।

সব গুছিয়ে উঠতে চার বছর লেগে গেল। আমি এখানের একটা রিটেল শপে, শপ এসিস্টেন্টের কাজ করতাম। ভালোই চলে যেত দুজনের। ছুটির দিনে হলে সিনেমা দেখতাম আমরা। ছোটো একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনলাম আমরা, ত্রিশ বছরের ইন্সটলমেন্ট। বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কী চাই আর। ধরণীর কোণে এতটুকু বাসা।

ইতোমধ্যে দু'পক্ষের আত্নীয়রাই তাড়া দিতে লাগল। আমাদের মধুচন্দ্রিমা শেষ হয় না নাকি? বংশে বাতি দিতে হবে না? হবে বৈকি। আল্লাহ দিয়েও দিলেন।

প্রেগনেন্সি থেকেই শুরু। যখন তখন বমি। খেতে গেলে গন্ধ লাগে। সজিবের সাথে আর এক সাথে খেতাম না। কেউ ওয়াক ওয়াক করলে খাওয়া যায়? রাতে এপাশ-ওপাশ ছটফট। সজীব পাশের

ঘরে ঘুমাতো, খুব ডিস্টার্ব হতো ওর ঘুমের। সকালে কাজ আছে তো, নাকি? শরীর খারাপ থাকায় আর জব কন্টিনিউ করা গেল না। কোনোরকমে নয়মাস পার করলাম, ফুটফুটে একটা ছেলে হলো আমার। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম, বংশের বাতি দিতে পেরেছি, নয়তো হাহাকার রয়েই যেত।

বাংলাদেশের কোনো মা সাধারণত মুখ ফুটে বলে না, মা হওয়াটা আসলে কী ব্যাপার। কী ব্যাপার তা তো বুঝলাম, কষ্টের কথা কেন বলে না, তাও বুঝলাম। বললেই আরেকজন মা-ই বলবে, "হু আমি আর বাচ্চা মানুষ করিনি। মা হলে ওসব করতেই হয়। বাচ্চা কাঁদতে থাকে, খাওয়াতে গেলে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমালে খিদেয় উঠে যায়। বিদেশ বাড়ি, সব কাজ আমার। সজিব মাঝেমধ্যে সাহায্য করে, মাঝেমধ্যে বিরক্ত হয়, কী করতে মা হয়েছ? কিছুই সামাল দিতে পারো না?"

খুব খিটখিটে মেজাজ হয়ে গেছে আমার। কত রাত ঘুমাই না, একটু চোখ বুঝে এলে ছেলেটা কেঁদে উঠে। সজিব বিরক্ত হয়, "কাঁদছে শুনছ না? থামাও না। সারাদিন কাজ শেষে বাড়ি এসে শান্তি নাই এক ফোঁটা।"

কি যেন খুঁজতে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। এক মধ্যবয়সী মহিলাকে দেখলাম। বেঢপ মোটা, রংচটা ম্যাক্সি পরা। এ মা, কপালের কাছের চুলগুলো কি পেকে গেছে নাকি? কত বয়স হয়েছে আমার, বত্রিশ? অনেক নাকি? এই তো সেদিন ভার্সিটির র‍্যাগ ডে'তে সবাই মিলে কত হইচই করলাম, এর মধ্যে বত্রিশ হয়ে গেল? কপাল ভালো, ছেলেটা কেঁদে উঠে রেহাই দিল, এ দৃশ্য সহ্য করা আসলেই মুশকিল। হু, ন্যাপি চেঞ্জ করে রান্না চড়াতে হবে। ডাল, মুরগি, করলা ভাজি।

মাঝেমধ্যে সজিবের সাথে খুব ঝগড়া হয়, বাচ্চা লুক আফটার নিয়ে, ঘরের কাজ নিয়ে, বাইরের কাজ নিয়ে, সংসার খরচ নিয়ে, আমার চাকরিটা তো আর নেই। সজিবের অসহ্য লাগে, বিরক্ত হয়ে বলে, "তুমি ক্রেজি। তোমার সাথে থাকা আর সম্ভব না। ছয় মাস সময় দিচ্ছি, সব গুছিয়ে নিয়ে আলাদা থাকো। সিংগেল মাদার হিসেবে ভালো সাপোর্ট পাবে সরকার থেকে, আমাকে রেহাই দাও। আমি আর পারি না।"

নিজেকে খুব ছোটো লাগে। সাত বছর আগে যার কাছে দেবী ছিলাম, আজ তার কাছে মাটির পুতুলের চেয়েও ফেলনা হয়ে গেছি। খুব ভাবতে চাইলাম, সজিব একটা খারাপ লোক, তার মতামতে কিছু যায় আসে না, আই অ্যাম গ্রেট। আই উইল বি অ্যান ইন্ডিপেনডেন্ট হিউম্যান বিয়িং। ছেলেকে নিয়ে একা থাকব, কাজ করব, স্বামী থাকতেই হবে এমন কোনো কথা আছে? তবু আমার জ্বালা একটুও কমল না, বিছানায় সারারাত জেগে বসে রইলাম।

তিন-চারদিন পর সজিব আমার কাছে ক্ষমা চাইল। সে নিজেও নানাবিধ চাপে বিপর্যস্ত। আমি বোধহীনভাবে তাকিয়ে রইলাম, কি বোধ করা উচিৎ সেই জ্ঞান আমার লোপ পেয়েছে। তবু পরদিন আবার সংসারের কাজ শুরু করলাম, যদ্দিন সংসার টিকে, করে যাই। মরা ছাড়া রেহাই নেই।

ঘর গুছাতে গিয়ে সেদিন এক ড্রয়ারে সেই পুরোনো আইফোনটা পেলাম। সাথে একটা পুরোনো অ্যালবাম। আমার অনেকগুলো ছবি। বিয়ের পর বিদেশ আসার সময় সজিব নিয়ে এসেছিল, আমাকে না দেখে নাকি থাকতেই পারবে না। সেই পয়লা ফাল্গুণের বাসন্তী শাড়ি পরা ছবি, বিয়ের জরোয়া সাজে, কক্সবাজারের হানিমুন, বিদেশে আসার প্রথম দিককার ছবি, একটা ভেংচি কাটা ছবিও আছে। তখন আমি আর আইফোন থ্রি - দুজনেই বেশ আরাধ্য ছিলাম। একটা জড়বস্তুর সাথে আমার কি আশ্চর্য মিল।

সজিব এখন আইফোন টেন ম্যাক্স ব্যবহার করছে, আমি এখনো আছি। ফোনের মতো বউ চেঞ্জ করা যায় না, এ কথা ভাবলে সজিবের প্রতি আমার বেশ মায়াই হয়।

কোহলি কথন

শেখ মিনহাজ হোসাইন

অনেক মানুষই বলে, ভিরাট কোহলিকে মানুষ হিসেবে সে দেখতে পারে না। কিন্তু ব্যাটসম্যান কোহলিকে স্বীকার না করে পারে না! আমিও প্রথমদিকে কোহলিকে ‘বেয়াদব’ মনে করতাম। আস্তে আস্তে যতই কোহলিকে দেখি ততই মুগ্ধ হই, এবং হচ্ছি!

কিন্তু তাঁকে শুধু 'ক্রিকেটার' বিবেচনায় ভালো কেন বলতে হবে?

সে মানুষ হিসেবেও খুব ভালো! মাঠের বাইরে তার একটা খারাপ উদাহরণ আছে? ফিল হিউজের মৃত্যুর পরে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের বাইরে সে একমাত্র ক্রিকেটার যে হিউজের ফিউনারেলে গিয়েছিল। তার কোহলি ফাউন্ডেশনের কাজের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাতে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের থেকে শুরু করে এতিম শিশু, আবার ক্রিকেটার তৈরি করার জন্য ইয়াং ট্যালেন্টও খুঁজে বের করা হয়। সে নিজে এতিম শিশুদের সাথে গিয়ে সময় কাটায়, বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে সময় কাটায়। হিউম্যানিট্যারিয়ান দিক নাহয় সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি। বাদ দেই। ক্রিকেটে আসি।

সে মাঠের বাইরে তার লেভেলে সব জিনিয়াসদেরেই শ্রদ্ধা করে। একটা ছোটো উদাহরণ দেই। ২০১৬ এশিয়া কাপের আগে সংবাদ সম্মেলনে নিজে থেকে পুরো সংবাদ সম্মেলন জুড়ে মুস্তাফিজ আর রাবাদার প্রশংসা করে গেছে। সাংবাদিকেরা কিছু বলেনি। তাঁরা দুইজন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বোলার। কীভাবে তাদের আরও ভালো করতে হবে, তাদের সমীহ করতে হবে; সেগুলো বলে গেছে। পাকিস্তানের আমিরকে সে এতটাই এপ্রিশিয়েট করেছে যে বিশ্বকাপ ম্যাচের আগে গিয়ে আমিরকে নিজের ব্যাট উপহার দিয়ে এসেছিল। এশিয়া কাপের ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হবার পরে নিজের কথা বাদ দিয়ে আমিরের স্পেলের প্রশংসাই করে গেছে!

নিজের ব্যাটিং নিয়ে এত রেকর্ডের পরেও টেন্ডুলকারের সাথে তুলনা হলেই বলে যে তারটা পুরোটাই পরিশ্রমের ব্যাপার। সাচিনের সাথে তার তুলনাই হতে পারে না। এবিডি ভিলিয়ার্স তার চেয়ে ভালো ব্যাটসম্যান বলতে বলতে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলে। স্টিভেন স্মিথ, কেন উইলিয়ামসনকে তার চেয়ে ভালো মানে। রোহিত শর্মা তার চেয়ে ট্যালেন্টেড; এটা সব জায়গায় বলে। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, চলমান রাইভালদের কাছ থেকে সে সবসময়েই শিখছে সেটা দাবি করে।

ব্যক্তিগত জীবনে আসি। এখনকার মিডিয়ার যুগলরা সবকিছু লুকাতে পছন্দ করে। অথচ সে সবজায়গায় হাই ভোকালে আনুশকাকে আগলে রাখে। ২০১৫ বিশ্বকাপের পরে প্রবল সমালোচনার মুখে এয়ারপোর্টে শক্ত হাতে আনুশকাকে ধরে রেখে জনগণের সামনে নিজের স্টেটমেন্ট দিয়েছিল। সব জায়গায় বলে যে আনুশকা তার জীবনকে গোছাচ্ছে! তাদের সম্পর্ক ভাঙতে পারে অথবা টিকতে পারে। সেটা ভবিষ্যৎ জানে। কিন্তু তার কথাগুলো একটা মেয়ের মধ্যে নির্ভরতার বার্তা দেয়। আর এখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আপাতত ভারতের অনুসরণীয় জুটি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছেন।

বাকি রইলো মাঠে কম্পিটিটিভ থাকার বিষয়টা, গালি দেবার বিষয়টা। লক্ষ্য করলে দেখবেন আগে সে যেভাবে গালি দিতো গত ২ বছরে তা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। সে ভারতের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'আপ কি আদালত'-এ গিয়েছিল। এখানে বিভিন্ন সেলিব্রিটিকে কাঠগড়ায় বসিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোকে উপস্থাপন করা হয়। ওখানে তার বিরূদ্ধে এই অতি আক্রমাত্মক ব্যবহার নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে তার এই ব্যবহার বাচ্চারা শিখবে। তখনই কোহলি কথা দিয়েছিল যে সে চেষ্টা করবে এই ব্যাপারটা পরিহার করতে। সে এরপরে অনেকটাই কমিয়েছে। এটাকেই নিজেকে শোধরানো বলে। তবু এখনো সে যে স্লেজিং করে না, বা অতি আক্রমাত্মক হয় না, তা নয়। কিন্তু মাঠের মধ্যে যেমন বাউন্সার খেয়ে মিচেল স্টার্ককে গালি দেয়, তেমনি মাঠ থেকে বের হয়েই সেই স্টার্কের সাথেই গলা মেলায়, সংবাদ সম্মেলনে স্টার্কের প্রশংসা করে। আবার যেমন স্টিভেন স্মিথের প্রশংসা করে ব্যাটসম্যান হিসেবে, সমীহ করে; ঠিক তেমনি স্মিথের 'ব্রেইন ফেড' নিয়ে তীব্র ঝাঁঝালো মন্তব্য করে! আবার ২০১৯ বিশ্বকাপে যখন স্টিভেন স্মিথকে ভারতীয় দর্শকেরা তার টেম্পারিং কাজের জন্য চিটার বলেছিল, তখন সে নিজে দর্শকদের কাছে গিয়ে এইরকম 'চিটার' শব্দও না বলতে অনুরোধ করে এসেছে, উল্টো হাততালি দিতে বলেছে! মাঠ এবং মাঠের বাইরের এই ব্যালেন্স, আলাদা করতে পারার গুণটা আসলেই শিক্ষণীয়!

আইপিএল-এর প্রথম দুই সিজনের পরে সে বুঝলো যে ফিট না হলে একটুও উপায় নেই। সে দিল্লির ছেলে। তার প্রিয় খাবার 'বাটার চিকেন'। কিন্তু ফিট থাকার অভিলাষে ২০১৩ সালের পর থেকে সে 'বাটার চিকেন' খায় না, মিষ্টি খায় না। সেদ্ধ মুরগী, সবজিই তার খাওয়া। অফ সিজনেও প্রতিদিন ন্যূনতম গড়ে চার ঘণ্টা জিমে কাটায়। তাঁকে এত পার্টিবাজ হিসেবে জানি আমরা, বলিউড নায়িকা তার স্ত্রী। অথচ একেবারেই বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া সবসময়েই রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, প্রতিদিন রাত ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, এমনকি খেলা না থাকলেও!

ব্যাটসম্যান কোহলির একটা বড়ো ব্যর্থতা ২০১৪ ইংল্যান্ড সফর। ইংল্যান্ডের মাটিতে অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল খেলতে পারেননি, তাঁর বিরুদ্ধে সুইং বল খেলতে না পারার অপবাদ উঠে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতা থেকে কী শিখে পরের ইংল্যান্ড সফরে যাবে সে সেটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে ছিলাম। দেখিয়েছে কোহলি! ২০১৮ এর ১০ ইনিংসে ৫৯.৩০ গড়ে ৫৯৩ রান করে জবাব দিয়েছেন, দেখিয়েছেন একাগ্রতা নিয়ে নিজেকে উন্নত করার আদর্শ উদাহরণ! এখন তাঁকে পৃথিবীর কোনো জায়গায় ব্যর্থ বলবার পথ নেই। প্রত্যেকটা ম্যাচ শেষে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করে। কোনো একটা শট ভুল হলে সেটা কীভাবে ঠিক করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করে। এমন রেকর্ড থাকার পরেও কয়জন ব্যাটসম্যান প্রতিটা ম্যাচ শেষে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে এতটা প্যাশনেট থাকে?

কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে তার ট্রেনিং আর হার্ডওয়ার্ক নিয়ে কথা বললেন,

"যেমন একটা ক্যাচের কথাই ধরেন, ক্যাচ ধরতে দৌড় শুরু করলেন, মিস হলো, মানুষ বললো Great Effort. কিন্তু আপনার ক্যাচ ধরতে গিয়ে Point A থেকে Point B এর দূরত্ব কাভার করতে আপনার ত্বরণ কত সেকেন্ডে হয়েছে, তার জন্য আপনি কতটুকু ট্রেনিং করেছেন, আপনার পুষ্টি কতটুকু ছিল, ঘুম ঠিক টাইমে ছিল কিনা এসব জিনিসই ঠিক করবে অই দূরত্ব আপনি ৩ সেকেন্ডে কাভার করেছেন নাকি ২ সেকেন্ডে কাভার করেছেন। আপনি ২ সেকেন্ডে কাভার করতে পারলে সহজ ক্যাচ। আপনি ৩ সেকেন্ডে কাভার করলে Great Effort. এটা খুব সামান্য মার্জিনের ব্যাপার, এক সেকেন্ডের ব্যাপার। আপনি কি ওই ১ সেকেন্ডের জন্য ট্রেনিং এবং হার্ডওয়ার্ক করছেন কিনা সেটাই হলো আসল কথা!"

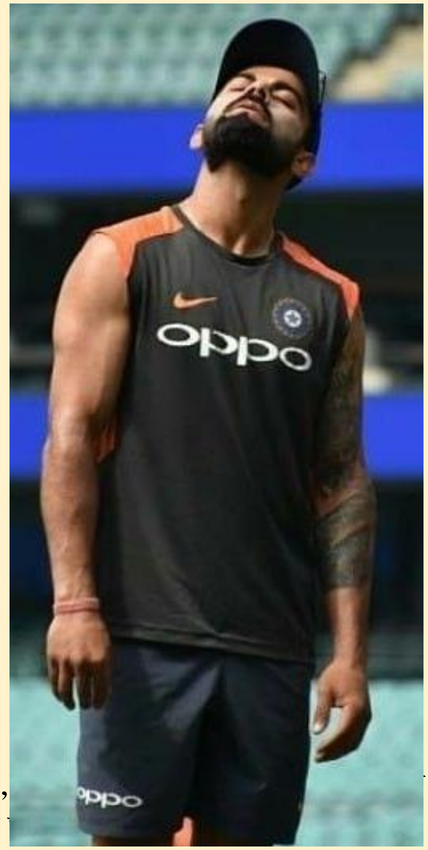

এভাবে কে চিন্তা করে, কয়জন চিন্তা করে?

ভিরাট কোহলির প্রফেশনালিজম, ক্রিকেটীয় সেন্স,
পরে শুধুমাত্র মাঠের মধ্যে তার প্যাশন বা এগ্রেশন দেখে
হিসেবে ভালো বলা একেবারেই উটপাখির বালিতে মুখ ডুবানোর পরিচায়ক!

বাবার মৃত্যুর পরেরদিন শুধুমাত্র প্যাশন আর প্রফেশনালিজম থেকে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন। ফলো অন বাঁচানো ৯০ রান করেছিলেন ২৩৮ বলে। নিজেই বলেছেন যে যেদিন সকালে উঠে মনে

হবে শরীর আর চলছে না, অথবা ক্রিকেটের প্রতি প্যাশনটা কমে গেছে, অথবা জয়ের ক্ষুধা আসছে না। সেদিনই তিনি ক্রিকেট ছেড়ে দিবেন!

এটাই ভিরাট কোহলি। তার রেকর্ডের খতিয়ানে গেলাম না। যেদিন অবসর নিবেন সেদিন এ নিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচ করা যাবে! সে ব্রায়ান লারার মতো ব্যাটিংয়ের বরপুত্র নয়। সে শচীন টেন্ডুলকারের মতো প্রতিভা আর বিশুদ্ধতার মিশেলও নয়। এমনকি নিজ দলের রোহিত শর্মার মতো টাইমিং করার প্রতিভা নিয়েও আসেনি!

কিন্তু সে অনুকরণীয়। প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজেকে কীভাবে উন্নতি করতে হয়, পরিশ্রম করে কীভাবে নিজেকে খুব ভালো থেকে গ্রেট থেকে গ্রেটেস্টদের কাতারে নিয়ে যেতে হয়, তার আদর্শ উদাহরণ ভিরাট কোহলি! আপাতত 'মানুষ' কোহলির বন্দনা করি। আর নিজেদের সৌভাগ্যবান ভাবি যে এই কোহলিকে আমরা 'লাইভ' দেখতে পারছি!

প্রতিশোধ

আহাদ আদনান

বেশ ভয় করছে।

সাথে উৎকণ্ঠা। কিছুটা দুশ্চিন্তা। মেয়েটা ঘুমিয়ে গেছে। স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে বছর দুই হলো। সারাদিন বাসায় ছুটোছুটি করে সন্ধ্যা হলেই ঝিমিয়ে পড়ে। রাতের খাবার নিয়ে এক দেড় ঘণ্টার যুদ্ধ শেষ হলেই বিছানায়। দশ মিনিটে একেবারে ঘুমে কাদা। সমস্যা হয় ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে। চারে পড়েছে মাত্র। বুকের দুধ ছেড়ে দিয়েছে দুই বছর বয়সে। ঘুম পাড়াতে গেলে গল্প বলতে হয়। গল্পের পর গল্প সাজাতে হয়। সত্যি গল্প। মিথ্যা গল্প। সত্যির মতো তেতো মিথ্যা গল্প। মিথ্যার মতো সুন্দর সত্যি গল্প। আজ কেন যেন কোনো গল্পই আসছে না মাথায়। ঘুমও নেই ছেলেটার চোখে।

"আম্মু, আব্বু আসবে কখন?"

"তুমি ঘুমালেই এসে পড়বে। সকালে দেখবে তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে।"

মিথ্যা বলতে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে আসে। কাল জুনের ১ তারিখ। বারোটা বাজলেই নতুন একটা তারিখের বিশেষ একটা রাত। ও আসবে না এই রাতে।

"আব্বু না আসলে আমি ঘুম যাবো না। আব্বু বলেছে আমার জন্য পেস্ট্রি আনবে।"

"তুমি না ঘুমুলে কাক এসে পেস্ট্রি নিয়ে যাবে। এত্ত বড়ো একটা কাক আছে জানালার ওপাশে। কালো। কুচকুচে কালো। আমার ভাগ্যের মতো কালো। কাকটা এই এলো বলে।"

পিচ্চিটা হাসে। ভয় পায় না মোটেও। প্রযুক্তি দিনদিন ভয় জিনিসটা তুলে দিচ্ছে নাকি? মনে হয় না। ভয় আমার তো করছে। আমিও তো প্রযুক্তির সাথে প্যাচিয়ে আছি। ফেসবুক, ইমো, অন্তর্জাল এসব জঞ্জাল না থাকলে এই ভয়ের রাতটা কি আসত?

অনিকের ফোনে আবার কল করি। এখনও বন্ধ। সন্ধ্যা থেকেই বন্ধ পাচ্ছি। ম্যাসেঞ্জারে কিছু কথা লিখে পাঠিয়েছি। এখনও পড়েনি মনে হচ্ছে। আরেকটা নাম্বারে কল করে যাচ্ছি। এটা বন্ধ থাকার কোনো মানেই নেই। বন্ধ তবুও এই দ্বিতীয় নাম্বারটা। এই দ্বিতীয় বন্ধ নাম্বারটা আমার বুকের কম্পন বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে।

এক অদ্ভুত সংসার আমার। ভার্সিটির শেষ বছরে বাবা হঠাৎ করেই এক রাজপুত্র পেয়ে যান। ছেলেবেলার এক বন্ধুর ছেলে। কাজ করে আয়কর বিভাগে। ঢাকা শহরে সাক্ষাৎ প্রিন্স। বাবা তখন ভেবেছিলেন, দাপুটে সেই অফিসারের সাথে বিয়ে না হলে তার মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমার পছন্দ, ভালোলাগা, ক্যারিয়ার সব তুচ্ছ তার কাছে। তারপর যেদিন দুর্জয় আর আমি ঠিক করলাম পালিয়ে বিয়ে করব, ঠিক সেদিনই দুর্জয়ের বাবা স্ট্রোক করল। ওর বাবা পরে বেঁচে গিয়েছিলেন। আর আমার জীবনের প্রথম আর একমাত্র প্রেমটা মরে গিয়েছিল। সেদিন থেকে শুরু আমার নরকবাস।

"আম্মু, তোমার কালো কাকটা অনেক বোকা। আব্বু তো কত রাতেই বাসায় আসে না। আমিও জেগে থাকি। তুমি ভয় দেখাও খালি খালি। একদিনও তো আসে না। আমাকে ভয় পায় বুঝি?"

আমার হাসি পায় কথা শুনে। ভয়ের মাঝেও হাসি। হাসলে হৃৎপিণ্ডের কম্পন মিনিটে দশ পনেরো কমে আসে। আহা, কতদিন প্রাণ খুলে হাসি না। ভালোবাসা নেই আমাদের সম্পর্কে। ঠিক অভ্যাসের মতো ঘর করে যাচ্ছি। সকালে আমি নাস্তা করে দিই, যাওয়ার আগে ও হাতখরচ দিয়ে যায়। মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাই, ও ফোনে জেনে নেয় ফিরেছি কখন। যেদিন সন্ধ্যায় বাসায় আসে, বিকেলে জেনে নেয় কি আনতে হবে। ভাতঘুম ভাঙার বিরক্তি নিয়ে আমি বলি, তোমার যা ইচ্ছা। রাতে ও মাঝে মাঝে বীর্য ত্যাগ করে। সকালে আমি আমার রাগ টয়লেটে ফ্ল্যাশ করে দিয়ে বলি, সুপ্রভাত। ওকে নয়; আয়নায় নিজেকে। এই নিন্দিত নরকে আরও একটা দিন এসে গেল। সুপ্রভাত তোমাকে, হে বন্দিনী।

আমাকে খুব অবাক করে দিয়ে ছেলেটার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। ঘুম যত বাড়বে, হৃৎকম্প তত কমবে। ওর আব্বুকেও কোনো এক মেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, এমন ভাবনা আমায় পেয়ে বসে। 'আমার স্বামীর একটা পরকিয়া আছে' ফেসবুকে অনেক মেয়েই এই কল্পনা লুকিয়ে রাখতে জানে না। অনুমান থেকেও গল্প ফাঁদে। সহানুভূতির কাঙাল সাজে। আমি কিন্তু খুব ভালো করে জানি ওদের কথা। প্রথমে সন্দেহ ছিল। একসময় পাই একটার পর একটা প্রমাণ। বিষয়টা এখন এতই প্রকাশ্য যে, ও এখন প্রায়ই বাইরে রাত কাটায়। আমি কিছুই বলি না। কোনোদিন বলিনি ঢাকা শহরের এই 'রাজপুত্র'কে।

এর কারণ আমার চরিত্রের একটা দিক। বুঝিয়ে বলছি। ক্লাস এইটে একবার এক শিক্ষক আমার বুকে হাত দিয়েছিল। ব্যথা, লজ্জায় আমি 'উহ' করে কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু কাউকে বলিনি এই ঘটনা। নিজের মা'কেও না। সেই স্কুলে ছিলাম আরও তিন বছর। ওই শিক্ষককে দেখলেই আমি আড়াল খুঁজতাম। বাঘ আর রক্তের স্বাদের গল্পটা আমি জানি। যেদিন এসএসসির রেজাল্ট হলো

সবাই মিলে সেলফি তুলছিলাম। সেদিনও আমি চুপ। এরপর আমি কলেজে ভর্তি হলাম। একদিন স্কুল থেকে ডাক এলো মার্কশিট নেওয়ার জন্য। কাগজটা হাতে নিয়ে আমি বুঝলাম, এই স্কুলের সাথে আমার লেনদেন শেষ। এর শিক্ষকদের কাছে আমি আর জিম্মি নই। সেদিনই গেলাম সেই শিক্ষকের বাসায়। দুপুর বেলা। দোরঘণ্টি বাজালাম। দরজা খুললেন তিনি। হাতে ঝোল লেগে আছে। খাওয়ার টেবিলে বউ, বাচ্চা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা স্যার আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

"ভাবি, ভালো আছেন? আজ থেকে চার বছর, আট মাস, তিন দিন, এক ঘণ্টা, দুই মিনিট আগে আপনার স্বামী খালি টিচার্স রুমে আমার বুকে হাত দিয়ে টিপে দিয়েছিলেন। বুককে তখনও আমি স্তন বলতে সাহস করিনি। আপনি আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন?"

সারা ঘর স্তব্ধ। তিনি মাথা নিচু করে আছেন। আমি জানি এরপর যা করতে যাচ্ছি, স্ত্রী সন্তানের সামনে তিনি আর মাথা উঁচু করতে পারবেন না।

"আমি বিচার দিতে শিখিনি কোনোদিন। আমি বিশ্বাস করি প্রতিশোধে। একদিন পর, এক মাস পর, এক বছর পর, এক যুগ পর। আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি না। প্রতিশোধ আমি এই জন্মে নেবই। ভুলি না আমি কিছুই।"

সেদিন আমার পায়ে ছিল সূচালো আগাওয়ালা চামড়ার জুতো। ডান পায়ের মোক্ষম আর তীব্র এক লাথিতে স্যারের অণ্ডকোষ থেঁতলে যাওয়ার কথা। তবে লুঙ্গি খুলে মাটিতে গড়াগড়ি খাবে, এটা ভাবিনি।

ছেলেমেয়ে দুটোই ঘুম। অনিকের ফোন বন্ধ এখনো। ফেসবুক থেকে জেনেছি, বারোটা বাজলেই ওর বান্ধবীর জন্মদিন। আর কয়েক মিনিট বাকি। এই রাতে ও ফিরবে না, এটা নিশ্চিত। আমি হাঁটছি ফ্ল্যাটের মধ্যে। রান্না ঘরে কিছু নাইলনের দড়ি, একটা ব্লেড, ধারালো ছুরি, একটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত তরলের কৌটা আমি লুকিয়ে রেখেছি। নেড়েচেড়ে দেখি প্রায়ই। ইচ্ছে করে অনেক কিছুই। এগুলো আমার কাজে লাগতে পারে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে চাই এদের চেয়ে ভয়ংকর কিছু।

হঠাৎ বেজে ওঠে দোরঘণ্টি। চমকে তাকাই দরজার দিকে। ভয়ে পা চলছে না। দরজায় 'স্পাইহোল' নেই। কে আসতে পারে এত রাতে? অনিক ফিরে এসেছে? পাশের ফ্ল্যাটের ভাবি? অচেনা কেউ? চেনা ভয়ংকর কেউ?

"কে? কে, বাইরে?" কাঁপা কাঁপা গলায় আমি চিৎকার করার চেষ্টা করি। কোনো উত্তর নেই।

আবার জিজ্ঞেস করি, "কে ওখানে?"

এবারও কোনো জবাব না পেয়ে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমি কি দরজা খুলব? নাকি বন্ধই রাখব? খুলে কী দেখব? অপরিচিত কোনো লোক? এসে যদি ডাকাতি করে? কিংবা খুন? আমাকে, বাচ্চাদেরকে। নাকি, ধর্ষণ করবে আমাকে? ধর্ষণ অবশ্য চেনা লোকগুলোই বেশি করে।

আবার সেই বীভৎস ঘণ্টি'র শব্দ। সাহস করে দরজাটা খুলতেই ভয় চলে যায় ছুমন্তর হয়ে।

"কুত্তা, তুই? এত শয়তান কেন তুই, দুর্জয়? কথার উত্তর দিচ্ছিলি না কেন? ফোন বন্ধ কেন? বিকেল থেকে পাচ্ছি না তোকে।"

"বিকেলে ফোন ছিনতাই হয়ে গেছে। সিম এখনও তোলা হয়নি। তোকে জানাবো, নাম্বার তো মুখস্ত নেই।"

“আমার নাম্বার তোর মনে থাকে না, বদ্‌।”

“সমস্যা কী? প্রোগ্রাম তো জানাই আছে। আজ রাতে তোর জামাই’র জিএফে’র বার্থডে। রাতে ওখানেই থাকবে। বারোটার মধ্যে আমি এসে পড়ব এখানে। তাই না?”

“তারপরও, ভয় করে না আমার?”

“কীসের ভয়?”

“ছেলেটা জেগে ছিল। আবার ধর অনিক যদি এসে পড়ে।”

“আসলে আসুক। এক ঘুষিতে নাক ভেঙে দেব।”

দুষ্টু আর অনৈতিক হাসিতে ঘর জমে ওঠে।

“তুই ওই ঘরে যা। আমি বাচ্চাদের ঘর লক করে আসি। প্রোটেকশন এনেছিস তো?”

“কেন, তুই পিল খাস না?”

ভয়ের মেঘ সরে গেছে। সারাটা রাত অসভ্য ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে শুধু।

স্যাণ্ডেল

সার্জিল খান

নয়ন এখন শ্যামলী ওভারব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড বাথরুম চেপেছে। আশেপাশের কোথাও কোনো বাথরুম নেই। ঢাকা শহরের বর্তমানে এমন অবস্থা, ব্যস্ত রাস্তাগুলোর আশেপাশে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে বাথরুম সারা যায় না। মার্কেটগুলোও বাথরুমের ব্যবস্থা রাখে না। মার্কেটের দোকানগুলোর কর্মচারীগুলো তাহলে সারাদিন বাথরুম না করে কী করে কাটায় কে জানে?

কোনো উপায় না পেয়ে অগ্যতা নয়ন সামনের দিকে হাঁটা দেয়। সামনেই শ্যামলী শিশুপল্লীর জামে মসজিদ আছে। সেখানে নিশ্চয়ই কাজ সারা যাবে।

দুপুর দেড়টা। নামাজের সময় হয়েছে। নয়ন শ্যামলী শিশুপল্লী জামে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দলে দলে মুসুল্লীরা ঢুকছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান পুরুষ মানুষ জীবনে দুইটা সময় একেবারে মন থেকে ধর্ম কর্মে মনোযোগ দেয়। এক টিনএজ বয়সের পুরোটা সময় ধরে, আর আরেকবার বার্ধ্যকে জড়ানো থেকে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত। এর বাইরের সময়গুলোতেও ধর্ম-কর্ম করে, তবে সেগুলোর একটিও নিঃস্বার্থভাবে না। অবশ্যই কোনো না কোনো কিছুর বিনিময় থাকবেই।

নয়ন এখন এই দুই সময়ের কোনোটাতেই নেই। পুরোদস্তুর যুবক বলতে যা বোঝায় সে এখন তাই। আর সব বাংলাদেশী মুসলমান পুরুষদের মতো সেও ধর্মকর্ম নিয়ে তেমন মনোযোগী নয়। তাই

নামাজ পড়ার অভ্যাস নেই। তাছাড়া কাপড়টাও বেশ পুরোনো, ধোয়া হয়নি কয়েকদিন যাবৎ। নামাজ না পড়ার একটি দুর্বল অযুহাত।

এতগুলো মানুষ মসজিদে ঢুকছে নামাজ পড়ার জন্য অথচ সে ঢুকছে কেবল বাথরুম সারার জন্য; এজন্য মন থেকেই কেমন যেন সাঁয় দিচ্ছে না। আবার অন্য কোনো উপায়ও নেই।

মসজিদে ঢোকার আগে উপরে কাগজে লেখা টাঙানো;

"পবিত্রতা রক্ষার্থে জুতা হাতে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করুন।"

নয়ন পবিত্রতা রক্ষার জন্য তার স্যান্ডেল হাতে নিয়ে মসজিদে ঢুকলো। সেখানে জুতা রাখার র‍্যাকে তার স্যান্ডেলটা রেখে বাথরুমে গেল।

বাথরুম সেরে মসজিদের দরজার কাছের স্যান্ডেল রাখার র‍্যাকে এসেই সে ভড়কে গেল। যেখানে সে তার স্যান্ডেল রেখেছিল, সেখানে তার স্যান্ডেলটি নেই। নয়ন আশপাশটা একবার তাকিয়ে দেখলো। মসজিদে ইমাম সাহেব নামাজ পড়াচ্ছেন। সবাই ফরজ নামাজ পড়ছে। মুসুল্লীদের মধ্যে স্যান্ডেল ভুলবশত তার স্যান্ডেল নিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব। নামাজরত অবস্থায় ছাড়া আর কেউ নেইও মসজিদে। তাহলে স্যান্ডেলটা কি চুরি হয়ে গেল?

খালি পায়ে ঢাকা শহরে ঘোরার মানে তুমি হয় পাগল নয়তো নেশাখোর অথবা ফকির। নয়নের যে বেশভূষা, তাতে তাকে পাগল, নেশাখোর বা ফকির কেউ ভাববে না। কি মনে করে নয়ন র‍্যাক থেকে এক জোড়া স্যান্ডেল হাতে করে নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল।

যে স্যান্ডেলটা তার চুরি হলো মসজিদ থেকে সেটা ছিল রাবারের। কিনেছিল মাত্র ষাট টাকা দিয়ে খিলখেতের ফুটপাথ থেকে। এই স্যান্ডেলও চুরি যে হতে পারে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। এমনও অভাবী চোর থাকতে পারে ঢাকা শহরে তার জানা ছিল না।

তবে সবকিছুর পরেও মুহূর্তের মাঝেই নয়নের মনটা হঠাৎই ভালো হয়ে গেল। বহুদিন ভালো স্যান্ডেল পরা হয় না। তিন বছর আগে শেষ চামড়ার নতুন স্যান্ডেল কিনেছিল নিউ-মার্কেট থেকে। এরমাঝে আরো অনেকবারই সে চাইলেই পারতো নতুন কোনো স্যান্ডেল কিনতে। কিন্তু বাবা মারা যাওয়া পরিবারের সবকিছু সামলে নিজের বেশভূষার দিকে নজর খুব একটা দেওয়া হয়নি তার বিলাসিতা ভেবে। সদা শাশ্বত মধ্যবিত্ত চিন্তাধারা।

সেই স্যান্ডেল বারবার ছিঁড়ে যাওয়ার পর সেলাই করতে করতে আর তলা ক্ষয়ে গিয়ে ফুটো হয়ে যখন পরার অযোগ্য হয়ে পড়েছিল, তখন খিলখেতের ফুটপাথ থেকে রাবারের স্যান্ডেলটা কিনেছিল মাত্র ষাট টাকা দিয়ে। তাও প্রায় ছয় মাস হতে চললো। হঠাৎ এমন স্যান্ডেল পরিবর্তন হওয়ায় তার ভালোই লাগছে, এখন অন্তত লোকজনের সামনে ভালো কিছু পরে হাঁটা যাবে।

শ্যামলীর শিশু মেলার সামনে দাঁড়িয়ে নয়নের হঠাৎ এসব সুখী চিন্তার ব্যাঘাত ঘটালো তার সেলফোন। বাম পকেটে ভাইব্রেশান দিয়ে রিং বাজছে। অফিসের সুপারভাইজারের কল।

"নয়ন সাহেব কোথায় আছেন?"

"জি স্যার, শ্যামলীতে।"

"আগারগাঁও গিয়েছিলেন নাজিম সাহেবের বাসায় টাকাটা আনতে?"

"জি স্যার ওদিকেই যাচ্ছি।"

"জি, জলদি যান। উনার থেকে টাকাটা নিয়ে ফিরবেন কখন?"

"জি ঘণ্টাখানের মাঝেই ফিরবো।"

“আচ্ছা কাজ সেরে কল দিবেন।”

“জি আচ্ছা স্যার।”

কলটা কেটে দিয়ে বাসে উঠে নয়ন আগারগাঁওয়ের দিকে রওনা দেয়। বাসটা ফাঁকাই আছে। ফাঁকা সিটে বসে গা এলিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে সে। পায়ে বেশ আরাম লাগছে। অনেকদিন পর নতুন স্যান্ডেল পায়ে দেওয়ার পর তার নিজেকে বেশ সুখী সুখী লাগছে। তাছাড়া স্যান্ডেলটাও বেশ ভালো। পুরোটাই চামড়ার। পরেও আরাম।

এরই মাঝে নয়ন বাসের অন্যান্য যাত্রীদের পায়ের দিকেও নজর দেয়। কেউ কেউ স্যান্ডেল পরেছে, কেউ কেউ স্যু। সবার স্যান্ডেলের সাথে সে তার নিজের পায়ের স্যান্ডেল মিলিয়ে দেখলো; মনটা আরো ভালো হয়ে গেল। তার চেয়ে দামী স্যান্ডেল পায়ে আর কারো নেই। হঠাৎই তার কেন যেন মনে হলো ঠিক তার পাশের সারির সিটের লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। নয়ন আড়চোখে একবার লোকটার দিকে তাকালো। লোকটা ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছে। শুধু তাই না, লোকটা একবার তার দিকে আরেকবার তার পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। নয়ন মনে মনে ভাবছে, এই লোকটা তার স্যান্ডেলের আসল মালিক নয় তো? বাসের সবার সামনে চিৎকার চেঁচামেচি করে তাকে সবার সামনে আবার স্যান্ডেল চোর বলে অপমানিত করবে না তো? দুশ্চিন্তায় তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। খুব দ্রুত এ জায়গা ছাড়া দরকার। রাস্তাও ফাঁকা। বাসও চলছে দ্রুতই, তবুও নয়নের মনে হচ্ছে আরো জোরে যাচ্ছে না কেন বাস?

বাস আগারগাঁও এসে থামে। নয়ন নেমে পড়ে খুব দ্রুত। নেমেই সে বাসের দরজার দিকে তাকায়, লোকটাও নামলো কিনা লক্ষ্য করে। না! লোকটা নামেনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে থাকে।

অফিসের এক ক্লায়েন্টের থেকে টাকা পায় কোম্পানি। নাজিম উদ্দীন ভূঁইয়া। বেশ ক’দিন হলো পাওনা টাকা নিয়ে ঘোরাচ্ছে সে। আজ কথা দিয়েছে টাকাটা দিয়ে দিবে। বিশ হাজার টাকা। সে টাকা আনতে তার বাসায় যেতে হচ্ছে।

ঠিকানা খুঁজে ফিরে অবশেষে নাজিম সাহেবের বাসা খুঁজে পাওয়া গেল। দোতলা বাসা। কলিং বেল টিপে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে নয়ন। অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ তার চোখ গেল পাপোশের দিকে। বেশ ক’জড়া স্যান্ডেল সেখানে রাখা আছে। তার পায়েরটার চেয়েও ভালো মানের ও দামী। নয়ন কেমন কেমন করে যেন তাকালো স্যান্ডেল জোড়াগুলোর দিকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দরজাটা খুলে গেল। নাজিম সাহেব দরজা খুলেছেন।

“চলে এসেছেন?”

“জি চলে এলাম।”

“বাসা চিনতে অসুবিধা হয়নি তো?”

“না না, অসুবিধা হয়নি।”

“ভেতরে আসুন।”

“না না, ভেতরে আর না আসি। যদি পারেন তো, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি কি হবে?”

“জি অবশ্যই হবে। ভেতরে আসুন।”

ভদ্রতা করে নয়ন ভেতরে ঢুকলো। সুন্দর ছিমছাম পরিপাটি বসার ঘর। মধ্যবিত্ত পরিবারের বসার ঘরই কেবল গোছানো থাকে, অগোছালো থাকে ভেতরের ঘর। বসার ঘরের সোফায় বসে অপেক্ষা করতে করতে নাজিম সাহেব তার জন্য পানি নিয়ে আসেন। সাথে টাকার খামটাও। পানি এনে এগিয়ে

দেওয়ার পর এক ঢোকেই পুরোটা পানি শেষ করে ফেলে নয়ন। এরপর টাকার খামটা এগিয়ে দেন নাজিম সাহেব নয়নের দিকে।

"পুরোটা গুনে নিন।"

"না থাক গোনা লাগবে না।"

"আরে ভাই, অফিসিয়াল ব্যাপার স্যাপার। স্বচ্ছতা থাকা ভালো।"

নয়ন খামটা খুলে টাকাগুলো গুনতে থাকে। পুরো বিশ হাজারই আছে। জাল নোটও নেই। মুখে একটা হাসি টেনে বিদায় নিয়ে নেয় সে। নাজিম সাহেব দরজা বন্ধ করে দেন। নয়ন তবুও দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো স্যান্ডেল পরে সে এসেছিল সে ঠিক মনে করতে পারে না। নিজের কেনা ব্যবহৃত স্যান্ডেল হলে মনে থাকতো। এখানে রাখা সবগুলো স্যান্ডেলই একই রকম দেখতে। সবগুলোর মাঝে থেকে সবচেয়ে ভালো স্যান্ডেলটা পায়ে দিয়ে নেমে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে। গন্তব্য এখন তার অফিস।

আগারগাঁও থেকে অফিসে যাওয়ার জন্য সে মতিঝিলের বাসে উঠে পড়ে। আজ শনিবার না। অন্য কোনো সরকারি ছুটিও নেই। হরতালও নেই, কোনো আন্দোলনও নেই। অথচ ঢাকা শহরে বাসও ফাঁকা, রাস্তাও। এমন আরামের ঢাকা অনেকদিন পায়নি সে।

বাসে ওঠার পর ফাঁকা সিটে বসে আবারো সে গা ছেড়ে পা এলিয়ে দিয়ে বসে। এবারের স্যান্ডেলটা আগেরবারের থেকেও ভালো। আবারো সে বাসের অন্যান্য যাত্রীদের পায়ের দিকে তাকায়। মনে মনে আবারো পরিতৃপ্তির হাসি হাসে সে। এবারও তার চেয়ে দামী আর ভালো স্যান্ডেল আর কেউ পায়ে দেয়নি। পা থেকে খুলে গোড়ার দিকটায় তাকালো সে। এ্যাপেক্সের স্যান্ডেল। তার থেকেও বড়ো কথা, এখন আর তেমন কোনো আশঙ্কা নেই অন্য কেউ এসে বলবে, "এই তুই আমার স্যান্ডেল চুরি করেছিস!"

বাস মতিঝিল পৌছে বিকেল চারটায়। বাস থেকে নেমে অফিসে পৌঁছার পর অফিসে তার সুপারভাইজারের কাছে টাকার খামটা এগিয়ে দেয়। সুপারভাইজার আবারো গুনে নেয়। প্রতি পাঁচ হাজারের রাউন্ড পার হওয়ার পর সে আড়চোখে নয়নের দিকে তাকায়। নয়নও তাকিয়ে আছে সুপারভাইজারের টাকা গোনার দিকে। টাকা গোনা শেষে সুপারভাইজার বলেন, "আজ তো অফিস তাড়াতাড়িই ছুটি হবে।। জানেন তো?"

"না। কেন?"

"আমাদের এমডি স্যারের মায়ের কুলখানি। অফিস ছুটির পর বাদ' আসর আট তলায় নামাজের ঘরে মিলাদের আয়োজন করা হয়েছে। সবাইকে থাকতে বলেছে।"

"ও জানতাম না।"

"থাকবেন না? নাকি অন্য কোনো কাজ আছে? চলে যাবেন?"

"না থাকি। কাজ নেই অন্য কোনো। আজ রাস্তাও ফাঁকা। পরে গেলেও সমস্যা নেই।"

"আচ্ছা। তাহলে চলে আসবেন।"

"জি আচ্ছা স্যার।"

আসরের নামাজ শেষে সবাই জড়ো হয়ে পড়ে আট তলায়। আয়োজন তেমন বিরাট কিছু না। শামিয়ানার কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্লোরে। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে বসে আছে। নয়ন অফিসের সামান্য একজন ক্লার্ক। সে বসেছে দরজার কাছে। সিনিয়র অফিসাররা বসেছে একদম সামনের সারির দিকে। এরপর অফিসের পজিশনের ভিত্তিতে অন্যান্য স্টাফেরা বসেছে পর্যায়ক্রিমকভাবে সারিবদ্ধ হয়ে। মসজিদেও এমনটা দেখা যায়। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাধারণত একদম প্রথম দিককার সারির

দিকে বসেন। এরপর এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে জায়গা পান মসজিদে বসার, নামাজ পড়ার। বাংলাদেশের সবখানেই যার যার যে অবস্থান, তাকে সেখানেই রাখা হয়। অথচ আল্লাহর নিয়ম তো তা নয়। তাঁর কাছে সবাই সমান, কিন্তু বাংলাদেশে তা মানা হয় না কেন? মিলাদে বসে বসে এ কথাই ভাবতে থাকে নয়ন।

মিলাদ পড়ানো শেষে তবারকের অপেক্ষায় সবাই বসে থাকে। নয়ন মিলাদ পড়ানোর আগেই বেড়িয়ে পড়ে তবারক না নিয়েই। তার মনে অন্য চিন্তা। কেন যেন হঠাৎ করে তার নতুন স্যান্ডেল পরার শখ জেগে উঠেছে। দরজার বাইরে অসংখ্য স্যান্ডেল রাখা। এরমাঝে বেছে বেছে সব থেকে দামী আর ভালো স্যান্ডেলটা পায়ে দিয়ে দ্রুত বেড়িয়ে পড়ে সে।

অফিস থেকে বেড়িয়ে পড়ার পর মতিঝিল থেকে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে। এতক্ষণ ছিল বাসের সিট ফাঁকা, রাস্তা ফাঁকা, এখন বাস স্ট্যান্ডে বাসই ফাঁকা। হঠাৎ করে সব বাস যেন চলে গিয়েছে। অপেক্ষা করতে করতে সে একটা চায়ের দোকানে বসে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সে তার স্যান্ডেলটার দিকে তাকায়। এবারেরটা বাটা। শেষ কবে বাটা'র স্যান্ডেল পরেছিল সে ভাবে। কলেজে পড়বার সময় ইদে শেষবারের মতো বাটা'র স্যান্ডেল কিনেছিল। তাও প্রায় আজ থেকে বারো বছর আগে। তখনও বাবা বেঁচে ছিলেন। সেবারই বাবার সাথে তার শেষ ইদ।

সেবার বাবার বেতন বোনাস হয়নি ইদের আগে, তবুও নয়নের বায়না মেটাতে চাঁদরাতে ইদের বাজার করে দিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাবা বলেছিলেন, "খুশি রে বাবা?"

"হ্যাঁ।"

"বুঝলি, প্রতিটা মানুষই খারাপ সুযোগের অপেক্ষায়। প্রতিটা মানুষই ভালো সুযোগের অভাবে।"

"বুঝলাম না।"

"থাক কিছু না।"

নয়নের বাবা মারা যায় আত্মহত্যা করে। জেলের ভেতর। ইদের পরপরই বাবার ওপর কেস আসে সাত লাখ টাকা চুরির। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারায় তিন বছরের জেল হয়। জীবনেও ঘুষ না খাওয়া একজন অফিসার চুরির কেসে জেল খাটছেন, এই অপমান সইতে না পেরে জেলের ভেতরেই ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেন। চাঁদরাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাবার সেদিনের সেই কথার অর্থ নয়ন তখন কিছুই বোঝেনি। কেনই বা বাবা এ কথা তাকে সেদিন বলেছিলেন, সেটা আজও তার কাছে অমীমাংসিত। তবে আজ বাবার সেই কথাটা তার কাছে পরিষ্কার।

বাস এসেছে অনেকক্ষণ পরে। এখন একেবারে কয়েকটা। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বাসে উঠে পড়ে সে। এখনও বাসের সিটগুলো মোটামুটি ফাঁকাই। খালি সিটে গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে। বাসের অন্যান্য যাত্রীদের পায়ের দিকে আবার সে নজর দেয়। কেউ কেউ স্যান্ডেল পরেছে, কেউ কেউ স্যু। সবার স্যান্ডেলের সাথে সে তার নিজের পায়ের দিকে মিলিয়ে দেখলো; মনটা আরো ভালো হয়ে গেল। বাবার সেদিনের সেই কথাকে সে ভুল প্রমাণিত করেছে। খালি পায়ে নিজের পা দুটোকে দেখতে খুব একটা খারাপ লাগছে না। গন্তব্য এখন তার বাসা।

ক্রাইম

সুরাইয়া জামান

আমি আর গৌতম তখন অপরাধ জগতে রাজ করছি।

খুন, ধর্ষণ, রাহাজানিসহ অপরাধ জগতে এমন কোনো কাজ নেই যা আমরা করি না। আমাদের একটা গ্যাং আছে। গৌতম শহরের আনাচে-কানাচে থাকা সুবিধা বঞ্চিত বাচ্চাদের খাবারের লোভ দেখিয়ে ডেরায় নিয়ে আসে। ক্ষুধার আদিম সেই তাড়না বাচ্চাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে আমাদের ডেরায়। আমি ওদের হাতে কলমে শেখাই কীভাবে অন্ধকারে মাঝ রাস্তায় পথচারীর গলায় ক্ষুর ধরে ছিনতাই করতে হয়। গৌতমকে কামিজ পরাই, ভীড় বাসে কীভাবে পেছন থেকে মেয়েদের জামা কেটে ভদ্রলোকের মুখোশে নিজেকে আড়াল করতে হয়, তার ডেমো দেখাই।

গৌতম বা আমি, বাকিদের মতো তাল গাছের গোড়ায় গজিয়ে উঠা ব্যাঙের ছাতার মতো নই। কলেজের পেছনের গলিতে বন্ধুদের সাথে একদিন গাঁজার স্বাদ নিতে গিয়ে ফেঁসে যাই আমি। অদৃষ্ট আমাকে আর আমার মধ্যবিত্ত বাবার মুখের দিকে ঘুরে তাকাতে দেয়নি। আদরের বড়ো সন্তান ছিলাম আমি বাবার। স্বপ্ন ছিল বড়ো হয়ে আর্টিস্ট হবো।

একটা ধুলোপড়া চেয়ারে আয়েশী ভঙ্গিতে বসে চিত্রকরের আঁকা ছবির মতো মদের গ্লাসে ঠোঁট লাগাই।

গৌতম বড়োলোকের ছেলে। দেখতে সুন্দর। বাবার পকেট থেকে টাকা খরচ করে আমাকে বিদেশী মদ এনে দেয় সে মাঝে মাঝে। এনায়েতের কাছ থেকে মাস চুক্তিতে ইয়াবা আর গাঁজার চালান বুঝে নেওয়া গৌতমের দায়িত্ব।

জয়েন্ট বানানো নিয়ে ঝামেলা করে এক মাতাল জুয়াড়িকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে খুন করি আমি। ওটাই আমার প্রথম খুন। এরপর থেকে রক্তের নেশা পেয়ে বসে আমাকে।

একদিন ডেরায় খাবার সাপ্লাই দিতে এসে খালেদা মাসির ছোটো ছেলেটা বলাৎকার হয় আমার হাতে। ভয়ে কাঁপতে থাকে ছেলেটা। ওকে খুন করতে আমার খারাপ লাগে, কেমন মায়া হয়। গৌতমকে বলি ওর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে। গৌতম একটা আস্ত ইট দিয়ে থেঁতলে দেয় ছেলেটার মুখ।

গৌতম রক্তে মাখামাখি অবস্থায় আমার সাথে মেতে উঠে রতিক্রিয়ায়।

পহেলা ফাল্গুনে মেয়েদের ঈশ্বরী সাজতে দেখে আমারও খুব ইচ্ছে করে শাড়ি পরতে। গৌতম আমার জন্য হালকা বাসন্তী রঙের শাড়ি কিনে আনে। আমি শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়াই। দেখতে থাকি নিজেকে। ছোটো বোনটার কথা মনে পড়তে থাকে।

ঘুরতে বের হই গৌতমের সাথে। রমনাতে বসি কিছুক্ষণ একসাথে। গৌতম আমার হাত ধরে একটা সুস্থ জীবনে ফেরার কথা বলে। আমি খিল খিল করে হাসতে থাকি। এক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। ওর চোখে আমার জন্য দেবীভক্তি দেখি আমি।

গৌতম খুব পছন্দ করে আমাকে। ঠিক কতটা পছন্দ করলে সে মানুষটাকে অপরাধ জগতে একা ছেড়ে দেবার সাহস মানুষ করতে পারে না, সেটা ভেবে পুলকিত হই আমি।

হঠাৎ খুব রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ইচ্ছে করে আমার। প্লেয়ারে একটা গান ছেড়ে মদের গ্লাস নিয়ে বসি। ফোন আসে একটা। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে এনায়েত বলে, "একটা কচি মাল পাইছি ম্যাডাম। কাল সকালে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে।"

একটা ক্রুর হাসি দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠি। অনেকদিন পর ড্রইংবোর্ডের সামনে চেয়ার টেনে বসি। বাম হাতে আর্টপ্যালেটের জলরঙে তুলি ভেজাই। আঁচড় কাটতে থাকি সাদা ক্যানভাসে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ফিরে যাই ক'বছর আগে।

মনে হতে থাকে, মধ্যবিত্ত সংসারে বেড়ে ওঠা এক সরল কিশোরীর জীবনের সাদা ক্যানভাস কালো রঙে ঢেকে যাচ্ছে যেন!

আনরোমান্টিক জামাই

জান্নাতুল ফেরদৌস

বিয়ের আগে বুঝিনি যে অনিকের ভেতরে রোমান্টিকতা একেবারেই নেই। এমনিতে অবশ্য আমিও বেশি আহ্লাদীপনা পছন্দ করি না। কিন্তু তবুও; নতুন বিয়ে হওয়া প্রতিটা মেয়েই চায় বরটা তাদের সাথে একটু রংঢং করুক। হাতে হাত রেখে বলুক, "তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি এ জীবনে কখনো দেখি নাই!" বা "তুমি চুলটা খোলা রাখবা, সুন্দর লাগে।" অনিক এসবের ধারে কাছেও নাই।

বিয়ের দুইদিন পর গম্ভীর মুখে অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাচ্ছে এই সময় ওর মা এসে অবাক হয়ে বললেন, "এখন কীসের অফিস?"

অনিক বিরক্ত স্বরে বললো, "ইমার্জেন্সি পড়ে গ্যাছে!"

আমার শাশুড়ি আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, "দুইটা দিন তুমি অফিস ছাড়া থাকতে পারছো না? নতুন বউ রেখে অফিসে যেতেই হবে?"

অনিক রাগত স্বরে বললো, "তো কী করবো? নতুন বউ কোলে নিয়ে বসে থাকার সময় আমার নাই!" বলেই গ্যাটগ্যাট করে বেরিয়ে গেল। আমি লজ্জায় শাশুড়ির চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

কিছুদিন পার হতেই বুঝতে পারলাম এই ছেলের কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। সে ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে ফুল দেবে না, বার্থডের দিন রাত বারোটায় কেক আনবে না, অফিস থেকে

ফেরার পথে বেলি ফুলের মালা নিয়ে এসে মাথায় গুঁজে না দিয়ে ফোন করে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করবে, “বাড়িতে কাঁচাবাজার কিছু লাগবে?”

আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো যেদিন আমি একটু রেগে গিয়ে ওকে বললাম, “আজ টেডি ডে, আমার বান্ধবীদের বরেরা সবাই তাদের টেডি গিফট করেছে, তুমি করো নাই।”

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, “আমি কীভাবে করবো? তোমার বান্ধবীদের কী আমি চিনি?”

এরপর আমার আর কিছু বলবার রইলো না। আমি ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে আম্মুকে ফোন দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার দিকের আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে গেল।

আমি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিচার দিলাম, “অনিক আমাকে ভালোবাসে না। আমার সাথে থাকতে ওর ভালো লাগে না। ওকে বাসা থেকে জোর করে বিয়ে না-দিলে বিয়েও করতো না আমাকে!”

অনিকের অবাক দৃষ্টি উপেক্ষা করে আমার ফুপু এক রামধমক দিয়ে বললেন, “কেন গো জামাই, আমাদের এত সুন্দর মেয়ে তোমার ভালো লাগে না? পছন্দ না হলে বিয়ে করলা কেন? আমাদের মেয়ের কী ছেলের অভাব হইতো? হইতো না! আমার ননদের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, তার সাথে দিতাম।”

অন্যদিক থেকে ফুপা মিনমিন করে বললেন, “নিশ্চয়ই অন্য কোনো কাহিনি আছে। আদার লেডি এট্রাকশন... পরকিয়া-টরকিয়া করছে।”

ফুপু হাতে কিল দিয়ে বললো, "রাইট! এটাই হবে।"

অনিকের মা দুঃখী দুঃখী গলায় বললেন, “এইসব কী বলেন, বেয়ান! আমার ছেলের অন্য মেয়েমানুষের ওপর কোনো আকর্ষণই নাই। সে ছোটোবেলা থেকেই এরকম। পড়াশোনা নিয়ে থাকে, চাকরি পাবার পর কাজকর্ম নিয়ে থাকে। একটু কম রোমান্টিক কিন্তু ছেলের চরিত্র খারাপ না। এত বড়ো অপবাদ দিয়েন না।”

আমার আত্মীয়-স্বজন কোনো কথাই শুনলো না। আমাকে নিয়ে বাড়ি চলে এলো।

এদিকে অনিক রোমান্টিক না হতে পারে কিন্তু আমি তো ওকে ভালোবাসি! দিনের পর দিন ওকে ছাড়া থাকতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তারচেয়েও রাগ উঠছে অনিক একবারও আমাকে ফোন দিয়ে রাগ ভাঙানোর চেষ্টাও করছে না। এরমধ্যে সে শুধু একদিন ফোন দিয়েছে।

আমি বাথরুমে ছিলাম। ফোনের আওয়াজ শুনে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে ও গম্ভীর গলায় বললো, “আমার সাদা পাঞ্জাবিটা কোথায় রেখেছো? ভেতরে হালকা ফুল দিয়ে ডিজাইন করা।”

আমি কোনোমতে নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করলাম, “কেন কী করবা?”

“বন্ধুর আকদ, সেখানে যাবো।”

আমি হাহাকার করে উঠলাম, “বাহ! তুমি তো ভালোই আছো। সুখে আছো। বন্ধুর বিয়ে খাচ্ছো! আমার কথা একবারও মনে পড়ে না?”

অনিক সহজ স্বরে বললো, “মনে না পড়ার কী আছে? বউ ছিলা তুমি। মাঝেমধ্যে মনে পড়ে।”

“মনে যদি পড়ে ফোন দাও না কেন?”

“আজব তো! মনে পড়লেই ফোন দিয়ে তোমাকে ইনফর্ম করতে হবে যে মনে পড়েছে?”

আমি ফোন রেখে দিলাম। আইফোন না হলে ফোনটাকে একটা আছাড় দিতাম। আইফোন বলে আছাড় না দিয়ে ফোন অফ করে দিলাম। যদিও তার দরকার ছিল না। অনিক বারবার ফোন দিয়ে আমাকে বিরক্ত করবে এই আশা করাও বৃথা।

আমাদের কেস কোর্টে উঠেছে। আমি তুলিনি। আমার ফুপুই দায়িত্ব নিয়ে তুলেছেন। ফুপু আমার ডিভোর্স করিয়ে তার ননদের ছেলের সাথে বিয়ে দেবে। অনেক কষ্টে ননদকে রাজি করিয়েছেন।

জজ সাহেব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ওনার সাথে থাকতে চান না?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "চাই! তবে একটু রোমান্টিক হলে..."

জজসাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অনিককে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কিছু বলার আছে?"

অনিক গম্ভীর গলায় বললো, "আমি আর কী বলবো বলেন! রোমান্টিক কীভাবে হয় আমার জানা নাই। তাছাড়া আমার দিক থেকে তো কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। থাকলে থাকবে, না থাকলে ডিভোর্স চাইলে দিবো।"

আমি চিৎকার করে উঠলাম, "এইটাই তোমার সমস্যা! না থাকলে জোর করবা না কেন? আমি তোমার বউ না! হাত ধরে নিয়ে যেতে পারো না?"

অনিক আরও জোরে চিৎকার করে বললো, "বাচ্চা নাকি তুমি যে হাত ধরে কোলে করে নিয়ে যাবো! অ্যাডাল্ট মেয়ে; থাকতে না চাইলে আটকাবো কেন?"

আমি ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে ফেলে জজ সাহেবের কাছে বিচার দিলাম, "স্যার! আমি চলে গেলে ও আরেকটা বিয়ে করবে!"

এদিকে জজ সাহেব ঠাস ঠাস করে টেবিলে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছেন আর বলছেন, "সাইলেন্স! সাইলেন্স! সাইলেন্স!"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার মামলা জোরদার না। আপনি নিজেই জানেন না কী করবেন। একবার বলেন থাকবো, একবার বলেন রোমান্টিক না হলে চলে যাবো। আপনারা সময় নিন। নিজেরা আগে ঠিক করেন কী করবেন। যান, বাড়ি যান।"

আমরা যার যার বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি গিয়ে ফুপুর কাছে অনেক ঝাড়ি খেলাম। আমার দোষে আমরা কেস হারবো, আমার জীবন নষ্ট হবে ইত্যাদি।

এরমধ্যে অনিকের মা ফোন দিয়ে বললেন, "মা, তুমি কান্নাকাটি কোরো না, আমি আমার ছেলেকে বুঝিয়ে বলছি।"

সারাদিন আমি খাইনি। দরজা বন্ধ করে কেঁদেছি। সন্ধ্যার পর মা এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললো, "অনিক এসেছে, তোকে ডাকে।"

আমার আবার রাগ উঠে গেল। কেমন একটা বর! দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে তা না!

ড্রয়িংরুমে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। অনিক চার-পাঁচটা বড়ো বড়ো টেডি এনেছে — পান্ডা, বিড়াল, কুকুর দিয়ে ছড়াছড়ি। সেইসাথে গোলাপ এনেছে শখানেক। চকলেট এনেছে, বই এনেছে, মেকআপ আইটেম এনেছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই আমার হাত ধরে বলল, "চলো। টিকিট কাটা আছে, ব্যাগ গুছাও।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কোথাকার?"

অনিক গম্ভীর স্বরে বললো, "হানিমুন। অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিয়েছি এরমধ্যে ঘোরাঘুরি সারবা। আর এই নাও তোমার টেডি-ফেডি যা চাইছিলা। ফেরত চলো, রোমান্টিক তো হইছি আর কত!"

যাত্রা

মাঙ্গীশা মারিয়াম

যেহেতু থামিনি মরণের তরে-
মরণ এসেছে দোরে-
অমরত্বের রথযাত্রায়-
সাথী করে নিতে মোরে।

মন্থরবেগে চলিলাম দোহে-
তোড়জোর সে না জানে-
শ্রান্তর সব ক্লান্তি সঁপিনু-
শান্তর সম্মানে।

পার হয়ে গেলো পাঠশালাঘর-
ফেলে আসা শৈশব-
সোনা ঝলমল মাঠভরা ধান-
গোধূলীর বৈভব।

আলতো সে ছোঁয়া পাইনি কি আগে-
শিশিরের শিহরণে-
কাশের বুননে, মেঘের পিরাণে-
শরতের আবরণে।

দীর্ঘ সে পথ থেমেছিলো শেষে-
পাতালের এক প্রাসাদে-
কার্নিশ যার নেমেছিলে এসে-
মেঝেতে, দেওয়াল ছাদে।

তারপরে কত শতক কেটেছে-
তবু মনে হয় গতকাল-
জেনেছি এ যাওয়া অশেষের পানে-
জানতাম যেন কতকাল!

[Emily Dickinson এর Because I Could Not Stop For Death কবিতার অনুবাদ]

দৃষ্টি আকর্ষণ

ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।

অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

ধন্যবাদ।

আমি শুধু পোস্টার হয়ে ঝুলে রইবো দেয়ালে দেয়ালে

সকাল রয়

"রাজনীতির ঘোলা জলে পড়ে তুই একদিন পত্রিকার ফটো হয়ে যাবি;
শুধু কি ফটো হয়ে যাবো? দেখিস, দেওয়ালের পোস্টারও হয়ে যেতে পারি।"

॥ ০১ ॥

এক লাফে পাঁচিল টপকালাম।

শব্দগুলো পিছু পিছু আসছে দুর্দান্তবেগে। একমুহূর্ত দাঁড়াবার কোনো উপায় নেই। ছুটছি ঊর্ধ্বশ্বাসে। পিছু পিছু ছুটছে শব্দগুলো, নেড়ি কুকুড়ের মতো। ঘামছি দর দর করে, কিন্তু থামছি না। হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে কামারের হাঁপরের মতোন। মনে হচ্ছে ছিটকে বেরিয়ে যাবে যেকোনো সময়।

পায়ের গতি ক্রমশই স্তিমিত হয়ে আসছে। কতক্ষণ আর দৌঁড়ানো যায়? হাটুর গিঁটটা ব্যথায় টনটন করছে, কোথায় লেগেছে কে জানে? গলি পেরিয়ে রাস্তা তারপর মাঠ, মাঠ পেরিয়ে বড়বাজার তার শেষ মোড়টায় কফি হাউজ, এভাবেই রাস্তা শেষ হয়ে আসছে। লক্ষ্য ছাড়া দৌঁড়ের মাঝেই পাশ পকেটটায় হাতড়ালাম। নাহ্, সেলফোনটাও নেই; হয়তো সে খোয়া গেছে আমারি মতো।

কফি হাউজ পার হবার পর বুঝা গেল জনশূণ্য পথে আজ আর কোনো সাহায্য পাওয়া আমার হবে না। শব্দের গতির কাছে কতক্ষণ টিকতে পারবো জানি না। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম, চকিতে মাথাটা ঘুরে গেল। ডানদিকের গলিটায় ঢুকলাম, আড়ংয়ের দোকানটাও বন্ধ। বা-হাতি মোড়ে, আকমলের ঝুঁপড়িতে এখনও তালা ঝুলছে। সব শালা আজ ঘুমপাড়ানীয়া মাসির হাত ধরেছে। বাম দিকের গলিতে এখনও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। চোখ ঘুরিয়ে দেখি মহাথীর রোডে সবে মাত্র জিমন্যাস্টিকের ছেলেগুলো নেমেছে, ভাবলাম একবার ওদের মাঝে মিশে যাই না। কিন্তু কীভাবে সম্ভব সেটা? শব্দগুলো তো গোঁড়ায় গোঁড়ায় আসছে। ডানহাতি রিপ-কর্নার পেরিয়ে বেদীটার পাশে দাঁড়ালাম। বোধহয় ওদের চোখ এড়িয়ে গেছে আমার ছায়াটা, তাই শব্দগুলো আমার অস্তিত্ব না পেয়ে কুকুড়ের মতো দৌঁড়ে পাশের রাস্তা ছাড়লো বটে, আমার পিছু যে ছাঁড়বে না তা বুঝতে পারছি।

॥ ০২॥

কোনোরকম দেওয়াল সেটে দাঁড়িয়ে আছি এই অন্ধকার গলিটাতে। নিশ্বাসটাও কি আজ বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমার সাথে? কেন যে খুব শব্দ করে সে আন্দোলন করছে? হাঁটু থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে মাটিতে, ধূলো কিছুটা জমাট বেঁধে গেছে; রক্তের দাগ দেখলে আর রক্ষে নেই

ধরে ফেলতে সুবিধা হবে ওদের। কী যে করি? পা দিয়ে বালি এনে ঢেকে দিলাম রক্তের দাগটাকে। পিছনে আসা পায়ের শব্দগুলো খুঁজে খুঁজে তোলপাড় করছে সব। ইস্ যন্ত্রণা! আর কতটা সময় এভাবে জ্বালাবে?

ডানদিকে তাকিয়ে একটু জোরে নিশ্বাস টানলাম, ভাবলাম আবার রক্ত না এসে যায়। শীতের সকাল বেশ ঠান্ডা। গলার ভেতরটা ব্যথায় কাদঁছে কিন্তু কী করবো? উপায় তো নেই কোনোও। একটু চোখ বন্ধ করলাম একটা প্রাণভরে নিশ্বাসের আশায়, চোখ খোলার আগেই শব্দটা আবার কানে বাজলো; কেউ যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

এই এলাকাটা আমার পরিচিত। রাজবাড়ীর পাশেই থাকে আমার ক্লসমেট শ্যামলী, ভাবলাম দেখি শেষ চেষ্টা করে ও কী করতে পারে আমার জন্য? কথাটা মনে হতেই সেই দিকটায় দৌঁড় লাগালাম। মনে হচ্ছে এ-যাত্রায় আমার রক্ষা মিলবে।

চায়ের পট উল্টে ফেলে দিয়ে একেবারে সোজা অন্দরে গেলাম ঢুকে। সকালের চা-টা বোধহয় আর খাওয়া হলো না ওদের। কিন্তু এসব ভাববার সময় বড়ো অল্প। রাস্তাটা চেনাই ছিল সোজা রান্নাঘরে ঢুকলাম।

শ্যামলী বোধহয় পরোটা ভাঁজছিল হঠাৎ মুখোমুখো দেখে বলল, "তুই এখানে?"

এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না ও। গত সপ্তাহে যে পরিমাণ কলহ আর বচসা হয়েছে তাতে আজ ওদের বাসায় আমাকে দেখে খানিকটা অবাক হওয়া অন্যরকম কিছু নয়!

হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "কি, রে অনি তুই এখানে? এই সাত সকালে? কী হয়েছে তোর? দৌড়াচ্ছিস যে?"

আমি শুধু বললাম, "একটু লুকাতে দে আমায়?" শ্যামলীর কথা শুনবার সময় আমার ছিল না। অগ্যতা আর না দাঁড়িয়ে সোজা গ্যাসের ট্যাংকির পেছনে দাঁড়ালাম।

শব্দগুলো ততক্ষণে সদর দরজায় এসে গিয়েছে। শ্যামলী গেল এগিয়ে সে দিকে। কাকাবাবু গিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াবার পর অনুসন্ধানী চোখগুলো বলল, "এখানে কেউ ঢুকেছে?"

না বলা সত্বেও ওরা ক্ষান্ত হলো না তছনছ করলো পুরো ঘর। খিস্তি দিয়ে বলল, "শালা, পালাবি কোথায়? পেলে ছিঁড়ে খাবো।"

পায়ের শব্দটা মিলিয়ে যেতেই আমি স্থান পরিবর্তন করলাম। শ্যামলী পথ আগলে দাঁড়ালো আমার।

"অনি বলতো, ওরা তোকে খুঁজছে কেন?"

"কেন আবার, জানিস না তুই? জাল ভোট ঠেকিয়েছি যে? রক্ত চুষে খেতে খেতে রক্ত চোষা হয়ে যাচ্ছে যে ওরা। ঠেকাতে হবে না। প্রতিবাদ করেছি তাই পিছু নিয়েছে।"

আমার গলা কাঁপছিল কথায়। চোখ মেলে দেখি শ্যামলী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। সামনে এসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "দেশপ্রেম করতে গিয়ে নেতা হয়েছিস? তোর মা'র তো তুই একটাই ছেলে তাই না? আঁধার রাতের সলতে; মারা পড়লে শোক সইতে পারবে তো?"

"পারবে? জানিস না তুই শুধু কারো জন্য নয়, কারো কারো জন্যও ভাবতে হয়।"

"তোর একার প্রচেষ্টায় নিশ্চই দেশটা রসাতল থেকে উঠে আসবে না। দু'একজন ছাড়া দেশের বাকী সব রাজনৈতিক নেতারাই তো হিংস্র প্রাণীর মতো। তুই কি তাই হবি?"

আমি শেষে রেগে গিয়ে বললাম, "বাজে বকিস না তো! সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হলে দেশ শাষণ করবে কে? নামধারী যে ক'টা আছে, সব'কটাতো নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। আমি দেশকে ভালোবাসি তাই নেমেছি। জানি না এ ক্রান্তিকাল টিকে যেতে পারবো কিনা।"

।। ০৩ ।।

আমি প্রাণপন ছুটছি। পায়ে খিল ধরে গেছে। এই বুঝি ভেতরটা গুড়িয়ে যাবে। শব্দটা ছুটছে আমার পিছনে ঘোড়ার মতো। ঝোপের পাশ কাটিয়ে রেল লাইনটা পাড় হলাম। এরপর আর রাস্তা নেই। শুধু জলাধার।

ওহ! এবার কী হবে? ঘুরছে মাথা লাটিমের মতো। দাঁড়িয়ে গেলাম। পথের হলো শেষ। এবার পিছু ফিরতেই হবে। কিন্তু আর পিছু ফেরা হলো না আমার।

শব্দটা ঝাপিয়ে পড়লো। আমার গায়ে ধারালো ছুরির ফলাটা পুরো ঢুকে গেল পেটের মাঝখানটায়। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। আমি চোখ বন্ধ করে অনুভব করছি।

তীব্র যন্ত্রণা। মৃত্যুর স্বাদ কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা শিরায় শিরায় বইছে। ধীরে ধীরে সব ঝাপসা হচ্ছে। ঝাপসা থেকে আরো ঝাপসা। ঝাপসা থেকে ধোয়াটে, ধোয়াটে থেকে ক্রমশই কুন্ডলী পাকাচ্ছে। ঘুরছে বিশ্বলয় আমার চারপাশে। চারপাশ থেকে চারপাশের স্মৃতিকে টেনে এনে মিশিয়ে ফেলছে সব কিছুতেই ভজঘট হয়ে যাচ্ছে।

আজ মনে পড়ছে ছোটোবেলায় একবার হাত কেটে রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রক্তে আমার ভীষণ ভয়। আজ হাত ভর্তি রক্ত। জমাট বাধছে। পৃথিবীটা দুলছে। চোখে ভাসছে আম বাগানের ভাষণ। ‘একদিন দেশ গড়বো, দুঃখী মানুষগুলো দু-বেলা খেতে পাবে।’ নেতাদের তুমুল করতালি। রাস্তার মোড়ে পুলিশ বলছে, *ঘুষ খাবো, দেখি ঠেকায় কী করে?* তা দেখে আমার রক্তগরম চোখ।

সব ক’টা জোচ্চোর মিলেছে একসাথে। সব মিলিয়ে ভজঘট আর ভজঘট। রাজনীতি, রাজারনীতি, স্বার্থনীতি সব নিয়ে পেটনীতি। হত্যা, গুম, ধর্ষণ আর কতকাল হবে? মানুষ হিংস্র প্রাণী হয়ে পৃথিবীতে কতকাল আর অপ-শাষণ করবে?

আমি আঘাতে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি ক্রমশই। মাথায় কথা ঘুরছে, আমি বাচঁতে চাইবো কি? আজ লাশটা ওরা পাবে কি আমার? কিছু আর ভাবতে পারলাম না। আমি মরে যাচ্ছি...

চির ঘুমের চোখে ভাসছে মা ডাকছে, অনি আজ ইলিশ রেধেছি শর্ষে দিয়ে? খাবি না? মা, আমি যাচ্ছি। তোমার অনি আর রাত করে ঘরে ফিরবে না। এবার চোখ বন্ধ করতে যাবো। শ্যামলী বলছে, অনি তোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে আমি কি তবে ভুল করলাম?

আমি চুপ। অন্ধকার আমায় ডাকছে বুঝতে পারছি আমি মরে যাচ্ছি।

।। ০৪।।

আমার লাশটা রেললাইনের ড্রেনে পড়ে আছে।

উৎসুক জনতার মুখ আমাকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। ফটো তুলছে সাংবাদিক। পত্রিকায় ছাপা হবে। বড়ো বড়ো লাইনে প্রথম পাতায় আসবে লাশ হয়ে ছাত্রনেতা ড্রেনে পড়ে আছে।

আজ শুধু ফটো নয়, দেওয়ালের পোস্টারও হয়ে যাবো আমি। আমাকে ঘিরে স্লোগান উঠবে আজ। তারপর একসময় সব স্তিমিত হবে। আমি শুধু পোস্টার হয়ে ঝুলে রইবো দেওয়ালে দেওয়ালে।

ঝড়ের গান

সুলতানা জহুরা আফরিন কুমু

রাতে আমেনা বিছানায় গা এলানো মাত্র ঝড় শুরু হলো। ছয়তলার ছাদের ওপর ছোট্ট দুইটা ঘরে আমেনার সংসার। শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে বাইরে। ওপরের দিকে থাকার একটা সমস্যা হলো ঝড়ের মধ্যে এইরকম ভয়ংকর শব্দ হয়। আমেনা গায়ের ওপর কাঁথা টেনে দিতে উঠে বসতেই বিকট শব্দে ট্রান্সফরমার ব্লাস্ট হয় কোথাও! আর সাথে সাথেই পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়।

আমেনা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে ওঠে। আমেনার ঝড় বৃষ্টি খুব ভয় লাগে।

"আম্মা," পাশের ঘর থেকে ডাকে আবিদ।

আমেনা উত্তর না দিয়ে দু'আ পড়তে থাকে।

আবিদ তার মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে চলে আসে। মোবাইলের আলোয় দেখা যায় আবিদের বগল তলায় একটা বালিশ।

"সরো মা, জায়গা দাও তোমার কাছে ঘুমামু।"

আমেনার বিরক্তি লাগে। "বুইড়া গাধা, ভয় পাস ক্যান?"

"আমি ভয় পাই না আম্মা, আপনে ভয় পান।"

"এহ আসছে, দরজা জানালা লাগাইছস?"

আবিদ শুতে শুতে বলে, "হুম লাগাইছি, খ্যাতা দাও তো।"

"তরডা নিয়া আয়।"

"আম্মা প্লিজ।"

আমেনা নিজের কাঁথার এক অংশ আবিদকে দিয়ে বিড়বিড় করতে থাকেন। তার কোনো কিছুই ইদানীং শেয়ার করতে ভালো লাগে না। অথচ একসময় এক কাঁথায় তিন বাচ্চাকে নিয়ে জড়াজড়ি করে শুয়েছেন। আলেয়া আর হাসিনা একদম বুকের সাথে চেপে থাকতে চাইত। আবিদ শুধু হাসত। তার কোনো রাগ দুঃখ কিছুই ছিল না। এখনো নেই মনে হয়। মা আশেপাশে থাকলেই হলো। এইচএসসি পরীক্ষা দেবে সে এখনো মা ছাড়া তার চলে না।

আবিদের গায়ে কাঁথা তুলে দিতে গিয়ে রফিকের কথা মনে পড়ে আমেনার। আজব ব্যাপার হলো রফিকের চেহারা মনে করতে পারে না সে। কী আজব! এভাবে রফিককে ভুলে গেল সে! সবাই বলে আবিদ নাকি রফিকের ফটোকপি, কই আমেনার তো তাও মনে পড়ছে না। চোখ বন্ধ করে স্মৃতি হাতড়ে বেড়ায় আমেনা। ওই তো রফিকদের বাড়ি। পেছনে পুকুরঘাট। দুইটা টিনের ঘর। এক ঘরে রফিক আর আমেনা থাকত। আরেক ঘরে রফিকের বড়ো ভাই রাজ্জাক।

সেই বাড়ির পুরোটা খুঁজে ফিরে আমেনা। নেই কোথাও রফিক নেই। টপ টপ করে পানি পড়তে থাকে আমেনার চোখ দিয়ে। আশ্চর্য এত আবেগ তো আমেনার কখনো ছিল না। তবে রফিক আবেগী ছিল।

বাইরে ঝড় বৃষ্টি কমতে থাকে। আমেনার চোখে ঘুম চলে আসে। প্রায় ঘুমিয়েই পড়বে, তখন মিষ্টি একটা ডাক।

"হুজুরাইন!"

আমেনা চমকে ওঠে। এই ডাকটা তার অতি পরিচিত। গলাটাও রফিকের। ঘুমিয়েই পড়েছিল বোধহয়। চোখ খুলে দেখে আবিদের ঘরে আলো জ্বলছে। এরই মাঝে ইলেক্ট্রিসিটি চলে এসেছে।

আমেনা উঠে গিয়ে লাইট বন্ধ করে দিয়ে আসে।

এবার শুতে গিয়ে, চোখ বন্ধ করতেই সেই গ্রামের বাড়ির পুকুরপাড়ে নিজেকে আবিষ্কার করে সে।

আলেয়া আর হাসিনাকে গোসল করাচ্ছে সে। আর বাড়ির ভেতর থেকে রফিক ডাকছে, "হুজুরাইন!"

আমেনা হাসে, জলদি গোসল সারিয়ে দুইজনকে নিয়ে উঠানে দাঁড় করিয়ে দেয়। শীতের দিন, দুপুর বেলার রোদটা গায়ে লাগুক। এরপর বড়ো একটা ঘোমটা টেনে চোখে মুখে কপট রাগ দেখিয়ে রফিকের সামনে হাজির হয়।

"কী হলো? এত ডাকাডাকি কীসের? আসছেন, ঘরে যান, বসেন! তা না উঠান থেকেই চিল্লাপাল্লা।"

"আরে, দেখো কী আনছি।"

এবার রফিকের হাতের দিকে নজর যায় আমেনার। দুটো ভীষণ সাদা সাদা বক পাখি।

রফিক চোখে মুখে উচ্ছাস ছড়িয়ে বলে, "আমাদের স্কুলের দপ্তরি সামাদ আইনা দিছে। দুইটা ৫০০ নিছে।"

"বেতন পান ৪০০০ টাকা, তাও তিনমাসে একবার, বক কেনার কী দরকার ছিল?"

"তোমার হিসাব রাখো, ঝাল ঝাল কইরা রানবা হুজুরাইন।"

আমেনা আজো জানে না রফিক কেন তাকে হুজুরাইন ডাকতো। না রফিক হুজুর ছিল, না সে খুব ধর্ম-কর্ম করতো। রফিক ছিল অংকের শিক্ষক। খুব হতাশ শিক্ষক, কেউ অংক না পারলে সে বোঝাতেই থাকত। স্কুলের বেল দিয়ে দিত। সে অংক করতেই থাকত। তার ছাত্ররা কখন চলে গেছে সে হুঁশ তার থাকত না। যখন হুঁশ হতো চোখমুখ ফুলিয়ে বাসায় ফিরত।

"হুজুরাইন, সহজ একটা অংক! চৌবাচ্চার অংক! এত বোঝাইলাম।"

"আপনেরে নিয়া সবাই মশকরা করে। পোলাপান আপনেরে খেপাইয়া মজা পায়। আলেয়ারে খেপায় পাগলা গণির মাইয়া বইলা। গণিত এর ছোটো করে গণি।"

রফিকের কিছু আসে যায় না। সে স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে ঘুমায়। ঘুম থেকে উঠে হারিকেন জ্বালিয়ে দুই মেয়েকে পড়তে বসায়।

মেয়েদের হাতের কাজ দিয়ে গুণ গুণ করে গান গায়।

তোমায় না দেখলে বাঁচে না আমার প্রাণ
তুমি কোনো বা দেশে রইলা দয়াল চান

একটা গানই তার প্রিয় ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গাইত সে।

গাইতে গাইতে ডাকত, "হুজুরাইন, চা দেও ছে দেহি।"

আবিদ অন্যপাশে কাত হতেই আমেনার কাঁথায় টান লাগে। আমেনা, "হাড় জ্বালাইয়া খাবি আমার, নিজের খেতা আনতে পারলি না।"

আমেনার বিরক্তি এত বেড়ে গেছে আজকাল। সংসারের সব কিছুই অসহ্য লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় অযথা বেঁচে আছেন তিনি। বেঁচে থাকার কোনো স্বার্থকতাই নেই তার।

ঝড় থেমে গিয়েছে। দমবন্ধ লাগছে বলে জানালাটা খুলে দিল আমেনা। জানালা খুলতেই ঠান্ডা একটা বাতাস আমেনার চোখমুখ ছুঁয়ে গেল।

আমেনার বিয়ের দিন ও এমন ঝড় উঠেছিল। সেটাও বৈশাখ মাসের একদিন। আমেনা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দেখল তার বাবা আর খালু দাঁড়িয়ে। খালু বললেন, "আমেনা, তোমার খালা বলছে তোমারে দেখতে চায়, তার শরীরটা ভালো না।"

খালার বাসায় গিয়ে দেখা গেল কাহিনি অন্য। আমেনার আম্মা, চাচা-চাচী, বড়ো মামা সবাই এসেছে। বাড়িতে খুশির কিছু একটা ঘটবে এমন ভাব। খালার একটা লাল শাড়ি পরতে বলা হলো আমেনাকে। বিকেলের দিকে খালুর বড়ো বোন এলেন ছেলেকে নিয়ে। ছেলে স্কুলের মাস্টার। আমেনার খালাতো বোন রানু বলল, "আপা, রফিক ভাইয়ের সাথে তোমাকে মানাবে কিন্তু, দুইজনেই উঁচা লম্বা।"

আমেনা আগে দুই একবার দেখেছে তাকে। কিন্তু ওইদিনও সে রফিকের চেহারা মনে করতে পারছিল না। বিয়ের পুরোটা সময় সে রফিকের চেহারা মনে করার চেষ্টা করল।

ওদের ইচ্ছা ছিল বিয়ের পরই আমেনাকে রফিকদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবে। এমনকি লঞ্চের টিকিট কাটা ছিল। কিন্তু এমন ঝড় শুরু হলো। ওরা বের হতেই পারল না।

বিয়ের রাতে আমেনার প্রথম কথা ছিল, "ও আচ্ছা, আপনি!"

রফিক লাজুক হেসে বলল, "তোমার জন্য কিছুই আনতে পারি নাই আমেনা, এই কলমটা রাখো। আমার অনেক প্রিয় কলম। কালির কলম। এইটা দিয়েই বিএ, এমএ পরীক্ষা দিছি।"

আমেনা দীর্ঘদিন কলমটা আগলে রেখেছিল। ঢাকা আসার সময় জিনিসপত্রের সাথে কোথায় যে গেছে সেটা।

আমেনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। লোকটার কোনো স্মৃতিই তার কাছে অবশিষ্ট নেই। লোকটা যত ভালোবাসা দেখিয়েছিল সে তো তার ছিটেফোঁটা ও দেখাতে পারেনি তাকে। লোকটা প্রায়ই আফসোস করত।

"আমেনা, আমি যে বুড়া এইজন্য তুমি আমাকে পছন্দ করো না তাই তো?"

আমেনার পেটে তখন আবিদ। দুইটা ছোটো বাচ্চা পেলে, আরেকটা পেটে নিয়ে ঘরের সব কাজ করে আমেনার শখ আহ্লাদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। বয়স কুড়ি পেরুতে না পেরুতেই বোধহয় মন শুকিয়ে গিয়েছিল তার।

তবু রফিকের "হুজুরাইন" ডাক শুনলে বুক কেঁপে উঠত তার। রাতের বেলা বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রফিকের গায়ে আলতো করে হাত রাখত সে। রফিক অল্প করে হাত বুলিয়ে দিত তার মাথায়। কী যে এক অপার শান্তি ছিল সেই সব রাতগুলোতে। আমেনার নিমিষেই ঘুম চলে আসত।

একদিন সকালে স্কুলে যাবার আগে রফিক বলল, "আমেনা, বাচ্চা পেটে কত কিছু খাইতে ইচ্ছা করে মানুষের। কোনোদিন তো কিছু বলো না তুমি।"

কয়েকদিন যাবত আমেনার বেলের শরবত খেতে ইচ্ছে করছে এটা শুনে রফিক বলল, "দেইখো এক ঝাঁকা বেল আইনা দিব।"

খাবার দাবার নিয়ে রফিকের বাড়াবাড়ি আছে। আমেনা বার বার করে বলে দিল, "দেখো দুইটার বেশি আনবা না।"

সেইদিনই স্কুলে গিয়ে দপ্তুরি সামাদকে দিয়ে এক ঝাঁকা বেল আনায় সে। ক্লসের শেষের দিকে কোনো এক হতচ্ছাড়া অংক নিয়ে খুব জ্বালায় রফিককে।

"স্যার বুঝে আসে না।"

রফিক আবার গোড়া থেকে বোঝায়।

একসময় চেয়ারে বসে বলে, "আজকে বাসায় যাওগা সবাই। কালকে আবার বোঝাবো।"

এটুকু বলেই হড়হড় করে বমি করতে থাকে রফিক। এরপর আস্তে করে টেবিলে মাথা রাখে।

রফিকের নিথর দেহ যখন হাসপাতাল হয়ে বাড়িতে পৌঁছায় তখন আমেনা দুই মেয়েকে খাওয়াতে বসেছে।

এই প্রথম রফিক বাড়িতে ফিরে "হুজুরাইন" বলে ডাকে না। আমেনা বাড়ির উঠানে এসে দেখে রফিক শুয়ে আছে খাটিয়ায়। খানিকটা দূরেই এক ঝাঁকা বেল।

মাত্র ৮ বছরের সংসার। আমেনাকে সারাজীবনের জন্য একা করে চলে যাওয়ার জন্য রফিককে ক্ষমা করতে পারে না সে। তবে এটাও ঠিক রফিক না মারা গেলে সে জানতেও পারতো না কত শক্তি আর সাহস ছিল তার মনে। কীভাবে তিন সন্তানকে সে বড়ো করেছে সেই সব ঝড়ের দিনের গল্প শুধু সে-ই জানে।

তবু আজকাল আর ভাল্লাগে না, দুই মেয়ে বিয়ে দিয়েছে বড়ো ঘরে। মেয়েরা স্বনির্ভর, আবিদও ছাত্র খারাপ না। দু'দিন পর সেও চলে যাবে, নিজের জীবনের তাগিদে কোথাও ছুটে বেড়াবে। শুধু পড়ে রইবে তার নিঃসঙ্গ জীবন। এর চেয়ে ওপারে গিয়ে রফিকের সাথে হিসাব মেটাতেই তার আগ্রহ বেশি।

কী কী কথা হবে তাও ঠিক করা।

"এই যে আপনে স্ট্রোক কইরা মইরা গেলেন, একটা খোঁজ খবরও তো নিলেন না।"

রফিক লাজুক ভঙ্গিতে বলবে, "হুজুরাইন, মনে কষ্ট নিও না। কি যে হইলো না, হঠাৎ মাথাডা চক্কর দিয়া উঠলো সেইদিন।"

"ভূত-টুত সাইজাও তো আসতে পারতেন। কত বেশি একা একা লাগছে আমার আপনে কী জানেন?"

"তুমি তো ভালোই মশকরা শিখছ। বাঁইচ্যা থাকতে তো একটু হেসে কথা বলো নাই। সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতা।"

"হুম, এখন আমি রসিক হইছি। এখন যেকোনো কাজ কাম নাই! আপনের দেশে যাইতে ইচ্ছা করে, আপনের গান শুনতে ইচ্ছা করে। আর কোনো ইচ্ছা নাই।"

এরপরে মাথার ভেতর বেজে উঠে সেই পুরোনো গান,

তোমায় না দেখলে বাঁচে না আমার প্রাণ
তুমি কোনবা দেশে রইলা দয়াল চান

ফজরের আযান দেয়, আমেনা নামাজ পড়তে ওঠে। আবিদ মোচড় দিয়ে উঠে।

"আম্মা, লাইট বন্ধ করো। অন্য ঘরে যাও নামাজ পড়তে।"

"এহ আইছে, তুই অন্য ঘরে যা।"

নামাজ পড়ে কুরআন বের করে আমেনা। সুর করে পড়তে থাকে।

এমন সময়, আবিদ ঘুম ঘুম চোখে উঠে বসে, “হুজুরাইন, আপনার সাথে আর ঘুমাবা না। আমারে আর ডাইকেন না। ধম্ম কম্ম শেষ হয় না কেন আপনার? ঘুম নাই?”

বহুদিন পর আবার সেই ডাক। নিজেকে সামলে হেঁকিয়ে উঠে, “যা যা বেনামাজি বেশরম পোলাপান, কথাবার্তার কি ছিরি। তরে কে ডাকছে? যা তুই ভাগ।”

আবিদ এবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, “আপনেরে ছাইড়া যাইতেছি না, আপনেরে যন্ত্রণা দিয়া অস্থির করমু, আপনের এত রাগ কেন?”

আমেনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

“আম্মা, ঘুমাইলাম। ডাক দিয়েন না। আমার কথা বেশি মনে পড়লে টেবিলে আমার ছবি আছে দেইখেন, ডিস্টার্ব কইরেন না তাও।”

সকালের আলোয় স্পষ্ট হতে থাকে আবিদের কপালের একটা বড়ো তিল। ঠিক রফিকের মতো। রফিকের চেহারাটা আস্তে আস্তে ভেসে ওঠে আমেনার চোখে।

বহুদিন পর আমেনার মনে হয় রফিক তাকে একা করে দিয়ে যায়নি। আর তার বেঁচে থাকাও অনর্থক না। বরং রফিক মরে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে আমেনার বেঁচে থাকা কতটা জরুরি!

শুনানি

কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত

বিকেল চারটা বেজে ত্রিশ মিনিট, ইন্দ্রপুরী। স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের সামনে শুনানিতে অংশ নিতে যাচ্ছে স্বর্গের প্রবেশাধিকার পাওয়া ও স্বর্গ হতে মর্তে তিরোধানের অপেক্ষায় থাকা সজল মিত্র। আজ রাত আটটায় তার মাতৃজঠর থেকে ধরণীতে ভূমিষ্ট হবার কথা। শুনানি শেষে বিকেল পাঁচটার রথে যাত্রা করলে তিনঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীতে পৌঁছানো সম্ভব।

সৌম্য দর্শন দেবরাজ আজ কিছুটা অস্থির। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিস অথচ আজ স্বর্গকে বিদায় জানিয়ে ধরণীতে পদার্পন করার জন্য এখনো ছয়জন মানব-মানবী তাঁর অফিসের ওয়েটিং রুমে শুনানিতে অংশ নিতে অপেক্ষা করছেন। প্রত্যেকের জন্য দশ মিনিট করে সময় বরাদ্দ করলে বেজে যাবে বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিট। এর মধ্যে কেউ যদি বেশি পীড়াপিড়ি করে তাহলে আরো বেশি সময় লাগবে। ভগবান বিষ্ণুকে ওভার টাইমের কথা আবারও বলতে হবে। দিনের পর দিন বিকেল সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস করলে নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে চিন্তা করার সময় থাকে না। এনার্জিও পাওয়া যায় না। ক্যারিয়ার ডেভলপের জন্য এখনই পর্যাপ্ত সময় নিয়ে চিন্তা করে গোল ফিক্সড করতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এছাড়া প্রতিদিন সাতটায় বাড়িতে গেলে ‘দেব’ টিভির

পর পর তিনটি সিরিয়াল মিস হয়ে যায়। ড্রেস চেঞ্জ করতে করতে শেষের সিরিয়ালে একটু সময় চোখ বুলানো যায়। কিন্তু আত্মস্থ করা যায় না।

সজল মিত্রের ডেথ সার্টিফিকেট, মাইগ্রেশন পেপার, ব্যক্তি পরিচিতি এবং জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের ঢাউস একটি বই নিয়ে ইন্দ্রের টেবিলে রাখলেন অফিস সহায়ক। ভাবনায় ছেদ পড়লো দেবতার। বিরক্তি নিয়ে তিনি বললেন, "ওদেরকে চা নাস্তা কিছু দিয়েছ?"

অফিস সহায়ক-মহাশয়, আপনি জানেন এই খাতে আমাদের কোনো বাজেট নেই। ইওর এক্সিলেন্সি, গত বছর বাজেটে আমরা আপ্যায়ন খাতে কিছু থোক বরাদ্দ রেখেছিলাম। কিন্তু বাজেট অধিবেশনে ভগবান বিষ্ণু সেটি অনুমোদন করেননি। তাই সরোবরের সুপেয় জল শুধু দিতে হয়েছে।

ইন্দ্র : তোমাদের এই ফকিরী দশা আমার আর ভালো লাগে না। ভগবান বিষ্ণুকে কিছু বলাও যায় না। উনার আঙুলে সুদর্শন চক্র। সেটি আমি ভীষণ ভয় পাই। সে যাক গে, তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? শুনানি কি আজ আর হবে না? ওদেরকে ভেতরে পাঠাও।

অফিস সহায়ক : জি, আজ্ঞে মহাশয়। এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

"মে আই কাম ইন স্যার?"

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন দেবরাজের স্বর্গীয় দ্যুতিময় মুখাবয়ব দেখে মোহিত হয়ে গেল সজল। নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো। করজোরে দেবরাজকে প্রণাম করে সম্মুখে অগ্রসর হতেই চোখ তুলে তাকালেন দেবরাজ। ইশারায় সজলকে তাঁর সামনে রাখা চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে বললেন।

ইন্দ্র : বলো, তোমার ইচ্ছে কী। নতুন জন্মে কী হতে চাও?

সজল : স্যার নতুন জন্মে আমি বিসিএস ক্যাডার হতে চাই।

ইন্দ্র : আরে বাবা, বিসিএস ক্যাডারের প্যাকেজ শেষ হয়ে গেছে। এই প্যাকেজ তোমার গত জন্মের জন্য বরাদ্দ ছিল। তুমি সেটা গ্রহণ করতে পারো নাই।

সজল : তারপরেও স্যার, আপনি চিন্তা করে দেখেন আর একবার। প্যাকেজ শেষ হয়ে গেলেও কি সার্ভিস শেষ হয়ে যাবে? পাবলিক সার্ভিস তো দিতেই হবে, তাই না স্যার?

ইন্দ্র : আরেহ বোকা ছেলে। তুমি ইউটিউবার হও, টুইটারে লক্ষ লক্ষ ফ্যান থাকুক তোমার। তুমি মেয়েদের হার্ডথ্রুব নায়ক হতে পারো। অথবা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার হও। সেসব না চাইলে পদ্মা সেতুর ইঞ্জিনিয়ার হতে পার। এইগুলোই ডিমান্ডিং সাবজেক্ট। তোমার নতুন জন্মে বিসিএস ক্যাডারকে কেউ মূল্য দিবে না। এই জন্মে কি তুমি মনে করো সরকারি অফিসারদের সহায়ক সরকার পাবে? যে সরকার নতুন নতুন পে স্কেল করে সরকারি চাকুরীজীবীদের বেতন বৃদ্ধি করতেই থাকবে? এইসব আমি এবার বন্ধ করে দেবো। বিসিএস বাদ দিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করতে হবে তোমাদের।

সজল : স্যার, আমি বিসিএস ক্যাডারই হতে চাই।

ইন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলছেন, এই ছেলে একদম নাছোড়বান্দা।

"বাবা দেখো, তোমার 'জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বইয়ের মোট এগারোশো তেরো পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ১৪৫টা পৃষ্ঠায় তোমার খুবই সিলি মিসটেকের কথা বলা আছে। আর বাকি সব তো পরিষ্কার।"

সজল : স্যার, আমি খুব নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করতাম।

ইন্দ্র : হ্যাঁ, আমিও তাই দেখছি। ছেলেরা মদ গাঁজা খায়। জিএফকে নিয়ে লিটনের ফ্ল্যাটে যেতে চায়। আচ্ছা তুমি এইসবে আগ্রহী ছিলে না কেন?

সজল : স্যার আমার জীবন-মরণ সব বিসিএসে আটকে গেছে। আজকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হবো এই অপেক্ষায় আমি ঐসব কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলাম।

ইন্দ্র : তো তুমি যা চাও তা তো তুমি তোমার পার্ফরমেন্সের কারণে আগে থেকেই অনুমোদিত করে রেখেছ। তবুও বাছা আর একবার ভেবে নাও। বোকামি করো না।

সজল : ভেবেই বলছি, স্যার। প্লিজ আমাকে বিসিএস ক্যাডার বানিয়ে দিন না ব্রো।

ইন্দ্র : ভেবে বলছো? দেখো পরে আবার আমার কাছে প্রার্থনা করো না। আমার মূর্তির সামনে কান্নাকাটি করো না। তোমরা কান্নাকাটি করলে আমার ঘর স্যাঁতস্যাতে হয়ে থাকে। সিরিয়াল দেখতে সমস্যা হয় আমার। খালি কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। মনোযোগ বসাতে পারি না।

সজল : স্যার, এমন হবে না, স্যার।

ইন্দ্র : আচ্ছা না হলেই ভালো। আর হ্যাঁ। আর একটা কথা বলে রাখি। শুধু তুমি না। তোমার বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সবাইকে বলে দিও যেন আমার মন্দিরে গিয়ে তোমার জন্য কান্নাকাটি না করে। তুমি বিসিএস ক্যাডার হতে চাও, তোমার প্যাশনের কারণে তুমি সেটা হতেই পারো। কিন্তু ক্যাডার হবার পরে যদি অন্য সেক্টরের প্রতি ভালোলাগা জন্মায় তাহলে আমাকে বিরক্ত করো না বাছা তোমরা।

সজল : প্রমিজ স্যার। বিরক্ত করব না। এবার অনুমতি দেন। বিকেল পাঁচটা বেজে গেল বলে। পৃথিবীতে যেতে তো আমার তিন ঘণ্টা সময় লাগবে।

ইন্দ্র : আচ্ছা যাও যাও। রওনা হও।

দশ মিনিটের জায়গায় আধা ঘণ্টা লেগে গেল? কী দরকার ছিল আমার এই ছোকরার সাথে এত তর্ক করার? আজ আমার বাড়ি যেতে যেতে নির্ঘাত রাত আটটা বাজবে। এই ভেবে সজলের ব্যক্তি পরিচিতি, জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মাইগ্রেশন পেপারে সাইন করে ডেথ সার্টিফিকেটে সাইন করতে যাবেন এমন সময় সজল রথে উঠে চিৎকার করে বললো, "স্যার, প্লিজ ভালো করে লিখে মেইল ফরওয়ার্ড করবেন। আমাকে সিসি দিবেন। মেইলে লিখবেন 'বিসিএস ক্যাডার (এডমিন)' হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত জনাব সজল মিত্র। আপনার প্রশ্নবাণে আমি 'এডমিন' কথাটা বলতেই ভুলে গেছি স্যার।"

নিজের রাগ চেপে গরগর করতে করতে পৃথিবীতে সজল মিত্রের নামে লেখা মেইল সেন্ড করে চমকে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। সজল মিত্রের ডেথ সার্টিফিকেটে যমরাজের সিগনেচার নেই। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দেবরাজ ইন্দ্র। পশুপাখি, লতাপাতা, পাহাড় পর্বত, সাগর নদী, জনপদ প্রকম্পিত করে সে আওয়াজ গিয়ে পৌঁছালো যমপুরীতে। যম তখন রাতের ডিউটিতে বের হচ্ছেন। ইন্দ্রের আওয়াজ শুনে ভয়ে টতস্ত হয়ে নক দিলেন রাইড শেয়ার কোম্পানিতে। দ্রুত একটা রথ চেয়ে নিলেন। পিক আওয়ারের রথ ভাড়ার কথা মাথায় না রেখে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন ইন্দ্রপুরীতে।

ইন্দ্রপুরীতে ইন্দ্রের অফিস ওয়েটিংরুমে অপেক্ষমান পাঁচজন সাক্ষাৎপ্রার্থী তখনো বসে আছেন। ইন্দ্র সেদিন আর কোনো শুনানি করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিপদগ্রস্ত পাঁচজন মানুষ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখনো বসে রইলেন। এমন সময় অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন যমরাজ। ইন্দ্রকে নতমস্তকে প্রণতি জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্র : সজল মিত্রের ডেথ সার্টিফিকেটে আপনার সিগনেচার নেই কেন যমরাজ?

যমরাজ : মহাশয় সজল মিত্র নামের অসংখ্য মানুষের ডেথ সার্টিফিকেটে আমার সাইন আছে। বিনা সাইনে আমি কোনো সার্টিফিকেট ইস্যু করি না। আর সাইন ছাড়া কোনো শুনানি আপনার সামনে উপস্থাপন করাও হয় না।

ইন্দ্র : তুমি কি বলতে চাইছো আমি মিথ্যে কথা বলছি? এই নাও ডেথ সার্টিফিকেট, নিজ চোখে দেখে নাও।

এই বলে সজল মিত্রের ডেথ সার্টিফিকেট এগিয়ে দিলেন দেবরাজ। সেটি হাতে নিয়ে চমকে উঠলেন যমরাজ। বললেন, "এমন কাজ হতেই পারে না স্যার। এইটা অবশ্যই অফিস সহায়কের কাজ। তাহলে কি সজল তাকে ঘুষ দিয়ে এই কাজ করিয়েছে?"

ইন্দ্র : ঘুষ? এমন কথাও আজ আমাকে শুনতে হলো, যমরাজ? তার মানে কি সজল মারা যায়নি? তোমাদেরকে ঘুষ দিয়ে ভুয়া ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে তার এই জন্মেরই প্রবল আকাঙ্ক্ষিত চাকুরিটা নিয়ে ভেগে গেল? এত বড়ো অন্যায়? আটকাও ওকে। তার রথের পথ রুদ্ধ করে দাও।ওকে নিয়ে এসো আমার কাছে। কুইক।

পৃথিবীতে তখন সন্ধ্যা ছয়টা। বিসিএস চূড়ান্ত ফলাফল জানানো হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে প্রথম হয়েছেন সজল মিত্র নামের সদ্য গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করা তুখোড় এক মেধাবী। রেজাল্ট ডাউনলোড করার জন্য অনলাইনে বারবার চেষ্টা করছেন সজল মিত্রের বাবা। এইদিকে সজল সেই যে সকালে বের হয়েছে এখনো বাসায় ফেরেনি। এই চিন্তায় বারান্দায় পায়চারী করছেন সজলের মা। স্বর্গ হতে রওনা দেওয়া রথের পৃথিবীতে পৌঁছুতে তখনো দুইঘণ্টা দেরি।

['শুনানি' গল্পের সকল চরিত্র, ঘটনাবলী, বিষয়বস্তু কাল্পনিক। বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই।]

এক জোড়া ঝলমলে চোখ

আসিফ উর রহমান

সোহানাদের কলেজে আজ সায়েন্স ফেস্টিভাল।

কলেজ প্রাঙ্গনে প্যান্ডেল টানিয়ে বিশাল আয়োজন। সোহানা ও তার বান্ধবীরা গতবছর থার্ড হয়েছিল প্রজেক্ট বিভাগে, এবার তারা ফার্স্ট না হয়ে ছাড়বে না পণ করেছে। গত দুই সপ্তাহ ধরে কলেজের পড়ে মোটামুটি গাধার খাটুনি দিয়েছে চারজন মিলে। তারা এবার বেশ আশাবাদী।

সারি সারি টেবিলের ওপর নানা টাইপের প্রজেক্ট। সারা ঢাকা শহরের নামীদামি কলেজ থেকে পার্টিসিপেট করে এই ফ্যাস্টিভালে, প্রতিযোগিতা বেশ হাড্ডাহাড্ডিই হয়। সোহানারা প্রজেক্টের

সাবজেক্ট এবার খুব চিন্তাভাবনা করে চুজ করেছে, যেহেতু বিচারকরা শুধু সায়েন্স না, আরো অনেক এঙ্গেল থেকে বিচার করেন, তাই প্রজেক্টের সাবজেক্ট হতে হবে সাম্প্রতিক কোনো জাতীয় সমস্যার ওপর। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তারা ট্রাফিক জ্যামকেই বেছে নিয়েছে।

সোহানাদের মডেলটা বেশ বড়ো, রাস্তা ঘাট, বিল্ডিং, গাড়ি, মানুষ, গাছপালা, মেট্রোরেল, আন্ডারপাস, ফ্লাইওভার সব কিছু খুব ডিটেইলসভাবে বানানো, দেখলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সোহানাদের টেবিলের সামনে ভীড় অনেক বেশি। আশপাশের স্কুল থেকে বাচ্চা-কাচ্চা এসেছে, তাদের প্রশ্নের শেষ নেই। সোহানারাও যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে উত্তর দিচ্ছে, মজা করছে। ভিতরে ভিতরে অবশ্য তারা খুবই নার্ভাস। বিচারকরা এখনো আসেননি, তারা বারবার শেষ মুহূর্তের ডিটেইলসগুলো দেখে নিচ্ছিল, প্রজেক্টের নোটসগুলো ঝালাই করে নিচ্ছিল। সোহানা মোটামুটি নিশ্চিত গতবছর বিচারকদের প্রশ্নের উত্তরে মুন্তাহা গুবলেট পাকিয়েছিল বলেই তাদের নাম্বার কমে গিয়েছিল।

হঠাৎ সামনে লম্বা ছায়া পড়তে সোহানা চমকে তাকালো। বিচারকরা হুট করে চলে এলো নাকি? তার বুক ধড়ফড় করে উঠলো- কিন্তু না। ঘিয়া কালারের ইউনিফর্ম পরা লম্বা কয়েকটা ছেলে। এর মধ্যে একজনকে সে চিনে। নাহিয়ান নাম। গতবার ফার্স্ট যে টিমটা হয়েছিল তাদের টিম লিডার ছিল। ভালোমতোই মনে আছে ছেলেটাকে তার।

"হাই, কী খবর?" ছেলেটা বেশ সপ্রতিভ, রিমলেস চশমার পিছনে চোখ দুটো ঝলমল করছে।

"ভালো," সোহানার চোখ-মুখ অজান্তেই শক্ত হয়ে গেল, "তোমাদের প্রজেক্ট নাই এবার?"

"সেকেন্ড ইয়ারে যে চাপ, পড়াশোনা করেই কুল পাই না প্রজেক্ট বানাবো কোন সময়?" বলেই ছেলেটাসহ সবাই এমনভাবে হাসলো যেন খুব উচ্চদরের কোনো রসিকতা করে ফেলেছে, "তার ওপর গতবার তো ফার্স্ট হলামই। আর আগ্রহ পেলাম না।"

সোহানা বিড়বিড় করে ফেসবুকে প্রচলিত একটা মিমের লাইন বললো, "তাহলে তো এটা আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ!"

ছেলেটা শুনে ফেললো, সে আবার হাসলো। তার চোখে মুখে কিছুটা মুগ্ধতা। সে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ট্রাফিক জ্যামের সলিউশন নাকি?"

সোহানা অল্প করে বললো, "হু" সে এখনও সহজ হতে পারছে না। ছোটোবেলা থেকেই প্রচণ্ড কম্পিটিটিভ মাইন্ডের সে, পরাজয় সহজে হজম করতে পারে না।

ছেলেটা চশমার ওপর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রজেক্টটা দেখলো। টুকটাক কিছু প্রশ্ন করলো। সোহানার দিকে তাকিয়ে বললো, "এবার মনে হচ্ছে গোল্ড মেডেলটা তোমাদেরই। গুডলাক।"

সোহানা কিছু বললো না। ছেলেটা একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে পাশের টেবিলে চলে গেল। পাশ থেকে মিলি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে বললো, "ইচ্ছা করে একটা ঘুষি মেরে নাকটা ভিতরে ঢুকেয়ে দেই। কি ভাব শালার।"

সোহানা আনমনে বললো, "হু।"

পুরুষ্কার বিতরনীর আগে কিছুক্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো। পার্টিসিপেন্ট হিসেবে দর্শকসারির একদম সামনের দিকে বসেও সোহানা সেগুলোর কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারলো না। নাচ, গান, অভিনয়, আবৃতি সব কেমন জানি ব্লার হয়ে রইলো, সে আনমনে হাতের নোট খাতার কোণাটা কামড়াতে লাগলো।

এবারের বিচারকদের ইন্টারভিউটা গতবারের মতো গুল্লেট পাকায়নি, আগেই প্র্যাকটিস করে এসেছে তারা, সব উত্তর ঠিকঠাক মতো দিয়েছে। বিচারকদের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে তারা বেশ ইমপ্রেসডও। যদিও সোহানার দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। পাট থেকে কি জানি একটা জিনিস বানানোর প্রজেক্ট এনেছে একটা দল, সেটা নিয়েও খুব কথাবার্তা হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে সেটা না আবার ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে যায়!

সোহানার আরেকটা দুশ্চিন্তা হলো একজোড়া চোখ। চশমার পিছনে একজোড়া ঝলমলে চোখ প্রজেক্টের নিয়ে ভয়ানক টেনশনের ভিতরেও ঘুরে ফিরে সামনে চলে আসছে। ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর লাগছে তার কাছে।

সোহানাদের বিভাগের পুরষ্কার বিতরনী শুরু হতে হতে সোহানার অবস্থা ক্রিটিকাল হয়ে গেলো– প্রেসার ডাউন খেয়ে গেল তার। ঘাড়-মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা! থার্ড পুরষ্কার পেল ছোটোখাটো জিনিস তুলতে পারে এমন একটা রোবট। এই রোবট কোত্থেকে এলো? এটার কথা শুনেইনি তারা। রোবট বানিয়েও থার্ড? তাদের ফোম আর খেলনা গাড়ির মডেলের কোনো আশা নাই আর।

সেকেন্ড পুরষ্কার পেল কলকারখানায় পরিবেশ দূষণ কমানো সংক্রান্ত একটা প্রজেক্ট। সোহানার শরীর ছেড়ে দিলো। মিলির কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে সে, আর কোনো আশা নেই। পাটের প্রজেক্টটা সেকেন্ড হলেও কোনো আশা থাকতো। সেটাও যখন হলো না স্বান্তনা পুরষ্কার ছাড়া আর কিছু... প্রথম পুরষ্কার হিসেবে যখন সোহানাদের দল টিম ভেলভেট থান্ডারের নাম মাইকে উচ্চারিত হলো তখন সোহানার হুঁশ নেই বললেই চলে। অর্ধ-অবচেতনে সে শুনতে পেল মিলি, মুন্তাহারা গলার রগ ছিঁড়ে চিৎকার করছে, তাকে মোটামুটি চ্যাংদোলা করে স্টেজে নিয়ে যাচ্ছে বাকিরা। ঘোরের মধ্যেই প্রধান অতিথিদের সাথে হ্যান্ডশেক করলো সে, টিম লিডার হিসেবে বিশাল ট্রফিটা নিলো। তার ছিপছিপে শরীরে ভারি ট্রফি হাতে নিয়ে বেঁকে গেল মোটামুটি। মুহূর্মুহু করতালি, তার কলেজের মেয়েদের চিৎকার, গার্জিয়ান, সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্লাশের চোখ ধাঁধানো আলো সব কিছু ছাপিয়ে একটা দৃশ্যে তার চোখ আটকে গেল।

ঝাপসা হয়ে আসা ভীড়ের মধ্যে ঘিয়া কালারের শার্ট পরা উজ্জ্বল একজোড়া চোখ নিয়ে একজন তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিচ্ছে। সেই চোখে অদ্ভুত একটা গর্বের ছাপ, মুখে রহস্যময় একটা হাসি।

রুদ্ধ প্রহর

সৈয়দা সুরভি রহমান

আজকে সবাই বন্দি ঘরে বড্ড কাতর মন,
সময় যেন থমকে গেছে, একঘেঁয়ে দিন ক্ষণ!
নেইকো তাড়া উর্ধ্বশ্বাসে ঘড়ির কাঁটায় চলার,
নেইকো সে মন চায়ের কাপে আজগুবি ঝড় তোলার!
শূন্য দৃষ্টি বাইরে মেলি অসাড় যেন বোধ,
থামলো চলা, প্রতি ধাপেই মস্ত প্রতিরোধ!
ছুঁই না আপন, মেলাই না হাত, হয় না আলিঙ্গন,
মৃত্যুভয়ে কাঁপছে সদা সমস্ত প্রাঙ্গন!
বড়োই বেশি ব্যস্ত ছিলাম, হয়নি অবসর,
আপনজনের কাছে যাবার, নেবার খোঁজখবর!
হয়তো কোনো পরম প্রিয় একলা ঘরের কোণে,
তোমার আমার প্রতীক্ষাতে চেয়েছে পথ পানে!
আমরা তখন নিজেতে মত্ত, ভাবিনি অন্য কথা,
ছুটেছি সমুখে দারুণ গতিতে রেখে উঁচু করে মাথা!
হয়তো তুমিও কারও সাড়া পেতে হয়েছিলে উন্মনা,
আমিও হয়েছি তোমার বিরহে উদাসীন আনমনা!
তবু কেও কারো করিনি পরোয়া দুর্বার ছিল গতি,
সময় চাকাতে যন্ত্রমানব দম্ভে পূর্ণ মতি!
তাই আজ যেন প্রকৃতি জেগেছে আনতে সমতা ভারে,
মানুষ হয়েছে সঙ্গবিহীন, দুয়ার রুদ্ধ ঘরে!
অঢেল সময় রয়েছে যে হাতে, থেমে গেছে সব কাজ,
তবু কারও সাথে ঘণিষ্ঠতার নেই অনুমতি আজ!
হয়তো কখনও কাটবে আঁধার, রুদ্ধ দুয়ার খুলে,
পথে বের হবে সকল মানুষ মৃত্যুর ভয় ভুলে।
হাতে হাত রেখে ছোঁবে ভালোবেসে বুকেতে জড়াবে সুখে,
জীবনের গান হবে অম্লান বিশ্ববাসীর মুখে!!

ভুলে ভরা গল্প

মুশফিকুর রহমান আশিক

আমার সাথে যে ফুটফুটে মেয়েটার আজ বিয়ে হতে যাচ্ছে, তার নাম নীলা। তাকে আমি খুব ভালো মতো চিনি না। আমি যতটুকু জানি, বিয়েতে নীলা নিজ থেকেই রাজি হয়েছে, তার বাবা-মা জোর করে কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না।

নীলার চেহারার দিকে তাকালেও বিয়েতে রাজি না হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। সে হাসছে। মোটামুটি আনন্দিত সে। তার হাত ভরা মেহেদি। হাসিমুখে সবার সাথে কথা বলছে। আমি বেশ আশ্বস্ত হলাম।

খুব ধুমধাম করে নীলার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিশাল খাওয়া-দাওয়া হলো। হাজার লোকের সমাগম ছিল। নীলাকে অসম্ভব রকমের সুন্দর লাগছিল। বিয়ের সাজে অবশ্য সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে।

আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বছরখানেক কেটে গেল। নীলার গর্ভে একটা ছেলে সন্তান এলো। নীলা এখন ভীষণ সুখী একটা মেয়ে। উঁহু, ভীষণ সুখী একজন মা!

নীলার সাথে সংসার করার পুরো তেরো বছর পর ড্রয়ারের এক কোণে আমি নীলার ডায়েরিটা খুঁজে পাই। ডায়েরিতে যে কয়টা লেখা ছিল সবগুলোই বিয়ের আগের। তারিখগুলো সে কথাই বলে।

ডায়েরির লেখাগুলো পড়ে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বিয়ের আগে নীলার একটা রিলেশন ছিল। ছেলেটাকে নীলা প্রচণ্ড ভালোবাসতো। প্রত্যেকটা লেখার মাঝে অনেক বেশি আবেগের ছাপ ছিল। ডায়েরির বিভিন্ন পাতার ফাঁকে শুকিয়ে যাওয়া গোলাপের পাপড়ি ছিল। খুব সুখী কাপল ছিল তারা।

নীলা খুব ভালো ছবি আঁকতো। ডায়েরির বেশিরভাগ পাতায় দুটো হাতের ছবি আঁকা ছিল। খুব শক্ত করে ধরে রাখা দুইটা হাত। একটা ছবির নিচে লেখা ছিল,

"সে সবসময় আমার হাত ধরে রাখে; খুব শক্ত করে ধরে রাখে। আমি বললাম, 'এমনভাবে হাত ধরে রাখো যেন হাত ছাড়লেই আমি চলে যাবো!' সে কপাল কুঁচকে বললো, 'হু, ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যাবা!' আমি হেসে ফেলি; দিনের বাকি সময়টা আমার হাত খালি খালি লাগে, প্রচণ্ড শূন্য লাগে!"

নীলার ডায়েরির বাকি লেখাগুলা আমি আর পড়তে চাইনি। শেষ পৃষ্ঠায় গেলাম। শেষ পৃষ্ঠায় কাঁপা কাঁপা হাতে কয়েকটা লাইন লেখা ছিল,

"আজকে সে প্রথম এবং শেষবারের মতো আমার হাত ছেড়ে দিলো। আমি কষ্ট পাচ্ছি, ভীষণ কষ্ট! এই অবস্থায় একটা মেয়ে আত্মহত্যা করে, ঘুমের ওষুধ খায় কিংবা হাত কাটে। আমি এগুলার

কিছু করবো না, আমি স্বাভাবিক থাকবো, ভীষণ স্বাভাবিক। কেউ কিচ্ছু জানবে না, কেউ কিচ্ছু বুঝবে না, শুধু আমি ভেতরে ভেতরে পুড়বো!

খুব শীঘ্রই আমার বিয়ে হবে। তার সাথে না, অন্য কারো সাথে। আমার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে; আমাকে অন্য কোনো একজনের হাত ধরে বেঁচে থাকতে হবে। অন্য কোনো একজন পাশের বালিশটায় জায়গা করে নেবে। আমার একটা সন্তান হবে, সে অন্য কোনো একজনকে বাবা বলে ডাকবে, আমি হাসিমুখে থাকবো!

শুধু আমিই জানবো— কেউ একজন আমার হাতটা শক্ত করে ধরেছিল, কেউ একজন আমার সাথে বৃষ্টিতে ভিজেছিল, কেউ একজন আমার কপালের টিপ ঠিক করে দিতো, কেউ একজন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, কেউ একজন খুব সকালে ফোন করে আমার ঘুম ভাঙাতো, কেউ একজন ফিসফিস করে রাতে কথা বলতো!

প্রত্যেকের জীবনে এই 'কেউ একজন' থাকে। কারো কারো ভাগ্য হয় ঐ 'কেউ একজন'-এর সাথে সারাজীবন থাকার, আর কারো কারো ভাগ্য হয় 'অন্য কোনো একজন'-এর সাথে সারাজীবন থাকার।

তবুও জীবন থেমে থাকে না। আমি, তুমি, 'কেউ একজন', 'অন্য কোনো একজন'— সবাই চলতে থাকে, একদম নিজের মতো!

অনেকে অবাক হয়ে প্রশ্ন করবে, 'কীভাবে তার জায়গাটা তুমি আরেকজনকে দিলা?'

পৃথিবীতে কেউ কাউকে কারো জায়গা দেয় না, কেউ কাউকে রিপ্লেস করতে পারে না। ভাগ্যের দোষে হয়তোবা অন্য কারো হাত ধরতে হয়, কিন্তু হাতের ভেতরটা আর আগের মতো উষ্ণ লাগে না। ভাগ্যের দোষে অন্য কারো সাথে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়, কিন্তু নিজের ভেতরটা আর আগের মতো সিক্ত হয় না!"

নীলার ডায়েরির শেষ লাইনটা পড়া যাচ্ছিল না, লেখার ওপর পানি পড়েছিল সম্ভবত। কলমের কালি ছড়িয়ে গেছে। খুব সম্ভবত লেখাটা ছিল,

"পৃথিবীর যে কেউ আমার চোখের জলের কারণ হতে পারে, কিন্তু ঐ 'টুপ করে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দু'টা কিন্তু একজনই, একজনের জন্যই, ওটা কখনোই কেউ হতে পারে না, পারবে না। টুপ করে গড়িয়ে পড়া অশ্রুটার কথা কেউ জানে না, কেউ না!"

আমার চোখ দুটো ভিজে এলো। এক ধরনের অপরাধবোধে আমি ভুগতে থাকলাম, এই অপরাধবোধ দূর করার কোনো উপায় আমার জানা নেই!

পৃথিবীতে সংসার করতে থাকা অনেকগুলো মেয়ে জীবনের এক পর্যায়ে তীব্ররকমের কষ্ট পেয়েছিল। কোনো এক অমানুষের হাত আকড়ে ধরে হয়তো সে বাঁচতে চেয়েছিল একসময়। সেই অমানুষ তাকে মৃত্যুর দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল!

এক সময়ের চঞ্চল, দুরন্তপনা, হাসিখুশি মেয়েটার ভেতরটা খুন হয়ে গেছে সেদিনই। তবুও সে এখনো বেঁচে আছে; ভারী পাথরের মতো জমাট বাঁধা কষ্ট বুকের ভেতরটায় পুষে রেখে স্বাভাবিক মানুষের মতো দিব্যি বেঁচে আছে— বাবা-মা'র জন্য, স্বামীর জন্য, ফুটফুটে সন্তানের জন্য!

একটা অমানুষের জন্য হয়তো কষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু অমানুষের জন্য মরে যাওয়া যায় না। সত্যিকারের আপন মানুষগুলোর জন্য বরং বেঁচে থাকা যায়, প্রচণ্ড কষ্ট নিয়েও বেঁচে থাকা যায়!

সন্ধ্যে বাতি
রুমানা বৈশাখী

১

নূরজাহানের দাদী শ্বাশুড়ি আতিয়া বানু মহিলা হিসেবে অত্যন্ত বিরক্তিকর! সন্ধে নামার আগেই চেঁচিয়ে ঘরদোর মাথায় তুলবেন রোজ।

"বউ... ও বউ... বউ লো ... ঘরে সইন্ধ্যা বাত্তি কি জ্বলবো না আইজকা? বউ... বউ লো... সইন্ধ্যা বাত্তিডা দে গো তাড়াতাড়ি ... মাগরিবের আজান পড়ল বইলা..."

এত হাঁকডাক শুনেও অবশ্য নূরজাহান চট করে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। আলসেমি করে আড়মোড়া ভাঙবে একবার, খানিক বাদেই আবার একটু গড়িয়ে নেবে। তবে সেই সুখও বেশিক্ষণ সইবে না কপালে, বুড়ির চেঁচামেচিতে অস্থির হয়ে ছাড়তেই হবে ভাতঘুমের বিছানা। আলুথালু শাড়ি গুছিয়ে "সন্ধে বাতি" জ্বালতে ঘরে ঘরে যেতে হবে। একটু দেরি হলেই চেঁচামেচিতে মাথায় উঠবে ঘরদোর, রাতের বেলা নাতি ফিরলে নাত বৌয়ের নামে বিচার দিতেও দেরি করবে না বুড়ি।

পাঁচ বছরের সংসারে প্রতিদিন এই চলছে, শ্বাশুড়ি মারা যাবার পর বুড়ির অত্যাচার আরও বেড়েছে। আর যে ভালো লাগে না! কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় চিন্তা করে ইদানীং বড্ড হতাশ বোধ করে নুরজাহান।

বুড়ি একটুও বোঝে না যে তার জামানা ফুরিয়েছে বহুকাল। এখন সুইচ চাপলেই ঝলমলে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, হারিকেন আর কুপি হাতে দৌড়ে দৌড়ে সন্ধে বাতি জ্বালতে হয় না ঘরে ঘরে। আর ওসব সন্ধে বাতি-টাতি জ্বালানোটাও হচ্ছে বিচ্ছিরি কুসংস্কার। কী হবে পাঁচটা মিনিট দেরি হলে? জ্বীন-ভূত-দৈত্য-দানবে ঘরদোর ভরে যাবে? ওগুলো এসে টুক করে ঘাটের মড়া বুড়িটাকে খেয়ে নেবে?

যত্তসব!

মনে মনে গাল বকতে বকতেই আজও বিছানা ছাড়ে নূরজাহান। সংসারে মানুষ বলতে তারা তিনজন। নূরজাহান আর তার বর জাহেদুল আলম, সাথে প্রায় শতবর্ষী এই দাদি শ্বাশুড়ি। শ্বশুর-শাশুড়ি গত হয়েছেন অনেক আগেই। কিন্তু কীভাবে কীভাবে যেন এই বুড়ি টিকে আছে অক্ষয়-অমর হয়ে। লোকে ঠিকই বলে, অল্প বয়সে বিধবা হওয়া মেয়ে মানুষ বাঁচে বেশিদিন! নিজের স্বামী-সংসার চিবিয়ে খেয়ে তারপর অন্যের হাড় কালি করতে বেঁচে থাকে এরা।

হাই তুলতে তুলতে বাড়ির সমস্ত ঘরের আলো জ্বেলে দিতে শুরু করে আতিয়া বেগমের নাত বৌ। বাইরে ঝড় আসবে আসবে করছে। বহুকাল পুরাতন দোতলা বাড়ির কপাটগুলো সশব্দে বাড়ি খাচ্ছে ঝড়ো বাতাসে। হুট করে শুনলে বুকের মাঝে গিয়ে লাগে, চমকে উঠতে হয় ভয়ে। আকাশটা

টকটকে লাল হয়ে আছে, বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ঘনঘন। বিয়ে হয়েছে পর্যন্ত এমন ঝড়-তুফান আর চোখে পড়েনি নূরজাহানের।

একতলার সব কামরায় বাতি না জ্বেলেই দৌড়ে দোতলায় উঠে যায় নূরজাহান। সেই পাকিস্তান আমলে দাদা শ্বশুর এই বাড়িখানা কিনেছিলেন বড়ো শখ করে। কালে কালে যত্নের অভাবে সেই সুখের নীড়ের দশা এখন জীর্ণ। নোনা ধরেছে প্রাচীন দেওয়ালগুলোতে, পলেস্তরা খসে খসে পড়ছে এখানে সেখানে। একটা অংশ ধসে পড়েছে পুরোপুরি, ব্যবহার করা হয় না বহুকাল। যেটুকু অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে সেটুকুও মেরামতের অভাবে প্রায় যাই যাই। জাহেদুল আলমের ক্ষমতা নেই বাপ-দাদার পৈত্রিক বাড়িখানা যত্ন করে আগলে রাখার। বিশেষ আগ্রহও নেই। তিনজনের ছোট্ট সংসার সামাল দিতেই রীতিমতো হিমসিম খাবার অবস্থা তার...

ভাবনায় ছেদ পড়ে বুড়ির ব্যাকুল চিৎকারে।

"ও লো বউ, সব ঘরে বাত্তি দিয়া হইসে তো? মনে কইরা দিসস তো? ও লো বউ... দিসস তো? ভুল হয় নাই তো? ভুল হয় নাই তো? ভালো কইরা ক বউ, ভুল হয় নাই তো?"

দাদী শাশুড়ির কামরার জানালাগুলো এঁটে দিতে দিতে ব্যঙ্গের হাসি হাসে নূরজাহান।

"না, দাদীজান। ভুল হয় নাই। সব কামরায় লাইট দিসি। আর আপনে এত ভয় পাইতেসেন ক্যান? এখনো সন্ধ্যা হয় নাই। মাগরিবের ওয়াক্ত হইতে অনেক দেরি।"

"ওইসব তুই বুঝবি না বেডি, তুই বুঝবি না..." বিড়বিড় করেন আতিয়া বানু। "তুফান আইতেসে, হারিকেন-কুপি সব বাইর কর। বাইর কইরা কেরাসিন ভর..."

"সব ঘরে লাইট দিসি তো, দাদীজান!"

"আরে রাখ তর লাইট! তুফান শুরু হইলেই ফুট্টুস কইরে কারেন্ট চইলে যাইবে। তখন থাকবি ক্যামনে? ফটর ফটর বাদ দিয়া হারিকেন নামা তাড়াতাড়ি, সইন্ধ্যা হইল বইলা..."

"আপনে চিন্তা কইরেন না তো, দাদীজান। কিচ্ছু হবে না। একটু কারেন্ট গেলে কিচ্ছু হয় না।"

"চুপ থাক বেডি!" ঝাঁঝিয়ে ওঠে বুড়ি। "তুই কি আমার চাইতে বেশি জানোস এইসব? বেশি জানোস? কার বাড়ি এইডা, কীসের বাড়ি জানোস কিছু? সইন্ধ্যা লাগলে "তেনারা" ঘুরাফিরা করে জানোস না? ঠিক মাগরিবের ওয়াক্তে "তেনারা" বাইর হয়। ওই সময়ে এই বাড়ি আন্ধার রাখা যায় না, কইসি না তরে?"

এবার সত্যি সত্যিই হেসে ফেলে নূরজাহান, নিচতলায় যেতে উদ্যত হয়। চা রেখে এসেছে চুলায়, পুড়ে পাতিল ঝামা হয়ে থাকবে।

"আপনারে এইসব আজগুবি গল্প কে যে বলে, দাদীজান! ভূত বলতে কিছু নাই। যদি থাকতোও, জগত ভরা মানুষের ভিড়ে কবেই মরে ভূত হয়ে যাইত।"

"সবকিছু নিয়া মশকরা করবি না, বউ। সবকছু নিয়া মশকরা করন ভালা না!"

"আচ্ছা, করলাম না মশকরা। আপনে শান্ত হয়ে বসেন তো, বসেন। আমি চা-বিস্কুট নিয়ে আসি। মুড়ি ভাজা খাবেন?"

"চা-বিস্কুট লাগবো না। সইন্ধ্যা হয়ে যাইতেসে। তুই হারিকেন নামায়া আমার ধারে আইসা ব। দুইজনে একলগে থাকি। এমুন সময়ে একলগে থাকা লাগে।"

"আমি এক দৌড়ে যাবো আর আসব।"

"দৌড়ায়া যা। চা লাগবো না, হারিকেন নিয়াই উপ্রে আইবি। আইসা জাহেদরে মুবাইল করবি। সে জানি সাবধানে থাকে।"

“আচ্ছা, করতেসি। আপনে একটু শান্ত হয়ে বসেন। আমি আসতেসি।”

“মাথায় কাপড় দে বেডি, মাথায় কাপড় দে। ভর সইন্ধ্যায় মাথায় কাপড় দেওন লাগে...”

কথাগুলো শুনতে পায় না নূরজাহান, চাপা পড়ে যায় বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজের নিচে। এলো চুলে ভাতঘুমের আলুথালু বেশেই দৌড়ে যায় একতলার রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের জানালা খোলা, বৃষ্টি নামার আগেই বন্ধ করতে হবে...

শুনতে পায় না নূরজাহান বৃদ্ধা দাদী শাশুড়ি আতিয়া বানুর কণ্ঠস্বর। কিংবা শুনলেও গুরুত্ব দেয় না। চঞ্চল পায়ে দৌড়ে নামে জীর্ণ সিঁড়িগুলো ভেঙে।

একতলার কোনো এক কামরায় তখন অন্ধকার কোনো এক ছায়া আড়মোড়া ভাঙে।

সেই কামরায়, যেখানে নূরজাহান আলো জ্বালতে অবহেলা করেছিল!

২

বৃষ্টি-বাদলের হিমশীতল পরিবেশেও কুলকুল করে ঘামতে থাকেন আতিয়া বানু।

বয়স হয়েছে তাঁর, এখন আর কেউ তাঁকে গোনায় ধরে না। তিনি বোঝেন, সবই বোঝেন। তবুও বলেন। কাউকে না কাউকে তো বলতে হবে। আজকালকার মেয়েরা সংসারের গুরুত্ব বোঝে না, গুছিয়ে সংসার করতে জানে না। সংসার করাও যে একটা বিশেষ কাজ, সেই বোধ এখনকার মেয়েদের নাই। সব সংসারের কিছু নিয়ম থাকে, সব বাড়ির কিছু কেচ্ছা থাকে- সেইগুলো পালন করতে হয়, সেইগুলো জানতে হয়। সব বুঝে-শুনে বুদ্ধি আর মমতা দিয়ে চারদিক আগলে রাখার নামই সংসার।

তিনি যখন গিন্নি ছিলেন, তখন এই সংসারের সবকিছু নিজে দেখে-শুনে সামলে রেখেছেন। কই, কোনোদিন তো কোনো দূর্ঘটনা ঘটেনি। কারো চুলের ডগার ক্ষতিটিও তো হয়নি কখনো। কারণ এই বাড়ির সব দেওয়ালের গল্প তিনি জানতেন, প্রতি মুহূর্তেই সবকিছুর দিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। এই বাড়ির প্রথম গিন্নির সব উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন তিনি। যতদিন স্বামী বেঁচে ছিল, তাই চলেছেন। তাতে স্বামী-সংসারের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কিছু হয়নি।

বাড়িটা জাহেদুল আলমের দাদা কিনেছিলেন এক হিন্দু ব্যবসায়ীর গিন্নির কাছ থেকে। স্বামীর দেহত্যাগের পর বিবাহযোগ্যা তিন কন্যা নিয়ে বড়ো বিপদে পড়েছিলেন মহিলা। আত্মীয়স্বজন সব ওপার বাংলায়, মানে ভারতে। এদিকে এদেশেও পরিস্থিতি খারাপ, লোকে বলে যেকোনো দিন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। মহিলা তখন নিরুপায় হয়ে স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকুনও বিক্রি করে দিচ্ছিলেন।

বিদায় কালে অশ্রুসজল চোখে আতিয়া বানুর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন-

“দিদি গো, এই বাড়ির গিন্নি মা এখন আপনি। এতকাল আমি আগলে রেখেছি, এখন আপনি রাখবেন। সন্ধে হলে ঘরে ঘরে বাতি দেবেন, সুগন্ধি ধূপ জ্বালবেন, কাঁসার বাটিতে তাজা গরুর দুধ ভরে রেখে আসবেন আম গাছের তলায়। এই বাড়ি কক্ষনো অন্ধকার থাকতে দেবেন না, দিদি। এই বাড়িতে “তেনারা” আছেন, “তেনারা” সন্ধেকালের অন্ধকার ভালোবাসেন। সেই অন্ধকারে তারা অনর্থ করতে পারেন। তাদেরকে সেই সুযোগ দেবেন না। “তেনারা” তাজা দুধ ভালোবাসেন, সুগন্ধি ধূপ ভালোবাসেন, পালা পার্বনের মিষ্টি ভালোবাসেন। “তেনাদের” সন্তুষ্ট রাখবেন, “তেনারাও” অনিষ্ট সাধন করবেন না। “তেনারা” চাইলে আপনার ঘরে কোনোদিন অভাবও হবে না কোনো কিছুর।”

আতিয়া বানু সেই অনুরোধ রেখেছিলেন।

অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন পূর্ববর্তী গিন্নি মায়ের সকল উপদেশ। ঠিক সন্ধে নামার আগে আগে কালো গাইয়ের দুধ বড়ো কাঁসার বাটিতে করে রেখে আসতেন আম গাছের তলায়, ছড়ানো কাঁসার থালায় দিতেন গরম গরম মিষ্টি। পিতলের ধূপদানী সুগন্ধ ছড়াতো সধ্যে নামলেই, হারিকেনে তেল ভরে রেখে আসা হতো সব কামরায়। তখনো বৈদ্যুতিক বাতির ঝলকানি এদিকে আসেনি। কিন্তু কই, কোনোদিন তো কোনো অনর্থ হয়নি! বরং দিনে-রাতে ফুলে ফেঁপে বহুগুন হয়েছিল সংসারের আয়-বরকত। যা পাবার কথা ছিল না, তাও পাওয়া হয়ে যেত। দু'হাতে খরচেও যেন ফুরোতো না বেহিসেবী সেই সম্পদ। এই বাড়িতে যে-ই পা রাখতো, তারই যেন কপাল খুলে যেত।

আতিয়া বানু ভক্ত না হলেও অবিশ্বাসীর দলে ছিলেন না। লোকের সাথে এসব নিয়ে আলোচনা করতেন না ঠিকই, কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করতেন প্রাক্তন গিন্নি মায়ের কথা। বিশ্বাস করতেন যে এই ভিটায় বাস করে কোনো অজানা শক্তি। তারা অন্ধকার, তারা ভয়াবহ। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে গৃহস্থের উন্নতি হবে, অন্যথায় হবে করুণ পরিণতি।

আতিয়া বানু বিশ্বাস করতেন, তাই সন্ধে বেলার রহস্যময় অন্ধকারকে এড়িয়ে চলতেন।

আতিয়া বানু ভয় পেতেন, তাই অশুভ সেই শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন।

সকল বিশ্বাসের উর্ধে গিয়ে নিজের সংসারকে আগলে রাখতে প্রাণপণ!

কিন্তু...

সময়ের সাথে বদলে গেল সবই। ঘরে পুত্রবধু এলো, স্বামী হারা হলেন। সংসারের দায় নতুন বউয়ের হাতে এক সময়ে ছেড়ে দিতেই হলো। জাহেদের মা শত বোঝালেও বুঝতে চাইতেন না, ঠিক জাহেদের বউয়ের মতোই। ক্রমে ক্রমে আমতলায় দুধ-মিষ্টি যাওয়া বন্ধ হলো, ঘরে ঘরে ধুপের সুবাস মিইয়ে গেল, প্রাচুর্যে ভরা সংসারে অভাব কড়া নাড়তেও দেরি করলো না। একে একে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল সবাই, মানুষে গমগম করা সংসারে নেমে এলো নিস্তব্ধতা।

না, তখনও জাহেদের মা শ্বাশুড়ির কথায় কান দেননি। ঘরে পড়ে থাকা অথর্ব এক বুড়ির কথায় কেই-ই বা কান দেবে। কালে কালে সবই গেল এই সংসারের। চোখের সামনে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হলো, অনাথ হলো জাহেদ। এই এক জাহেদকে বুকে আগলে বেঁচে ছিলেন জাহেদের মা। ছেলে বড়ো হলো, বিয়ে করালেন। এমনই কপাল যে সেই সুখ-ও ভাগ্যে সইলো না। জাহেদের বিয়ের কয়েক মাস পরেই রোগে ভুগে ভুগে খুব কষ্ট পেয়ে মৃত্যু হলো আতিয়া বানুর পুত্রবধূর।

এককালে এই সংসারে সবই ছিল। হাসি, আলো, মানুষ, প্রাচুর্য।

কালে কালে এই সংসার এখন ধ্বংসস্তুপ। আতিয়া বানু শত চাইলেও এখন আর আলো ফিরবে না এই ধুঁকে ধুঁকে চলে সংসারে। তিনি সংসারের কত্রী নেই বহুকাল। এখন তাঁর ঘরে কালো গাইয়ের দুধ নেই, পিতলের দানীতে ধূপ নেই, সন্ধে হলেই গরম গরম মিষ্টি তৈরির রাঁধুনি নেই। "তেনারা" নাখোশ আজ বহু বহু কাল, বোঝেন আতিয়া বানু। "তেনাদের" শীতল উপস্থিতি যেন অনুভব করতে পারেন নিজের প্রতি নিশ্বাসের সাথে।

সুযোগ পাওয়া মাত্র...

সামান্যতম সুযোগ পাওয়া মাত্রই বিস্তার করবেন তাঁরা অন্ধকারের রাজত্ব। এতকালের জমানো অসন্তুষ্টি উগড়ে দেবেন একসাথে। আতিয়া বানু জানেন। আতিয়া বানু অনুভব করতে পারেন। আতিয়া বানু অতীতকে চোখের সামনে দেখেছেন বলেই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারেন...

বাইরে বেড়েছে ঝড়ের গর্জন, শোঁ শোঁ শব্দে কান পাতা দায়। নূরজাহান এখনো আসছে না কেন? সামান্য হারিকেন আনতে গিয়ে এত কেন দেরি করছে মেয়েটা? যদি এখন বিদ্যুৎ চলে যায়? যদি চলে যায়?

আর ভাবতেও পারেন না আতিয়া বানু, অজানা ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে আর কাঁপতেই থাকে। কাঁপা হাতে কুরআন শরীফ বুকে টেনে নিয়ে বিড়বিড় করে দরূদ শরীফ পড়তে থাকেন আওয়াজ করেই। সেই কোনো ছেলেবেলায় মা শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দরূদ শরীফের চাইতে বড়ো বন্ধু আর কেউ নাই।

...কিন্তু নূরজাহান আসছে না কেন? নূরজাহান?

কুল কুল করে ঘামেন, বুকের মাঝে ধুকপুক করে হৃৎপিণ্ড। ভয়াবহ তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসে বার বার, প্রচণ্ড অস্থির বোধ করতে শুরু করেন আতিয়া বানু। গা গুলিয়ে ওঠে, তীব্র একটা বমি ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলে অস্তিত্ব।

ঠিক সেই সন্ধের মতো...

ঠিক সেই সন্ধের মতো...

যে সন্ধেয় ঘাড় মটকে মরে পড়েছিল লতিফা!

লোকে বলেছিল- অন্ধকারে সিঁড়ি ভেঙে নামতে গিয়ে পা পিছলে গেছে, পড়ে গিয়ে ঘাড়টা ভেঙে গেছে দুর্ভাগা মেয়েটার। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু, চিৎকার করার সুযোগটাও জোটেনি।

কিন্তু লোকে যাই বলুক, আতিয়া বানু তো জানেন আসল ঘটনা। আতিয়া বানু তো জানেন যে সেদিন দ্বায়িত্বে অবহেলা করেছিল বোকা মেয়েটা। আলসেমি করে কেরোসিন ভরেনি হারিকেনে আর বিদ্যুৎ যাবার পর সেই হারিকেন আনতে গিয়েই...

জাহেদুল আলমের বউ ছিল মেয়েটা। লতিফা, জাহেদুল আলমের প্রথম স্ত্রী!

হ্যাঁ, নূরজাহানের আগেও জাহেদুল আলমের বিয়ে হয়েছিল। এবং সেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল সন্ধে বাতিকে অবহেলা করতে গিয়েই। রোজকার মতো ঘরে ফিরে সিঁড়ির নিচে স্ত্রীর শীতল মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল সেইদিন জাহেদুল আলম। তীব্র ভয়ে মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে, ঘাড়টা বেঁকে গেছে এমনভাবে যেন কোনো দানব পৈশাচিক শক্তিবলে ভেঙে দিয়েছে। সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে লাশটাকে কে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছিল সিঁড়িঘরের পেছনের অন্ধকারে। সেখানে একদল ইঁদুর খুবলে খেতে শুরু করেছিল বেচারি মেয়েটির মৃতদেহ।

নূরজাহানের মতোই চঞ্চল ছিল মেয়েটি, দাদী শাশুড়ির কথা বিশ্বাস করতো না কিছুই।

ঠিক নূরজাহানের মতোই!

এবং আতিয়া বানুকে চমকে দিয়ে সে রাতের মতোই অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। বিদ্যুৎ চলে গেছে! একটা ভয়ানক ঝড়-জলের রাতে ঠিক সন্ধে বেলাই বিদ্যুৎ চলে গেছে...

ঠিক যে ভয়টা আতিয়া বানু করেছিলেন।

ঠিক যে ভয়টা আতিয়া বানু আগেরবারেও করেছিলেন!

৩

কেটলির মাঝে চা পাতা ছড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ চুলার ধারে অপেক্ষা করে নূরজাহান। কেরোসিনের স্টোভ, নীলচে আগুনের রঙ খেলা করে তাই ছিমছাম চোখমুখে। এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে খড়ির চুলোর রান্নাঘরে যেতে মন চাইছে না।

বাইরে ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি হচ্ছে অল্প অল্প। বেশ লাগছে! একটা নরম আলস্য ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। আতিয়া বানুর কথামতো হারিকেন-কুপি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না, রাতের

খাবারের আয়োজন করতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটা গল্পের বই পড়তে পড়তেই পার করে দেওয়া যেত জীবন...

সত্যি বলতে কি, এই বাড়িটাকে তারও ভালো লাগে না। কখনো ভালো লাগেনি। কেবল মন খারাপ করে দেওয়ার মতো পুরাতন বাড়ি বলে নয়, এই বাড়ির মাঝে কেমন যেন একটা অন্ধকার ব্যাপার আছে। তালাবদ্ধ কামরাগুলোকে দেখলে মনে হয় ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে ভয়াল কোনো দানব, জংলা হয়ে যাওয়া বাগান দেখলে মনে হয় বহন করে চলেছে শত বছরের অভিশাপ। এত বড়ো বাড়ি, অথচ চারদিকে কেমন দম বন্ধ করা নীরবতা। উঁচু পাঁচিলটার কারণে মনে হয় বুঝি জগত থেকে বিচ্ছিন্ন।

নূরজাহানের কেমন যেন গা ছমছম করে হঠাত হঠাত। মনে হয় কোনো এক কোণা থেকে অপার্থিব কিছু একটা বের হয়ে এসে তাঁকে টেনে নিয়ে যাবে অতল কোনো অন্ধকারে। হয়তো চোখের ভুলও হতে পারে, কিন্তু প্রায়ই মনে হয় নিচতলার কোণার দিকের কামরাটায় হেঁটে বেড়ায় কেউ। একটি মেয়ে, কমবয়সী। মেয়েটিকে দেখা যায় না যদিও, কেবল একই ক্ষীণ কটি ছায়াই চোখে পড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য। কখনো চোখে পড়ে ছোটো ছোটো শিশুদের ছায়া, কখনো আবার লাঠি হাতে কুঁজো কোনো বৃদ্ধ... না, সবসময়ে না। হঠাৎ হঠাৎ।

এই যেমন ঝুম ঝুম বৃষ্টির সন্ধ্যায় কিংবা ঝিম মেরে থাকা একলা দুপুরে। অমাবস্যার অন্ধকার রাতগুলোতে কিংবা খুব ভোরে ফজরের ঠিক আগে আগে। অদ্ভুত একটা মানসিক চাপ আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন নূরজাহানকে। মনে হয়, অন্ধকারের মাঝে শরীর মিলিয়ে লুকিয়ে আছে খুব ভয়ানক একটা কিছু। ফিসফাস করছে তাঁরা নিজেদের মাঝে।

ঝাঁপিয়ে পড়বে... প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁরা নিজের সর্বশক্তিতে। আর... আর টেনে নিয়ে যাবে অতল সেই অন্ধকারে। যার কোনো শুরু নেই। শেষ নেই। আছে কেবল কালিগোলানো নিঃস্তব্ধ অন্ধকার।

আতিয়া বানুকে অবশ্য ভুলেও এসব বলে না নূরজাহান। আতিয়া বানু কেন, কাউকেই বলে না। মনের বিভ্রম ওসব, বোঝে সে নিজেই। সকলের মনের মাঝেই ঘাপটি দিয়ে থাকে ছোটোবেলায় শোনা দেও-দানবের গল্প আর সুযোগ পাওয়া মাত্র মন নানানরকম ছায়ার বেশে ভয় দেখাতে কার্পণ্য করে না।

বোঝে নূরজাহান সবই। তারপরেও মনের মাঝে তীব্র অস্বস্তিটুকুন কাটে না। কখনো কখনো একাকীত্বের এই অনুভব আর অন্ধকারের ভয়টাকেই কেবল সত্য মনে হয়। এই যেমন এখন...

যাহ! বিদ্যুৎ চলে গেল নাকি!

জানে না কেন, বুকের মাঝে ধড়াস করে ওঠে। আতিয়া বানু ঠিকই বলেছিল, লোডশেডিং হবে। কিন্তু হারিকেন যে তৈরি করা হয়নি...

কালিগোলানো অন্ধকার নেমেছে রান্নাঘরের মাঝে, একমাত্র সম্বল কেরোসিনের স্টোভের ক্ষীণ আলোটুকুন। হাতড়ে হাতড়ে চুলার ধারে রাখা কুপিটা খোঁজে নূরজাহান। এখানেই তো ছিল... এখানেই... চুলার ঠিক ধারেই... কোথায় গেল!

বাইরে বেড়েছে বৃষ্টির পরিমাণ, বাতাস নেই একটু। তবুও চুলার আগুনটা নিভু নিভু হয়ে যায়। অদ্ভুত এক শীতলতায় ভরে ওঠে রান্নাঘরের উষ্ণ পরিবেশটা। মনে হয় বুঝি মাঘ মাসের শীতল শীতের রাত কোনো।

জানে না কেন, হুট করেই তীব্র আতংক গ্রাস করে নূরজাহানকে। বাতাস নেই, তবু নিভে যেতে চাইবে কেন চুলা? জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে কেন গায়ে কাঁটা দেবে মাঘ মাসের শীতের মতোন? কেন?

কুলকুল করে ঘামতে ঘামতে দেশলাই খোঁজে নূরজাহান, খোঁজে চুলার ধারে রাখা কুপিটা। কিন্তু না, মেলে না কিছুই। খানিক আগেই রাখা জিনিসগুলো যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, কিংবা সরিয়ে নিয়ে গেছে কেউ। বারবার কেবল মনে পড়ে আতিয়া বানুর সেই ভাঙা রেকর্ডের মতো কথাগুলি–

"এই বাড়িত যারা আছে, "তেনারা" আমগো উপরে নাখোস। বুঝছস বৌ, তেনারা আমগো উপরে নাখোস। অখন আমরা তেনাদের সেবা করি না, অখন আমরা তেনাদের সন্তুষ্ট করি না। ...আমার সময়ে আমি করসি। কিন্তু অখন তুমরা শিক্ষিত হইসো, এই বুড়ির কথা তুমাগো মনে ধরে না। সইন্ধ্যা বাতি জ্বালাইতে কইলে তুমরা রাগ হও... আমি বইলে রাখলাম দেইখো, যেইদিন তেনারা সুযোগ পাইবে, কাউরে ছাড়ান দিবে না... তেনাদের অবহেলা করার মাসুল সবাইরেই দিতে হবে..."

মাথা ঝাঁকিয়ে কথাগুলো ভুলে যাবার চেষ্টা করে নূরজাহান। এখন আতঙ্কিত হলে চলবে না। আতঙ্কিত হবার মতোন কিচ্ছু হয়নি। জগতে ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, সবই আমাদের মনের ভুল। চুলা নিভে গেছে, দেশলাই খুঁজে বের করে চুলা জ্বালতে হবে। তারপর হারিকেন বা কুপি ধরিয়ে নিয়ে দোতলায় দাদীজানের কাছে যেতে হবে। অন্ধকারে নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে বুড়ি মহিলা...

নেই... নেই... কোথাও নেই! না দেশলাই, না কুপি, না হারিকেন!

...না না, আছে... দেশলাইখানা হাতে লাগতেই জানে যেন পানি ফিরে পায় নূরজাহান। মনে হয় বুঝি ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে...

উফ! নিভে যাচ্ছে কেন?

চুলা জ্বালে নূরজাহান, নিভে যায়। আবারো জ্বালে, আবারো নিভে যায়।

আবারো! আবারো! আবারো!

ফুরিয়ে যায় কাঠিগুলো ক্রমশ, কিন্তু কেরাসিনের স্টোভখানা জ্বালিয়ে রাখা যায় না কিছুতেই। মনে হয় বুঝি কামরার হিম শীতলতাই গ্রাস করে নেয় আগুনের উষ্ণতাটুকুন। আর শেষ কাঠিটা যখন জ্বলে ওঠে, তখন চুলার ধারে বসে আছে আরো একটি মেয়ে...

ঠিক নূরজাহানের মতোই যেন। পরনে একই রকম তাতের শাড়ি, একই রকমের ক'গাছা চুড়ি কব্জি জুড়ে। আর বড়ো বড়ো চোখগুলোতে জগতের গভীরতম বিষাদ, বুঝি এখনই অশ্রু হয়ে নামবে গাল বেয়ে...

বড়ো অপার্থিব দৃশ্য।

বড়ো ভয়াবহ দৃশ্য।

"তোমাকে নিতে এসেছি আমি।" ফিসফিস করে বলে আবছায়া মেয়েটি। গভীর বিষাদে ছাওয়া চোখদুটি মেলে বলে। যে চোখ দুটি বলে দেয় যে এই মেয়েটি এখন আর এই ভুবনের বাসিন্দা নয়। অন্য কোনো ভুবনে তাঁর বাস, অন্য কোনো অন্ধকারে।

"তোমাকে নিতে এসেছি আমি। তোমাকে নিতে এসেছি!"

"কোথায় নিয়ে যাবে?"

"যেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"কে নিয়ে গেছে? কে?"

"তাঁরা!"

"যাবো না আমি। যাবো না আমি তোমার সাথে।"

"তাঁরা তোমাকে নিয়ে যাবেন, যেভাবে আমাকে নিয়ে গেছেন... তাঁদের অন্ধকারে!"

এরপরের কথাগুলো নূরজাহানের আর শোনা হয় না। দেশলাইয়ের সর্বশেষ কাঠিখানা নিভে যায়, অন্ধকার গ্রাস করে বাস্তবতার অস্তিত্ব।

কেবল নূরজাহানের কণ্ঠ ছেঁড়া ভয়াবহ আর্তনাদ বাতাসে ভেসে থাকে অনেকক্ষণ।

পরিশিষ্ট

চার্জ লাইটখানা বুকের মাঝে চেপে ধরে ক্রমাগত দোয়া দরূদ পড়তে থাকেন আতিয়া বানু।

এই চার্জ লাইট খানা তাঁর পরম বন্ধু, সারাক্ষণ একে নিজের বালিশের নিচেই রাখেন। সদর থেকে জাহেদুল আলম এনে দিয়েছিল তাঁকে, তারপর থেকে আর কখনো নিজের হাতছাড়া করেননি। আতিয়া বানু জানতেন, তিনি জানতেন যে কখনো না কখনো এমন সময় নিশ্চয়ই আসবে, যখন চার্জ লাইটের সামান্য আলোটুকুই হবে তাঁর একমাত্র সম্বল।

বৃষ্টির আওয়ার এত তীব্র যে শোনা যায় না কিছুই। বউ মা যে সেই চা আনতে গেল, এরপর থেকে কোনো খোঁজ নেই। ডেকেছেন তিনি অনেকবার, কিন্তু বৃষ্টির আওয়াজে নিজের কণ্ঠ নিজেই শুনতে পাননি। মনের মাঝে কু ডাকে, কিন্তু উঠে গিয়ে দরজার বাইরের অন্ধকারে পা দেবার সাহস আতিয়া বানু করতে পারেন না। এতকাল যে অন্ধকারকে ভয় করে এসেছেন, তাঁকে জয় করার স্পর্ধা আজো করে উঠতে পারেন না।

জাহেদুল আলমের বউ অবশ্য ডানপিটে মেয়ে। মুরুব্বিদের যেমন খুব একটা মান্যগন্য করে না, তেমন ভূত-প্রেতও মানে-টানে না। একবার রাত বারোটার সময়ে স্বামীর সাথে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি রওনা হয়েছিল, এমনই এই মেয়ের সাহস। এই মেয়ে ঝড়-তুফান বা অন্ধকার কিচ্ছুকেই ভয় করে না।

কিন্তু তবুও...

আসছে না কেন? এতক্ষণে তো হারিকেন হাতে দৌড়ে আসার কথা। নূরজাহান তো খুব ভালো করেই জানে যে দাদী শাশুড়ি অন্ধকার ভয় পান। তাহলে? আসছে না কেন এখনো?...

না না, এসেছে। ওই তো দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে নূরজাহান। দুইহাতে ধরা চায়ের ট্রে, তাতে সাজানো চা। কোনো আলো নেই সাথে, অন্ধকারের মাঝেই দিব্যি সিঁড়ি ভাঙছে সে। দশ, নয়, আট, সাত...

আর মাত্র কয়েকটি সিঁড়ি... মাত্র কয়েকটি সিঁড়ি বাদেই নূরজাহান উঠে আসবে দোতলায়। তারপর আর চিন্তা নেই কোনো। দুজনে এই চার্জ লাইট হাতে নিয়ে ঘরের দরজার খিল এঁটে বসে থাকবেন।

দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করেন আতিয়া বানু। প্রতিটি মুহূর্ত যেন মহাকালের মতোন দীর্ঘ হয়ে যায়। তিনি জানতেও পারেন না যে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসা প্রাণীটি নূরজাহান নয়। বরং সেই অন্ধকারের জীব, যাদেরকে তিনি ভয় করেছেন আজীবন...

আতিয়া বানু অপেক্ষা করেন!

আতিয়া বানু জানতে পারেন না...

ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন না যে নিচতলায় কোণার দিকের কামরার দরজাটা তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ভেতরে ছেঁচড়ে নেওয়া হচ্ছে নূরজাহানের লাশ।

সেই লাশ, আগামীকাল সকাল নাগাদ যার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না!

নামে কিবা এসে যায়

সাখাওয়াত হোসাইন

তানিয়ার আব্বা আমায় দেখতে পারেন না।

আমি খেয়াল করেছি, সময়েসী সুন্দরী মেয়েদের আব্বাগুলা আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমার বন্ধু মেশকাত বলে, তুইও সুন্দর, ওর মেয়েটাও সুন্দর- হিংসে হিংসে।

আমারও তাই ধারণা।

মেয়েটার নাম যে তানিয়া; মেশকাতের কাছ থেকেই জানা হয়েছে। সে খোঁজখবর করেছে। আদর্শ মহিলা কলেজে পড়ে, ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার। বাম কাঁধে একটা তিল আছে।

তানিয়া যেই বাসার দোতলায় থাকে, ওই বাসার নিচ থেকে আমি প্রায় ঢিল ছুঁড়ি। বারান্দা লক্ষ্য করে। প্যাকেটজাত ঢিল। কাগজে মোড়ানো। কাগজে লেখা থাকে, "তানিয়া, তোমায় না পাওয়ার কষ্টে নীল হতে চাই না; তোমার বাম কাঁধের তিল হইতে চাই।"

তানিয়া কোনোদিন-ই বারান্দা আসে না। আমি নীল হয়েই থাকি। ঢিলগুলো ময়লা মনে করে বারান্দা দিয়েই তানিয়ার সুন্দরী অল্পবয়সী আম্মা পুনরায় ছুঁড়ে ফেলে ফেরত দেন।

এক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করেই যাচ্ছি।

আজকে ইদ।

আমাকে বলা হয়েছিল গরুর পা ধরে রাখতে, আমি বলেছি- আমার খুব ইগো, পা ধরি না। বলেই পালিয়ে এসেছি।

তানিয়ার আব্বা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন। তার সাদা স্যান্ডো গেঞ্জিতে ছোপ ছোপ রক্ত। তাকে দেখতে লাগছে পুরোদস্তর রক্তপিপাসু। আমি সুযোগ বুঝে ঢিল ছুঁড়লাম বারান্দায়। কপাল! হাতের টিপ এত ভালো আমার, ডিরেক্ট গিয়ে হুট করে বারান্দা আসা রক্তপিপাসুর বুকে লাগলো।

জোরসে দৌঁড় দেওয়ার আগেই একপলক দেখেই চিনে ফেললেন আমায়।

আমার সাথে তো তার শালা দুলাভাই সম্পর্ক না; তড়িৎ গতিতে বুঝলেন... ঢিল মে কুচ কালা হ্যায়!

চিঠি উদ্ধার করলেন, তারপর পড়ে লাল হয়ে গেলেন। জোরে ডাকলেন, "তানিয়ায়ায়া..."

তানিয়ার অল্পবয়সী সুন্দরী আম্মু কোমরে আঁচল বেঁধে চামচ হাতে ছুটে এলেন।

"কী হইছে, চিল্লাচ্ছো কেন এত?"

রক্তপিপাসু হাত বাড়িয়ে ধরলেন, চোখ দুটো স্যান্ডো গেঞ্জির মতোন করে বললেন, "তোমার নামে চিঠি পাঠিয়েছে এক ছোকরা। নাও পড়ো। ওয়ান সেকেন্ড, তোমার বাম কাঁধে তিলও আছে?"

এই ইদের মতোন ব্যস্ত সময়েই দুপুরের দিকে বাসায় ছোটোখাটো বিচার বসেছে৷ রক্তপিপাসু শুঁকে শুঁকে বের করে ফেলেছে আমার বাসা। আব্বার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ছিহ ভাই ছিহ, চিঠিতে কি অশ্রাব্য ভাষা লেখা। এটা আপনার ছেলে? সিউর তো?”

আব্বা হকচকিয়ে গেলেন, আম্মার জোরে ক্রন্দনের শব্দ শুনেই রক্তপিপাসু থতমত খেয়ে বললেন, “ইয়ে মানে, একটু শাসন করবেন। আমার বৌয়ের নামে চিঠি দিচ্ছে, এটা কোনো কথা?”

আব্বা ভয়ানক রেগে আমায় বললেন, “তোর শাস্তি হচ্ছে, গরুর ভুঁড়ি পরিষ্কার করা। কোনো হেল্প পাবি না। ওই কেউ ওর ধারে কাছেও যাবা না...”

ভুঁড়ি পরিষ্কার করতে করতে একটা প্ল্যান কষলাম। চটপট কাজ সেরে ওই ময়লা পোশাকেই রওনা হলাম। সামনের গলিতে গিয়ে এক লাইনে সবগুলো বিল্ডিংয়ের সবতলার সবক'টা বাসার কলিংবেল বাজিয়ে বললাম, “এক টুকরো গোশত হবে?”

কোরবানীর দিন সবাই বড্ড অমায়িক দয়ালু হয়ে উঠেন। সবাই জিজ্ঞেস করে বস্তা কই?

আমি ওপরের দিকে তাকায়ে গরীব স্বরে আর্তনাদ করি, “থলে আনতে তো ভুলে গেছি ইয়া খোদায়ায়া। আমি ওই সামনের গলির ডানদিকের তিন নম্বর বিল্ডিং এর দোতলায় থাকি। কষ্ট করে...”

বিকেল চারটার দিকে আরেকটা ছোটোখাটো বিচার বসলো। রক্তপিপাসু অপমানিত লাল টুকটুকে চেহারা নিয়ে আব্বাকে বললেন, “পুরো এলাকার সবাই থলে করে গোশত পাঠাচ্ছে এইদিক ওইদিক থেকে... লজ্জায় আমি শেষ, দেড় লাখ টাকার গরু কোরবানী দিছি। আমার কোন ছেলে নাকি সবার দরজায় গিয়া এক টুকরা গোশত চাইছে। আপনি আজকেই এর বিচার করবেন.. আপনার ছেলে ছাড়া আর কারোর কাজ না এটা!”

মেশকাত রাতে দেখতে এলো। আমায় বাসায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি জানালার শিকের ভেতর দিয়েই হাত ঢুকিয়ে কষে কান চেপে ধরে টানতে টানতে জিজ্ঞেস করলাম, “মেয়েটার নাম তানিয়া নাকি মেয়েটার আম্মার নাম তানিয়া?”

মেশকাত ব্যথায় মুখ বিকৃত করে বললো, “মাই মিসটেক দোস্ত। মেয়েটার নাম জেনেছি। কবিতা। মায়ের মতোন মেয়েটার কাঁধেও তিল। জেনেটিক সৌন্দর্য!”

আমি বিশ্বাস করলাম না। মেশকাত গরুর মাংসের কসম করে বললো, “এবার হান্ড্রেন্ড পার্সেন্ট সত্যি।”

জানালার শিক মচকে বের হয়ে এলাম।

কবিতার জন্য কবিতা লিখতে হবে।

বাসার নিচে ঘুরঘুর করছি। মেশকাত ভাবছে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললো, “কেরোসিন আনবো আমি দৌঁড়ে গিয়ে। তুই গায়ে মেখে দেয়াশলাই হাতে দাঁড়িয়ে থাকবি। আর চিৎকার করে বলবি... কবিতা, আই লাভ ইউ। উইল ইউ ম্যারি মি? না বললেই দেওয়াশলাই কাঠি ঘষে ঘষে ভয় দেখাবি...”

আমি পিঠ চাপড়ে দিলাম, দুর্দান্ত! কিন্তু কেরোসিন? আমার ভয় হলো ভুলে যদি দেয়াশলাই কাঠি ঘষার সাথে সাথে জ্বলে উঠে। মেশকাত চোখ টিপে বললো, “সত্যি সত্যি কেরোসিন দিব নাকি গাধা?”

রাত সাড়ে দশটা।

সবাই সাদা রুটি আর মাংসের ঝোল খেয়ে শুয়েছে সারাদিনের পরিশ্রম শেষে। হুট করেই চিৎকার চেঁচামেচিতে লাফিয়ে উঠলো...

আমি ভেজা গায়ে দাঁড়িয়ে আছি, হাতে দেয়াশলাই বক্স। চিৎকার করছে মেশকাত।

“ওহ আল্লাহ রে... কি করতেছে দেখেন আপনারা, ছেলেটা মারা যাবে। ওর সারা গায়ে কেরোসিন। কেউ কাছে যাবেন না প্লিজ, দূরত্ব রাখুন... এক পা এগোলেই ঘষা দেবে...”

কবিতার আম্মা তানিয়া আন্টি, তানিয়ার আন্টির হাজবেন্ড রক্তপিপাসুসহ আশেপাশের সব লোকজন বের হয়ে পড়েছে। বিরাট একটা গোলযোগ হচ্ছে। মেশকাতকে দেখলাম লাঠি হাতে ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করছে।

এইরকম সিচুয়েশনে অটো ভলান্টিয়ার তৈরি হয়ে যায়।

মেশকাতের সাথে সাথে দেখলাম আরো বেশ কয়েকজন লাঠি হাতে নিয়েছে। কিছু মুরুব্বিগোছের লোক আর্দ্র স্বরে জিজ্ঞেস করলো, “কী চাও বাবা তুমি?”

কয়েকজন মহল্লার নেতাগোছের লোক বিষয়টা সরকার এবং রাজনৈতিক চ্যাপ্টারে ঢুকায়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো।

আমি চিৎকার করলাম, “কবিতা। কবিতাকে ভালোবাসি। কবিতাকে ডাকুন... এ্যাই কবিতা, তুমি শুনতে পাচ্ছো...? আই লাভ ইউ, উইল ইউ ম্যারি মি?”

তানিয়া আন্টির মুখ লালচে হয়ে উঠলো। রক্তপিপাসু মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলালেন নিজেকে। মেশকাত মাথা চুলকে জিভে কামড় দিয়ে একটু পাশ ঘেঁষে ফিসফিস করে বললো, “সর্বনাশ হইছে দোস্ত, মাই মিসটেক। কবিতা মেইবি মেয়েটির আম্মুর ডাকনাম। মেয়েটির নাম মেইবি ববিতা। তাও সিউর নাহ... কি যে জ্বালা, ভুলোমনা স্বভাব আমার। টেনশন নিস না, নামে কিই বা এসে যায়! আল্লাহর নাম নিয়ে দম ধরে দাঁড়িয়ে থাক, যা হবার হবে।”

আমার হাত পা কাঁপতে লাগলো। গর্দভটারে কে বুঝাবে ‘নামে কতকিছু যে এসে যায়’- এক ছুটে পালাবো নাকি ভাবছি। উপায় নেই। চারোপাশে এত ভীড়। কোনো ফাঁক-ফোকর রাখেনি হারামজাদারা। বেঁচে থাকলে মেশকাইত্তার শুকনা চেহারাটা থাবড়াতে থাবড়াতে রঙিন করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ।

রক্তপিপাসু লাল চোখে তাকিয়ে আছে। আমি দেয়াশলাই কাঠি না জ্বালালে এই লোকই দেয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে মারবে।

এই সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল!

মেয়েটি নেমে এলো। ঘুম ঘুম চোখ। রক্তপিপাসুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, “বাবা, ভেতরে যাও।”

চারপাশে ভিড়ভাট্টার দিকে কড়া দৃষ্টি রেখে চিৎকার করলো, “যান আপনারা, এখানে কী হচ্ছে? সার্কাস। গেলেন নাকি পুলিশ ডাকবো?”

আমি ভেজা গায়ে থরথর করে কাঁপছি। ভাল্লুক আসলে বন্ধু গাছে উঠে... আমার বন্ধু মেশকাত কেটে পড়েছে অন্য সবার সাথে। মুহূর্তেই শশ্মানের নীরবতা নেমে এলো রাস্তায়। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে বললো, “হাত ধরুন। পানির সাথে রঙ মিশালেই কেরোসিন বলে বিশ্বাস করবে না লোকে, সামনের বার গন্ধটাও মাথায় রাখবেন। গোসল করে কাপড় পাল্টে নিন এখন, ঠাণ্ডা লাগবে...”

মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগছে, খুব জোরে একটা লাফ দিতে গিয়ে সামলালাম নিজেকে। কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার নামটা?”

মেয়েটি মিষ্টি করে হাসলো। যেন হাসির দমকেই কয়েকশত চুল সরে গেল হাওয়ায়; নগ্ন বাম কাঁধে থোকা থোকা সৌন্দর্য- এক ফোঁটা তিল। টের পেলাম পৃথিবী দুলছে। এই মেয়েটির বাম কাঁধের তিল হওয়া চাই আমার! হোক নাম তানিয়া, কবিতা, ববিতা, শাবানা... নামে কিই বা এসে যায়!

কোভিড – ১৯: সচেতনতা, করণীয় ও কিছু এড়িয়ে যাওয়া বিষয়

ডা. অসীম পিয়াস, এম.বি.বি.এস.

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত গোটা বিশ্ব। বৈশ্বিক মহামারী নামক সম্পূর্ণ নতুন এক জিনিস প্রত্যক্ষ করছি আমরা। এতদিন এই সম্পর্কে সাধারণ সব কিছুই প্রায় জানা হয়ে গিয়েছে সচেতন সকলেরই। আমি তাই সংক্ষেপেই কিছু ব্যাপার তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

***কীভাবে বুঝবেন আপনি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত?**

কোভিড-১৯ এর সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গ হলো শুকনো কাশি, দুর্বলতা এবং জ্বর। কারো কারো নিউমোনিয়ার মতো গুরুতর অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে।

তবে কোভিড-১৯ আক্রান্ত কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার একমাত্র উপায় হলো ল্যাবরেটরি টেস্ট।

অনেকে বলেন যে কেউ যদি ১০ সেকেন্ডের জন্য দম বন্ধ করে রাখে, আর এই সময়ে তার কোনো কাশি বা শ্বাসকষ্ট না হয়, তাহলে তার করোনা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য।

***করোনা ভাইরাস ছড়ায় ড্রপলেটের মাধ্যমে।**

যে ভাইরাস দিয়ে কোভিড-১৯ ছড়ায়, সেটি আক্রান্ত ব্যক্তি যখন কথা বলে, কাশে বা হাঁচি দেয়, তাহলে মুখ নিঃসৃত ড্রপলেট (শ্লেষ্মা) দিয়ে সুস্থ্য ব্যক্তির দেহে ছড়াতে পারে। এই ড্রপলেটগুলো যথেষ্ট ভারি, তাই কিছুক্ষণ পরেই মেঝে বা অন্য কিছুর উপরে পড়ে যায়। ১ মিটার বা ৩ ফুট পর্যন্ত বাতাসে ভাসে এগুলো।

***করোনা থেকে নিজে বাঁচা এবং নিজের প্রিয়জনকে রক্ষা করার উপায়:**

- বেশি বেশি হাত ধোবেন।

কখন?

- হাঁচি বা কাশি দেওয়ার পরে
- রোগীর যত্ন করার পরে
- রান্নার শুরুতে, সময়ে এবং শেষে
- খাওয়ার আগে
- টয়লেট ব্যবহারের আগে ও পরে
- যখন হাতে নোংরা দেখা যাবে
- কোনো পশু বা পশুর বর্জ্য ধরলে
- হাঁচি বা কাশি আসলে কনুই দিয়ে আটকাবেন, হাত দিয়ে না।

- চোখ, নাক এবং মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।
- ভীড় এড়িয়ে চলুন, না পারলে যতটা কম পারেন অবস্থান করবেন।
- অসুস্থ ব্যক্তির সান্নিধ্যে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- যেসকল জিনিস প্রায়শই স্পর্শ করা লাগে সেগুলোকে বারবার পরিষ্কার করুন।

***সঠিকভাবে হাত ধোয়ার নিয়ম**

***কিছু কিছু রোগ থাকলে আপনার করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় :**

- উচ্চ রক্তচাপ
- ডায়বেটিস
- হৃদরোগ
- হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক
- দীর্ঘকালীন শ্বসনতন্ত্রের রোগ
- ক্যান্সার

কিছু সাধারণ জিজ্ঞাসার জবাব

***আপনি নিজে করোনা আক্রান্ত হলে কী করবেন?**

- আপনার যদি জ্বর এবং কাশি হয় তাহলে বারবার সাবার না অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণুনাশক দিয়ে হাত ধুতে থাকুন।

- বাড়িতেই থাকুন। কাজে, স্কুলে বা কোনো পাবলিক প্লেসে যাবেন না। বিশ্রাম নিন, প্রচুর তরল খান এবং পুষ্টিকর খাবার খান।

- পরিবারের বাকিদের থেকে আলাদা একটা ঘরে থাকুন, যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সবসময় একটা সার্জিক্যাল মাস্ক পরুন এবং বাকিদের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখবেন। ঘরটায় যেন বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা থাকে আর সম্ভব হলে আলাদা বাথরুম ব্যবহার করবেন।

- কাশি বা হাঁচি দেওয়ার সময় অবশ্যই শক্ত করে কনুই চেপে ধরবেন মুখে বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করে পরে ফেলে দেবেন সেটা। যদি শ্বাস নিতে সমস্যা হয় তাহলে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

***আপনার বাসায় যদি কোনো করোনা আক্রান্ত থেকে থাকে, তাহলে কী করবেন?**

- নিশ্চিত করবেন যেন আক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তি পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায়, প্রচুর তরল পদার্থ খায় আর পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে।

- রোগীর সাথে একই ঘরে অবস্থান কালে অবশ্যই মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক পরবেন। ব্যবহারের সময় কখনোই মাস্ক বা মুখে স্পর্শ করবেন না এবং ব্যবহার শেষে ফেলে দেবেন।

- কিছুক্ষণ পর পরই সাবান বা অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণু পরিস্কারক দিয়ে হায় ধোবেন। বিশেষ করে – আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যেকোনো ধরনের সংস্পর্শে আসলে

- খাবার তৈরির আগে, সময় ও পরে।

- খাওয়ার আগে

- টয়লেট ব্যবহারের পরে

- রোগীর জন্য আলাদা থালা, কাপ, খাওয়ার বাসন, তোয়ালে এবং বিছানার চাদর ব্যবহার করবেন। রোগির ব্যবহৃত যেকোনো কিছুই অবশ্যই সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবেন।

- রোগী প্রায়শই স্পর্শ করে এমন জায়গা চিহ্নিত করুন আর নিয়মিত সেই জায়গা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করুন।

- রোগীর অবস্থা যদি খারাপ হয়ে যায়, বা যদি শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তাহলে সাথে সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

***বাইরে বের হলে রাবার গ্লাভস পরে থাকলেই কি আমি নিরাপদ?**

- না, বরং বার বার হাত ধোয়া-ই আপনাকে করোনা থেকে অধিক নিরাপদ রাখবে। কারণ আপনি গ্লোভস পরা হাতে যদি ভুল করে মুখ স্পর্শ করে ফেলেন তাহলেও আপনি করোনা আক্রান্ত হতে পারেন।

***যদি আপনাকে বাসায় বা অন্য কোথাও কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়, তাহলে কী করবেন?**

- মানসিক চাপের এই সময়টায় আপনার নিজের প্রয়োজন এবং অনুভূতির প্রতি জোর দিন।
- যে সমস্ত স্বাস্থ্য রক্ষার কর্মকান্ড আপনার ভালো লাগে এবং মানসিক চাপ দূর করে সেসবে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। ঘরের কাজে মন দিন, নতুন কোনো দক্ষতা শিখে নিতে পারেন।
- নিয়মিত ব্যয়াম করুন, সময় মতো ঘুমান এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খান। সহজে করা যায় এমন সব ব্যায়ামের অভ্যাস করুন, এতে আপনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারবেন এবং বিরক্তি দূর হবে।
- পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সবকিছু করবেন।

***কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েও বুকের দুধ খাওয়ানো যাবে। তবে খেয়াল রাখবেন:**

- সবসময় আপনার শ্বসনতন্ত্র (নাক, গলা, মুখের ভিতর) পরিষ্কার রাখবেন।
- মাস্ক পরে নেবেন।
- বাচ্চাকে ধরার আগে ও পরে অবশ্যই হাত ধুয়ে নেবেন।
- নিয়মিত বাচ্চাকে রাখার জায়গাটা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখবেন।

***ঘরে বসে কাজ করেন যারা তারা যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন:**

- নিজের বসার ভঙ্গীর দিকে নজর রাখুন।
- কাজ করার সময় বা ফোনে কথা বলার সময় বা টিভি দেখার সময়, মাঝে মাঝেই বসা থেকে উঠে দাঁড়ান কিছু সময়ের জন্য।
- বড়োরা কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম করবেন। [বাচ্চারা কমপক্ষে ১ ঘণ্টা]

***ঘরে বসেই অ্যাকটিভ থাকতে যা করতে পারেন :**

- সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা
- অনলাইন ব্যায়ামের ক্লাস, কিছু হাত পা ছড়ানো ব্যায়াম করুন
- কয়েক মিনিট সঙ্গীতের তালে নাচতে পারেন
- অনলাইন ঘেটে অন্যদের থেকেও নানান বুদ্ধি নিতে পারেন
- নাড়াচাড়া করতে হয় এমন ভিডিও গেমস
- দড়ি লাফ খেলা
- শক্তি বর্ধক কিছু ট্রেনিং

-বাসায় থাকলে মেডিটেশন, ডিপ ব্রেদিং এবং রিলাক্সিং-এর অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।

***কাপড় এবং বিছানার চাদর দিয়ে যেন করোনা না ছড়ায় সেটা নিশ্চিত করবো কীভাবে?**

- আপনার দেহের সাথে চেপে রেখে কাপড় সরাবেন না।
- গরম (৬০-৯০০ সেন্টিগ্রেড) পানি দিয়ে ধৌত করবেন সেসব। সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন।
- যদি সম্ভব হয় ব্লিচ ব্যবহার করবেন। প্যাকেটের গায়েই নিয়মাবলি পাবেন।
- কাপড় মেশিনে শুকালে উচ্চ তাপমাত্রায়, আর নাহলে সরাসরি রোদে শুকাবেন।

***কোভিড-১৯ এর সময়ে কীভাবে আমি নিরাপদে বাজার করবো?**

- বাজার করার সময় অন্যদের চাইতে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখবেন, এবং নিজের চোখ, নাক মুখ স্পর্শ করবেন না।
- সম্ভব হলে শপিং ব্যাগ, ট্রলি বা বাস্কেটের হাতল স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেবেন।
- বাসায় ফেরামাত্র ভালো করে হাত ধুয়ে নেবেন, তারপর আপনার বাজার জায়গামতো রখার পরেও হাত আবার ধোবেন।
- কোনো খাবার বা খাবারের মোড়ক থেকে এখনও কোভিড-১৯ ছড়ানোর এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

***কোভিড-১৯ এর সময়ে কীভাবে আমি ফলমূল বা সবজি পরিষ্কার করবো?**

- অন্য সময়ে যেভাবে পরিষ্কার করেন সেভাবেই ধুয়ে নিন।
- ওগুলো ধরার আগে সাবান আর পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন।
- তারপর আবার ওগুলোকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন, বিশেষ করে যদি কাঁচা খেতে চান।

***কোভিড-১৯ এর সময়ে কীভাবে আমি কাপড় বা তোয়ালে আর বিছানার চাদর ধুবো? বিশেষ করে আমার ঘরেই যদি কেউ আক্রান্ত থাকে?**

- রোগীর কাপড়, তোয়ালে আর বিছানার চাদর আলাদাভাবে ধুতে হবে।
- যদি সম্ভব হয়, তাহলে ওগুলো ধরার আগে হেভি-ডিউটি গ্লোভস পরে নেবেন।
- কখনোই শরীরের সাথে চেপে ধরে ব্যবহৃত কাপড় সরাবেন না; ব্যবহৃত কাপড়কে একটা পরিষ্কার, ছিদ্রবিহীন কোনো ব্যাগ বা বালতিতে বহন করবেন।
- যদি কঠিন কোনো বর্জ্য হয় (পায়খানা বা বমি) তাহলে তা একটা শক্ত, চ্যাপ্টা কিছু দিয়ে তুলে ফেলে রোগীর ব্যবহৃত টয়লেটে ফেলে দেবেন, তারপর কাপড়কে ব্যাগে বা বালতিতে রাখবেন। যদি রোগীর ঘরের বাইরে ঘটে এমন কিছু, তাহলে বর্জ্যটাকে ঢাকনাওয়ালা কোনো বালতিতে রেখে টয়লেটে নিয়ে যাবেন।
- ব্যবহৃত কাপড়কে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেবেন: মেশিনে হলে ডিটারজেন্ট দিয়ে ৬০-৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। তা নে হলে, একটা বড়ো গামলায় গরম পানিতে ভেজাবেন কাপড়, একটা কাঠি নিয়ে নাড়বেন, পানি যেন ছলকে না ওঠে। যদি গরম পানি না পান, তাহলে ০.০৫% ক্লোরিন দ্রবণে ৩০ মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখবেন। পরিষ্কার পানি দিয়ে এরপর ধুয়ে রোদে শুকাতে দেবেন।
- সব শেষে নিজের হাত ধুতে ভুলবেন না।

কিছু ভুল ধারণা

***রোদে গেলে বা ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে কি করোনা ছড়ায় না?**

- আবহাওয়া যতো গরমই হোক না কেনো, আপনি করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন। গরম আবহাওয়া সম্পন্ন দেশেও করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। করোনা থেকে বাঁচতে সচেতন থাকুন।

***মিথানল, ইথানল বা ব্লিচ খেলে কি কোভিড-১৯ থেকে বাঁচা যাবে?**

- মিথানল, ইথানল এবং ব্লিচ বিষাক্ত পদার্থ। এসব পান করলে শারীরিক অসুস্থতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এগুলো দিয়ে আপনি আপনার ঘর পরিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু কখনোই পান করবেন না।

***ব্লিচ বা অন্য কোনো জীবাণুনাশক নিজের গায়ে স্প্রে করলে বা ঢুকিয়ে দিলে কি কোভিড-১৯ থেকে বাঁচা যাবে?**

- কক্ষনো না। কোনো অবস্থাতেই এই কাজ করতে যাবেন না। এই পদার্থগুলো বিষাক্ত। তাই নিঃশ্বাস বা অন্য কোনোভাবে শরীরে প্রবেশ করলে আপনার ক্ষতি হতে পারে। এগুলো শুধু কোনো জিনিসের উপরিভাগ পরিস্কারের কাজে ব্যবহার করবেন। আর অবশ্যই বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখবেন।

***৫জি মোবাইল নেটওয়ার্ক দিয়ে কোভিড-১৯ ছড়ায় কি?**

- ভাইরাস রেডিও তরঙ্গ/ মোবাইল নেটওয়ার্ক দিয়ে ছড়াতে পারে না। এমন অনেক দেশেই কোভিড-১৯ আছে যাদের ৫জি নেটওয়ার্ক নেই।

***কোভিড-১৯ কি টাকা বা কয়েন দিয়ে ছড়াতে পারে?**

- এই ব্যাপারে বর্তমানে এখনও কোনো প্রমাণ বা বিরুদ্ধেও কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। তবে কোভিড-১৯ এর ড্রপলেট যেকোনো কিছুর গায়ে লেগে থাকতে পারে। তাই টাকা ও কয়েন ধরার পরে অবশ্যই হাত ধোবেন।

***কোভিড-১৯ এর জন্য কি কোনো ওষুধ আছে?**

- এখন পর্যন্ত (১০ মে, ১৯) কোভিড-১৯ এর জন্য কোনো ওষুধের লাইসেন্স হয়নি। তবে বেশ কিছু ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। হাইড্রোক্সিক্লোরকুইন নিয়ে কিছু গুজব শোনা গেলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের অপব্যবহার নানান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

***আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি কি ভাইরাস মারতে পারবে?**

- না। আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প আপনার হাত বা শরীরের অন্য কোনো অংশে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এটা আপনার ত্বক ও চোখের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। সাবান বা অ্যালকোহলযুক্ত জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন।

কোভিড-১৯ ও মানসিক চাপ

রোগের আতংক, বাসায় থাকতে থাকতে বিরক্তিভাবসহ নানান কারণে এই সময়ে যে কেউই মানসিক চাপে আক্রান্ত হতে পারেন, এবং এর নানান উপসর্গ মানসিক এবং শারীরিক দুইভাবেই

প্রকাশিত হতে পারে। এমনকি তা ঘরের ভিতরে ভায়োলেন্সে পর্যন্ত গড়াতে পারে। বিশেষ করে মহিলারা এমন সময়ে নিগৃহীত হতে পারেন অহরহই।

তবে মনে রাখবেন, এই সময়ে ভয় পাওয়া বা উদ্বিগ্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। আপনার অনুভূতির ব্যাপারে অন্যের সাথে কথা বলুন এতে আপনার দুশ্চিন্তা কমবে। কারণ আপনি একা নন, আরও অনেক মানুষ এখন এই সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম করছে।

***স্ট্রেস এর শারীরিক লক্ষণ:**

- মাথা ব্যথা
- ক্ষুধা না লাগা
- ঘাড় বা কাঁধ ব্যথা
- গলায় কিছু একটা বেঁধে থাকা মনে হওয়া
- পিঠ ব্যথা
- বুক ভারি লাগা
- পেট খারাপ হওয়া
- পেশী টানটান লাগা

***স্ট্রেস-এ সাথে সম্পর্কিত কিছু আচরণ:**

- নিজেকে সব কিছুতে দোষারোপ করা
- জীবনকে কঠিন মনে হওয়া
- সহজেই তর্ক বা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া
- ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা

***স্ট্রেসের সাথে মানিয়ে নেওয়ার কিছু বাস্তবিক উপায়:**

১- নিজেকে শান্ত করুন : যখন প্রবল আবেগী ঝড় বয়ে যাবে মনের ভিতরে, তখন খেয়াল করবেন যে আসলে আপনার কেমন লাগছে। উড়ু উড়ু মনকে আবার শরীরের সাথে সংযুক্ত করুন। আপনার আশেপাশের দুনিয়ার সাথে যুক্ত হোন।

২- নিজেকে ছাড়িয়ে নিন : আপনার ভাবনা চিন্তা আর আবেগকে নাম ধরে ধরে পৃথক করুন, তারপর আবার যা করছিলেম তাতে মন দিন।

৩- নিজের প্রতি যত্নশীল হোন : নিজদের প্রতি খেয়াল রাখাটাও স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। আমরা যদি নিজেদের যত্ন নেই, তাহলে অন্যকে সাহায্য করার শক্তি আমরা পাবো, ফলে সবাইই উপকৃত হবে।

***যদি এই সময়ে কোনো মহিলা ঘরে কোনো ধরনের ভায়োলেন্সের স্বীকার হন, তাহলে কী করবেন?**

- একজন আত্মীয়, প্রতিবেশি বা বন্ধু নির্দিষ্ট করে রাখুন যার কাছে আপনি যেতে পারবেন।
- কীভাবে ওখানে যাবেন সেটাও ঠিক করে রাখবেন।
- আপনার অতি প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে রাখবে যাতে নিয়ে যেতে পারেন।
- ঝামেলা শুরু হলে আপনার কাছে বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ করুন আগে।

- স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করুন।

কোভিড-১৯ কালীন সময়ে বাচ্চা পালন

***একত্রে সময় কাটান**

কাজে যেতে পারছেন না? স্কুল বন্ধ? টাকা পয়সা নিয়ে দুশ্চিন্তা? এই সময়ে মানসিক চাপে ভোগা বা বিহ্বল হয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

তবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়াটা কিন্তু আপনার বাচ্চা বা টিনেজার ছেলেমেয়ের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলার একটা বড়ো উপায়। আপনি তার সাথে সময় কাটান, এতে করে আপনার সন্তান নিজেকে সুরক্ষিত ভাববে, এতে করে তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো হবে আর ওরাও নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভাববে।

প্রতিটা সন্তানের সাথে কাটানোর জন্য আলাদা সময় রাখুন। হতে পারে এটা শুধু ২০ মিনিটের জন্য, বা অনেক বেশি- সেটা আমাদের ব্যাপার। আবার এটা হতে পারে প্রতিদিন একই সময়ে, যাতে আপনার সন্তান সময়টার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

সন্তানকে জিজ্ঞেস করেন যে ওরা কি করতে চায়। সিদ্ধান্ত নিতে দিলে সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। যদি ওরা এমন কিছু করতে চায় যেটা সামাজিক দূরত্ব মেনে করা সম্ভব না, তাহলে ওদের সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করেন।

আপনার নিতান্ত বাচ্চার সাথে যা করতে পারেন :

-ওদের মুখভঙ্গি আর শব্দ নকল করেন

- গান শুনাতে পারেন, বা চামচ বাটি ইত্যাদি দিয়ে শব্দ করে শোনাতে পারেন।

- কাগজের কফির কাপ বা বক্স গাদা করতে পারেন।

- গল্প বলতে পারেন, বই পড়ে শোনাতে পারেন না ছবি দেখাতে পারেন।

আপনার বড়ো বাচ্চার সাথে যা করতে পারেন :

- বই পড়ে শোনান বা ছবি দেখেন

- ক্রেয়ন বা পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকেন।

- সঙ্গীতের তালে নাচেন বা গান গাইতে পারেন।

- ঘরের যে কোনো একটা কাজ একত্রে করেন- ঘর পরিষ্কার করা আর রান্নাকে একটা খেলায় পরিণত করুন।

- স্কুলে কাজে সাহায্য করেন।

আপনার টিনেরজার সন্তানের সাথে যা করতে পারেন :

- ওদের পছন্দের কোনো বিষয়ে আলাপ করেন, যেমন: খেলাধুলা, সঙ্গীত, সেলেব্রেটি, বন্ধুবান্ধব।

- একসাথে পছন্দসই কোনো খাবার রান্না করেন।

- পছন্দের সঙ্গীত চালু করে শরীরচর্চা করেন।

- টিভি মোবাইল বন্ধ রাখুন। এখন ভাইরাস মুক্ত সময়।

ওদের কথা শোনেন, ওদের দিকে দেখেন। আপনার পূর্ণ মনোযোগ দিন ওদের দিকে। উপভোগ করুন।

***সবকিছু পজিটিভ রাখুন।**

যদি দেখা যায় যে বাচ্চারা নানান উপায়ে আমাদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে, তাহলে আসলে পজিটিভ থাকাটা বেশ দুঃসাধ্য। আমরা হয়তো বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বসি ওদেরকে, তবে বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় যে যদি আমরা ওদেরকে দিয়ে যা করাতে চাই সেই ব্যাপারে যথেষ্ট পজিটিভ ধারণা দেই, আর কাজ করার পর প্রচুর প্রশংসা করি তাহলে ওরা সেই কাজটা ঠিকভাবে করে।

আপনি যে আচরণ দেখতে চান সেটা ওদেরকে বলুন

কি করতে হবে সেটা বলার সময়ে পজিটিভ শব্দ ব্যবহার করুন; যেমন: প্লিজ তোমার কাপড় গুছিয়ে রাখো। (কাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখো না তো- এভাবে না।)

পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে আপনার বাচনভঙ্গির ওপরে

বাচ্চার সাথে চেঁচামেচি করলে আপনার আর তার দুজনেরই মানসিক চাপ বাড়বে, আর রাগও হবে বেশি। বাচ্চার নাম ধরে ডেকে এনে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে বলে দিন কি করতে হবে।

অবাস্তব কিছু বলবেন না

আপনি যা করতে বলছেন, সেটি কি আপনার বাচ্চা আসলেই করতে পারবে? যেমন ধরে একটা বাচ্চার জন্য সারাটা দিনই চুপ করে থাকা সম্ভব না কিন্তু ধরেন আপনি ফোনে কথা বলছেন, তখন ওরা ১৫ মিনিট চুপ থাকতে পারবে।

ওরা যখন ভালো আচরণ করতে থাকবে তখন ওদের প্রশংসা করুন

আপনার বাচ্চা বা টিনেজার যে কাজটাই ভালোভাবে করবে সেটার মন খুলে প্রশংসা করুন। ওরা হয়তো আপনাকে দেখাবে না, কিন্তু খেয়াল করলে দেখবে ঐ ভালো কাজটা সে আবার করছে। এটা এদেরকে এটাও নিশ্চিত করবে যে আপনি ওদেরকে খেয়াল করেন আর কেয়ার করেন।

আপনার টিনেজার সন্তানকে সবার সাথে যোগাযোগ করতে দিন

টিনেজারদেরকে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়। আপনার সন্তানকে সোশ্যাল মিডিয়া বা নিরাপদ দূরত্ব রেখে অন্যান্য মাধ্যমে যোগাযোগ করতে দিন। এই কাজটাও কিন্তু আপনারা একত্রেই করতে পারেন!

***রুটিন মেনে চলুন হোন**

কোভিড-১৯ আমাদের দৈনন্দিন জীবন, বাড়ি আর স্কুলের রুটিনকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ব্যাপারটা বাচ্চা, টিনেজার বা আপনার জন্যেও বেশ কঠিন। তাই নতুন রুটিন করে নিলে সেটা ভালো কাজে দিতে পারে।

একটা পালনে সহজ কিন্তু নিয়মিত দৈনন্দিন রুটিন করে নিন

- আপনার নিজের এবং নিজের বাচ্চার জন্য একটা সময়সূচী বানিয়ে নিন, যেখানে কাঠামোবদ্ধ নানান পরিকল্পনা আর অবসর সময় ভাগ করা থাকবে। এতে করে বাচ্চারা আরও বেশি নিরাপদ অনুভব করবে আর তাদের আচরণও উন্নত হবে।
- দিনের পরিকল্পনা করার জন্য বাচ্চারা আর টিনেজাররাই সাহায্য করতে পারে- যেমন স্কুলের সময়সূচী বানানো। বাচ্চারা নিজেরাই যদি বানায়, তাহলে ওরা সেটা পালনে আরও বেশি আগ্রহী হবে।
- প্রতিদিনের কর্মপরিকল্পনায় অবশ্যই ব্যায়াম রাখবেন- এতে করে মানসিক চাপ কমে এবং বেশি চঞ্চল বাচ্চারাও কিছু করার সুযোগ পায়।

আপনার বাচ্চাকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা শেখান

- যদি আপনার এলাকায় সম্ভব হয় তো বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে যান।
- আপনি চাইলে ছবি এঁকে বা পোস্টার লিখে লোকজনের সাথে শেয়ার করতে পারেন। বা বাসার বাইরে টাঙ্গিয়ে রাখতে পারেন যাতে লোকজন দেখে।
- কীভাবে আপনারা নিজেরদেরকে নিরাপদ রাখছেন সেই ব্যাপারে আপনার বাচ্চার সাথে আলাপ করে তাকে নিশ্চিত করতে পারেন। তাদের কাছে থেকেও পরামর্শ নিন এবং সেগুলোও প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন।

হাত ধোঁয়া আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে মজার একটা কাজে পরিণত করুন

- একটা ২০ সেকেন্ডের কবিতা বা গান নির্বাচন করুন, যেটা হাত ধোঁয়ার সময় গাওয়া হবে। এর সাথেও আরও কোনো কাজ জুড়ে দিন! যেমন নিয়মিত হাত ধোয়ার জন্য বাচ্চাকে প্রশংসা করুন ও পয়েন্ট দিন যা ভিত্তিতে সে পরে পুরষ্কার পাবে।
- একটা খেলা চালু করতে পারেন যে ঘরের কে সবচেয়ে বেশিক্ষণ মুখ স্পর্শ না করে থাকতে পারে। যে সবচেয়ে কম স্পর্শ করবে সে পুরষ্কার পাবে। (একজন আর একজনেরটা গননা করতে পারে)

আপনার বাচ্চার আচরণের জন্য আপনিই রোল মডেল

আপনি নিজে যদি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন আর পরিষ্কার পরিচ্ছনতা বজায় রাখেন, বাকিদের সাথে সহানুভূতি দেখিয়ে চলেন, বিশেষ করে যারা অসুস্থ এবং দুর্বল- আপনার সন্তানও আপনার কাছে থেকেই শিখবে।

প্রতিটা দিনের শেষেই একটু সময় নিয়ে ভাবুন যে দিনটা কেমন গেল। আপনার বাচ্চাকে বলুন যে আজকে সে কোনো ভালো বা মজার কাজ করেছে।

আপনার নিজেকেও বাহবা দিন আজকে আপনি যা যা করলেন সেসবের জন্য।

অয়েল পেইন্টিং

মনিরা প্রীতু

পেইন্টিংটা দেখেই ছবির মেয়েটার প্রতি এক ধরনের মায়া জন্মে গেল জেরিনের। কিন্তু পেইন্টিংটা কেনার মতো টাকা তার কাছে এখন নেই।

মফস্বল থেকে ঢাকায় এসেছে সে বেশি দিন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকায় একটি কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছে। থাকছে আপাতত ফুপুর বাসায়। চারুকলা, নাট্যকলার প্রতি তার অনুরাগ সেই ছোটো থেকে। জেরিনের অনেক দিনের শখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তমঞ্চ অনুষ্ঠিত মঞ্চ নাটক দেখবে। পত্রপত্রিকায় আর টেলিভিশনে যখন নাটক মঞ্চস্থ হবার খবর প্রকাশ পেত অথবা বিজ্ঞাপন দিত তখন তার ভীষণ রকম ইচ্ছে হতো একবারের জন্য হলেও একটি নাটক দেখার, কাছ থেকে কলাকুশলীদের অভিনয়শিল্প প্রত্যক্ষ করার। এখনো পর্যন্ত তাদের নাটক দেখার সুযোগ না পেলেও তাদের আঁকা ছবিগুলো দেখার ইচ্ছেটা পূরণ হয়েছে আজ।

ছবি আঁকার এক্সিবিশনে এসেছে সে। খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখছে। প্রত্যেকটি ছবি তার জন্য নতুন নতুন একটি অধ্যায় তৈরি করছে, একেকটা ছবিতে শিল্পীর মনের যতটুকু আবেগ অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে, সে যেন কল্পনার ঘোড়ায় চেপে এরচেয়েও বেশি দেখতে পাচ্ছে। জেরিন এতটাই মনোযোগী দর্শক যে, প্রতিটি ছবি থেকে সে নিজেই একটি করে গল্প বানাচ্ছে। বিকেল পাঁচটার দিকে এসেছে, তিন ঘণ্টা যাবত এভাবেই ঘুরে ঘুরে সময় নিয়ে ছবি দেখছিল সে।

প্রত্যেকটি ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একটি ছবিতে চোখ আটকে যায় তার। খুবই সুন্দর একটি ছবি। সাদা ফ্রক পরা একটি মেয়ে কামরাঙ্গা গাছের মতো মাঝারি মাপের একটি গাছের নিচে মন খারাপ করে বসে আছে। তার হাতে একটি ফুলের ঝুড়ি। ঝুড়িতে কোনো ফুল নেই। মেয়েটির মাথায় ফুল পাতা দিয়ে বানানো মুকুট। মনে হয় ঝুড়িতে তোলা ফুলগুলো দিয়েই মাথায় পরা মুকুটটা বানানো হয়েছে। তাই ঝুড়িটা খালি। জেরিন মেয়েটিকে মিলিয়ে নিল সানস অ্যান্ড লাভারস-এর মিরিয়াম-এর সাথে। মিরিয়াম তার প্রেমিকের হাত ধরে প্রতিদিন বিকেলে ফুল কুড়াতে যেত। কিন্তু মিরিয়াম তো সেই সময়টাতে অনেক উচ্ছ্বসিত থাকত। ছবির এই মেয়েটির মতো এত মন খারাপ ছিল না। ডেনমার্কের বিষণ্ণ যুবরাজ হ্যামলেটের কথা পড়েছে জেরিন বইতে, কিন্তু এমন বিষণ্ণ রাজকুমারীর সাথে তার এই প্রথম দেখা।

মেয়েটির জন্য মমত্ববোধ থেকে আবেগের পরিমাণ বেড়ে একটা অদ্ভুত ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল জেরিনের। তার মনে হচ্ছিল যদি মেয়েটিকে সে বাসায় নিয়ে যেতে পারতো, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে বলতো– মন খারাপ করো না, এই যে আমি আছি, অনেক অনেক ফুল এনে তোমার ঝুড়িটা ভর্তি করে দেবো। কিন্তু সে যে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে নিজেকেই। নিজের কাছে যাতায়াতের ভাড়াটুকু ছাড়া আর কোনো টাকা নেই। পেইন্টিং কেনার টাকা আসবে কোত্থেকে! আর

ফুপুকে বললে টাকা তো দেবেই না, উল্টো বিরক্ত হবে। টাকা দিয়ে ছবি কেনা এখন তার জন্য রীতিমতো অপরাধ।

ইতোমধ্যে সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাতের শুরু হলো। জেরিন বাসায় ফিরে যাবার জন্য ভাবতে ভাবতেই আবারও তাকিয়ে দেখলো পেইন্টিং'র মেয়েটার দিকে। মেয়েটাকে সে নিয়েও যেতে পারছে না, আবার রেখে যেতেও খারাপ লাগছে। কেন জানি জেরিনের খুব কান্না পেল। হয়তো মনের গহীনে লুকানো কোনো কষ্টের জন্য, অথবা এই অসহায়ত্বের জন্য। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই চোখ জলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছিল তার। ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে চোখ মুছে নিল জেরিন।

পরেরদিন আর্ট এক্সিবিশনে অংশ নেওয়া কিছু শিল্পীরা এসেছিল। ওরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। নিজেদের মনের অনেকটুকু রঙ ঢেলে তারা এঁকেছে এই ছবিগুলো। প্রতিদিন সময় না পেলেও দুই-একদিন অন্তর অন্তর কয়েকজন মিলে এসে দেখে যায় এক্সিবিশনের খুঁটিনাটি, গল্প আড্ডাও হয়ে যায় এই ফাঁকে। তেলরঙে আঁকা ছবিটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো শিল্পী নিজেই। তার নিজের হাতে সে শুধু সাদা ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়েটাকেই এঁকেছিল। পাশের নীল জামা পরা এই মেয়েটি এলো কোত্থেকে? চুল দিয়ে মুখের অর্ধেক ঢাকা পড়ে থাকায় আর পাশ ফিরে ছোট্ট মেয়েটার কাঁধ ছুয়ে থাকায় মেয়েটার মুখটা বোঝা যাচ্ছিল না। তাছাড়া চেহারা বোঝা গেলেও কেউ চিনে নিতে পারতো না মফস্বলের অজানা অচেনা বোকা জেরিনকে। হ্যাঁ, বোকাই তো! বোকা বলেই পৃথিবীর জটিল ক্যানভাসের চেয়ে ছোটো এই ক্যানভাসকেই বেছে নিয়েছে মেয়েটা।

বিদ্যুতের দৌড়

আহমদ খান হীরক

এলাকা থেকে ফোন দিয়েছে রফিক। বিদ্যুতের খবরটা শুনে বুঝলাম না এখন কী বলা, বা নিদেনপক্ষে, কী করা উচিত আসলে!

এমন আশ্চর্য ঘটনা যে বিদ্যুৎ ঘটাতে পারে, বিশ্বাসও হয় না।

বিদ্যুৎ আমাদের ক্লাসেই ছিল। তবে আমাদের বন্ধু ছিল না।

পোলিও ছিল বিদ্যুতের। একটা পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। আমরা ওকে খেপাতাম। ধাক্কা মেরে ফেলেও দিয়েছি কয়েকবার। কাঁদত না ও, হাসত! বলতো, "দোস্তো... এইবার তুলে নে না..."

আমাদের বয়েই গেছে।

আমরা ওকে তুলতাম তো না-ই; কখনো কখনো ওই অবস্থায় ওকে মাড়িয়ে দৌড়ে চলে যেতাম। ও কোনোদিন আমাদের দৌড়ে ধরতে পারত না!

তবু তার মুখে হাসিই থাকত। সব সময়।

কেঁদেছিল অবশ্য একদিন। নাইনের ক্লাস। বাংলা ব্যকরণ। ছ'মাসের সমাস সাধনার পর পড়া গেছে প্রবাদ-প্রবচনের দিকে। বাংলার বটবৃক্ষ জয়নুল স্যার বললেন, "এই প্রবাদটা দেখ... কানার নাম পদ্মলোচন... কী লোচন?"

আমরা সমস্বরে বললাম, "পদ্মলোচন!"

বটবৃক্ষ বললেন, "এইবার এইটার মানে কী? এইটার মানে তোরা কোনোদিন ভুলবি না! এইটার মানে হলো বিদ্যুৎ..."

আমরা অবাক। বিদ্যুৎ? ক্লাসের বিদ্যুৎ? সে যদি নাইনের ব্যকরণ বইয়ে ঢুকে যায় তাহলে আমাদের মরা ছাড়া গতি কী?

স্যার বলল, "বিদ্যুৎ যেমন খোঁড়া... অচল... লাফাতে পারে না, দৌড়াতে পারে... কিন্তু নাম তার কি? বিদ্যুৎ! যেন ঠিক... কানার নাম পদ্মলোচন! মনে থাকবে এইবার?"

আমরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললাম, "থাকবে স্যার! কানার নাম পদ্মলোচন... মানে বিদ্যুৎ!"

আমাদের হাসি জোর থেকে জোরতর হলো। ছাত্রদের প্রত্যুৎপন্নতা দেখে জয়নুল স্যারও মৃদু হাসলেন। আমি এক ফাঁকে দেখলাম বিদ্যুতের চোখে পানি। আমার খুব খুশি লাগল মনে মনে—শালা এইবার কানছে!

ম্যাট্রিকে বিদ্যুৎ ফেল করল। আমার নিজের সেকেন্ড ডিভিশনের দুঃখ পর্যন্ত ভুলে যাই ধরনের অবস্থা! স্কুলে না শিখলেও আরেকটা প্রবাদ তো হাটে-মাঠেই ঘুরত—ন্যাংড়া খোড়া বদের গোড়া!

বিদ্যুৎ ছিল বদের গোড়া! কিন্তু ঠিক কী যে তার বদগিরি তা অবশ্য কোনোদিন বের করতে পারিনি।

আর ম্যাট্রিক দেয়নি বিদ্যুৎ। স্কুলও যায়নি, কলেজও।

আমরা যখন কলেজে ছাত্ররাজনীতির নামে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ক্যান্টিনে বসে বড়ো ভাইদের নামে চা-সিগারেট ফুঁকি বিদ্যুৎ তখন বাজারে দোকান খুলে বসে।

তা একটা দোকান তাদের বাপ-চাচাদের ছিল বাজারে।

হার্ডওয়্যারের দোকান। লোহালক্কড় আর কি। মাল আছে কি নেই ভালোমতো বোঝা যেত না। বিদ্যুৎ এসে ওই দোকান খুলে, দোকানের সামনে পানি মেরে, ঝাড়ঝাঁটা দিয়ে, গুছিয়ে বসত। ক্যাশে বসত তার বাপ না হয় চাচা। কোনোদিন তাদের দোকানে খরিদ্দার দেখিনি অবশ্য।

পরে তো আমি পড়ালেখা নিয়ে শহরে চলে এলাম। বছর কয়েক পর দেখি বিদ্যুতের দোকানের জেল্লা বেড়েছে একটু। ইদের মৌসুম। বিদ্যুৎ আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরল। আমার বামঘেষা নাক কড়া আতরের গন্ধে কুঁচকে উঠল।

বিদ্যুৎ বলল, "দোস্তো, চা খা... আয়..."

কিছু করার ছিল না বলে বসলাম। আবার আমি যে কতটা কেউকেটা হয়ে উঠেছি সেটা জানানোর অভিপ্রায়ও ছিল। বললাম, "তাহলে তুই দোকানদার হয়েই থেকে গেলি?"

বিদ্যুৎ হাসল। বলল, "তোদের মতোন বিদ্যাবুদ্ধি তো নাই দোস্তো! তোর কি পড়া শেষ?"

"আরে! এখনই কোথায় শেষ? কত কী বাকি আছে... তুই এইখানে এইভাবে থেকে গেলি রে... জীবনের কিছুই দেখলি না..."

বিদ্যুৎ তবুও হাসল। স্কুলের বিখ্যাত হাসি। জীবন না দেখায় তার মনে হয় কোনো খেদ নেই। আশ্চর্য! বললাম, “তুই কোনোদিনই দৌড়ে থাকতে পারলি না!”

বিদ্যুৎ তার ঝুলন্ত পা-টা বাড়িয়ে চা নিলো টঙের ছেলেটার হাত থেকে। আমাকে দিয়ে নিজের কাপেও চুমুক দিলো। তারপর বলল, “তোদের কথা খুব মনে হয়... চন্দা তো তোদের সব্বাইরে নামে চেনে!”

“চন্দা কে?”

“তোদের ভাবি। ও বলে তোমার যে কোনো বন্ধুই নাই দেখি! আমি হাসি আর বলি... আছে আছে। সব শহরে। বড়ো বড়ো ক্লাশে পড়ে। বড়ো বড়ো জাগায় চাকরি করে। চন্দা হাসে খালি। ভাবে ঝাড়ি মারি! কিন্তু তোরা ছাড়া কি আর আমার কোনো দোস্তো আছে বল? এই যে ইদে বাড়ি আসছিস, ঠিকই আমার সাথে দেখা করতে আসছিস, আসছিস না? আর আইসাই আমাকে জড়িয়ে ধরে কুলাকুলি করছিস না? বন্ধু আর কী করবে? বন্ধু কি বন্ধুর বাড়িতে গিয়া ভাত রানবে?”

বিদ্যুৎ আবার হেসে উঠল। আমি হাসব কিনা বুঝতে পারলাম না। চা শেষ। সেদিনের মতো উঠলাম।

ইদের তিনদিন পর একেবারে বাড়িতে বিদ্যুৎ হাজির। বলল, “দোস্তো, আজ রাত্রে আমার বাড়িতে যে আসা লাগবে!”

আমি অবাক। এর আগে কোনোদিনও বিদ্যুতের বাড়ি যাইনি। যাবো এমন ভাবিওনি। আজ হঠাৎ কী হলো?

বিদ্যুৎ বলল, “তোর ভাবি তোকে দাওয়াত দিছে। রাত্রে দুইটা ডাল-ভাত খাবি...”

একটু থেমে আবার হেসে বলল, “আসলে চন্দা বুঝতে চাইছে তোর মতো বড়ো পাশ দেওয়া মানুষ সত্যি আমার বন্ধু কিনা! আমি বলছি কী জানিস? বলছি এইটা ওয়ান-টুয়ের ব্যাপার। বলছি আমি বললেই তুই আসবি! শোন, সন্ধ্যা হতে হতেই চলে আসিস দোস্তো... ম্যালা গল্প করা যাবে। চন্দারে শুনাবো স্কুলের গল্প...”

বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল হাসতে হাসতে। তবে আমি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাইনি। বিদ্যুতের বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রমাণের কোনো দরকার আমার ছিল না। হয়তো বিদ্যুতের ছিল... তাতে আমার কী? আমি তো তার বন্ধু না!

এর অনেকদিন পর বিদ্যুতের সাথে দেখা হয়েছিল একবার। খুব জরুরি কোনো কাজ আছে ভাব নিয়ে আমি দ্রুত চলে গিয়েছিলাম। এমন হতে পারে আমার ভেতর হয়তো কোনো অপরাধবোধের জন্ম হয়েছিল। বা কে জানে, আমি হয়তো আরো অহংকারী হয়ে উঠেছিলাম!

আজকে যখন প্রায় একমাস ঢাকার লকডাউনে ঘরে বসে বসে আমার রাজনীতি সচেতন মন দেশ উদ্ধারে নেমেছে ফেসবুকে, তখন রফিকের ফোনটা আমার কাছে বিরক্তিকরই মনে হলো। তার ওপর এমন উদ্ভট সব কথা। আসলে এদের পেটে বিদ্যা অল্প। কিন্তু লাফানিটা ম্যালা! ওই যে প্রবাদটা কী যেন... ফাঁকা কলসি বাজে বেশি!

ফোন দিয়েই রফিক বলে উঠল, “দোস্তো কেমন আছিস রে তোরা?”

আমার জবাব সংক্ষিপ্ত, “আছি। ভালো আছি।”

“ঘরে থাকতেছিস তো? খাবার দাবার সব কিন্যা রাখছিস তো? হাত ধুইতেছিস তো? বিশ সেকেন্ড কিন্তু... এর কম হইলে...”

এসব দিনই দেখা বাকি ছিল আর কি! রফিকদের কাছ থেকে এখন পরামর্শ নেওয়া লাগবে আমার! একটু রূঢ় কণ্ঠে বললাম, "কী হয়েছে আসল কথা বল তো..."

"আরে কী হইছে শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোর..."

এদের অবশ্য সবকিছুতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। একবার এই রফিকই ফোন দিয়ে বলেছিল মাথা খারাপ অবস্থা দোস্তো! বড়বাজারের বাঁজা গাইটা এইবার বাচ্চা দিছে। দুইটা বাচ্চা... দুইটাই তাজা!

আমি একটু ছটফটিয়ে বললাম, "কী হয়েছে তাড়াতাড়ি বল রফিক, কাজ আছে!"

"আরে ঘটনা শুনলে সব কাজকাম ভুইলা যাবি! ওই বিদ্যুৎ আছে না, বিদ্যুৎ... ওরে তো সংবর্ধনা দিতেছে!"

"আচ্ছা।"

"আরে আচ্ছা না, তুই একটা রিপোর্ট কর না দোস্তো...এত বড়ো ঘটনা..."

"তা এই সংবর্ধনা দিচ্ছে কে? তুই?"

রফিক হেসে উঠল হা হা করে। হাসির মধ্যেই বলল, "আমি ক্যান সংবর্ধনা দিবো রে শালা! সংবর্ধনা দিতেছে সরকার! মানে প্রধানমন্ত্রী!"

"কী?"

"হ হ। একটা হেবি ঘটনা ঘটছিল... রহিমার মা ছিল না... রহিমার মা? ওই যে.. পোস্ট অফিসের পিছনে যে ভাঙা বাড়িটা... তাতে থাকত যে... রহিমার মার এখন তো কেউ নাই, রহিমাও মরছে না... তার ওপর প্যারালাইজ হইছে না ছয় মাস থেইকা..."

"তো কী হয়েছে আমাকে বলবি?"

"ওইটাই তো বলছি... ওই রহিমার মায়ের বাড়িতে এক সপ্তাহ আগে আগুন লাগছিল না...? গভীর রাইতে কেউ কিছু বোঝে নাই তো... এই বিদ্যুৎই একলা দৌড়ায় গিয়া রহিমার মায়েরে কোলে উঠায়া বাইর করে আনছিল... ল্যাংড়া পায়ে!"

"আচ্ছা..."

"এই খবর ক্যামনে ক্যামনে জানি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাইছে..."

"কী বলিস, প্রধানমন্ত্রী এতই সস্তা নাকি?"

"কী জানি দোস্তো.. আইজ টিয়োনো (ইউএনও) আইসা বিদ্যুৎরে চিঠি দিয়া গেছে... সংবর্ধনার চিঠি... এই সব লকডাউন ফাউন গেলে ও গণভবনে গিয়া প্রধানমন্ত্রীর হাত থেইকা সংবর্ধনা নিবে। তুই তোর টিভি চ্যানেলে এইটার একটা রিপোর্ট করাতে পারবি না, অ্যা? আমাদের এলাকার বিদ্যুৎ, দেখ সবার মুখে কেমন একশ ওয়াটের বাত্তি বসায়ে দিছে, না?"

এ সময় আমাদের চ্যানেলের নিউজ হেডের ফোন আরেকটা ফোনে। তাড়াতাড়ি ধরে বললাম, "হ্যালো স্যার... স্লামুয়ালাইকুম..."

নিউজ হেড রফিকের কথাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবটা বলে বলল, "আপনাদেরই তো এলাকা, চেনেন নাকি ছেলেটাকে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ স্যার। আমাদের তুইতুকারি সম্পর্ক। আমরা বাল্যবন্ধু! আমার খুবই কাছের বন্ধু!"

ইচ্ছেগুলি

জাকিয়া আফজাল

ইচ্ছেগুলিকে দেখো,
কেমন ছোটো, বড়ো, মাঝারী,
কেউবা বয়সের ভারে ন্যুব্জ,
কেউ কেউ সম্ভব কিংবা অসম্ভব।
কিছু কিছু ইচ্ছেরা পূর্ণতা পেয়ে শঙ্খচিল হলো
আর উদার ডানা মেললো তাপদগ্ধ রোদের বিবস্ত্র আক্রোশকে আড়াল করতে।

একসময় খুব সাজতে ইচ্ছে হতো।
তোমার বিমুগ্ধ চোখে নিজেকে সাজাতাম স্পর্ধিত ক্লিওপেট্রায়।
আজ সেই ইচ্ছেরা মৃত।
নকশি কথায় শব্দ বুননের ইচ্ছেগুলিও
আজকাল অবদমনে মুমূর্ষু।
আমার তাই কথা বলতে ইচ্ছে করে না,
সাজতে ইচ্ছে করে না,
হাসতে ইচ্ছে করে না,
ভালোবাসতেও ইচ্ছে করে না।
শুধু একটি অদম্য ইচ্ছা বিক্ষুব্ধ ভিসুভিয়াসের মতো
আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে টগবগ করে ফুটে -
ইচ্ছে করে চিৎকার করে তোমায় ডাকি।
ইস্রাফিলের শিঙাধ্বনির প্রবলতায়
সে ডাক পৌঁছে যাবে মহাবিশ্বের প্রতি কোণে কোণে।
নিশ্চয় শুনতে পাবে তুমি।
তুমি সাড়া দিলেই মৃত ইচ্ছেরা সব
কফিন ফেলে উঠে আসবে দলে দলে,
মুমূর্ষুরা সুস্বাস্থ্য নিয়ে হবে হৃষ্টপুষ্ট।
প্লিজ সাড়া দাও তুমি,
একটি ইচ্ছাপূর্ণ জীবন পেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

নিঃসঙ্গ ডায়েরী

ওমর ফারুক শ্রাবণ

কুয়াশায় ঘেরা শীতের সকাল। একজন মাঝ বয়সী মহিলা লাকড়ির চুলায় ভাপা পিঠা তৈরি করে বিক্রি করছেন। এত সকালে চলে এসেছি যে পিঠা এখনো তৈরি হয়নি।

চুলায় মাত্র আগুন দেওয়া হয়েছে। আমিই আজ প্রথম কাস্টমার। চুলার পাশেই একটি কাঠের বাক্স রাখা। বাক্সের ওপরে একটি থালা। পিঠা তৈরি হলে এই থালায় রাখা হবে। পাশেই একটি ডায়েরির মতো দেখা যাচ্ছে। পিঠা তৈরি হলে পুরাতন খাতা বই ছিঁড়ে তাতে পিঠা রেখে বিক্রি করা হয়। ডায়েরির মলাটের ছবিতে একটি গাছের ডালে একটি একাকী পাখি বসে আছে। যেন নিঃসঙ্গতা তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে ডায়েরিটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতেই আমি অবাক। এত সুন্দরও কারো হাতের লেখা হয়? মনে হচ্ছে যদি পৃথিবীতে কোনো ছাপাখানা না থাকত তবে এই সুন্দর হাতের লেখাকেই ছাপার অক্ষর বলে মানা হতো। আমি মুগ্ধ হয়েছি ডায়েরির পাতার হাতের লেখা দেখে। এই ডায়েরি ছিঁড়ে পিঠা বিক্রি ঠিক হবে না মনে হচ্ছে। আমি জানতে চাইলাম, এই ডায়েরি ছাড়া আর খাতা বা বই আছে? মহিলা নিচ থেকে আরো দুইটি খাতা দেখালেন। আমি দশ টাকা দিয়ে ডায়েরিটি নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। মহিলা খুশি মনেই আমাকে দিলেন।

এক বৃষ্টির বিকালে বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছিলাম। হঠাৎ ডায়েরিটির কথা মনে হলো। ইচ্ছে হলো এই অবসরে ডায়েরিটি পড়া যাক। অন্যের ডায়েরি পড়া উচিত নয়, কিন্তু পরিত্যক্ত ডায়েরি। আর হাতের লেখা আমার কৌতূহল বাড়িয়েছে। আমি ডায়েরির পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

> ডায়েরি লেখার মাঝে আলাদা এক মজা আছে। এখানে কাউকে সম্বোধন করে লেখা শুরু করতে হয় না। পত্র লেখার মতো প্রিয় অমুক বা দরখাস্ত লেখার মতো বরাবর অমুক সমীপেষু লিখতে হয় না। ডায়েরিতে লেখার কোনো নিয়মকানুন নেই। লেখা যায় আপন মনে আপনকথা, পরকথা। এই ডায়েরি ছাড়াও আমার আরো দু'টি ডায়েরি আছে। একটাতে কেবল ছড়া, গান আর ছন্দ মিলিয়ে কিছু কথা। দ্বিতীয়টিতে আমার প্রতিদিন কী ঘটে, স্মরণীয় করে রাখার জন্য দৈনন্দিন জীবনের ভালো লাগা, মন্দ লাগা আর আবেগ অনুভূতিগুলো লিখে রাখি। যেমন আমি যে আজ এই নতুন ডায়েরি লেখা শুরু করেছি এটাও দ্বিতীয় ডায়েরিতে লিখে রাখব। আর এই ডায়েরিটি কেবলই আমার জীবন কাহিনি। জীবন কাহিনি বলাটা ভুল হলো। এক জীবনের কাহিনি এমন শত শত ডায়েরিতে লেখা সম্ভব না। জীবনের কিছু অংশ শুধু মাত্র লেখা যায়। এই ডায়েরিটি আমার ভালোবাসা, আমার ভালোবাসাময় অংশটুকু তুলে ধরার জন্য।
>
> – শানু

পৃথিবীর অনেক দুঃখী মানুষের ভীড়ে আমিও একজন দুঃখী মানুষ। অনেক কুৎসিত চেহারার মানুষের মধ্যে আমিও একজন কুৎসিত মেয়ে। রোগা পাতলা এই শরীরে দাঁতগুলো ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়ে না। আমি দাঁতের জন্য কখনোই দুই ঠোঁটকে একত্রে করতে পারি না, দাঁত সামনের দিকে বের হয়ে থাকে। আমার ছোটো বোন মমতার চেহারা সুন্দর হলেও আমি দেখতে অনেক কালো। একই মায়ের পেটের দুই বোন, অথচ মমতা কত সুন্দর আর আমি এমন কুৎসিত। বিধাতাকে দোষ দেই না, কারণ পৃথিবীতে আমার চাইতেও কুৎসিত, বিকলাঙ্গ মানুষ আছে। তবুও হুমায়ূন স্যারের দেবী বইটার কথা মনে পড়ে। যেখানে নিলু দেখতে রোগা পাতলা হলেও নিলুর বোন বিলুর চেহারা অনেক সুন্দর। তবে আমার দেবী হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমার মতো নিলুর দাঁত এমন উঁচু ছিল না। আমি আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি না। আমার কেন যেন মনে হয় পৃথিবীর সুন্দর মানুষেরাই শুধু রোজ আয়না দেখে। আমি কোনো রূপ চর্চাও করি না। মজার বিষয় হলো কোনো রোমান্টিক নাটক বা ছবি আমার দেখতে ভালো লাগে না। বিরহ আমার মন ছুঁয়ে যায়। আমার জীবন যেন বিরহ গাঁথা। আমি সারা জীবন ভেবেই এসেছি আমাকে কেউ কোনোদিন পছন্দ করতেই পারে না। যে আমাকে পছন্দ করবে তার চোখ থাকতেও অন্ধ। আমাকে কেউ বিয়ে করলেও করুণা করে করবে। তবুও আমি সেই করুণা পেতে ইচ্ছুক ছিলাম ছোটো বোনটির জন্য। আমাকে পাত্রপক্ষ দেখতে এলে মমতাকে অন্য বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে হয়। নয়তো মমতাকেই পাত্র পক্ষের পছন্দ হয়। মমতার বিয়ে দিতে সমস্যা হবে না। কিন্তু বাবার জেদ, উনার বড়ো মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি ছোটো মেয়ের বিয়ে দিবেন না। বাবা নরসিংদী পৌরসভার কর বিভাগের কর্মকর্তা।

একেকবার বাবাকে আমার জুলুমকারী মনে হতো। এটা শুধুই মানসিক দিক থেকে। কেন যেন মনে হতো রাজা বাদশাহদের কর আদায়কারী বা জমিদারদের খাজনা আদায়কারীর মতো বাবাও কর আদায়কারী। এখন তেমনটা মনে হয় না। কারণ বাবা আমাকে অনেক ভালোবাসেন। আর মা ভালোবাসেন বেশি মমতাকে। ছোটো মেয়ে তো, সেজন্য। বাবা যৌতুক দিতেও রাজী আছেন, কিন্তু আমাকে বিয়ে না দিয়ে মমতাকে বিয়ে দিবেন না বলে পণ করেছেন। আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। মমতার ইন্টারের ফলাফল বের হয়নি এখনো। অথচ বাবা আমার বিয়ে নিয়ে কত চিন্তা করছেন। আমি যদি পারতাম একজন প্রতিবন্ধীকে বিয়ে করে বাবার এই চিন্তা দূর করে দিতাম।

আমার স্বপ্ন দেখা বারণ ছিল। প্রেম ভালোবাসা আমার জন্য নিষিদ্ধ। রোজ কতসব ছেলেরা চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। কখনো কাউকে ভালো লাগেনি। আমি ভালো লাগতে দেইনি। ইচ্ছে করে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি। মনটাকে এক প্রকার বেঁধে রাখি। খবরদার মন, কারো প্রতি যেন ভালোলাগা সৃষ্টি না হয়।

নরসিংদী সরকারি কলেজের তমালতলায় যেতে চাইতাম না। ক্লাসের ফাঁকে অনার্স ভবনের মাঠের দুর্বা ঘাসে বসে থাকতাম একাকী। আমার যে বান্ধবী ছিল না তেমনটা নয়। তবুও আমি তাদের সাথে না গিয়ে একা থাকি। এরও একটা কারণ রয়েছে। বান্ধবীদের অন্য বন্ধুরা তাদের সাথে আমাকে দেখলে কেন যেন পছন্দ করত না। আচ্ছা আমি কি তবে প্রতিবন্ধী? জগতের একটি চরম সত্য হলো মুখে মানুষ যতই বলুক, চেহারা আল্লাহর দান। মানুষকে তিনি যেভাবে বানিয়েছেন তেমনই সুন্দর। মানুষকে ঘৃণা করতে নেই। কিন্তু বাস্তবে মনে মনে ঠিকই সেই অসুন্দরকে মানুষ এড়িয়ে চলে। কোথাও ঘুরতে গেলেও সাথের বোকা টাইপ বন্ধুটাকে অনেকে সাথে নিতে চায় না।

কয়েকদিন ধরে খেয়াল করছি মমতা কোনো এক ছেলের সাথে প্রেম ভালোবাসায় জড়িয়েছে। জড়িয়েছে হয়তো আগেই। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সারাক্ষণ বাড়িতে থাকার কারণে এখন লুকিয়ে ফোনে কথা বলে। কখনো আড়াল থেকে শুনতে পাই *তুমি তুমি* করে কার সাথে যেন ফিস ফিস করে করে কথা বলে। আমি সামনে গেলেই *তুই তুই* ব্যবহার শুরু করে মোবাইলে। যেন আমি ভেবে নেই আমার বোনটা তার কোনো বান্ধবীর সাথে কথা বলে। কিন্তু এটা হয়তো সে ভুলে যায় আমি তার আগে পৃথিবীতে এসেছি। আমি তার বড়ো, এতটুকু বুঝার বয়স আমার হয়েছে। তার এখন পড়ালেখার সময়। অজানা এক ভয় আমাকে ভাবিয়ে তুলে।

যখন মন খারাপ হয়, যখন নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় তখন পাশের বাড়ির রূপা ভাবীর সাথে বসে কথা বলি। মাথার চুলে বিলি কেটে উকুন তুলে দেই। কিন্তু দুইদিন ধরে রূপা ভাবীর সাথে দেখা করতে যেতে পারছি না। উনার ছোটো ভাই বেড়াতে এসেছে। আড়চোখে যেভাবে তাকায় মনে হয় আমাকে গিলে খাবে। এই তাকানোর ভাষায় যে নোংরা কাব্য লেখা এতটুকু যে কেউ বুঝতে পারবে। অথচ মেয়েরা ছেলেদের তাকানোর ভাষা জানে। কোনো চোখে ভালোবাসা কোনো চোখে লালসা। কেউ কখনো আমার প্রেমে পড়েনি আর পড়বেও না, সেজন্য ভালোবাসার চোখ চেনা হয়নি, দেখা হয়নি কখনো। তাই দ্বিতীয় লালসার চোখটির সাথে না চাইতেই পরিচয় হয়ে গেল। কিছু নরপশু আছে, চেহারা যেমনই হোক তাদের দৃষ্টি থাকে শরীরের অন্যসব জায়গায়।

কলেজের পুকুর ঘাটে বসে পা ভিজাচ্ছি। ক্লাস শেষ সেই কখন, কলেজও ছুটি। দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে। আমার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

“একা একা বসে আছেন যে, বাড়ি যাবেন না?”

পেছন ফিরে দেখি সিঁড়ির ওপরে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। ছেলেটাকে মনে হয় আমি চিনি, কোথাও হয়তো দেখেছি। মুখ চেনা মনে হচ্ছে। আমি কথার জবাব না দিয়ে বসা থেকে উঠে গেলাম। ছেলেটা কীভাবে যেন তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি রূপা ভাবীর ভাইটির মতো নয়। তবুও অচেনা কেউ তাকিয়ে থাকলে নিজেকে সবসময়ই অপ্রস্তুত মনে হয়। আমি তার পাশ কাটিয়ে চলে এলাম।

নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটি ট্রেন ছুটে আসছে খুব দ্রুত গতিতে। মনে হয় এই স্টেশন ধরবে না। আমি ব্রিজের ওপরে হলেও মনে হচ্ছে ট্রেন যেন আমাকে চাপা দিয়ে যাচ্ছে।

আবারো রূপা ভাবীর ভাইদের মতো কয়েক জোড়া চোখ আমার চারিদিকে। ওভার ব্রিজের ওপরে এখানে সেখানে তিন-চারজন দাঁড়িয়ে। আড়চোখে আমাকে দেখে। মেয়েটা ট্রেন দেখছে এটা যেন অস্বাভাবিক কিছু। মাঝবয়সী লোকটাই বা কেন তাকিয়ে আছে আমার ধারণার বাইরে। হয়তো আমার মতো একটা দুটো মেয়েও আছে তার বাড়িতে। আমি যখনি চলে আসব তখন খেয়াল করলাম ছেলেটা সিঁড়ি দিয়ে ওভারব্রিজে উঠা শুরু করেছে। সেই পুকুর ঘাটের ছেলেটা। সে কি আমার পিছু নেবে? আমি দ্রুত দক্ষিণ দিক দিয়ে নামতে শুরু করলাম।

ওভারব্রিজ থেকে নেমে দুইটি পত্রিকা দোকানের মাঝামাঝি এসে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ছেলেটাও ওভারব্রিজ থেকে নামছে। ভয় আর জেদ কাজ করছে মনে। ছেলেটার চাহনীতে কোনো লালসা দেখিনি আমি। কিন্তু আমার পিছু নিবে কেন ছেলেটা? আমি স্টেশন থেকে বের হয়ে রিক্সা

নিলাম। রিক্সায় উঠেও বারবার পেছন ফিরে দেখেছি ছেলেটা আবার পিছু নেয় নাকি। না, আর পিছু নেয়নি। ছেলেটার তো স্টেশনে কোনো কাজও থাকতে পারে। হয়তো পত্রিকা কিনতে এসেছে। নয়তো জুতায় কালি করতে এসেছে। ছেলেটার পায়ে কালো রংয়ের চামড়ার জুতো ছিল। আমি সিঁড়ি বেঁয়ে পুকুরঘাট থেকে উঠার সময় দেখেছি।

আচ্ছা আমি ছেলেটাকে নিয়ে এতকিছু ভাবছি কেন? তবে কী...

না, তা হতেই পারে না। আগ বাড়িয়ে এসে কথা বলেছিল ছেলেটা তাই এমন কৌতূহল।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, "এখন হুট করে ভিতরে ঢুকিস না, বাড়িতে মেহমান। তোকে দেখতে এসে কতক্ষণ ধরে বসে আছে। কত করে বললাম একটা মোবাইল কিনে দেই, তুই ব্যবহার করবি না। দাঁড়া আমি ঐ পাশের দরজা খুলে দেই।"

আমি বাবার হাত ধরে বললাম, "কোরবানীর গরুর মতো আমাকে আর কতবার সাজিয়ে হাটে তুলবে? তবুও দেখবে কারো পছন্দ হয়নি। তার চেয়ে ভালো তুমি মমতার বিয়ে দিয়ে দাও।"

"এই কথা আর মুখেও আনবি না। এমনিতেই পাত্রপক্ষ বাড়িতে ঢুকে মমতাকে দেখে জানতে চেয়েছে এটাই পাত্রি কিনা।"

"বাবা, মমতাকে যখন দেখেছে তখন ছেলে পক্ষ ভেবে বসে আছে মমতার বোনও নিশ্চয় এমনই সুন্দর। তুমি আর কথা না বলে মমতাকে নিয়ে যাও।"

"দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে আমি কী করি।"

বাবা যখন রাগ দেখিয়ে ভিতরে গেলেন আমি আর বাড়িতে ঢুকার সাহস পাইনি। সোজা রূপা ভাবীর কাছে চলে এসেছি। ভাগ্যিস লালসার চোখের মালিক তার ভাইটা চলে গেছে। আমাকে দেখে ভাবী আগ্রহভরে জানতে চাইলেন, "তোকে না আজ দেখতে আসছে শানু? কলেজ থেকে আসতে দেরি করলি যে? একটা মোবাইল কিনলে কী হয় বলতো? অন্তত মানুষটা কোথায় আছে খোঁজ পাওয়া যায়। আমি ভাবীর কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললাম, কত প্রশ্ন করো ভাবী? দেও তোমার চুলে বিলি কেটে দেই।"

ভাবীর চুলে বিলি কাটার সময় ভাবছি, বাবা মমতাকে নিয়ে যাবে তো ছেলে পক্ষের সামনে? মমতার বিয়েটা যদি হয়ে যেত তাহলে আমার বিয়ের চিন্তা চিরতরে বাদই দিতাম।

সবাই জানতে চায় মোবাইল কেন ব্যবহার করি না। আমার মোবাইলে খুব ভয়। রং নাম্বারে নাকি প্রেম হয়। আমারও যদি কখনো প্রেম হয়ে যায়, আর প্রেমের মানুষটা দেখা করতে এসে যদি আমাকে দেখে। সেও মনে কষ্ট পাবে, আমারো বুক ফেটে কান্না আসবে। থাকুক না, মোবাইল ছাড়াই তো বেশ আছি।

রূপা ভাবীর কাছ থেকে বাড়িতে গিয়ে দেখি পাত্রপক্ষ চলে গেছে। বাবা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। মা আমাকে বলল, বাবা নাকি বলেছে তাদের মেয়ে এখন বিয়ে দিবে না। যখন পাত্রপক্ষ জানতে চাইলো, তাহলে তাদের খবর দিয়ে আনা হলো কেন? বাবা উল্টো রাগ দেখিয়ে বলল, "এনেছি এখন দরকার হলে ভাড়া দিয়ে দেই, আপনারা চলে যান।"

আমি বাবার রুমে গিয়ে দেখি বাবা চোখ মুছে। আমাকে দেখে বলল, "আয় তো মা। দেখ তো আমার চোখে কী যেন পড়েছে।"

আমি কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মানুষ তার অতীত জীবনে ফিরে যেতে চায়। আমি চাই তিন-চার বছর যেন চলে যায় আমার জীবন থেকে। যখন মমতার বিয়ে হবে। আমার জন্য আর

কোনো পাত্রপক্ষ আসবে না। লেখাপড়া শেষ করে ছোট্ট একটি চাকরি করব আমি। বারান্দায় থাকবে আমার পোষা একটি মাত্র পাখি। যে থাকবে আমার মতোই নিঃসঙ্গ।

পরেরদিন কলেজ থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছিলাম। প্রতিদিন হেঁটেই ফিরি। আমার হাঁটতে ভালো লাগে। রেললাইনের পাশ দিয়ে বিলাসদীর রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় বিলের হাঁসগুলো দেখতে ভালো লাগে।

"আজ রিক্সায় চড়েননি? বাসা কতদূর?"

গতকালের পুকুরপাড়ের সেই ছেলেটি। আজ আবার আমার পিছু নিয়েছে। ছেলেটাকে ভালো মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম রূপা ভাবীর ভাইয়ের মতো ছেলেটার লালসার চোখ নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছেলেটার নিশ্চয়ই কোনো কু-মতলব আছে।

"কথা বলবেন না আমার সাথে?"

"আজব আমি আপনার সাথে কথা বলব কেন? দেখুন আপনি এমন করলে কিন্তু আমি মানুষ ডেকে জড়ো করব।"

ছেলেটা সাইকেল থেকে নেমে আমার পাশে হাঁটছে। আমি তাকাতে পারছি না ছেলেটার দিকে। হঠাৎ বলে উঠল, "আমাকে যতটা খারাপ ভাবছেন, আমি কিন্তু খারাপ নই। আপনি কিন্তু আমাকে চিনেন। একসাথে কোচিংও করেছি আমরা তিনমাস। আমিও অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি অনার্স ভবনেই।"

আমার রাগ কিছুটা কমে গেল। পুকুরপাড়ে দেখার সময়ই মনে হয়েছিল ছেলেটাকে আমি চিনি। একসাথে কোচিং করেছি, অথচ মনে করতে পারছি না। কোনো ছেলের দিকে তাকালে তবেই না মনে করতে পারব। ছেলেটাকে এখন আর খারাপ মনে হচ্ছে না। আমি তবুও বললাম, "আপনি খারাপ না হলে আমার পিছু নিয়েছেন কেন?"

"পিছু নিলাম কোথায়? আপনার পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছি, কথা বলছি। আমার এখনো মনে হয় না আমি আপনাকে বিরক্ত করছি। যখন থেকে মনে হবে আমি আপনাকে বিরক্ত করছি, তখন থেকে আর আপনার সামনে আসব না।"

"আমার তো মনে হচ্ছে আপনি বিরক্ত করছেন। আমার পাশ দিয়ে হাঁটছেন এটা আমার জন্য বিব্রতকর। আমি তো কথাও বলতে চাইনি।"

"ঠিক আছে, তাহলে আর বিরক্তির কারণ হবো না। আমি কেবল বন্ধু হতে চেয়েছিলাম।"

ছেলেটি সাইকেল ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। বাঁচা গেল, আর পিছু নিবে না। বিরক্তও করবে না। কিন্তু শেষে আবার কী ঢংয়ের কথা বলল এটা, আমি কেবল বন্ধু হতে চেয়েছিলাম।

আমি চারদিন আর সেই বন্ধুটার কোনো খোঁজ পাইনি। আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করতে চেয়ে যে ছেলেটা আমার পিছু নিয়েছিল, সে হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অনার্স ভবনের সামনে দুর্বা ঘাসে বসে থেকেছি কত সময়, একবারের জন্যও ছেলেটিকে দেখিনি। ওভারব্রিজের ওপর ট্রেন দেখার ছলে কতবার দাঁড়িয়ে থেকেছি, সে আসেনি। বাড়িতে আসার সময় ধীর গতিতে হেঁটে আসতাম, ভাবতাম এই বুঝি সাইকেল থেকে নেমে পাশ দিয়ে হেঁটে বলবে, আমি কিন্তু পিছু নেইনি, পাশেই আছি। না, সে আর আমার সাথে দেখা করেনি। আমার ভিতরে অভিমানগুলো কান্না হয়ে জমা হয়। মনে হতো তাকে দেখলে ঠিক কেঁদে দেব আমি। সে আমাকে একটিবারের জন্য কাঁদতেও দেয়নি। কান্নাগুলোকে ভিতরেই পুষে রেখেছি আমি। সে বলেছিল আমি বিরক্ত মনে করলে আর কখনো আমার সামনে আসবে না। সে সত্যিই তার কথা রেখেছে। আমার ওপরের রাগটাই সে দেখেছে, আমার নিঃসঙ্গতা,

আমার একাকীত্ব সে বুঝতে পারেনি। আমার একাকীত্ব আমার ভাবনার আকাশটাকে আরো বড়ো করে দিয়েছে।

মমতাকে রোজ ফোনে কথা বলতে দেখি। এখন বড্ড রাগ হয়। কেন বন্ধুটাকে পেয়েও হারালাম। আমিও বাবাকে বলে একটি ফোন নিয়ে তার সাথে আমার একাকীত্বের গল্প বলতাম। আমার অপূর্ণতার কথা বলতাম। কিছুই হয়নি। রূপা ভাবীর চুলে বিলি কাটার সময় চুল ধরে কোথায় হারিয়ে যাই। ভাবীর ডাকে বাস্তবে ফিরে আসি। একাই তো ভালো ছিলাম। কেন বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চেয়েছিল? আর কেনইবা আমার একটি কথায় অভিমান করে দূরে সরে গেল? নদীতে উত্তাল ঢেউয়ে হাবুডুবু খাওয়ার সময় লতাপাতা কাছে পেলেও মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। আমিও তো দুঃখের নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। বন্ধুটাকে আঁকড়ে ধরা বড্ড বেশি প্রয়োজন ছিল আমার।

বাবা আমার জন্য এখনো পাত্র খুঁজে। আজকাল নিজেকে অসহায়ের পাশাপাশি লজ্জাতেও সামিল হতে হয়। বাবা তার এলাকার বন্ধুদের প্রায় সবাইকে বলে রেখেছে, আমার মেয়েটার জন্য ভালো একটা পাত্র দেখিও। যৌতুক লাগলে আমি দেব। বাবার দিকে তাকাতেও লজ্জা লাগে আমার। কত চেষ্টাই না করছে আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা বিয়েটাই কি জীবন? বিয়ে ছাড়া বাঁচা যায় না?

বাবা একদিন হুট করেই হাসিমুখে বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে ঢুকলেন। বাবাকে এত খুশি আমি কখনো দেখিনি। আমাকে কাছে ডেকে বললেন, মা'রে আমি বলেছিলাম না তোকে ভালো ঘরে বিয়ে দেব? আল্লাহ আমার মনের আশা পূরণ করেছে। তোর বিয়ে পাকা করেই এলাম। এই শানুর মা মিষ্টি দেও, আজ ডায়াবেটিসের রোগী হলেও আমাকে কেউ মিষ্টি খাওয়া থেকে ফিরাতে পারবে না।

মেয়েরা বিয়ের কথা শুনলেই লজ্জা পায়। আমার কেন যেন লজ্জা পেতে ইচ্ছে হয়নি। বাবার আনন্দে আমার চোখ ছলছল করছে। অনেক কান্না বুকের ভিতর জমিয়ে রেখেছি। আমার একটু কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

মা জানতে চাইলেন, ছেলের বাড়ি কোথায়? কী করে? কোথায় বিয়ে ঠিক করে এসেছো? ছেলে তো আমার মেয়েটাকে দেখলই না। বাবা মুখে হাসি টেনে বললেন, দেখেছে শানুর মা দেখেছে। আমাদের এলাকার সামসুল আমাকে পাকা কথা দিয়েছে, তার ছেলে মোবারকের সাথে সামনের শুক্রবারে শানুর বিয়ে। এখন আমার কত কাজ, বিয়েটা আমি ধুমধাম করে দেব। ওরা যৌতুক নিবে না এক টাকাও।

মোবারক ছেলেটাকে আমি চিনি। আমার বছর খানেকের বড়ো হবে। ছেলেটা দেখতে সুন্দরই। কিন্তু আমার মতো মেয়েকে মোবারক কেন পছন্দ করতে যাবে? আমার মনে ভয় বিরাজ করছে।

মা জানতে চাইলেন, ছেলে আবার বেঁকে বসবে না তো? বাবা জোর গলায় বললেন, সামসুলকে তো আর তুমি চিনো না, আমি চিনি। সামসুলের ছেলে তার কথার অবাধ্য হয়নি জীবনে। এজন্যই ছেলেটাকে আমার আগে থেকেই পছন্দ। কিন্তু এতদিন চক্ষু লজ্জায় সামসুলকে কিছু বলতে পারিনি।

আজ কেন যেন আমার খুব আয়না দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু দেখব না। যদি স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। যদি স্বপ্নও হয়, বিয়ের পরই আয়না দেখব।

দুইদিন পর আমার বিয়ে। এখনো সবকিছু আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান ঘটাতে কেউ আসছে।

ভাবতেই পারছি না। রূপা ভাবীর কাছে যেতেও লজ্জা করছে। গতকাল আমাকে দেখেই বলে উঠল, "কে আমার মাথায় বিলি কেটে দেবে? শানু তো ননদ আর শ্বাশুড়ীর চুল ছিঁড়বে এখন।"

যদিও কথাটি দুষ্টুমি করে বলেছে। কিন্তু আমি কখনো ননদ বা শ্বাশুড়ীর সাথে ঝগড়া করব না, ওদের মনে কষ্ট দেব না। ইস, কত ভাবনা আসে মনের মধ্যে। মমতাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারলে ভালো লাগত। মমতা কোথায় কে জানে? আমি খুঁজতে লাগলাম মমতাকে।

মমতার ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। কিন্তু ওর ঘরের দরজা বন্ধ। ফোনে কারো সাথে কথা বলে কাঁদছে, স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। তাহলে কি মমতা যে ছেলেটার সাথে ফোনে কথা বলত, "তার সাথে ঝগড়া হয়েছে? ঝগড়া হলে কাঁদতে হবে? নাকি সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল?"

আমি দরজা ধাক্কাতে লাগলাম, "মমতা এই মমতা দরজা খোল।"

মমতার চোখে পানি নেই। পানি মুছেই দরজা খুলেছে। কিন্তু তার চোখ মুখ ফোলা। দেখলেই বুঝা যায়, অনেক কান্না করেছে মেয়েটা। আমি জানতে চাইলাম, "কী হয়েছে বোন আমার? ঝগড়া হয়েছে? কান্না করছিস কেন?"

মমতা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল। বলতে লাগলো, "আপু তুই এত ভালো কেন? তুই আমাকে এত বুঝিস কীভাবে? তুই অনেক সুখী হবি আপা।"

বলেই হাত মুখ ধুইতে চলে গেল। পাগলি একটা, ঝগড়া হতেই পারে সেজন্য কাঁদতে হবে? আর আমি তো জীবনে কারো সাথে ঝগড়া করারও সুযোগ পেলাম না। একজন বন্ধু হতে এসেও হারিয়ে গেল। সে হয়তো জানে না আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তার সাথে চাইলেও আর বন্ধুত্ব হবে না আমার।

আজ রাতে আমার গায়ে হলুদ। বেলা এগারোটায় বাবা আমার কাছে তার মোবাইল নিয়ে এলেন। আস্তে করে বললেন, "নে মা জামাইর সাথে কথা বল। তোর পছন্দ অপছন্দের কথা বল। ওরা মার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা করবে, তোর পছন্দের কথা জানতে চায়। নে কথা বল, আমি একটু মোড়ের দোকানে যাচ্ছি।"

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবার অবস্থা। কী বলব আমি? হ্যালো বলব? মোবাইল কানে নিয়ে বুঝতে পারছি ঐ প্রান্তে কেউ আছে। কিছু বলার আগেই সে বলল, "আমি মোবারক। আমি জানি না আপনি কথাগুলো কীভাবে নিবেন। কথাগুলো কখনোই বলতে চাইনি আমি। কিন্তু এখন না বলে পারছি না। আমি না হয় বাবার হুকুমে বিয়ে করে সংসার করে নেব। কিন্তু আপনার বোনটা হয়তো একটা দুর্ঘটনা ঘটাবে। গতকাল যখন আপনি দরজা ধাক্কাচ্ছিলেন তখন মমতা আমার সাথে ফোনে কথা বলছিল। আমরা একজন আরেকজনকে দেড় বছর ধরে পছন্দ করি, কথা বলি। আমি বাবার কথার অবাধ্য হতে পারব না। এখনো আমি বিয়ে করতে রাজি। কিন্তু আপনার বোন মমতা ড্রয়ারে ঘুমের ঔষধ এনে রেখেছে। কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি কিছু করতে পারেন। সত্যিই কিছু করতে পারেন, হয়তো বিয়েটাও আটকাতে পারেন।"

আমি দাঁড়ানো থেকে বসে পড়লাম ছেলেটার কথা শুনে। আমার বোন মমতার ভালোবাসার মানুষকে আমি বিয়ে করব? এটা কীভাবে সম্ভব? কাল বিয়ে, আজ বিয়েটাই বন্ধ করি কীভাবে? বাবার এত অপেক্ষার পর যে খুশিটা সে খুশি কেড়ে নেই কীভাবে? আমাদের বাড়িতে প্রথম অনুষ্ঠান, মানুষজন দাওয়াত করা শেষ মেহমানরা আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে এই বিয়ে বন্ধ করব কীভাবে? বন্ধ না করলেও মমতা? মমতার ড্রয়ারে ঘুমের ঔষধ। আমি ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি মমতা আয়নার সামনে সাজগোজ করে। ওর যখন খুব বেশি মন খারাপ থাকে, তখন সে নিজেকে সাজিয়ে তুলে। আমার দৃষ্টি মমতার ড্রয়ারের দিকে, মমতা ঘরে থাকলে ড্রয়ার খোলা যাবে না।

আমার ডায়েরিতে হয়তো আর বেশি কিছু লেখা যাবে না। আর দুইটা মাত্র পৃষ্ঠা বাকি আছে। এখন লেখার পর আর একটি মাত্র পৃষ্ঠা বাকি থাকবে। জানি না কখনো শেষ পৃষ্ঠায় কিছু লেখার সুযোগ পাবো কি না। আমার বিশ্বাস আমি শেষ পৃষ্ঠায়ও লিখতে পারব। আমি এখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব। বাড়িতে বলব আমার ঘনিষ্ট এক বান্ধবীকে আমার গায়ে হলুদে আনতে যাচ্ছি। বান্ধবীর কাছে যাব ঠিকই, কিন্তু আজ আর আসব না। শুধু আজ না, তিন চারদিন আর আসব না। আমার গায়ে হলুদে আমাকে খুঁজে পাবে না। বাবা চিন্তিত হবেন। তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বলবেন, সম্মান বাঁচাতে মমতাকেই বিয়ে দিয়ে দেই। আর যদি আমি বাড়ি থেকে না গিয়ে সরাসরি বলি বাবা মমতা মোবারককে পছন্দ করে। বাবা মনে কষ্ট পাবেন। ভেবে নিবেন মমতা আমার সুখ নষ্ট করছে। ঐদিকে সামসুল চাচা বাবাকে কথা দিয়েছে, মোবারকও বিয়ে আমাকেই করবে। তাই আমি মনে করি আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। এতে করে বেঁচে যাবে ছোটো বোনের জীবন। মোবারক পাবে তার ভালোবাসার মানুষ মমতাকে। বাবা আমাকে না পেয়ে মমতাকে বিয়ে দিতে আপত্তি করবে না।

আজ ডায়েরি এই পর্যন্তই। চারদিন পর মমতার বিয়ে হয়ে গেলে যখন বাড়িতে আসব তখন হয়তো শেষ পাতায় কিছু লিখব।

আমার শেষ ইচ্ছেটি পূর্ণ হলো। আমি ডায়েরির শেষ পাতাটি লিখতে পারছি। বাইরে বাবা চিৎকার করে রাগ ঝাড়ছেন। আমি দরজার ছিটকিনি দিয়ে লিখতে বসেছি। এরই মধ্যে বাবা বললেন, "মমতা ওকে বের হতে বল ঘর থেকে। যদি মরতেই হয় আমার বাড়ি থেকে গিয়ে যেন মরে। নিজে মরে আমাদের যেন বিপদে না ফেলে।"

বাবা হয়তো জানে না, আমি তাদের কোনো কষ্টের কারণ আর হবো না কোনোদিন। তারা জানবেও না কেন আমি বিয়েটা করিনি। যদি আমি বিয়েটা করতাম, মমতা নিশ্চিত অঘটন ঘটিয়ে ফেলত। গায়ে হলুদের দিন যখন আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম, মমতার ড্রয়ার থেকে ঘুমের ঔষধগুলো নিয়ে গিয়েছি। যেন মমতা কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে। চারদিন পর আজ যখন বাসায় ফিরলাম, মমতা গেইট খুলে দিল। তার শ্বশুর বাড়িতে থাকার কথা ছিল। তার মানে মমতার বিয়েটাও হয়নি। মায়ের কাছে জানতে পারি, সেদিন সামসুল চাচা বাবাকে অনেক অপমান করেছে। বাবাকে বলেছে, "মেয়ে বিয়ে দিতে পারো না মানুষের ধারে ধারে ঘুরেছো। আমি তোমার মেয়েকে পুত্রবধূ করতে চেয়েছিলাম। অথচ মেয়ে অন্য ছেলে নিয়ে পালিয়েছে। তাহলে এই বিয়ের নাটক করার কী দরকার ছিল?"

বাবা বলেছিল, আমার তো আরেকটা মেয়ে আছে, তাকেই বিয়ে দেব তোমার ছেলের সাথে। উত্তরে সামসুল চাচা বলেছেন, যে ঘরের বড়ো মেয়ে অন্য ছেলে নিয়ে পালিয়ে যায়, সেই ঘরে আমার ছেলেকে বিয়েই করাবো না।

বাবা বাড়ি এসে যখন জানলেন আমি এসেছি। তখনই বাবা রেগে আগুন। বলতে লাগলেন, যার সাথে পালিয়েছে সেখানে তাকে চলে যেতে বলো শানুর মা। আমি তার মুখ আর কোনোদিন দেখতে চাই না। সে আমার মেয়ে না, আমার একটাই মেয়ে মমতা। আজ থেকে তুমি শুধু মমতার মা।

আবারো দরজায় কড়া নড়ছে। "এই বের হয়ে যা ঘর থেকে? কী করিস ঘরে? মরতে হলে দূরে গিয়ে মর।" আমি বললাম, "আমার কিছু জিনিস নিয়ে বের হচ্ছি। বাবা উত্তরে বললেন, "এই ঘরে তোর কোনো জিনিস নেই। এক কাপড়ে বের হয়ে যা।"

আমি জানি বাবার রাগ আর কমবে না। যে বাবা আমাকে সবচেয়ে বেশি আদর করতেন সেই বাবা আজ বলছে আমি তার মেয়ে না, দূরে গিয়ে মরে যেতে।

অনেকগুলো টাকা জমা হয়েছিল আমার ব্যাগে। আমি দিনের পর দিন রিক্সায় না চড়ে পায়ে হেঁটে কলেজ করে টাকা জমিয়েছি। এই টাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই। যদি আমিই না থাকি পৃথিবীতে এই টাকা দিয়ে কী হবে? টাকাগুলো বালিশের নিচে রেখে দিয়েছি। হয়তো পরিবারের কাজে আসবে। মমতাও হয়তো আমাকে ভুল বুঝবে। অথচ যদি আমি বিয়েটা করতাম, মমতা যদিও আত্মহত্যা না করত তবে জীবিত লাশ হয়ে যেত। স্বামী নিয়ে তো আমাকে এই বাড়িতেই আসতে হতো। তখন মমতার মনের অবস্থাটা কেমন হতো? আমি সব জেনে ছোটো বোনকে এত বড়ো কষ্টের নদীতে ফেলতাম কী করে?

যে ছেলেটা আমার বন্ধু হতে চেয়েছিল, তাকে আর খুঁজে পেলাম না। সে হয়তো জানবে না, যে মেয়েটার সাথে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল সে আর এই পৃথিবীতে বেঁচে নেই। আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করে এতটুকু জীবনে আমার সুখের মুহূর্ত কোনটা ছিল? ভেবেছিলাম বিয়ের পর আয়না দেখব, আমার আর আয়না দেখা হয়নি। ভেবেছিলাম কাউকে জড়িয়ে ধরে ভিতরের জমে থাকা কান্নাগুলো বের করে ফেলব। কান্নাগুলো ভিতরেই আটকে আছে, দলা হয়ে। আমার আর ট্রেনের ছুটে চলা দেখা হবে না। আমি থাকব না আর এই পৃথিবীতে। যদি থাকি, পথে ঘাটে প্রান্তরে দূরে কোথাও চলেও যাই, রূপা ভাবীর ভাইয়ের মতো লালসার চোখ আমাকে গিলে খাবে। লালসার চোখ আমার দাঁত উঁচু, আমি কুৎসিত কিছুই খুঁজবে না। শুধু শরীর খুঁজবে।

বাবা যেহেতু বলেছে দূরে গিয়ে মরতে আমি অনেক দূরে গিয়ে মরব। যেন আমার লাশও বাবা দেখতে না পারে। মানুষ বড্ড অভিমানী প্রাণী, তার চোখের পানিও কাউকে দেখাতে চায় না। আর আমার চোখে তো চৈত্র মাসের খরা।

ডায়েরির পাতাও ফুরিয়ে গেল। আমার দুঃখের ভাগ নিতে নিতে ডায়েরিও বেশ ক্লান্ত। ডায়েরিটি আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি যদি না থাকি ডায়েরি দিয়ে কী হবে? ডায়েরিটি পুরাতন খাতা বইয়ের ভেতর রেখে দেব। হয়তো কোনো একদিন এই ডায়েরি পুরাতন খাতা বইয়ের সাথে বিক্রি হবে। আমার কষ্টের কথাগুলোও কেজির দরে বিক্রি হবে। হয়তো কোনো আচার বিক্রেতা কোনো বাদামওয়ালা আমার কষ্টের ওপর আচার, বাদাম বিক্রি করবে। হে পৃথিবীতে তোমাকে বিদায়, শুধু একটি প্রশ্ন তোমার কাছে,

"আমি তো প্রেম চাইনি, বিয়ে চাইনি, সংসার চাইনি। তোমাতে একটু বেঁচে থাকতে চেয়েছি। এই জনমদুঃখী কুৎসিত মেয়েটাকে একটু বাঁচতে দিলে কী হতো?"

বাইরে এখন বৃষ্টি নেই। কিন্তু ডায়েরিটি পড়ার পর আমার দুই চোখে বৃষ্টি হচ্ছে। মেয়েটি সারা জীবনে সুখ পেল না। শেষেও অভিমান করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল?

না, আমি এসব ভাবছি কেন? হয়তো শানু বেঁচে আছে। হয়তো তাকে কেউ বাঁচিয়েছে। হয়তো তারও একজন ভালো বন্ধু হয়েছে, একটি সংসার হয়েছে।

হয়তো বাবার সাথে অভিমান করে আর ফিরে আসেনি, আসবে না। মন কেন যেন দ্বিমত পোষণ করছে। একবার মন বলছে শানু বেঁচে আছে। আরেকবার মন বলছে অভিমান করে শানু...

Trapped
মানবতা যেখানে বন্দী
সৈয়দ নাজমুস সাকিব

মুম্বাইয়ের মতো সদাব্যস্ত একটা শহরে কি কেউ একদম একা হয়ে যেতে পারে?

তাও এবার এই ইন্টারনেট, ফোন, ফেসবুকের যুগে। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউড সিনেমা 'ট্র্যাপড' দেখলে আপনার মনে হবে- হ্যাঁ, পারে।

শৌর্য (রাজকুমার রাও) একটি ট্র্যাভেল কোম্পানিতে চাকরি করে। প্রেমে পড়ে যায় তারই সহকর্মী নুরির (গীতাঞ্জলী) ওপর। কিন্তু নুরির আরেক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে থাকে। নিজের এই প্রেমকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না শৌর্য। এ কারণে নুরিকে নিয়ে নতুন এক ফ্ল্যাটে উঠবে বলে কথা দেয় সে। নুরিও রাজি হয়।

কথা দেওয়া যতটা সোজা, সেই কথা কাজের বেলায় আসলে যে কতটা কঠিন, সেটা শৌর্য এরপরেই বুঝতে পারে। তার মতো চাকরি করা মানুষ রাতারাতি একটি ফ্ল্যাট কোথায় পাবে? কিন্তু ভাগ্য ভালো ছিল তার বলতে গেলে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লোকের (পড়ুন দালালের) সাহায্যে খুব কম দামে ৩৫ তলা এক বিল্ডিংয়ে একটি ফ্ল্যাট পেয়ে যায় সে। এই বিল্ডিং এ আর কেউ থাকে না। সেই রাতেই সেখানে চলে যায় সে। পরদিন খুবই অদ্ভুতভাবে নিজের সেই ফ্ল্যাটে আটকে পড়ে সে। মারফিস ল' অনুসারে- "whatever can go wrong, will go wrong"। এরপর থেকে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে তার সাথে। আর এই ফ্ল্যাট থেকে বের হওয়া অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তার জন্য। শৌর্য কি পারবে এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে?

একজন মানুষ একটি ফ্ল্যাটে আটকা পড়েছে আর সেখান থেকে সে কোনো না কোনোভাবে বের হবে, 'ট্র্যাপড' সিনেমার পুরোটাতেই শুধু এই গল্প- এমনটা যদি আপনি ভেবে থাকেন, তাহলে সম্ভবত সেটা ভুল হবে। সিনেমাটিতে অনেক লুকনো ব্যাপারস্যাপার আছে, যেটা একটু মনোযোগী দর্শকদের চোখে পড়বে সহজেই। যেমন- শৌর্য যখন নিজের রুমমেটদের ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে আসতে নেয়, তখন নিজের রুমমেটদের সে বলে যে সে বাড়ি যাচ্ছে কিছুদিনের জন্য। তার রুমমেটদের সেই

ব্যাপারে কোনো আগ্রহ থাকে না। তারা টিভিতে একটি প্রোগ্রাম দেখতে থাকে, যেটি প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকবে তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রোগ্রামটি WildTV নামের একটি চ্যানেলে দেখানো হচ্ছিল। সেই প্রোগ্রামের উপস্থাপক তখন বলে উঠেন- "Never give up. Adventure is not about what happens out there. It is about what happens in here. The brave survive. The weak, they die."

খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এ দুটি লাইন 'ট্র্যাপড' সিনেমার একদম সারাংশ! জীবনে যত কঠিন অবস্থাতেই আপনি পড়েন না কেন, কোনোভাবেই হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। শৌর্য হাল ছাড়েনি বলেই সে বাঁচতে পারে। এমনকি সিনেমাটির পোস্টারেও লেখা আছে- 'Freedom lies beyond fear'।

'ট্র্যাপড' সিনেমাটি পুরোটা বিভিন্ন Irony-তে ভর্তি। Irony যদি খুবই সহজ বাংলায় বোঝাতে চাই, তাহলে এটা আসলে এমন একটা এক্সপ্রেশন যেটা দিয়ে যা বলা হবে বা যা দেখা যাবে, ঠিক তার উল্টো অর্থ প্রকাশ পাবে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। রাজকুমার রাও যে অ্যাপার্টমেন্টে আটকা পড়ে, সেই ফ্ল্যাটের নাম ছিল 'স্বর্গ এপার্টমেন্ট'। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সেখানে সে মোটেও স্বর্গের মতো কোনো পরিবেশ পায়নি, উল্টো তার জীবন নরকে পরিণত হয়েছিল খাদ্য আর পানি ছাড়া। ইংরেজিতে একেই বলে Irony। রাজকুমার রাও যে চরিত্রে অভিনয় করেন, তার নাম ছিল শৌর্য, যার অর্থ সাহস। অথচ আমরা দেখতে পাই এ মানুষটি সামান্য একটা ইঁদুরকে কী পরিমাণ ভয় পায়! একদম উল্টো চিত্র যাকে বলে।

শৌর্য যখন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকে, তখন সেখানে রঙিন কাগজে Welcome লেখা থাকে।(৫ম কমেন্ট এ ছবি) তবে এই স্বাগতম যে মোটেও 'সু' ছিল না, সেটা আমরা সিনেমাতে পরেই দেখতে পাই। সিনেমার একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, ক্ষুধায় কাতর শৌর্য তার সাথে আনা বিস্কুটের প্যাকেটের অবশিষ্ট বিস্কুটগুলোও খেয়ে ফেলে। সেই বিস্কুট কোনো কোম্পানির ছিল সেটা খেয়াল করেছেন কি? সেটা ছিল Good Day কোম্পানির বিস্কুট। অথচ শৌর্যের Day মোটেও Good যাচ্ছিল না, বরং আতঙ্কে যাচ্ছিল। পুরো সিনেমার অনেক অংশেই রয়েছে এরকম Irony।

সিনেমার একটি চমৎকার দৃশ্য হচ্ছে, শৌর্য নিজের এপার্টমেন্টে একটি তেলাপোকা আবিষ্কার করে যেটি উল্টো অবস্থায় শুয়ে ছিল। কিন্তু তেলাপোকাটি বারবার নিজেকে সোজা করার চেষ্টা করছিল। শৌর্য অনেকক্ষণ তেলাপোকাটিকে দেখার পর যখন তাকে সোজা করার জন্য নিজের হাত বাড়াতে নিল, ঠিক তখনই কীভাবে যেন তেলাপোকাটি সোজা হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। এই ঘটনাটি অনেকটা আমাদেরকে ছোটোবেলা থেকে শুনে আসা সেই রবার্ট ব্রুস আর মাকড়শার কথা মনে করিয়ে দেয়। মাকড়শার বারবার ব্যর্থ হয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা যেমন রবার্ট ব্রুসকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, ঠিক তেমনি উল্টো তেলাপোকার সোজা হওয়াটা শৌর্যকে বেশ অনুপ্রেরণা দেয় যে, 'এই তেলাপোকা যদি নিজে সোজা হতে পারে, তাহলে আমার পক্ষেও সম্ভব নিজে এখান থেকে বের হওয়া'। বেশ কিছুদিন পর দেখা যায় তেলাপোকাটি মরে গেছে। তেলাপোকার এই অবস্থা দেখে সম্ভবত শৌর্য সিদ্ধান্ত নেয়, আর যা-ই হোক, আমার এখানে মরে যাওয়া চলবে না, আমার এখান থেকে বের হতে হবে।

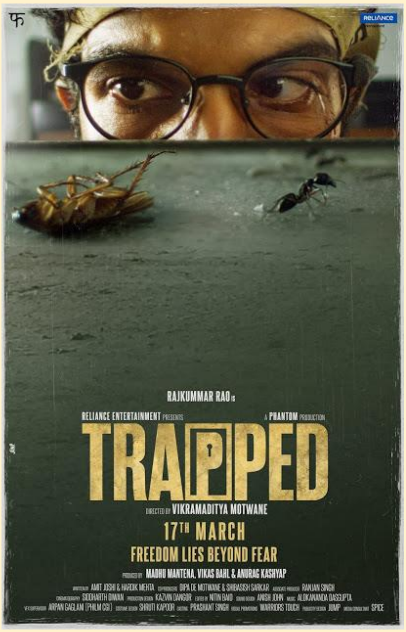

না খেতে খেতে শৌর্য বেশ শুকিয়ে যায়। খালি গায়ে শুধু প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায় সে। চেষ্টা করতে করতে অনেকবারই ক্লান্ত হয়ে যায়। একটা সময়ে বারান্দায় শুয়ে থাকে সে। সেসময় তার শরীরের করুণ অবস্থা দেখা যায়। এতটাই শুকিয়ে গেছে সে যে, তার আন্ডারওয়্যার পর্যন্ত দেখা যায় প্যান্টের উপরের অংশে! খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন- আন্ডারওয়্যারটি ZOIRO ব্র্যান্ডের তৈরি। (৩য় কমেন্ট এ ছবি) এটি একটি ইটালিয়ান ব্র্যান্ড যারা পুরুষের অন্তর্বাস তৈরি করে। মজার ব্যাপার হলো zoiro শব্দটি এসেছে zero শব্দ থেকে। আর দুটি শব্দের অর্থই এক অর্থাৎ- শূন্য। যে দৃশ্যের কথা বলা হচ্ছিল, সেখানে শৌর্যের এই বন্দিদশা থেকে বের হওয়ার আশা ভরসার পরিমাণও শূন্য ছিল। বারবার বের হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হতে তার চোখে ছিল শুধু শূন্য দৃষ্টি!

শহর জিনিসটার কথা বললেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে চাকচিক্য আর মায়া। আমরা যেমন ঢাকা শহরকে স্বপ্নের শহর বলি, মুম্বাইও ঠিক তেমনি একটি স্বপ্নের শহর। কিন্তু সেটাই এই শহরের একমাত্র রূপ নয়। এই শহরের আরেকটি কদর্য রূপ

আছে যেটা 'ট্র্যাপড' সিনেমাতে দেখানো হয়েছে। এখানে সবাই ব্যস্ত, কেউ আপনার দিকে খেয়াল রাখবে না। আপনার চিৎকার কারো কানে যাবে না, আপনি শৌর্যের মতো "ওয়াচম্যান, ওয়াচম্যান" বলে যতই চিৎকার করুন না কেন, সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। এমনকি নিজের রক্ত দিয়ে HELP লিখে কাগজ ছুঁড়ে ফেললেও সেটা দেখে সাহায্য করতে আসা মানুষটা ভয় পায় যে সাহায্য করতে এসে তার নিজের কোনো ক্ষতি হবে না তো? এমনই অদ্ভুত এক যান্ত্রিক জীবন বানিয়েছি আমরা, যেখানে মানবতা শৌর্যের মতোই বন্দি।

মুশকিল অবস্থায় পড়লে মানুষের স্বভাব কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়, সেটাও দারুণভাবে দেখানো হয়েছে এ সিনেমাতে। যে মানুষটা ইঁদুরের ভয়ে কাঁপতে থাকে, সেই মানুষটাই একা ফ্ল্যাটে তার একমাত্র কথা বলার বন্ধু বানায় সেই ইঁদুরটাকে। যে মানুষটা কঠোরভাবে নিরামিষাশী, এমনকি নুরির আথে রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে গেলেও, সেই মানুষটাই নিজের জীবন বাঁচাতে পাখির মাংস খায়। নিরামিষাশী শৌর্যের পাখি মারার আর খাওয়ার দৃশ্য দেখলে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়, যেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করাটা কঠিন।

'ট্র্যাপড' সিনেমাটি একাকীত্বের কথা বলে, আমাদের মানসিক বন্দিত্বের কথা বলে। প্রযুক্তির ওপর আমরা যে কতটা ভয়াবহভাবে বন্দি হয়ে পড়ছি, সেটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় এ সিনেমা। শৌর্য যখন মুক্ত হয়ে নিজের অফিসে ফিরে আসে, তখন দেখা যায় কারো কোনো বিকার নেই। কেউ খেয়ালই করেনি যে একটা মানুষ এতদিন ধরে অফিসে নেই, সবাই তখনও কম্পিউটারে যার যার কাজে বন্দি!

সিনেমাটির শেষ দৃশ্যটা খুবই অসাধারণ আর গুরুত্বপূর্ণ। শৌর্য সেই ফ্ল্যাটে আবার আসে যেখানে সে আটকে পড়েছিল। হয়ত নিজেকে প্রবোধ দিতে যে- **"হ্যাঁ, আমি এরকম একটি জায়গা থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। আমি বন্দি না।"** কিন্তু আসলেই কি তাই? একদম শেষ দৃশ্যে জানালার গ্রিলের প্রতিবিম্ব শৌর্যের মুখে পড়ে, আর ক্লোজ শটে সেটাকে যেভাবে দেখানো হয়, তাতে মনে হয় শৌর্য আসলে বন্দি! শৌর্য নাগরিক জীবনের আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে বন্দি, যতই নিজেকে স্বাধীন মনে করি না কেন আমরা।

পরিচালক বিক্রমাদিত্য আর রাজকুমার রাও এর অসাধারণ কাজের জন্য অনেকদিন এই সিনেমাটি যে কারো মনে গেঁথে থাকবে। এছাড়া টানা ২০ দিন শুধু কফি আর গাজর খেয়ে যে ডেডিকেশন রাজকুমার রাও এই সিনেমার জন্য দেখিয়েছেন, সেটার জন্য তার প্রতি মন থেকে একটা আলাদা শ্রদ্ধা চলে আসে। সিনেমার সিনেমেটোগ্রাফিও চমৎকার!

কেউ ফেরে খালি হাতে

আবুল ফাতাহ

এক.

পাণ্ডববর্জিত এই এলাকায় প্রথম পা ফেলেই আমার মনে হলো - বড় ভুল করে ফেলেছি।

আবছা অন্ধকারে শোয়েব আমার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত হাসি দিল। কারণ অন্ধকারে ওর উজ্জ্বল দাঁতের পাটি ঝিলিক ছাড়া আর কিছু নজরে এল না। আমিও ওর প্রতিউত্তর দিতে চাইলাম কিন্তু তা শেষমেশ কাষ্ঠহাসি হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য শোয়েব তা দেখেছে বলে মনে হয় না।

“কীরে, কেমন লাগছে?” শোয়েব উচ্ছসিত ভঙ্গিতে বলল।

“দারুণ!” এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললাম।

শোয়েব সম্ভবত আমার ব্যঙ্গটা ধরতে পারল না, উল্টো গদ-গদ কণ্ঠে বলল, “বলেছিলাম না!” কথাটা শেষ করেই শোয়েব হাঁটা ধরল।

আমি শোয়েবের পিছু পিছু একটু দূরে দাঁড়ানো ভ্যানটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভ্যানচালক খুব সম্ভব শোয়েবের পূর্বপরিচিত। অন্ধকারে শোয়েবকে চিনতে পারামাত্রই একগাল হেসে আমাদের ভ্যানে উঠে বসার আমন্ত্রণ জানাল।

আমার কাছে তেমন কোন ব্যাগ-পত্র নেই, শুধু একটা মাঝারি আকারের ব্যাকপ্যাক। সেটা ভ্যানের পাটাতনে রেখে ভ্যানের দু”পাশে অবস্থিত ইঞ্চি ছয়েক চওড়া সিটে কোনোমতে পশ্চাৎদেশ স্থাপন করার সাথে সাথেই ভ্যানে টান দিল মাঝবয়সী চালক। উল্টে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম।

শোয়েবদের বাড়ির উঠোনে যখন পৌঁছুলাম তখন আমার হাড়গোড় থেকে ব্যাচেলরের চৌকির মতো খটাখট আওয়াজ আসছে, এক্ষুণি হুড়মুড় করে খুলে পড়ল বলে! আধাপাকা রাস্তার অবস্থা ছিল তথৈবচ। জায়গা জায়গায় ইট সরে গিয়ে বিশাল বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে, তার এক একটাতে ভ্যানের চাকা পড়তেই মনে হচ্ছিল যেন বয়ামে ভরে ঝাঁকাচ্ছে কেউ।

অবশ্য এরপর আদর আপ্যায়নের কমতি হলো না। শোয়েবের ছোট ভাই খুবায়েব প্রায় জোর করেই আমার হাত থেকে ব্যাকপ্যাকটা নিয়ে নিল। শোয়েবের মা বড় একটা ঘোমটার আড়াল থেকে বলল, “আব্বা, হাত মুখ ধুইয়া আসেন, আমি খাবার দিতাছি।” আব্বা ডাকটা শুনতেই ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর বাহিরটা ঠাণ্ডা হলো কলতলায় গিয়ে। চাপকলের পানি যেন বরফজল। মুহূর্তেই ক্লান্তির আধেকটা ঝেটিয়ে বিদেয় করল।

ফ্রেশ হয়ে বারান্দায় রাখা একটা চৌকিতে গিয়ে বসলাম। শোয়েবও এসে পড়েছে। বাড়ির বাকি সবার খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা না এলে এতক্ষণে একঘুম হয়ে যাবার কথা ছিল। শোয়েবের বাবা

একটু অসুস্থ দেখে আর দেরি করেননি। চৌকির উপর মাদুর বিছানো। এখানেই বাড়ির খাওয়া দাওয়া চলে। আমরা বসতে না বসতেই শোয়েবের মা এবং অন্য এক মহিলা পরিবেশন করতে লাগল।

এই বেলা খাওয়া-দাওয়ার একটা বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক মনে করছি। পদের মধ্যে মাছেরই আধিক্য। শোয়েবের বাবার দুটো বড় বড় পুকুর আছে। সেখান থেকেই নানা রকম মাছ পাওয়া যায় সারা বছর। নিজেরা খেয়েও বিক্রি করতে পারে প্রচুর। ওর বাবার মূল পেশা কৃষি। আগে এক সময় নিজে চাষ করলেও এখন সব জমি বর্গা দেয়া। মাছ ভর্তা, মাছের ঝোল, মাছ ভুনা—কয়েক রকম পদের পর এল মুরগি। শুরুতে দু'তিন রকমের ভাজাভুজি তো ছিলই। তবে আমার মনে থাকবে খাবারের শেষে জ্বাল দিয়ে হলুদ করে ফেলা ঘন দুধের পায়েস। মিষ্টি এবং এলাচির পরিমাণ ছিল যথাযথ। পায়েসে এলাচির ভূমিকা স্বর্ণের খাদের মতোই। একটু কম হলে মিষ্টি ঘ্রাণটা আসবে না আর বেশি হলে তো মুখে তোলারই জো নেই।

এমন রাজকীয় খাওয়া দাওয়ার বদৌলতে সারাটাদিন শোয়েব আমাকে দিয়ে যে পরিমাণ ভোগান্তি করিয়েছে তা মাফ করে দেয়া যায়। অবশ্য ওরই বা দোষ কোথায়? গাঁয়ের ছেলে, পরিশ্রম গায়ে লাগে না বড় একটা। আমার মতো শহুরে ননীর পুতুল তো আর না। আমার তেরো পুরুষের বাস শহরে। শুধু এক চাচার বাড়িই ছিল গ্রামে। ছোটবেলায় হাতে গুনে বার কয়েক গিয়েছিলাম। সে স্মৃতিগুলোও ঝাপসা হতে চলেছে। চাচা-চাচি মারা যাবার পর তার দুই ছেলে এখন ঢাকায় সেটল। ফলে গ্রামমুখী হবার বন্দোবস্ত এক রকম বন্ধ। এমন সময় শোয়েব যখন ওর গ্রামের বাড়ি থেকে দুটো দিন ঘুরে আসার প্রস্তাব দিল, ফেলে দিতে পারিনি।

শোয়েব আমার অফিস কলিগ। আমরা একই সাথে একটা আইটি কোম্পানিতে জব করি। বরাবর পোস্ট হবার কারণেই বোধহয় বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। বেশ কয়েকবার আমাদের বাসায়ও এসেছে। হপ্তায় শুক্র-শনি আমাদের ডে অফ। কিন্তু এবার সরকারি ছুটির মারপ্যাঁচে কীভাবে কীভাবে যেন টানা চার দিনের একটা লম্বা ছুটি পেয়ে গেলাম। ছুটির আগের দিন সন্ধ্যায় শোয়েব আমার কিউবিকলে এসে প্রস্তাবটা দেয়। ফলাফল, আজকের এই পাঁচ ঘন্টার জার্নি শেষে এখন লম্বা হয়ে আছি প্রত্যন্ত এক গ্রামে।

ভরপেট খাবার পর শরীর ছেড়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল মাদুর বিছানো চৌকিতেই শুয়ে পড়ি। শোয়েবেরও একই হাল। দেরি না করে শোয়েবের ঘরে চলে আসি আমরা। বড়-সড় কামরায় উল্লেখযোগ্য আসবাব বলতে গ্রামের চিরায়ত ঐতিহ্য ওই প্রমাণ সাইজের খাটটাই। দুজনে হাত পা ছড়িয়ে শোয়া যাবে। শুতেই চোখ লেগে এল। গ্রামীণ কাঁথা, হালকা শীতল আবহাওয়া আর বিশাল বিছানা আমার ঘুমের জন্য উস্কানিমূলক ভূমিকা পালন করল।

সকালের নাস্তা হলো পিঠাপুলি দিয়ে। বেশিরভাগ পিঠা এর আগে আমি কখনও চোখেও দেখিনি। ছেলের বন্ধু-তাও কলেজ ভার্সিটির ইয়ার দোস্ত না, কলিগই বলা চলে-তার জন্য এমন আদর আপ্যায়ন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। আতিথেয়তায় সংজ্ঞা একমাত্র গ্রামের মানুষই রপ্ত করতে পেরেছে ।

খাওয়া সেরে বসে আছি বারান্দার চৌকিতে। শোয়েবের বাবার সাথে খাওয়ার সময়ই পরিচয় হয়েছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেশ দিলখোলা মানুষ। বাড়ির অন্যান্য সদস্যের মতোই বাড়ির কর্তাও আমাকে এক দেখাতেই আপন করে নিয়েছেন। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই একটা বাজারের ব্যাগ হাতে ছুটলেন।

তিনি বিদায় হতেই আমি শোয়েবের দিকে তাকিয়ে বললাম, "হ্যাঁ রে, তোর গ্রামে দেখার মতো কী আছে?"

শোয়েব একগাল হেসে বলল, "কী দেখতে চাস? সব পাবি। ধানক্ষেত, বিশাল বড় বটগাছ, পুকুর, খাল—কোনটা দরকার তোর?"

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, "আরে ব্যাটা! এসব তো সব গ্রামেই থাকে, তোর গ্রামের স্পেশালিটি কী? এমন কিছু বল যেটা অন্য গ্রামে নেই।"

শোয়েব যেন অকূলপাথারে পড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়ে, মাথা চুলকে ও যেটা বলল সেটা শুনে আমি বিষম খেতে বসলাম।

"এক বাবা আছে।"

"তোর বাবা গ্রামে থাকে সে তো জানিই।"

"গাধা! ওই বাপ না রে!" শোয়েব হেসে ফেলল, "ফকির দরবেশ টাইপ। গ্রামের মানুষ ভক্তি করে বাবা ডাকে।"

"অ।"

আমি ঠোঁট ওল্টালাম দেখে শোয়েব বলল, "এভাবে তাচ্ছিল্য করিস না। অনেক কামেল লোক। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষজন তার কাছে তদবির নিতে আসে।"

আমি মাছি তাড়ানোর মতো শোয়েবের কথাটা উড়িয়ে দিলাম। "সব ভন্ড! পিটিয়ে এদের পাছার ছাল তুলে ফেলা উচিত।"

বলেই বুঝলাম, এতোটা রুক্ষ না হলেও পারতাম। হিন্দিতে একটা কথা আছে—গলির কুত্তা বাঘ হয়। এই বাবাও হয়তো এই গ্রামের বাঘ। লোকে সম্মান করে।

আমার কথায় যথেষ্টই আহত হয়েছে শোয়েব। তোম্বা মুখে বলল, "তুই না দেখে এভাবে বলতে পারিস না। তোর কি কোন পীর ফকিরের সাথে পারসোনাল শত্রুতা আছে নাকি!"

শেষের কথাটা শোয়েব হালকা চালে বললেও প্রসঙ্গটা এসে যাচ্ছে দেখে আমি তড়িঘড়ি বললাম, "সরি রে, এভাবে বলা ঠিক হয়নি। আসলে এসবে আমার বিশ্বাস নেই তো।"

শোয়েব এরপর একটু বিরতি নিয়ে বলল, "আমাদের গ্রামে না থাকলেও এক গ্রাম পরে একটা জমিদার বাড়ি আছে। যাবি নাকি?"

কাল অমন দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু পাড়ি দিয়ে এসে আজ আর পাশের গাঁয়ে যাওয়া পোষাবে না। আবার বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকতেও মন সায় দিচ্ছে না। অগত্যা বললাম, "না রে, তার চাইতে চল তোর দরবেশ বাবাকেই দেখে আসি। দেখি, কেমন কাবিল লোক!"

"এক শর্তে নিতে পারি।" শোয়েব শুকনো গলায় বলল। "ওখানে গিয়ে আউল ফাউল বকতে পারবি না।"

আমি হেসে ফেললাম।

দুই.

শোয়েবদের বাড়ি থেকে বাবার দরবারে আসতে মিনিট পনেরো লাগল। গ্রামের এদিকটাতে ঘরবাড়ি পাতলা। মেঠোপথ ছেড়ে একটা পায়ে হাঁটা পথ বাঁ দিকে কিছুটা এগিয়ে একটা উঠোনে গিয়ে মিশেছে। উঠোনসহ বাড়ির চৌহদ্দি মাটি থেকে ফুট দুয়েক উঁচু। বারান্দাসহ মূল বাড়িটা টিনের। লাগোয়া রান্নাঘর। উঠোনে লম্বা করে কয়েকটা মাদুর বিছানো। সেইসব মাদুরে বসে আছে জনা বারো

মানুষ। একটা বিষয় দেখে চমৎকৃত হলাম, উঠোনে কোনো মহিলা নেই। সবাই পুরুষ। আজ কি কোনো মহিলা আসেনি? না, তা হতে পারে না। বাংলাদেশের ভণ্ড পীরেরা যে দুটো খেয়ে পরে বেঁচে আছে তার বেশিরভাগ কৃতিত্ব নারীকে দিতেই হবে। মহিলারাই এদের প্রধান অডিয়েন্স। তাহলে এখানে কি মহিলাদের আসা নিষেধ নাকি তাদের বসার আলাদা ব্যবস্থা? যেটাই হোক, তাতে এই বাবা একটা সাধুবাদ পেতেই পারেন।

আমি শোয়েবের দিকে গলা বাড়িয়ে নিচু গলায় বললাম, "এখানে মহিলাদের আসা নিষেধ নাকি?"

"হ্যাঁ, মহিলারা তদবির নিতে চাইলে বাড়ির পুরুষ মানুষকে পাঠাতে হবে।"

"দারুণ ব্যাপার তো! কারণ কী, জানিস নাকি?"

"হলফ করে বলতে পারব না কিন্তু শুনেছি বাবার বেগম নাকি মারাত্মক সুন্দরী। বউয়ের নিষেধ, মেয়েছেলের তদবির করা যাবে না।"

"বাবার চেয়ে তো বাবার বউয়ের ক্ষমতা বেশি দেখা যাচ্ছে, লোকে তার থেকে তদবির নিলেই পারে!" আমি দাঁত বের করে বললাম।

শোয়েব চোখ পাকিয়ে আমাকে ওর পিছু নিতে ইঙ্গিত করল।

শোয়েবের পিছু পিছু ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, বারান্দায় মিচকা টাইপের এক লোক চেয়ার পেতে বসে আছে। পরনে ওভার সাইজ পাঞ্জাবি, সবুজ লুঙ্গি আর মাথায় কিশতি টুপি। বুঝলাম, লোকটা বাবার কম্পাউন্ডার। সিরিয়াল অনুযায়ী এক এক করে রোগী ভেতরে পাঠাচ্ছে। আচ্ছা, এদের সবাইকে কি রোগী বলা যায়? না বোধহয়।

গ্রামে শোয়েবদের খানিক প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বোধহয়। কম্পাউন্ডার আমাদের দেখামাত্রই উঠে দাঁড়াল। সালাম দিল।

"গোলাম নবী, এ হলো আমার বন্ধু সোহেল। ঢাকা থেকে এসেছে। বাবার সাথে একটু দেখা করতাম। করা যাবে?" শোয়েব বলল লোকটার উদ্দেশে।

"যাইব না কেন, নিশ্চই যাইব। অ্যার পরেই আপনেগো সিরিয়াল।" দাঁত বের করে বলল গোলাম নবী।

শোয়েব কথা না বলে হাসল। এই ফাঁকে আমার নজর চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। সেখানে মাঝ বয়সী এক মহিলা রান্না করছেন। এ মহিলা অতি অবশ্যই হুজুরের বউ নন। সম্ভবত বাড়ির কাজকর্ম এই মহিলাই দেখাশোনা করেন। হুজুরের আমদানি নিশ্চয়ই মন্দ না। বউকে রাণির হালে রাখতেই পারেন।

আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট দশেক পরেই ভেতর থেকে একজন লোক বের হতেই গোলাম নবী আমাদের ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল।

"আয়," বলে শোয়েব পা বাড়াল। আমি ওর পিছু নিলাম।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা দিতেই আতরের কড়া গন্ধে মাথা ঝাঁ করে উঠল। বাইরের রোদ থেকে ভেতরে আসায় দৃষ্টি পরিষ্কার না। আমি চোখ পিট পিট করলাম। আস্তে আস্তে নজরে এল ভেতরের দৃশ্য। জায়গাটা বেশি বড় না। একটা চৌকি কোনোমতে বিছানো হয়েছে। জায়গাটা সম্ভবত শুধুমাত্র তদবিরের জন্যই ব্যবহৃত হয়, অন্দরমহল আরো ভেতরে।

চৌকির সামনে একটা চেয়ার পাতা দর্শনার্থীদের জন্য। বাবা নিজে পদ্মাসনে বসে আছেন চৌকিতে। ধবধবে সাদা জুব্বা বেয়ে আমার দৃষ্টি ভদ্রলোকের চেহারায় নিবদ্ধ হলো। একটা ছোট খাট ধাক্কা খেলাম। আমার ধারণা ছিল, বাবার বয়স নিদেনপক্ষে চল্লিশ তো হবেই, ধবলকেশ কোনো বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখলেও অবাক হতাম না। অথচ তার পরিবর্তে বসে আছে প্রায় আমাদেরই সমবয়সী এক... হ্যাঁ, যুবক বলা যায় তাকে। টেনেটুনে পঁয়ত্রিশ হবে হয়তো বয়সটা।

আমাদের দেখে বাবা... নাহ, এই ভাইয়ের বয়সী ভদ্রলোককে আর যাই হোক, বাবা বলা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না। আমি বরং হুজুর বলেই সম্বোধন করি তাকে। হুজুর আমাদের দেখে স্মিত হাসলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথার ভেতরে যেন কীসের বিস্ফোরণ ঘটল! হাসিটা আমার খুব পরিচিত। বিদ্যুৎচমকের মতো আমি চিনে ফেললাম আমার সামনে বসা মানুষটাকে। মাথায় একগাদা স্মৃতি মেইলট্রেনের যাত্রীদের মতো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

বসে পড়তে পারলে ভালো হতো কিন্তু আর এক মুহূর্তও এখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই। আমি তীরবেগে বেরিয়ে এলাম ঘরটা ছেড়ে। তার এক সেকেন্ড পর বিহ্বল শোয়েব আমার পথ ধরল।

তিন.

আমি আর শোয়েব বসে আছি একটা গাছের নিচে। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। ধাতস্থ হতে চনমনে বাতাস বেশ ভূমিকা রাখল।

আমাদের থেকে একটু দুরেই একটা মুদি দোকান। দোকানের টিভিতে মান্নার একটা ছবি চলছে। সামনের বেঞ্চিতে বসে থাকা চারজন দর্শক মুগ্ধ নয়নে মান্না কর্তৃক ডিপজলকে ফর্দাফাই হতে দেখছে।

"চা খাবি?" বসার মিনিট পাঁচেক পর শোয়েব প্রস্তাব দিল। আমি জবাব দেয়ার আগেই সে নিজেই কৈফিয়তের সুরে বলল, "চা কেমন জানি না।"

"সমস্যা নেই, চলবে।"

আমি সায় জানাতেই শোয়েব উঠে গেল। একটু পরেই দুটো কাপে রং চা নিয়ে ফিরে এল। হাতে নিতেই দেখলাম, তেজপাতার টুকরো ভাসছে। চুমুক দিলাম। মন্দ না, মিষ্টি একটু বেশি।

ঠোঁট থেকে কাপ নামাবার আগেই অবধারিত প্রশ্নটা চলে এল শোয়েবের পক্ষ থেকে।

"ওভাবে চলে এলি কেন? তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, বাবাকে তুই আগে থেকে চিনিস।"

"বাবা বাবা করিস না তো।" আমি ধমকে উঠলাম।

"ঠিক আছে, আর করব না, বাবা..." বলেই জিভ কাটল শোয়েব।

আমি ওর মুখের ভঙ্গি দেখে হেসে উঠলাম।

পরিবেশ খানিক হালকা হতেই শোয়েব আমাকে ক্যাঁক করে চেপে ধরল। একেবারে কচ্ছপের কামড়। ছাড়া ছাড়ি নেই। অগত্যা হাল ছেড়ে দিলাম। তবে শোয়েবকে ঘটনা বলার আগে আমার কিছু তথ্য জানা দরকার।

"আচ্ছা, বলছি। তার আগে বল তো হুজুরের নামটা কী? বাড়ি কি এখানেই?"

"আরশাদ। আগে পরে কী আছে জানি না। নাম ধরে তাকে আর কেউ ডাকে না। ছোট বড় সবাই তাঁকে হয় "বাবা" নয় "হুজুর" বলে। হ্যাঁ, বাড়িও এখানেই। ওই বাড়িতেই তাঁর বাবা-মা থাকত। বাবা অনেক আগেই মারা গেছে। মা মারা যায় বছর দুই আগে।"

“হুম, এতক্ষণে নিশ্চিত হলাম। একেবারে কংক্রিট প্রুফ। এবার আসল কথা বলি, তোদের আরশাদ হুজুর পাক্কা একটা ভণ্ড। জোচ্চোর।”

“কী বলছিস এসব?” আহত শোনাল শোয়েবের গলা। সারা এলাকার লোক মানুষটাকে ভক্তি করে। লোকের উপকার না হলে কি তেরো চোদ্দ বছর ধরে এই কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তুইই বল?”

“হুম, তারমানে ওই জোচ্চুরির পর সোজা এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে।”

“একটু ঝেড়ে কাশ তো, ভাই।” চায়ে জোরে করে একটা চুমুক দিল শোয়েব। কণ্ঠের বিরক্তি প্রকাশ পেল রুক্ষ চুমুকেও।

“আচ্ছা, শোন।” আমি আর ভণিতার মধ্যে গেলাম না। “প্রায় পনেরো বছর আগে-তখন আমার বয়স কতোই বা হবে, এই ধর, সতেরো আঠারো-আমরা যে এলাকায় থাকতাম সেই এলাকার মসজিদের মুয়াজ্জিনের সাথে আমাদের বেশ ভালো খাতির ছিল। যখনকার কথা বলছি, তখন ওই বয়সী ছেলেপেলেরা নামাজ কালাম পড়ত মসজিদে। মুয়াজ্জিন সাহেবের বয়সও আমাদেরই মতো ছিল। হয়ত বছর দু”তিনের বড় হবে। এজন্যই একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই মুয়াজ্জিন সাহেব আবার টুকটাক তাবিজ কালামের পাশাপাশি এক মাদ্রাসায় ফাজিল প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করত। তার কথায় একটু পর আবার আসছি, এখন রাকিবের কথা বলা যাক। রাকিব আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ওর বাবা ফটো স্টুডিও চালাত। মাঝে মাঝে রাকিবও বসত দোকানে। ওখানেই আমরা বন্ধুরা আড্ডা দিতাম মাঝে মাঝে। তো একদিন আমি আর রাকিব বসে আছি। রাকিব ফটোশপে ছবি এডিট করছিল। আমি গল্প করতে করতে ওর কাজ করা দেখছিলাম। এমন সময় একটা ছবি দেখে আমার পিঠ খাড়া হয়ে গেল। এক অপূর্ব সুন্দরী কিশোরীকে স্ক্রিনে দেখতে পেলাম। বয়স আমাদের মতোই হবে, কিন্তু সারল্য এখনও যায়নি মেয়েটার চেহারা থেকে।

রাকিবকে বললাম, মেয়েটার পরিচয় বের করতে। রিসিট দেখে জানতে পারলাম মেয়েটার নাম সুমাইয়া। আমাদের করিম চাচার মেয়ে। এ কারণেই মেয়েটাকে আগে কখনও দেখিনি। করিম চাচা ছিলেন খুবই ধার্মিক মানুষ। এলাকাবাসী শুধু জানত তাঁর দুটো মেয়ে আছে কিন্তু কেউ কখনও দেখেনি। দুজনই কঠোর পর্দা করত। সুমাইয়া হলো তাঁর ছোট মেয়ে। সম্ভবত কোনো অফিশিয়াল কাজের জন্য কন্যার ছবি তোলার দরকার হয়ে পড়েছিল।

আমি রাকিবকে বললাম, ছবির একটা কপি আমাকে দিতে। ও তো কিছুতেই দেবে না। ওর বাবা জানতে পারলে ওকে নাকি স্রেফ কেটে ফেলবেন। ঘটনা সত্য। ওর বাবা রাগী মানুষ ছিলেন। কিন্তু ছবি তো আমার চাই। পকেটে যা ছিল, সব বের করে কোনোমতে ওকে রাজি করালাম একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে।

ছবি তো পেলাম কিন্তু আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। দিন রাত ছবিটা বুক পকেটে রাখতাম। মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতাম। মনে হতো, সুমাইয়াকে না পেলে আমি বাঁচব না। খুব অস্থির লাগত। এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করল রাকিবই। বলল, আমাদের মুয়াজ্জিন সাহেব তো তাবিজ কালাম করেন। তার কাছে নিশ্চয়ই বশীকরণ টাইপ কোনো টোটকা থাকবে। আমার কাছে পরিকল্পনা খুব একটা জাতের মনে না হলেও আর কোনো রাস্তা ছিল না। অগত্যা একদিন আছরের নামাজের পর মুয়াজ্জিন সাহেবকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, করা যাবে কিন্তু একটু বেশি খরচাপাতি হবে। পাঁচ হাজার। সাথে যাকে বশ করব তাঁর পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি।

শুনে আমার বুক শুকিয়ে গেল। না, ছবির জন্য না। ছবি তো ছিলই কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা আমি কোথায় পাব? আমি তখন নিতান্তই কিশোর। হপ্তায় পকেট খরচা পাই সাকুল্যে একশ টাকা। জমানো সবটাই গেছে রাকিবের থেকে ছবিটা খসাতে। বুঝে ফেললাম, সুমাইয়াকে আমার আর পাওয়া হবে না। কিন্তু মন তো আর সায় দেয় না। আমার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করতাম না। বাবা মা ভাবল আমার অসুখ করেছে। ডাক্তার-ফাক্তার দেখানো হলো। কিন্তু অসুখটা যে কোথায়, তা তো আমি জানি!

প্রায় মাসখানেক পর ঘটনাটা ঘটল। একদিন খাটের নিচে বল খুঁজতে গিয়ে মায়ের একটা স্বর্ণের আংটি খুঁজে পেলাম যে আংটি অনেক আগেই হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। যখন হারায় তখন পুরো বাড়ি তন্ন তন্ন করে ফেলা হলেও আংটিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই আংটি আমি কীভাবে পনেরো টাকার টেনিস বল খুঁজতে গিয়ে পেলাম, সে রহস্যের কিনারা আজও হয়নি।"

আমি দম নেয়ার জন্য একটু থামলাম। শোয়েব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নিশ্চয়ই ভাবছে, কোথাকার কোন সুমাইয়া আর আংটির সাথে আরশাদ হুজুরের সম্পর্ক কী!

আমি আবার খেই ধরলাম।

"এরপরের ঘটনা বুঝতেই পারছিস। আংটিটা আট হাজার টাকায় বিক্রি করি। সেদিন বিকালেই আমি টাকা আর ছবি নিয়ে হাজির হই মুয়াজ্জিন সাহেবের দরবারে। মুয়াজ্জিন সাহেব সব দেখে শুনে বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। শুনে আমি নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলাম।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পরদিন শুনতে পেলাম, মুয়াজ্জিন সাহেব চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। সাথে নিয়ে গেছে আমার পাঁচ হাজার টাকা আর সুমাইয়াকে বশ করার স্বপ্ন।"

"সবই বুঝলাম, এর সাথে আরশাদ হুজুরের সম্পর্ক... দাঁড়া, এক মিনিট... তারমানে তুই বলতে চাচ্ছিস, তোদের মুয়াজ্জিন সাহেবই আরশাদ হুজুর?!"

আমি শুধু হাসলাম। শোয়েব জবাব পেয়ে গেল।

"আনবিলিভেবল! আমি বিশ্বাস করি না। ছোটবেলা থেকে আমি আরশাদ হুজুরকে দেখে আসছি। অনেক দারিদ্রতার মধ্যে বড় হলেও কখনও অন্যায় কিছু করতে দেখিনি। সেই মানুষ তোর পাঁচ হাজার টাকা মেরে দেবে?"

"বন্ধু, যখনকার কথা বলছি তখন পাঁচ হাজার টাকা অনেক ছিল। আর বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্পূর্ণ তোর উপর। আমি কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না তোকে।"

শোয়েব ধন্দে পড়ে গেল। আমাকে চেনে ও। জানে, এ ধরনের মিথ্যা আমি কখনই বলব না। অপরদিকে আজীবন ধরে বিশ্বাস করে আসা একজন মানুষকে মিনিটের ব্যবধানে জোচ্চর বলেও মেনে নিতে পারছে না।

হঠাৎ ঝপ করে দাঁড়িয়ে গেল শোয়েব। কঠিন গলায় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর কণ্ঠ শুনে। "কোথায়?"

"হুজুরের বাড়িতে।"

"দেখ, আমি আগেই বলেছি...।"

"তোর কথা আমি শুনতে চাই না," আমাকে থামিয়ে দিল শোয়েব, "আমি তোদের দুজনকেই অনেক বিশ্বাস করি। দুজনের মধ্যে কেউ তো অবশ্যই মিথ্যা বলছে। আমার নিজের স্বার্থেই ব্যাপারটা

পরিষ্কার হওয়া দরকার। নইলে তোদের দুজনকেই আমি বাকিটা জীবন অবিশ্বাসের চোখে দেখব। দুজনকে অবিশ্বাস করার চাইতে একজনকে বিশ্বাস করা ভালো।”

আমি মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেলাম। না হবার কারণ নেই। আমি জানি, এইমাত্র যে ঘটনা আমি বলেছি তাতে এক রত্তি মিথ্যা নেই।

চার.

আজকের দিনে দ্বিতীয়বারের মতো প্রবেশ করলাম আরশাদ হুজুরের দরবারে।

দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে এজন্যই বোধহয় দর্শনার্থী আর নেই। আমরা যখন ঢুকি, আরশাদ হুজুর তখন তার গদি ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই থমকে গেলেন। অস্বস্তিকর কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর সেই স্মিত হাসিটা ফিরে এল তাঁর ঠোঁটে। হাসিটা মুখে ঝুলিয়েই তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন।

“কেমন আছো, সোহেল?”

আমি না তাকিয়েও শোয়েবের অবস্থা বুঝতে পারলাম। আরশাদ হুজুরের এই সম্ভাষণই বুঝিয়ে দেয়, তিনি আমাকে খুব ভালোমতোই চেনেন। বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে।

শোয়েব কঠিন গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন আরশাদ হুজুর।

“খাবারের সময় হয়ে গেছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, তোমরা আবার আসবে। এজন্য খাবার একটু বেশি করে রাঁধতে বলেছি। আসো, খেতে খেতে আলাপ করি।”

হাহ! স্টান্টবাজি আর কাকে বলে! আমি মনে মনে বললাম। এসব স্টান্টবাজি দেখিয়েই গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোকে ভাঁড়িয়ে খাচ্ছে ভণ্ড হুজুরটা। আমরা যে ফিরে আসব, সেটা বোঝার জন্য নাসার সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। তবে মুখে কিছু বললাম না। হুজুরের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে ভেতরের ঘরে প্রবেশ করলাম আমি আর শোয়েব। ভেতরে তিনটে কামরা। তারই একটার মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে খাবারের ব্যবস্থা। আটপৌরে আয়োজন, গত দুবেলা গুরুপাকের পর এই খাবার দেখে বসে পড়তে দেরি করলাম না।

হুজুর নিজেই সব এগিয়ে দিতে লাগলেন। এরমধ্যেই শোয়েবের সাথে কুশল বিনিময় হলো। তিনজনের পাতে খাবার পৌঁছুতেই শুরু করার ইঙ্গিত করলেন আরশাদ হুজুর। আমি করলা ভাজিটা দিয়ে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলতে যাবার আগেই আসল কথা পাড়লেন তিনি।

“আমার উপর রাগ করে আছো, তাই না সোহেল?”

আমি মৃদু হেসে বললাম, “সত্যি করে বললে, না। ওসব কথা অনেক আগেই ভুলে গেছি। আজ আপনাকে এভাবে হুট করে দেখতে পেয়ে মাথাটা গরম হয়ে গেছিল। একটু ওভার রিয়াক্ট করে ফেলেছি। আপনি শোয়েবকে সত্যিটা বলে অন্যায় স্বীকার করে নিলে আর কোনো খেদ থাকবে না। গ্রামের মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আমি সে শ্রদ্ধায় বাগড়া দেব না।”

আরশাদ হুজুর হাসলেন।

“বলছি। তুমি যেদিন আমার কাছে সুমাইয়াকে বশ করার প্রস্তাব নিয়ে আসো, আমি ভেতরে ভেতরে খুব মজা পেয়েছিলাম। মানুষকে বশ করার বিদ্যা আমার জানা ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল তাই সরাসরি তোমাকে নিষেধ না করে ছবি আর টাকার শর্ত জুড়ে দিলাম। করিম সাহেবকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়ের ছবি তোমার পক্ষে যোগার করা অসম্ভব বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু কে জানত, মেয়েটার ছবি পকেটে নিয়েই সেদিন আমার কাছে এসেছিলে। দ্বিতীয় বাধা ছিল—টাকা। ছবি যদি কোনোভাবে ম্যানেজ করতেও পারো, টাকাটা যে

পারবে না সেটা এক প্রকার নিশ্চিতই ছিলাম। কিন্তু একমাস পরে যখন ছবি আর টাকা নিয়ে আমার কাছে এলে, আমি খুবই চমকে যাই। কীভাবে তোমাকে ফিরিয়ে দেব বুঝতে পারছিলাম না। তাই এক সপ্তাহ সময় নিলাম। ভেবেছিলাম এরমধ্যে কিছু একটা বলে তোমাকে মানিয়ে নিতে পারব। টাকাটাও ফেরত দিয়ে দেব। কিন্তু সেদিন রাতেই খবর পাই, আমার বাবা মারা গেছেন। আমার কোনো ভাই বোন নেই। এই বাড়িতে শুধু বাবা মা-ই থাকতেন। বাবা মারা যাবার পর মা'র একা একা এখানে থাকা অসম্ভব। তাই সেদিনই আমি চাকরি ছেড়ে একেবারে গ্রামে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেই। সব কিছু এত দ্রুত ঘটে যায়, অন্য কোনো চিন্তাও মাথায় আসেনি। ভেবেছিলাম, তোমার টাকাটা মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে রেখে আসব। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার টাকার খুব প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া টাকাটা অন্য কারো হাতে দিলে তোমার ফ্যামিলির জেনে যাবার সম্ভাবনা ছিল। সাত-পাঁচ ভেবে টাকাগুলো নিয়েই চলে আসি। তুমি হয়তো জানো না, এর মাসদুয়েক পরে আমি আবারও তোমাদের এলাকায় যাই। টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তোমাদের বাসায় গিয়ে জানতে পারি, তোমরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছো।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামলেন আরশাদ হুজুর।

আমি আড়চোখে শোয়েবের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তার বুক থেকে বিশাল এক পাথর নেমে গেছে। এতক্ষণ ধরে নিশ্চয়ই ভাবছিল, আজকের পর থেকে আমি অথবা আরশাদ হুজুরের মধ্যে থেকে একজনের সাথে ওর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আমাদের মধ্যে কেউ একজন অবশ্যই মিথ্যা বলছে। ভাবতে পারেনি, একই সাথে আমরা দুজনেই যার যার জায়গায় সঠিক হতে পারি।

কিন্তু আমি শোয়েবের মতো অতো নির্ভার হতে পারছি না। এক ধরনের মিশ্র অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এতোদিন যাকে জোচ্চোর বলে ভেবে এসেছি, মুহূর্তের মধ্যে তাকে ফেরেশতা ভাবতে মন সায় দিচ্ছে না। হয় এমন। মানুষ দীর্ঘদিনের ভাবনা এক লহমায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে না। কিন্তু আরশাদ হুজুরের কথা অবিশ্বাসও করতে পারছি না। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব। এতোদিনের ঘৃণার আসন থেকে মানুষটাকে সরিয়ে দেবার আগে শেষ একটা ধাক্কা দেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। বাঁকা হেসে বললাম, "ঠিক আছে, সবই মেনে নিলাম। কিন্তু আপনার যে আসলে কোনো ক্ষমতা নেই সেটা কিন্তু স্বীকার করে নিলেন। অর্থাৎ এখানে যা করছেন সেটা এক ধরনের লোক ঠকানো।"

আরশাদ হুজুর হেসে উঠলেন। এবার খানিকটা শব্দ করে।

"মানুষ বশ করার ক্ষমতা হয়তো নেই কিন্তু আল্লাহ'র কাছে চাইবার ক্ষমতা তো আছে। এটা সবারই থাকে কিন্তু সবাই চাইতে জানে না। আমি হয়তো কিছু কিছু জানি।"

"তাহলে সুমাইয়ার ব্যাপারে চাননি কেন? আর কিছু না হোক, একটু দোয়া তো অন্তত করতে পারতেন আমার জন্য।"

"কে বলল চাইনি? দোয়ার পাশাপাশি দাওয়ারও ব্যবস্থা করেছিলাম। বাবা মারা যাবার দু"মাস পরে তোমাদের এলাকায় আমার যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সুমাইয়ার বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া।" একটু বিরতি দিয়ে শান্ত স্বরে আরশাদ হুজুর বললেন, "তোমার দেয়া ছবিটা দেখে আমিও তোমার মতোই মেয়েটার প্রেমে পড়ে যাই। সুমাইয়াকে আমি খুব করে চেয়েছিলাম। তবে তোমার জন্য না, সোহেল, আমার নিজের জন্য।"

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

এরমধ্যেই আরশাদ হুজুর হাঁক ছাড়লেন, "খালাকে দিয়ে পায়েসের বাটিটা পাঠিয়ে দাও তো, সুমাইয়া!"

ফ্যান

হাফিজুর রহমান রিক

উগান্ডা বিরিয়ানি হাউজ থেকে ফুল প্লেট বিরিয়ানি খেয়ে বের হয়েছি একটা কোকাকোলা কিনতে। বিরিয়ানির দোকানে ড্রিংকসের দাম দশ টাকা বেশি রাখে। পাশেই কনফেকশনারি আছে, তাই ভাবলাম টাকাটা বেঁচে যাবে। তাছাড়া ড্রিংকসের বোতল খুলে দিলে নাকি ওয়েটারকে টিপস দিতেই হয়, এইটাই নাকি নিয়ম। এমনিতেও দিনকাল ভালো চলছে না, টাকাপয়সা তেমন নেই। অভাবের দিনে দশটাকা বাঁচলে তা কম কীসে?

উগান্ডা বিরিয়ানি হাউজ থেকে বের হওয়া মাত্রই চার-পাঁচজন সুঠামদেহী লোক এসে আমাকে চ্যাংদোলা করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রোবাসটির দিকে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি, থ মেরে গিয়েছি। আমার মতো ছাপোষা লোককে কে কিডন্যাপ করবে? আসলেই কিডন্যাপ হচ্ছি বুঝে যখন চিৎকার করলাম আশেপাশের কিছু লোক দৌড়ে এলো। সুঠামদেহীরা ডিবি পুলিশ পরিচয় দিতেই সবাই যে যার মতো চলে গেল। আমিও চুপসে গেলাম।

আমার মনে নানান দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। ডিবি পুলিশ কেন আমাকে ধরবে? ফেইসবুকে রাজনীতি নিয়ে রসিকতা করায়? আমি তো সিরিয়াস কিছু লিখিনি! রাজনীতি নিয়ে কয়েক লাইন ঘুরায় প্যাঁচায় স্যাটায়ার লিখে নিজের হিউমার দেখাই। ফ্যান ফলোয়াররা *সেই হইছে ভাই, কঠিন হিউমার আপনের* বলে কমেন্ট করে ফাটায় ফেলে। আমার খুব আনন্দ লাগে যখন কেউ বলে আমার হিউমার অন্য লেভেলের। এই তো কিছুক্ষণ আগেই স্ট্যাটাস আপডেট করলাম,

“দেশ তো আইসিটিতে এগিয়ে যাচ্ছেরে মমিন, মন্ত্রী সাহেবের ভ্যারিফাইড আইডিও হ্যাক খায়। তা মন্ত্রীসাবের কি কাজের লোক নাই?”

মনের ভিতরে খচখচানি শুরু হয়ে গেছে। ভয় পেলে আমার পেশাব চাপে। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড পেশাব ধরেছে। মূত্রত্যাগের কথা বললে কি এরা ছাড়তে দিবে? ডানপাশের সুঠামদেহীকে করুণ চোখে বললাম, “ভাই আমাকে কি গুম করে দিবেন?”

“চুপ থাকুন। যা বলার অফিসে গিয়ে বলবেন।”

“ভাই একটা স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্যে কাউকে এভাবে ধরে? আমি তো খারাপ কিছু লিখি নাই।”

“স্ট্যাটাস কী?”

“আপনি ফেইসবুক চালান না? স্ট্যাটাস কি জানেন না? কোন দুনিয়াতে থাকেন? আপনাদের চাকরি দিল কোন শালা? এজন্যেই তো না বুঝে আমাকে ধরেছেন। স্যাটায়ার বুঝে না আসছে ডিবি

পুলিশে চাকরি করতে। আমাকে চিনেন? জানেন আমি কে? আমি ফেইসবুক সেলেব্রেটি। একটা স্ট্যাটাস দিলে হাজার লাইক, শত কমেন্ট পড়ে। আমি স্ট্যাটাস দিয়ে একটা ইস্যু দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। সবাই ছাগলের বাচ্চার মতো সেই ইস্যু নিয়ে ফালাফালি করে। আমার পাওয়ার জানেন আপনি?"

বামপাশের সুঠামদেহী ঠাস করে আমার বাম গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, "চুপ থাক মাদারী। একবারে পিছন দিয়া লাইক কমেন্ট ভইরা দিমু। ঐ ছটু, কষ্টেপ দে হালার মুখ আটকায় দিব।"

ছটু আবার কেমন নাম? ছোটন হতে পারে বড়োজোর। এই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে খুব তাগাদা দিচ্ছে মন, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে আবার মারবে। তারচেয়ে চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া আমি অনেক বুদ্ধিমান। হাজার হলেও ফেইসবুক সেলেব্রেটি। সেলেব্রেটি হওয়া কি এতই সোজা?

ছটু স্কচ টেপ এগিয়ে দেয়। আমি সামান্য সাহস সঞ্চয় করে বলি, "ভাই একটু মুতা যাবে? খুব চেপেছে ভাই। ব্লাডার ফেটে যাবে। গাড়িটা একটু থামান প্লিজ ভাই।"

বামপাশের সুঠামদেহী মুচকি হাসি দিয়ে বলল, "ঐ ছটু মাদারীরে খালি বোতলটা দে।"

আমি বোতল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। গাড়ি থামায় না। আমি সেলেব্রেটি মানুষ, বোতলে মুতা আমার সাজে না। চাপে পরে না হয় করলাম, যদি ছবি তুলে সম্পদের ছবি ফেইসবুকে দিয়ে দেয়? আমার ইজ্জত থাকবে? বামপাশের লোকটি ধমক দিয়ে বলে, "কীরে মুতস না কেন?"

আমি কেঁপে গিয়ে বলি, "ভাই চলে গেছে।"

বামপাশের সুঠামদেহী আবার সজোরে চড় মেরে বললেন, "মাদারী বোতল থাকতে প্যান্ট ভিজাইলি কেন? গাড়ির মালিক এখন পাঁচশ বেশি নিব সিট ধুইতে।"

আমি বিরস বদনে বলি, "ভাই অনেক জোরে ধমক দিয়েছেন। ভয়ে হয়ে গেছে।"

যেহেতু আমি সেলেব্রেটি এবং অনেক চালাক সেহেতু 'গাড়ির মালিক' কথাটা শুনে বুঝে ফেললাম এরা ডিবি না। এরা আমাকে কিডন্যাপ করছে। কিন্তু আমাকে কেন কিডন্যাপ করবে? আমার বাবার কাছে মুক্তিপণ চাইলে বড়োজোর ত্রিশ হাজার টাকা মিলবে। তাও আবার মাস শেষ না হলে স্যালারি পাওয়ার আগে দিতে পারবে না।

হবু শ্বশুরকে বললে অবশ্য লাখ বিশেক একদিনেই ম্যানেজ হয়ে যাবে। শত হলেও বড়োলোকের মেয়ে পটে গেছে। কিন্তু তিনি কেন টাকা দিবেন? তিনি তো জানেনই না আমি তার মেয়ের সাথে প্রেম করি। আচ্ছা তিনিই কি ঘটনা জানতে পেরে লোক দিয়ে আমাকে গুম করাচ্ছেন? আমাকে বললেই তো হতো, লাখ দুয়েক টাকা দিলেই ব্রেকআপ করে ফেলতাম। কিছু হইল?

গাড়ি আশুলিয়া পার হতেই আমার চোখ মুখ বেঁধে ফেলা হলো। না বাঁধলেও সমস্যা ছিল না, এদিকের আমি কিছুই চিনি না। মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা দেখলাম আশুলিয়া সুইটস, তাই বুঝলাম এটা আশুলিয়া। জীবনে এইদিকে আসাও হয় নাই। শুনেছি বছর বিশেক আগেও এইখানে ধানগাছ লাগাইতো। এয়ারপোর্ট হওয়াতে এরা এখন নতুন ঢাকাবাসী সাজছে। নইলে আমরা গ্রামের পরিবেশ অনুভব করতে আজ আশুলিয়া যাইতাম। তালগাছের সাথে সেলফি নিয়ে ক্যাপশন দিতাম, দেখো বন্ধুরা গাছে কত ডাব ঝুলছে।

চোখ বাঁধার পরে কতদূর এসেছি জানা নেই। গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা ঘরে এনে আমার হাত পা চেয়ারের সাথে বেঁধে চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে একটা টিনের ট্রাঙ্ক ছাড়া কিছুই দেখলাম না। দেওয়ালের সিমেন্ট খসে পড়েছে। সামনের দেওয়ালে লাভ চিহ্নের মাঝে A+S লেখা। বুঝা গেল আমার আগেও কোনো পাগল প্রেমিক এই ঘরে এসেছিল। S দিয়ে সাদিয়ার নাম হতে পারে, তাহলে A কার নাম? সাদিয়ার আগের প্রেমিক? কিন্তু সাদিয়া তো বলেছে আমার আগে ওর কোনো প্রেমিক ছিল না!

সাদিয়া হচ্ছে আমার বর্তমান প্রেমিকা। আমার ধারণামতে যার বাবার লোকেরা আমাকে এখানে ধরে এনেছে। সাদিয়ার বাবার অনেক টাকা। খুব সুন্দরী মেয়ে। অজানা কারণে বড়োলোকের মেয়েরা সুন্দরী হয়। তবে সাদিয়া অনেক নরম মনের মেয়ে। আমি জানি মেয়েটা আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। আপনারা যদি ভেবে থাকেন আমি ওর বাবার টাকার প্রেমে পড়েছি, তাহলে আপনারা ঠিক-ই ভেবেছেন। সেলিব্রেটিদের কাছে প্রেমের কোনো দাম নেই।

A দিয়ে কি কী নাম হতে পারে? আজিজ? নাহ সাদিয়া এমন আনস্মার্ট নামের লোকের প্রেমে পড়বে না। আরিয়ান? হতে পারে। বাট ব্যাটার নাম সত্যিই আরিয়ান ছিল? নাকি শাহরুখ খানের ছেলের নাম দেখে নিজেই নিজের নাম বদলে নিয়েছে? নাম যাই হোক শালা যে এই ঘরে এসেছিল ভাবতেই আমার পৈশাচিক আনন্দ হয়। আবার নিজের পরিণতির কথা ভেবে কষ্টও হয়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। বিরিয়ানি খাওয়ার পরে শরীর ছেড়ে দেয়। এতক্ষণ ভয়ে ঘুম আসেনি। বাতি নিভিয়ে সুঠামদেহীরা চলে যেতেই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

সকালে কখন ঘুম ভেঙেছে জানি না। ঘরের অন্ধকারে সময় বুঝা যাচ্ছে না। লম্বা শুকনা একটা ছেলে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে লাইট অন করে বলল, "গুরু ভয় পাবেন না, আমি আপনার একজন কঠিন ফ্যান। বলতে পারেন আপনার সবথেকে বড়ো ফ্যান। আমার মতো পাগলা ফ্যান আপনার আর নাই। আর কোনোদিন থাকবেও না।"

আমার আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। এ কেমন ফ্যান? কিডন্যাপ করে নিয়ে এসে নিজেই নিজের ভক্তি জানাচ্ছে। তাও আবার দু'হাত শক্ত করে চেয়ারের হাতলে বেঁধে রেখেছে। মুখে স্কচ দিয়ে আটকে রেখেছে। গত পরশু বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগেছে। নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। ভাগ্যিস শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হয়নি। নইলে এই পাগলা ফ্যানের খপ্পরে এতক্ষণে মারা পড়তাম।

আমার মনে তখনো ভয়। এটা সাদিয়ার ভাই না তো আবার? সাদিয়া তো বলেছিল ওর কোনো ভাই নেই। যার A দিয়ে প্রেমিক জন্ম হতে পারে, তার ভাইও টুপ করে আবির্ভাব হতে পারে। কিন্তু সাদিয়ার ভাই আমাকে গুরু ডাকবে কেন? ডাকলে দুলাভাই ডাকবে। লম্বা ছেলেটি বাইরে থেকে একটা টুল এনে আমার সামনে বসে বলল, "তা কেমন আছেন, গুরু?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন ভাই।"

"ভাই বলবেন না গুরু। আমি আপনার শিষ্য। আমার স্থান আপনার পায়ে। তুই করে বলবেন।"

"ভাই আমাকে কিডন্যাপ করেছেন কেন? আমার তো টাকাপয়সা নাই, ভাই।"

"আহা গুরু ভাই বলবেন না। নাম ধরে ডাকেন। আমার ফেইসবুক নাম কেয়ারলেস সাকিব। আপনাকে প্রায়ই মেসেজ দেই। আপনি দেখেন না।"

"মেসেজ না দেখায় কিডন্যাপ করেছ?"

“কী যে বলেন না গুরু। এটা কিডন্যাপের কোনো কারণ হতে পারে? তবে হ্যাঁ, খারাপ লাগে এন্সার না পাইলে। অথচ আমার মেয়ে ফেইক আইডিতে আপনি ঠিক-ই রিপ্লাই দেন। অপ্সরী নীলা আইডিটা আমার গুরু।”

“তো কিডন্যাপ করলে কেন?”

“কারণ তো অবশ্যই জানবেন। তার আগে বলেন খাবেন কী?”

“আমার ঠিকানা কীভাবে জানলে?”

“ওমা! আপনিই তো চেকইন দিলেন ইটিং বিরিয়ানি অ্যাট উগান্ডা বিরিয়ানি হাউজ!”

“তোমার বন্ধুদের দিয়ে আমাকে কিডন্যাপ করিয়ে ফেললে?”

“বন্ধু হতে যাবে কেন? ভাড়া করেছি গুরু। আমার বাবার অনেক টাকা। আমি যা ইচ্ছা করতে পারি।”

“তো বললেই তো পারতা মিটিং করলে টাকা দিবা, আমি নিজেই আসতাম।”

“ছিহ্ গুরু। আপনার মতো মহান ব্যক্তিকে আমি কীভাবে টাকার লোভ দেখাই বলেন? আসলে আপনাকে ধরে আনার কারণ অন্য। বলেন না কী খাবেন? আপনার না ‘ভ্যাটম্যান বার্গার হাউজের’ বার্গার খুব পছন্দের। এনে দেবো?”

“একটা কোক খাবো শুধু। গতরাতে বিরিয়ানির পরে কোক খাওয়া হয়নি। তার আগেই ধরে নিয়ে এসেছে।”

ছেলেটি বেরিয়ে দরজা আটকে চলে গেল। এ কেমন পাগল বাপ! নেশা টেশা করে মনে হয়। শরীরের অবস্থা দেখলেই বুঝা যায় বাপের টাকা ধোঁয়ায় উড়ায়। ভক্ত বলে ধরে নিয়ে আসবে! আমার তো বিশ্বাস হয় না। অন্য মতলব আছে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কিছুই খোলাসা করছে না। আমার গলা শুকিয়ে আসে।

পাগল ফ্যান আমার অনেক আছে। এই তো গত বছরের বইমেলায় ‘ভন্ড প্রেমিক’ বইটি বের হবার পরে সে কী উন্মাদনা! মেয়েরা তো অটোগ্রাফ না নিয়ে বাসায় যাবেই না। এরমধ্যে মেলায় একদিন এক ছেলে এসে বায়না ধরল আমার পরনের পাঞ্জাবিটি তার চাই-ই চাই। এটা নাকি সে বড়ো ফ্রেমে বাঁধাই করে তার ঘরে লাগাবে। যতই বলি এটা একজনের দেওয়া গিফট। মানেই না, পা ধরে বসে পড়েছে। বলে যত টাকা লাগে দিবে, তাও পাঞ্জাবি তার চাই-ই চাই। কী আর করার, ভক্ত বলে কথা। সাড়ে সাতশ টাকার পাঞ্জাবি পনেরো হাজার টাকায় দিয়েই দিলাম। তাও যদি ওর মনে আশা পূর্ণ হয়। সেই টাকা দিয়েই এতদিন চলেছি। প্রকাশক বই বিক্রির একটি টাকাও দেয়নি।

একদিন তো আরো অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল এক মেয়ে। অটোগ্রাফ নিতে এসে বলল, “আই লাভ ইউ।”

আমি মুচকি হেসে বললাম, “সবাই বলে। ধন্যবাদ।”

মেয়ে বলে, “আমি অন্য সবার মতো না।”

আমি আবারো মুচকি হেসে বললাম, “সব মেয়ে এটাই বলে, ধন্যবাদ।”

কিছুক্ষণ বাদে নজরুল মঞ্চ থেকে মাইকে একটা মেয়ে কণ্ঠ দেখি আমার নাম ধরে ডাকছে। এগিয়ে যেতেই দেখি সেই মেয়ে। মাইকে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, “শুনে রাখুন সবাই, আমি ওকেই ভালোবাসি। ও যদি আমাকে ভালো না বাসে। আমি এখানেই সুইসাইড করব।”

ভেনিটি ব্যাগ থেকে একটা ছোটো বোতল বের করে মেয়েটি খেয়ে নিতে উদ্যত হয়। আশেপাশের লোকেরা আমাকে পাষাণ বলে গালি দিচ্ছে। কিছু কিছু মেয়ে দরদী ভাই আমাকে মারতে তেড়ে আসছেন, অন্যরা আবার তাদের ঠেকাচ্ছেন। পাবলিক প্রেশারের পড়ে ভালোবাসা গ্রহণ করতেই হলো। সেই মেয়েটিই ছিল সাদিয়া। আর সেই বোতলে ছিল কাশির সিরাপ।

দরজা খুলে সাকিব নামের লম্বা শুকনা ছেলেটি আবার ঘরে ঢুকল। তার এক হাতে একটি ঠান্ডা কোকের বোতল। বোতলের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটা দেখেই বুঝা যায় কোকটি ঠান্ডা। অন্য হাতে নেটের ব্যাগে পরোটা সম্ভবত। ঠোঙ্গার কাগজে তেলের ছাপ দেখেই পরোটা বুঝা যায়। সাথে কী এনেছে? ভাজি নাকি হালুয়া? এই সকালে হালুয়া খেলে এসিডিটি হবে। খালি পেটে মানুষের ঘ্রাণশক্তি বেড়ে যায়। ছেলেটা কাছে এসে বসতেই ভাজির ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আমি আশ্বস্ত হই।

ছেলেটা শুরুতেই কোকের বোতল খুলে আমার মুখে ধরে। আমি ঢক ঢক করে কোক গিলে নেই। গতরাত থেকে পিপাসা। এরপরে ছেলেটা পরোটা ভাজি আমার মুখে তুলে দেয়। আমি মোটেও প্রস্তত ছিলাম না। আমার মনে পড়ে বাবার কথা। ছোটোবেলায় বাবা এভাবে খাইয়ে দিতেন। বড়ো হবার পরে বাবার থেকে দূরত্ব রেখে থেকেছি। সেলেব্রেটি হবার পরে ফ্যামিলির সাথে দূরত্ব আরও বেড়েছে। সারাদিন এই ফ্যান ফলোয়ার নিয়েই থেকেছি। আমার চোখ ভিজে উঠে। আমি সত্যিই কেঁদে ফেলি। কেয়ারলেস সাকিব আমাকে জিজ্ঞেস করে, “গুরু কাঁদছেন কেন? এত বড়ো সেলেব্রেটি কিডন্যাপের ভয়ে কাঁদলে কেমন দেখায়? কাঁদব আমরা আপনার লেখা পড়ে। থামেন তো, অনেক হইছে। খান এখন।”

“ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে। তাই কাঁদছি।”

“কেন ছোটোবেলায় পরোটা ভাজি খান নাই?”

“আরে না, বাবার কথা মনে পড়ায় কাঁদছি।”

“আপনার বাবা নাই? মারা গেছেন?”

“আরে না, আমি ছেলে হয়েও নাই। মরে গেছি।”

এরপরে চলে দীর্ঘ নীরবতা। কেয়ারলেস সাকিব আমাকে খাইয়ে দেওয়া শেষে আবার চা আনতে বের হয়েছে। আমার মায়ের কথা মনে হয়। ছোটোবেলায় একটু তোতলানোর সমস্যা ছিল। আমার মা তাদের বলতেন, আমার এই ছেলের পিছনেই তোমরা মেয়ে নিয়ে ঘুরবা। আমার ছেলে একদিন অনেক বড়ো হবে। কত বড়ো হয়েছি জানি না। কিন্তু মায়ের সাথে অনেক বড়ো দূরত্ব এসেছে। এত বড়ো যে ভেবে দেখার সময়টাও হয়নি। আজকে এই পাগলের পাল্লায় না পড়লে হয়তো ফ্যামিলির মায়াটা বুঝতাম না। অন্তর্জালের এক মায়ার জগতে হারিয়েই যেতাম। পাগল ফ্যানটার জন্য আমার ভালোবাসা জন্ম হয়।

চা নিয়ে সাকিব আবার ঘরে প্রবেশ করে। সাকিবের হাতে দুইটি কাপ। একটিতে সে চুমুক দেয়, অন্যটি আমার সামনে ধরে। সাকিবের সাথে চা খেতে খেতে আমার কিছু গল্প হয়। আমি সাকিবকে জিজ্ঞেস করি, “এবার তো বলবা কেন ধরে এনেছ?”

“জি গুরু বলব।”

“কেন আনছ ভাই?”

“আহা! আবার ভাই বলছেন। আপনার মর্যাদা নষ্ট হবে যে।”

"আরে তোমার জন্য আজকে নিজের অনেক ভুল বুঝতে পারছি। তুমি আমার ভাই-ই হও আজ থেকে।"

"কেন ধরে এনেছি জানলে একথা বলতেন না।" (সাকিবের মুখের ভাব বদলে যায়)

"কেন সাকিব?" (আমার চেহারায় ভয় কাজ করে)

"আপনার দুই হাত আমি কেটে নিব। এখনো আমাকে ভাই বলবেন?"

"হাত কাটবে কেন?"

"আমি তো বলেছি আমি আপনার পাগলা ফ্যান। আমি চাই না আপনি আরো লিখেন। অন্য কেউ আমার থেকে বড়ো ফ্যান হয়ে যাবে আমি সহ্য করব না।"

"অন্য কেউ হবে কেন? তুমিই থাকবা। আমি বললাম তুমি থাকবা সাকিব। আমার সব বই তোমাকে উৎসর্গ করব।"

"না, গুরু। আমি থাকতে পারব না। আমি আর দুই মাস বাঁচব। ক্যান্সার হয়েছে। আমি এই পৃথিবীতে আপনার একমাত্র পাগলা ফ্যান হয়ে থাকতে চাই। এজন্যে আমার আপনার হাত দুটি আমার চাই।"

সাকিব আমার বেঁধে রাখা দুই হাতের ওপরে ওর দুই হাত রেখে অঝোরে কাঁদছে। আমি তাকিয়ে আছি আমার হাতের দিকে। এই হাত না থাকলে আমি কিছুই না। আমার ফ্যান ফলোয়ার কিছু না। আমার পৃথিবীই আমার কাছে মূল্যহীন। আমি সাকিবকে ডাকি। সাকিবকে বলি, "অন্য উপায় তো আছে সাকিব। ধরো আমি আর লিখব না। তাহলেই তো হলো তাই না?"

"তা হয় না। লেখকদের আমি চিনি। এরা না লিখে থাকতে পারবে না। আপনিও পারবেন না।"

"তা ঠিক। কিন্তু অন্যরা যে আমার লেখা মিস করবে। একজন পাগলা ফ্যান হয়ে তোমার খারাপ লাগবে না?"

"না গুরু। লাগবে না। আমি স্বার্থপর হয়ে মরতেও দ্বিধা করব না। আপনার হাত আমার চাই।"

"কিন্তু হাত ছাড়া তো আমার জীবন অচল। আমি কী করব?"

"আমাকে অভিশাপ দিবেন। বাকি জীবন অভিশাপ দিয়ে যাবেন। অভিশাপেই আমাকে মনে রাখবেন।"

হো হো করে উচ্চশব্দে হাসতে হাসতে সাকিব এগিয়ে যায় ঘরের কোণায় পড়ে থাকা টিনের ট্রাঙ্কটার দিকে। ট্রাঙ্ক খুলে সাকিব যা বের করল তা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। একটা গাছ কাটার ইলেক্ট্রিক মেশিন। ভূতের ছবিতেই এসব ট্রি-কাটার দেখেছি। সাকিব মেশিনটি নিয়ে আমার সামনে এসে করুণ মুখে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন গুরু। বলেই সাকিবের হাতে ভোঁ ভোঁ শব্দ তুলে মেশিনটি চালু হলো। এরপরে আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন চোখ মেলি তখন দেখি সামনে এক বৃদ্ধা মহিলা। আমার মুখে পানির ছিটা দিচ্ছেন আর বলছেন, "মরে গেছিস বাপ? মরে গেছিস নাকি?"

এই বৃদ্ধাকে আমি চিনিও না। কেউ মরে গেলে পানির ছিটা দিয়ে মরে গেছে কিনা জিজ্ঞেস করা হয় তাও আমি জানতাম না। সম্বিৎ ফিরে আমি আমার হাতের দিকে তাকাই। আমার হাত অক্ষত আছে। পাগলটা আমার হাত কাটেনি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমি কোথায়? এখানে ফেলে গেল কখন? সামনে তাকিয়ে দেখি একটা দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আশুলিয়া সুইটস।

এরপর আমার জীবন সত্যিই বদলে গেছে। আমি পরিবার কী, মায়া কী, বুঝতে শিখেছি। আমার বাবা মায়ের সাথেই বেশি সময় কাটে। আমি বাবা মায়ের মূল্য শিখেছি। সাদিয়ার বাবা নতুন একটা লবনের ফ্যাক্টরি করেছেন। সেদিকে আমার কোনো লোভ নেই। সাদিয়াকে সোজা বলে দিয়েছি, বাবার টাকায় বাহাদুরি আমার সাথে চলবে না। থাকলে গরীবের কুঁড়েঘরেই থাকতে হবে। ফেইসবুকেও নিয়মিত ঢুকি। খুঁজে খুঁজে সবাইকে রিপ্লাই দেই। কেয়ারলেস সাকিবের আইডিটাও পেয়েছি। কিন্তু ওর মেসেজগুলো রিপ্লাই দিতে পারি না। আইডি ডিএকটিভ করা। আমার খুব খারাপ লাগে ছেলেটার জন্য। আজকে আমি ওর কারণেই বাস্তবতা শিখেছি। এবছরের বই মেলায় আমার বইটির উৎসর্গ পত্রে লিখেছি,

উৎসর্গ

কেয়ারলেস সাকিব

আমার ছোটো ভাই।

বইমেলার পরে হঠাৎ একদিন ফেইসবুকে কেয়ারলেস সাকিবের আইডি থেকে মেসেজ দেখে বুক ধক করে উঠে। আমি দ্রুত মেসেজ ওপেন করে দেখি লিখেছে, "গুরু বই উৎসর্গ করেছেন দেখলাম।"

"তুমি বেঁচে আছো?"

"কেন থাকব না? রাখে আল্লাহ মারে কে?"

"তুমি না বলেছিলে দুই মাস বাঁচবা?"

"মিথ্যা বলেছি। এইটাই আমার কাজ ছিল, গুরু।"

"মানে বুঝলাম না?"

"আপনি বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। আপনাকে সঠিক পথে আনার জন্যই আমি কাজটা করেছি।"

"তার মানে সব প্ল্যান ছিল?"

"জি, গুরু। সব প্ল্যান মাফিক ছিল। আপনি সঠিক পথে এসেছেন দেখে ভালো লাগল।"

যেহেতু আমি সেলেব্রেটি এবং আমার অনেক বুদ্ধি তাই আমার খটকা লাগে। আমি জিজ্ঞেস করি, "সাকিব সত্যি করে বলো কে তোমাকে ভাড়া করেছিল?"

অনেক্ষণ সাকিবের কোনো উত্তর নেই? কে সাকিবকে এই কাজ দিতে পারে? কে আমার এই শুভাকাঙ্ক্ষী? কেন এমন করল? এতে তার কী লাভ? আমি কি তাকে দেখেছি? আমি কি তাকে চিনি? সে কি আমার আপন কেউ? নাকি দূরের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী?

এসব প্রশ্ন যখন আমার মনের মধ্যে তড়িৎবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনি টুপ করে করে সাকিবের মেসেজ এলো, "আপনার বাবা।"

মশলা ভূত

সোহাইল রহমান

"ভাই তুই আমাকে বাঁচা, তোর আল্লাহর দোহাই লাগে, বাঁচা আমাকে।"

আমার বাল্যবন্ধু সমীর আরেকটু হলে আমার পা জড়িয়ে ধরে।

আমি লাফ দিয়ে সরে যাই, "আরে কী হয়েছেটা কি, বলবি তো আমাকে।"

সমীর প্রায় কেঁদে দেয় এমন অবস্থা। বলে, "আমার বাসায় ভূতের আক্রমণ হয়েছে। তুই আমাকে বাঁচা প্লিজ। একমাত্র তুই-ই পারিস আমাকে এই ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে।"

আমি আনিসুর রহমান। একটা কলেজে হিস্ট্রি পড়াই। এছাড়া ভূত-প্রেত নিয়ে আমার প্রচুর আগ্রহ। ভূত নিয়ে দুটো বইও লিখেছি। ভূতদের সামাজিক রীতিনীতি আর আর হরেক রকম ভূতুড়ে রান্না। বাস্তব দুনিয়ায় একটা বইও দশ কপির বেশি বিক্রি না হলেও, ভূতসমাজে দুটো বই-ই বেস্টসেলার। যদিও আমার এই কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। আমার প্রকাশকও না। উনি রাগ করে বলেছেন, "একটা টাকা আয় হলো না, এমন বালের বেস্টসেলার দিয়ে আমি কী করব?"

উল্লেখ্য, ভূতেরা তো আর টাকা দিয়ে বই কিনবে না। তাদের মূদ্রা আলাদা। চাঁদের আলো। ভূতসমাজে চাঁদের আলো খুব দামী জিনিস হলেও, আমাদের এখানে আমরা ফ্রিতে ইউজ করে যাচ্ছি। যাই হোক, আসল কথায় আসি। আমার বন্ধু সমীর আর দশজনের মতো ভূতপ্রেত একদমই বিশ্বাস করে না। আমাকে নিয়ে বহু হাসাহাসি করেছে সারা জীবন। আজ সেই মানুষটা যখন ভূতের ভয়ে কাপাকাপি শুরু করে, সত্যি বলতে ব্যাপারটা আমার জন্য বড্ড আনন্দ বয়ে আনে। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করা যাবে না ভুলেও। খুব চিন্তিত এমন একটা ভান করে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে একটু খুলে বলতো কী ব্যাপার?"

সমীর হড়বড় করে যেটা বললো, সেটা হলো, ওর বাসায় আজগুবি কান্ড ঘটছে গত এক সপ্তাহ যাবৎ। কোনো খাবার রান্না করে রেখে দিলে, খাওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে সেটা প্রচণ্ড পরিমাণে লবনাক্ত। মুখে দেওয়ার মতো না। তিতা বিষ। অথচ রান্নার সময় লবণ পরিমাণ মতোই দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবার একই ঘটনা ঘটছে। বাইরে গিয়ে খেতে হচ্ছে গত একসপ্তাহ।

আমি হাসলাম, "আরে, এই ব্যাপার? এটা হলো লবণ ভূত।"

"লবণ ভূত?"

"হুম। ভূতদের একটা প্রজাতি। এরা খুব দুষ্ট প্রকৃতির হয়। এরা মানুষের বাসাবাড়ির রান্নাঘরে থাকে, আর রান্না করা খাবারে লবণ মিশিয়ে দেয়। এছাড়াও আছে, ঝাল ভূত, হলুদ ভূত, আদা ভূত, জিরা ভূত। এরা সবাই মোটামুটি একই গোষ্ঠীর। এদের গোষ্ঠীগত নাম হলো, মশলা ভূত।"

"তুই কীভাবে জানিস?"

“আমি জানবো না? আমার সাথে ভূতদের হরদম উঠাবসা। একটা ঝাল ভূত বহুদিন আমার বাসার রান্নাঘরে ছিল। তার সাথে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া আমার পরবর্তী বইয়ের টপিক হলো, ভূতদের প্রকারভেদ। সেখানে মশলা ভূত নিয়ে বড়োসড়ো একটা চ্যাপ্টার আছে।”

সমীর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, “আসলে, বিজ্ঞান এত উন্নতি করে ফেলেছে। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, কম্পিউটার বানিয়েছে, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করছে, এই সময় এসেও এই ভূতে বিশ্বাস করা ব্যাপারটা ঠিক কেমন যেন!”

আমি রাগ দেখাই, “তো করিস না বিশ্বাস। তোকে তো কেউ দিব্যি দেয়নি। এখন তো নিজের চোখে লবণ ভূত দেখতেছিস, এখন কী বলবি? তাছাড়া তোরা বিজ্ঞানপন্থী লোকজন সবসময় এই উদাহরণ কেন দিস যে, মানুষ চাঁদে গেছে, অমুক করেছে, তমুক করেছে, তাই ভূত বিশ্বাস করা যাবে না? আরে ভাই, ভূতের সাথে চাঁদে যাওয়ার কি সম্পর্ক। আগে মানুষ ভাত খেত, চাঁদে যাওয়ার পর কি ভাত খাওয়া বাদ দিছে? আগে মানুষ সেক্স করে বাচ্চা জন্ম দিতো, এখন কি মেশিনে দেয়? না, তো? তাইলে ভূত আগে বিশ্বাস করা গেলে এখন কেন যাবে না? তাছাড়া এত যে চাঁদ চাঁদ করিস, চাঁদে প্রথম পা কে রাখে বল তো?”

“নীল আর্মস্ট্রং।”

“উঁহু, হয়নি। চাঁদে প্রথম পা রাখে অকলা পিতু।”

“কী বলিস? এটা কে?”

“এটা না, বল ইনি। ইনি একজন পিছলা ভূত। ভূতদের জগতে বড়ো মহাকাশ বিজ্ঞানী। সুতরাং বিজ্ঞান দিয়ে ভূত বিচার করা বাদ দে। এই সেক্টরে মানুষের থেকে ভূতরা বহু এগিয়ে।”

সমীর আমার কথার বিপরীতে কোনো যুক্তি খুজে পায় না। আগে হলে হেসে উড়িয়ে দিত, কিন্তু লবণ ভূতের ঘটনার পর সেই সাহসও আর নেই। আমতা আমতা করে বলে, “এখন আমার করণীয় কী? সারা জীবন কি রেস্টুরেন্টে খেয়ে যাব? নাকি নিজের বাসা ছেড়ে এখন কোনো ভাড়া বাসায় গিয়ে উঠব?”

“দাঁড়া, আমাকে একটু ভাবতে দে। একেক ভূত থেকে রক্ষা পাওয়ার পদ্ধতি একেক রকম। লবণ ভূতের ব্যাপারটা একটু খুজে বের করতে হবে। টাইম লাগবে।”

সমীর ক্লান্ত গলায় বলে, “এই ভূতরা কেন আসে আমাদের জগতে?”

“মানে কী? এই জগত কি তোর বাপের নাকি? মানুষের যেমন এখানে থাকার অধিকার আছে তেমনি ভূতদেরও আছে। আমাদের আশেপাশে ভূত দিয়ে ভরা। আমরা দেখতে পাই না তাই। তাছাড়া অধিকাংশ ভূতই খুব ভালো, মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু লবণ ভূতের মতো কিছু দুষ্ট ভূত থাকেই।”

“কী বলিস! আমাদের আশেপাশে অনেক ভূত?”

“না তো কি! এই যে আমরা কথা বলছি, কে জানে আমাদের মাঝে বসে দুটো ভূতও গল্প করছে কিনা। কে জানে এখন তোর ঘাড়ে কোনো বাচ্চা ভূত উঠে বসে আছে কিনা!”

সমীর ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়!

আমি ওকে সাহস দেই, “ভয়ের কিছু নেই। ওরা ওদের মতো থাকে। ওদের লাইফ আলাদা। ওরা মূলত আমাদের উল্টোপাশে থাকে।”

“উল্টোপাশে মানে?”

“মানে, আমরা মেঝেতে থাকি, ওরা উল্টোপাশে ছাদের সাথে লেগে থাকে। আমরা মেঝেতে চেয়ার টেবিল পেতে অফিস করি, আর ওদের অফিস ঠিক আমাদের মাথার ওপর ছাদের সাথে ঝুলন্ত। অবশ্য ওদের কাছে ওটাই সোজা। ওরা ভাবে আমরা মানুষেরা ঝুলে আছি।”

“কি আশ্চর্য!”

“আশ্চর্য তো বটেই। ভূতদের সম্পর্কে যত জানবি ততই অবাক হবি। কিন্তু ওরা বড্ড ভালো, বুঝলি? আমাদেরকে বিরক্ত করে না। আমরা ওদের দেখতে না পেলেও ওরা আমাদের দেখে। তারপরও কিছু বলে না। বাট খারাপ কেউ কেউ সবখানেই থাকে।”

“তুই এতকিছু কীভাবে জানিস?”

“ইচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব। তাছাড়া আমার সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূতের বন্ধুত্ব হয়েছে।”

সমীরের হুট করে কিছু মনে পড়েছে এমন ভান করে বলে, “একটু আগে তুই বললি, তোর ঘরে একটা ঝাল ভূত ছিল। ওর থেকে মুক্তি পেয়েছিস কীভাবে?”

“কয়েক বছর পর ও এমনিই চলে গেছে।”

“ঐ কয় বছর কীভাবে ভাত খেয়েছিস?”

“একটা বুদ্ধি বের করেছিলাম। আমি খাবারে মরিচ দিতাম না। ভূতটা দিয়ে দিত। তাতেই ঠিকঠাক হতো। একটু ঝালঝাল হলেও খেতে সমস্যা হতো না। ইয়েস, আইডিয়া।”

সমীর চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, “আসলেই? বলছিস?”

“হুম, তুই বৌদিকে বলবি রান্নায় কোনো লবণ না দিতে। তাহলেই হবে। লবণ ভূত যেটুকু লবণ দিবে তাতে খুব বেশি সমস্যা হবে না।”

“এভাবে কতদিন চলবে? ভূতটাকে তাড়াবো না?”

“আরে সেটা আমি খুঁজে বের করছি। ততদিন তুই এই পদ্ধতি ফলো কর।”

সমীর খুশি হয়ে চলে যায়। দুইদিন পর ফোন দিয়ে বলে, “কাজ হচ্ছে না।”

“কেন, লবণ ছাড়া রান্না করিসনি?”

“করেছিলাম।”

“তারপর?”

“লবণ ছাড়া রান্না করলে ঐ হারামজাদা একটুও লবণ দিচ্ছে না। খাবার একদম পানসে হয়ে যায়। খাওয়া যায় না।”

“তাহলে মেবি চলে গেছে সে। এবার স্বাভাবিক লবণে রান্না করে দেখ।”

সমীর হতাশ গলায় বলে, “সেটাও করেছিলাম। সেদিন আবার লবণ দিয়েছে বেশি করে। খাওয়া যায়নি।”

“তাহলে তো খুব ঝামেলায় পড়া গেল। ভূতটা সম্ভবত শুধু দুষ্টুমি করে লবণ দিচ্ছে না। কোনো কারণে তোর ওপর রেগে আছে। এজন্য ইচ্ছা করে এসব করছে। তোকে শিক্ষা দিতে চায়!”

“আমার ওপর কেন রাগবে?”

“রাগতেই পারে। তুই ভূতদের নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলিস, ওরা তো আমাদের সাথেই থাকে। শুনে ফেলেছে হয়তো। তাতে ওদের ভূতানুভূতিতে আঘাত লেগেছে। যৌনানুভূতি বা ধর্মানুভূতি থেকে ভূতানুভূতি অনেক সিরিয়াস ব্যাপার।”

সমীর কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, "এখন আমার কী করা উচিত? এইভাবে প্রতিদিন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া কি সম্ভব, তুই-ই বল? জীবনে যা ভুল করার করে ফেলেছি। আর কোনোদিন ভূতদের নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলব বা। এবারের মতো আমাকে বাঁচা। প্লিজ।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। কাল আমি তোদের বাসায় আসছি। দেখি কোনোভাবে ভূতটার সাথে আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করা যায় কিনা।"

"আচ্ছা দোস্ত, আয়। দ্রুত কিছু কর।"

সমীরদের বাসা উত্তরায়। নিজেদের বাড়ি। ছয়তলা বাসার চারতলায় ওরা থাকে। বাকিসব ভাড়া দেওয়া। দুই ছেলে গলু-মলু আর স্ত্রী সুপর্ণাকে নিয়ে সমীরের সংসার।

আমাকে সমীর আর সুপর্ণা ওদের কিচেনে নিয়ে গেল। যেখানে খুব সম্ভবত লবণ ভূতটা থাকে। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা। আলো ঝলমলে। মনে হলো, একটু বেশিই আলো। খেয়াল করে দেখি মোট ছয়টা লাইট লাগানো এই ছোট্ট রান্নাঘরে। অবাক হয়ে ব্যাপারটা সমীরকে জিজ্ঞেস করতেই বললো, "আমি শুনেছি ভূতরা অন্ধকার জায়গায় থাকে। আলো ভয় পায়। এজন্য লাইট লাগিয়েছি এতগুলা।"

"হাইরে গাধা, তুই কি পাগল? এখনো এইসব পুরাতন ধ্যান-ধারণা নিয়ে পড়ে আছিস। আলোতে ভূতদের সমস্যা কেন হবে? ওরা তো যাবতীয় কাজ আলোতেই করে। ভূতরা আগুন, আলো, এইসব দেখলে ভয় পায় এগুলো সব গুজব। আচ্ছা বল তো, বৈদ্যুতিক বাতি প্রথম আবিষ্কার কে করে?"

সমীর উত্তর দেওয়ার আগেই পাশ থেকে বৌদি বললো, "টমাস আলভা এডিসন।"

আমি হাসলাম, "উঁহু, হয়নি। প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি আবিস্কার করে আটানা গোতু।"

"কী বলেন! এটা আবার কে?"

"এটা না বৌদি, বলুন ইনি। ইনি একজন শুকনা ভূত। ভূত সমাজের খুব বড়ো বিজ্ঞানী। বৈদ্যুতিক বাতি ছাড়াও ইনার আবিস্কারের মধ্যে আছে টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফেসবুক আর টাইম মেশিন!"

"টাইম মেশিন?"

"হ্যাঁ, ভূতেরা এটা অলরেডি আবিস্কার করে ফেলেছে। অথচ মানুষ পারলো না। দেখা যাবে আরো কয়েকশ বছর পর মানুষ এই জিনিস আবিস্কার করে নিজেদের নামে চালাবে। অথচ আড়ালে রয়ে যাবে মহান বিজ্ঞানী আটানা গোতুর নাম। অবশ্য আমি জ্ঞান বিজ্ঞানে ভূতের অবদান নামে একটা বই লেখার ব্যাপারে ভাবছি।"

সমীর অধৈর্য গলায় বলে, "এগুলো ছাড়, তুই আমাকে এই লবণ ভূত থেকে বাঁচার উপায় বল দোস্ত।"

"সেজন্য আমাকে এই রান্নাঘরে একা একা দুই ঘণ্টা থাকতে হবে। ততক্ষণে আমার জন্য রান্না করে ফেল।"

"রান্না করলে লবণের জ্বালায় খাওয়া যাবে না। খাবার অনলাইন অর্ডার করবো ফুডপান্ডায়।"

"উঁহু, তার দরকার নেই। ভূত তো রান্নাঘরে থাকবে। তুই অন্য কোনো ঘরে বা ছাদে চুলা বানিয়ে আমার জন্য রান্নার ব্যবস্থা কর। আর যদি পারিস, একটু গরুর মাংস করিস।"

সমীররা হিন্দু হলেও নাস্তিক টাইপ। নিজেরা গরু খায় না ঠিক, তবে আমি বা অন্য মুসলমান কেউ বেড়াতে আসলে তাদের জন্য রান্না করে।

সমীর মাথা নাড়ে, "আচ্ছা ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি। তুই শিওর যে রান্নাঘর ছাড়া অন্য কোথাও রান্না করলে লবণ ভূত কিছু করবে না?"

"মোটামুটি শিওর। আর হ্যাঁ, আমাকে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রেখে যা। কিচেনে আমি একা থাকতে চাই কিছুক্ষণ। দুইঘণ্টা পর আমাকে ডাক দিবি।"

দুইঘণ্টা পর আমি কিচেন থেকে বের হয়ে গোসল করে খেতে বসি। সমীরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলি, "খাওয়া-দাওয়ার পর কথা হবে।"

যথারীতি বাসার অন্য সবাই খাবার মুখে নিয়েই ফেলে দেয়। প্রচণ্ড লবণ হয়েছে। আমি হাসিমুখে খেতে থাকি।

সমীরের অবাক হওয়া দেখে বলি, "গরুর মাংসটা একদম ঠিক আছে। পারফেক্ট স্বাদ।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"খুব ভালোভাবেই সম্ভব। লবণ ভূতের রাগ তোদের ওপর, আমার ওপর না। সে জানে গরুর মাংস তোরা খাবি না, আমি খাবো। এইজন্য কিছু করেনাই।"

"তোর সাথে কথা হয়েছে? কী বললো? আমাদের মাফ করে দেবে?"

"দেবে, কিন্তু তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

"আমি যেকোনো কিছু করতে রাজি। কি করা লাগবে বল।"

"একটা কাগজে একশো বার লিখতে হবে যে, 'ভূত নিয়ে আর কোনোদিন হাসাহাসি করব না।' তারপর সেটা রান্নাঘরে টাঙিয়ে দিয়ে এক সপ্তাহের জন্য অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। একসপ্তাহ পর বাসায় ফিরলেই সব ঠিকঠাক।"

"একসপ্তাহ কেন?"

"কারণ তুই ভূত নিয়ে আজেবাজে কথা বলায় মন খারাপ করে লবণ ভূতের ছোটো মেয়েটা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। এক সপ্তাহ পর ফিরে এসেছে আবার। এজন্য ও চায় তুইও একসপ্তাহ তোর বাসার বাইরে থাক।"

"কিন্তু যাবোটা কোথায়?"

"কক্সবাজার বা সাজেক থেকে ঘুরে আয় না।"

সমীর খুশি মনে বউ বাচ্চা নিয়ে কক্সবাজার চলে গেল। একসপ্তাহ পর ফিরে এলো। তার দুইদিন পর ফোন দিয়ে বললো, "দোস্ত সব ঠিকঠাক। কোনো লবণ নেই আর। তোকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।"

"ধন্যবাদ লাগবে না। তুই ভূত বিশ্বাস করতে শুরু করেছিস এতেই আমি খুশি। আর নিতান্তই যদি কিছু দিতে চাস তো দরিদ্র ভূতদের লেখাপড়ার জন্য মাসে মাসে পাঁচশো টাকা করে ভূত কল্যাণ ফান্ডে দিয়ে দিস। তোর তো টাকার অভাব নেই। তোর জন্য একজন ভূতও যদি লেখাপড়ার সুযোগ পায় তাহলে অরিনি ঘেচুর স্বপ্ন পূরণ হবে।"

"ইনি আবার কে?"

"ইনি খুব বড়ো একজন মহান ভূত। ঠাণ্ডা ভূত গোষ্ঠির। মাদার তেরেসার বহু আগে থেকেই ভূতদের কল্যাণে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।"

“আচ্ছা ঠিক আছে। টাকাটা উনার ফান্ডে কীভাবে দেব?”

“আমার কাছে দিস, আমি পৌছানোর ব্যবস্থা করব।”

সমীর ফোন রেখে দিতেই সুপর্ণা বৌদির ফোন আসে। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে বলে, “আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব। আপনি না থাকলে এসব কিছুই হতো না।”

“আরে বৌদি আমি আর কি করলাম!”

“কিছুই করেননি?”

“নাহ, যা করার তা আপনিই করেছেন।”

“কিন্তু খাবার রান্নার সময় বেশি করে লবণ দিয়ে দেওয়ার বুদ্ধিটা তো আপনারই ছিল। নাহলে সমীরকে কতবার বলেছি কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে, কিন্তু খালি অফিস আর কাজের বাহানা দিত। পরে আপনার বুদ্ধিমতো কাজ করাতে কক্সবাজার ট্যুরটা হলো। সাথে বেশ কিছুদিন আমার রান্না করাও লাগেনি। তিনবেলা বাইরে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আপনি নিঃস্বার্থভাবে যা করলেন, এই ঋণ ভুলব না।”

“একেবারে নিঃস্বার্থও না কিন্তু। সমীর সবসময় ভূত নিয়ে হাসাহাসি করত। বিশ্বাস করত না। এখন ঠিকই বিশ্বাস করেছে। আমার হালকা একটা প্রতিশোধ নেওয়াও হলো। হাহাহা।”

“আচ্ছা, ভূত কি সত্যিই আছে?”

“আরে ধুর, কী যে বলেন! এই জামানায় এসেও কেউ এইসব ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে নাকি!”

আমি আনিসুর রহমান। একটা কলেজে হিস্ট্রি পড়াই। পাশাপাশি ভূতপ্রেত নিয়ে গবেষণা করি। বইটই লিখি। এসবই করি নিজেকে আর সবার কাছে একটু অদ্ভুত, একটু আলাদা প্রমাণ করার জন্য। বলতে পারেন আমার শখ এটা। অনেকে হাসাহাসি করলেও আমাকে আলাদা চোখে দেখে। তার আশেপাশে ঘটা ভূতুড়ে, ব্যাখাহীন ঘটনা শুনাতে আসে আগ্রহ নিয়ে। এই খাতে হালকা পাতলা টাকাপয়সাও আয় হয়। অথচ আমি নিজেই ভূতে বিশ্বাস করি না। আমি জানি এসব ভূতপ্রেত বলে কিচ্ছু হয় না। যে সময়ে মানুষ চাঁদে গেছে, মঙ্গল জয় করেছে, সারা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় এনেছে, সেই জামানায় এসে এসব ভূতপ্রেত বিশ্বাস করাটা আর যাই হোক, কোনো সুস্থ মানুষের কাজ হতে পারে না। যারা এখনো ভূতে বিশ্বাস করে, তাদের দেখলে আমারও হাসি পায়।

সুপর্ণা বৌদির ফোন রেখে আমি হাতঘড়ি বের করে সময় দেখি। দুইটা বেজে গেছে। দ্রুত রেডি হয়ে নিই। বাইরে খেতে যেতে হবে। গত দুই সপ্তাহ ধরে ঘরে ভাত খেতে পারি না। যা-ই রান্না করি না কেন, অদ্ভুতভাবে খাওয়ার সময় দেখি খাবারটা প্রচণ্ড ঝাল হয়ে আছে। যেন এক বাটি তরকারিতে এক প্যাকেট রাধুনি মরিচ গুড়া দেওয়া হয়েছে। একদম মুখে দেওয়ার মতো না।

আমি চিন্তিত মুখে বাইরে খেতে যাই। নিশ্চয় এই ঘটনার কোনো না কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা ছাড়া এই পৃথিবীতে কোনোকিছু ঘটে নাকি!

=০=

দৃষ্টি আকর্ষণ

পুরো ম্যাগাজিনটি পড়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
ম্যাগাজিনটি পড়ে ভালো লাগলে পরিচিতদের জানাতে ভুলবেন না
এবং
লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান পূর্বক ম্যাগাজিনটি সংগ্রহে উৎসাহ প্রদান করুন।
তবে ম্যাগাজিনটি আপনি কোনো মাধ্যমে বিনামূল্যে পেয়ে থাকলে অনুরোধ রইলো, ম্যাগাজিনটির সর্বনিম্ন শুভেচ্ছা মূল্য হিসেবে ৫০ টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তায় লাইটার ইয়ুথ ফাউন্ডেশনে অনুদান দেওয়ার।
অনুদান দিতে ক্লিক করুন: https://lighterbd.org/

আপনার জন্য শুভকামনা।
ঘরে থাকুন, নিরাপদ থাকুন।